গল্পে গল্পে বিংশ শতাব্দী



আমিনুল ইসলাম

অ্যাডভেঞ্চার প্রকাশনী ★ ঢাকা

গল্পে গল্পে বিংশ শতাব্দী



আমিনুল ইসলাম

অ্যাডভেঞ্চার প্রকাশনী ★ ঢাকা

গল্পে গল্পে বিংশ শতাব্দী

আমিনুল ইসলাম

গল্পে গল্পে বিংশ শতাব্দী
By আমিনুল ইসলাম

প্রকাশকাল :
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২১
দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২২
তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রকাশনা ও যোগাযোগ :
অ্যাডভেঞ্চার প্রকাশনী
৮/সি, রুপায়ন টাওয়ার, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৯২-০৯৯৬৬৮

বাঁধাই ও মুদ্রণে :
বুশরা প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৩২-৩৩ গাউসুল আযম সুপার মার্কেট
নীলক্ষেত, কাঁটাবন, ঢাকা।

প্রচ্ছদ :
লুৎফি রুনা

প্রচ্ছদের ছবি :
১৯৪৩ সালে ইরানের তেহরান সম্মেলনে প্রথমবারের মতো একসাথে মিলিত হওয়া তিন নেতার ছবি।

দাম : ৬৫০.০০ (ছয়শত পঞ্চাশ টাকা) মাত্র।

Golpe Golpe Bingsho Shatabdi
By Aminul Islam
Price : US $ 10.00 (Ten) only
ISBN : 978-984-35-0995-6

উৎসর্গ-

অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক পিতা মো. নূরুল ইসলামকে...

বিসিএস, সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা, ব্যাংক নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা, সরকারী-বেসরকারী চাকুরীর পরীক্ষাসহ সকল অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য।

গল্পে গল্পে বিংশ শতাব্দী
(টানটান উত্তেজনায় ভরপুর বিংশ শতাব্দীর কাহিনী)

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস অত্যন্ত ঘটনাবহুল। আমরা যারা বিগত শতাব্দীর পরের অর্ধেক অংশের সাক্ষী, তাদের মনে আছে আমেরিকা আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের দ্বন্দ্বমুখর দিনগুলোর কথা। পুরো পৃথিবীর অর্থনীতি আর রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো-এই দুই দেশের মর্জির উপর। স্নায়ুযুদ্ধের পরিস্থিতির কারণেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধে চীন-আমেরিকা বিরোধিতা করে, আর রাশিয়া পক্ষাবলম্বন করে।

স্নায়ুযুদ্ধের পূর্বে বিশ্ব রাজনীতি উলটপালট হয়েছে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে। পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্যকে একেবারে চুরমার করে দেয় দুইটি বিশ্বযুদ্ধ। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের কারণেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেন-ফ্রান্স দুর্বল হয়ে পড়ে; এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে। পাগলাটে জার্মানী পুরো বিশ্বের মালিক হতে গিয়ে দুটি বিশ্বযুদ্ধ বাধায়। কোটি কোটি মানুষ মারা যায় দুটি বিশ্বযুদ্ধে। বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে নিত্য নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়। আমেরিকা কর্তৃক জাপানে আণবিক বোমা নিক্ষেপের কারণে কলঙ্কিত হয় মানব সভ্যতা।

স্নায়ুযুদ্ধের দিন গত হয়েছে, নব্বই দশকের শুরু থেকে একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের পর বিশ্বে মাথাচড়া দিয়ে উঠেছে নিত্য নতুন ইস্যু। জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ, আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ, ধর্মীয় মেরুকরণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিশ্ব জর্জরিত। এসব সমস্যা সৃষ্টির পেছনে বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ঘটনাবলীই দায়ী।

গল্পে গল্পে বিংশ শতাব্দী-বইটিতে বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গল্পের আকারে বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত করে ঘটনাগুলো বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বাজারে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস জানার জন্য অনেক বই আছে। কিন্তু *গল্পে গল্পে বিংশ শতাব্দী* বইটিতে যেভাবে সহজ ভাষায়, সংলাপ আকারে অনেক জটিল বিষয়াবলী আলোচনা করা হয়েছে, তা এক কথায় অনবদ্য। ইতিহাস যাদের কাছে সন তারিখ মনে রাখার এক গোলক ধাঁধা, তারা এ বইটি পড়ে আনন্দের সাথে ইতিহাস জানতে পারবেন।

শুধুমাত্র চাকরীপ্রার্থীদের কাছে বইটি খুব মূল্যবান হয়ে উঠবে তা নয়, যে কোনো বয়সের পাঠক খুব আগ্রহসহকারে বইটি পড়তে পারবেন এবং বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

আমি বইটির সার্বিক সফলতা কামনা করি।

মো. লুৎফর রহমান
সাবেক পরিচালক
কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

লেখকের কথা

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার এক সাক্ষাৎকারে খুব মজা করে একটা ঘটনার কথা বলছিলেন। ঘটনাটা হলো-ইতিহাসের অধ্যাপক সুবিখ্যাত পন্ডিত তপন রায় চৌধুরী উনাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "আরে! তোমাকে দেখে তো আমার হিংসে হয়। আমরা ইতিহাসবিদেরা এত কষ্ট করে ইতিহাসের বই লিখি, কিন্তু লোকজন তো বই পড়ে না। কিন্তু যেইমাত্র তুমি গল্পের আকারে ইতিহাস লেখা শুরু করে দিয়েছো, তখনি দেখলাম হুমড়ি খেয়ে পড়লো লোকজন। ব্যাপারটা কি বলো তো?"

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখক। তাঁর সেই সাক্ষাৎকারটা আমার মনে গেঁথে আছে অনেকদিন যাবত। আমার মনেও একটা সুপ্ত ইচ্ছা ছিলো যে যদি কোনোদিন ইতিহাস নিয়ে কোনো বই লিখি তাহলে সেটা যেন গতানুগতিক বইয়ের মতো না হয়। গল্পের আকারে সংলাপের মতো করে বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনা দিব, যাতে করে পাঠকের মনে থাকে।

সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ২০২০ সালের আগস্ট মাসে আমার লেখা প্রথম বই '*গল্পে গল্পে বিশ্বভ্রমণ*' বেরিয়েছিলো। পাঠকমহলে প্রথম বইয়ের সাড়া পেয়ে আমি উৎফুল্ল। চাকরী প্রত্যাশী শিক্ষার্থীসহ সকলের কাছে আমার বই সমাদৃত হয়েছে।

এই বইটি আমার লেখা দ্বিতীয় বই। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এতই বেশি ঘটনাবহুল ও বিস্তৃত যে-সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে ফেলা অত্যন্ত কঠিন। টানা এক বছর যাবত বইটি লিখেছি আমি। প্রচুর বইপত্র ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ পড়তে হয়েছে আমাকে। ইংলিশ অ্যাডভেঞ্চার গ্রুপে অনেকগুলো পর্ব লিখেছি। গ্রুপে লেখার সময় অনেক পাঠক তাদের মুগ্ধতার কথা জানিয়েছিলেন।

আমি চেয়েছি-বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস যাতে লোকজন খুব সহজে পড়তে পারে। বাজারে এ বিষয়ে যথেষ্ট বই আছে। বইগুলোর ব্যাপারে সাধারণ পাঠকদের অভিযোগ হলো-এসব বইয়ে অহেতুক বেশি বেশি তথ্য দিয়ে ইতিহাসকে গুরুগম্ভীর করে ফেলা হয়েছে। কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পর পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

আমি দুটি কাল্পনিক চরিত্র সাজিয়ে সংলাপের আকারে ইতিহাসের যাবতীয় ঘটনা তুলে ধরেছি। বইটি যাদের জন্য লিখেছি, তাদের উপকারে আসলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

আমিনুল ইসলাম
পুরানা পল্টন, ঢাকা
আগস্ট-২০২১।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বইটির দুটি সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রকাশক হিসেবে আমরা অত্যন্ত উল্লসিত। ২০২১ সালে প্রথমবার বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর সর্বমহলে বইটি নিয়ে আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস জানার জন্য এ বইটি হয়ে উঠে এক নির্ভরযোগ্য দলিল। বইটির প্রচারের জন্য আমাদেরকে তেমন কোনো উদ্যোগই নিতে হয়নি। মুগ্ধ পাঠক সমাজই নিজ দায়িত্বে সে কাজটুকু করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। অনেকেই তাদের ইউটিউব চ্যানেলে, ফেসবুকের টাইমলাইনে বইটি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন।

এবার বইটির তৃতীয় সংস্করণ বের হচ্ছে। এই জনপদে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস জানার ক্ল্যাসিক্যাল বই হয়ে উঠুক আমাদের এই প্রচেষ্টা।

সবার ঘরে ঘরে থাকুক **'গল্পে গল্পে বিংশ শতাব্দী'** বইটি।

কর্তৃপক্ষ
অ্যাডভেঞ্চার প্রকাশনী
৮/সি, রুপায়ন টাওয়ার, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
মোবাইল-০১৭৯২-০৯৯৬৬৮

-If history were taught in the form of stories, it would never be forgotten.

(যদি ইতিহাসকে গল্পের আকারে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে এটা কখনোই মন থেকে মুছে যাবে না)

-Rudyard kipling(1865-1936)

প্রাথমিক সূচীপত্র

পূর্ণাঙ্গ সূচীপত্র

গল্প শুরুর আগে........

ইতিহাসের খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানা এবং সেগুলোকে মনে রাখা অনেকের কাছেই বিরক্তিকর। সন, তারিখ আর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের কর্মকান্ড কিছুটা একঘেঁয়েমিরও সৃষ্টি করে। অবশ্য যারা ইতিহাসের নিবিড় পাঠক, তাদের কথা আলাদা।

যারা বিসিএস, ব্যাংকসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং দরকার ছাড়া শখের বশে ইতিহাস পড়তে রাজি নন, তাদেরকে উদ্দেশ্যে করেই বইটি লেখার চেষ্টা করেছি আমি। ইতিহাস পাঠে অনিচ্ছুক পাঠক যেন বইটি পড়তে পারে, সে ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

আর ইতিহাস যাদের প্রিয় বিষয়, ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিষয় যাদের মুগ্ধ করে- তাদের জন্যও এই বই হবে আনন্দের খোরাক। জারিফ ও মামুন নামের দুটি চরিত্রকে উপস্থাপন করে তাদের মধ্যকার কথোপকথনের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর পুরো ঘটনাকে সাজানো হয়েছে।

ধরে নেওয়া হয়েছে, জারিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে পড়াশুনা করে। এখন দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে যাবে। উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবে; এটা তার স্বপ্ন। বিসিএস ম্যানিয়া তাকে গ্রাস করতে পারেনি। পৃথিবীর প্রতিটা দেশের ইতিহাস তার নখদর্পনে বলা চলে। বন্ধু-বান্ধব তাকে ঠাট্টা করে বলে-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এত জ্ঞান দরকার নাই মানুষের। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করা জারিফের নেশা। এই নেশাই তার পেশায় পরিণত হতে যাচ্ছে।

অপরদিকে জারিফের বন্ধু মামুন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে আইবিএ থেকে এমবিএ শেষ করলো মাত্র কিছুদিন হলো। বিভিন্ন ঘটনার মুখোমুখি হয়ে মামুন এখন বিসিএস ক্যাডার হতে চায়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভালো ভালো চাকরির সুযোগ পায়ে ঠেলেছে সে। বিসিএস ক্যাডার হওয়া এখন তার প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সে এবার জারিফের শরণাপন্ন হয়েছে।

সাধারণ জ্ঞান নিয়ে কখনোই পড়েনি সে। বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান থেকে বাংলাদেশ বিষয়াবলী ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর ৫০ টা এমসিকিউ আসে। বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বিশাল ব্যাপার। আন্তর্জাতিক বিষয়ে ১০০ নাম্বার আর বাংলাদেশ বিষয়ে ২০০ নাম্বারের লিখিত পরীক্ষা তো আছেই; এই ৩০০ নাম্বারের বাইরে বাংলা রচনায় কিংবা ইংরেজি রচনায় সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার জড়িত। বাজারে সাধারণ জ্ঞান বিষয় নিয়ে অজস্র বই কিংবা ছন্দব্যাপারীদের ছন্দের অভাব নেই ।

মেধাবী মামুনের ইচ্ছা হলো, কোনোদিন মুখস্থ বিদ্যাকে পাত্তা দেবে না সে। জারিফকে সে বললো, তাকে সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দিতে। যাতে করে সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে তার পরিপূর্ণ ধারণা জন্মে । না বুঝে মুখস্থ বিদ্যা থেকে যেন সে রেহাই পায়। মামুন এর আগে "*গল্পে গল্পে বিশ্বভ্রমন* " বইটি পড়েছে। পুরো পৃথিবী সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা আছে তার।

মামুন জারিফকে বললো, গল্পে গল্পে বিশ্বভ্রমণ-বইতে বিংশ শতাব্দীর আলোচনাটা বাদ পড়ে গেছে। অথচ বিসিএস পরীক্ষার জন্য বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস জানাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবার তাহলে বিংশ শতাব্দীর পুরো ইতিহাস তুমি আমার সাথে আলোচনা করো, যাতে আমি সব বুঝে ফেলতে পারি।

জারিফ বললো, সে কাজটা আমি তোমার জন্য করবো। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা, স্নায়ুযুদ্ধ, বার্লিন দেয়াল প্রতিষ্ঠা ও তার ধ্বংস, আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের রূপকথা, আফগানিস্তানে সোভিয়েতের আগ্রাসন ও তালেবানের উত্থান, সোভিয়েতের পতন........ আরও কতশত ঘটনা বিশ্বে ঘটেছে এই বিংশ শতাব্দীতে। সব বলবো আমি তোমাকে। চলো আমাদের অভিযান শুরু করি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী বিশ্ব

****

পর্ব – ০১

আলোচনা শুরু করলো জারিফ........

বিংশ শতাব্দীর আলোচনা মানে ১৯০১ সাল থেকে নয়। একটু পিছিয়ে যাবো আমরা। ১৮৮৪ সাল থেকে শুরু হবে আমাদের আলোচনা। শেষ হবে-২০০০ সাল পর্যন্ত।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, **১৮৮৪ সাল কেন বিংশ শতাব্দীর আলোচনার ভিত্তি হবে?**

জারিফ বললো, সে ব্যাখ্যা পরে দিবো। আমাকে আগে একটু বলো তো দেখি- **১৮৮৪ সাল নাগাদ বিশ্বে স্বাধীন দেশ কতগুলো ছিলো?**

মামুন আমতা আমতা করতে লাগলো-আটলান্টিকের ওই পারে আমেরিকা মহাদেশের দুই অংশ ছিলো প্রায় স্বাধীন। কিছু দ্বীপপুঞ্জ আর ছোটখাটো ভূখন্ড ছাড়া ইউরোপ মহাদেশ স্বাধীন ছিলো। ৪৭৬ সালে যখন পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়, তারপর থেকে সামন্তবাদের পথ ধরে ধীরে ধীরে ইউরোপ মহাদেশে অনেকগুলো স্বাধীন দেশের জন্ম হয়।

জারিফ এবার থামিয়ে দিলো, "ইউরোপ আর আমেরিকার মহাদেশ কার্যত স্বাধীন ছিলো বলা যায়। তুমি বিশাল এশিয়া মহাদেশের দিকে তাকাও। চীন পরাধীন না হলেও পুরোপুরি দুর্বল। চীনের কাছ থেকে স্বল্প মূল্যে চা ক্রয় করে তাদেরকে টনের টন আফিম গছিয়ে দিলো ব্রিটেন। আফিম বিক্রি নিয়ে দুই দুইটা যুদ্ধ হলো চীনের সাথে। ১৮৩৯-৪২ সালে সংঘটিত হয় প্রথম আফিম যুদ্ধ, আর ১৮৫৬-৬০ সালে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ। কিন্তু চীনের খেলা খতম, কিছুই করতে পারেনি তারা।

জাপানের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। জাপানকে বলা হয় প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক আক্রান্ত না হয়ে জাপান আপন শক্তিতে জ্বলে উঠে উনবিংশ শতাব্দীতে। সে কাহিনী অন্যত্র হবে। এই দুই দেশ বাদে-বিশাল ভারতবর্ষ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া বৃটিশের দখলে। ফ্রান্সের দখলে ইন্দোচীন-লাওস,ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া। ইন্দোনেশিয়া ডাচদের দখলে। আজকের মধ্যপ্রাচ্যের অতিশয় প্রভাবশালী সৌদি আরবসহ-সিরিয়া-ইরাক-জর্ডান-লেবানন-তুর্কীদের দখলে। ইরানকে পুরোপুরি স্বাধীন বলা যায় না, কারণ-ব্রিটেন আর রাশিয়া মিলে ইরানের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছিলো। **এশিয়া মহাদেশে হারিকেন দিয়ে খুঁজলেও তুমি স্বাধীন দেশ পাবে না।"**

মামুন বললো, “কেন? থাইল্যান্ড শব্দের অর্থই হচ্ছে মুক্তভূমি। এমসিকিও গাইডে এই প্রশ্ন পড়তে পড়তে জান শেষ। এশিয়ার কোন দেশটি কখনো কারো উপনিবেশ ছিলো না। সবাই জানে-থাইল্যান্ড। তুমিই বলো-থাইল্যান্ড কি পরাধীন ছিলো?

জারিফ বললো, তোমার কথা ঠিক আছে। কিন্তু থাইল্যান্ড যে স্বাধীন দেশ এতে থাইল্যান্ডবাসীর কোনো কৃতিত্ব নেই। ইউরোপের দুই সাম্রাজ্যবাদী দেশ ফ্রান্স আর ব্রিটেন তো পুরো পৃথিবী লুটে খাচ্ছে-। ফ্রান্সের দখলে ছিলো ওই ইন্দোচীনের তিনটি দেশ। থাইল্যান্ড দেশটাকে ব্রিটেন আর ফ্রান্স মিলে মুক্তভূমি বানালো। একরকম বাফার স্টেটও বলা চলে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন তাদের দখলকৃত ভূমি নিয়ে যাতে একে অপরের সাথে কোনো বিরোধ না হয়,সেজন্য থাইল্যান্ডকে সীমানা বানিয়েছিলো। এজন্যই তো বললাম-থাইল্যান্ড যে কখনোও কারো উপনিবেশ হয় নি-এতে থাইল্যান্ডের কোনো কৃতিত্ব নেই।

তবে, ১৮৮৪ সালের দিকে চীন-জাপান বাদে আরেকটি দেশকে তুমি স্বাধীন বলতে পারো সেটা হচ্ছে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদীদের গোরস্তান। ১৮৮৪ সালের আগে দুবার যুদ্ধ করে বৃটিশরা আফগানদের সাথে । প্রতিবারই পরাজয়ের মুখোমুখি হয় শক্তিধর বৃটিশ রাজ। দেশটি দখল করতে না পেরে অসম সাহসী আফগানদের সাথে সন্ধি করে ব্রিটেন। এই দুই দেশ বাদে-পুরো এশিয়া মহাদেশ পরাধীনতার গ্লানি টানছে। বিশাল আফ্রিকা মহাদেশে লাইবেরিয়া-ইথিওপিয়া ছাড়া সব দেশ পরাধীন। ওশানিয়া মহাদেশে একটাও স্বাধীন দেশ নাই। তার মানে এই যুগটাকে কি যুগ বলা যায়-তোমার মতে?

মামুন বললো-১৮৮৪ সালের সময়কার পৃথিবীকে কি তাহলে বলা যায় পরাধীনতার যুগ?

জারিফ বললো-জ্ঞানীজনেরা এই সময়টার একটা নাম দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে-
Age of imperialism:-

মানে সাম্রাজ্যবাদের যুগ। মাত্র গুটি কয়েকটা দেশ মিলে-পুরো বিশ্বের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। পররাজ্য দখল করে তার সম্পত্তি ভোগ করা মহা সওয়াবের কাজ ছিলো তখন। ইউরোপের দেশগুলি ১৪৯২ সালে কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পর পরই পররাজ্য দখলে নামে। পৃথিবী ব্যাপী ধ্বংসলীলা চালায় শতো শতো বছর ধরে। দাস ব্যবসা-লুণ্ঠন-সম্পদ পাচার-স্থানীয় মানুষকে পাইকারী হারে হত্যা-এমন কোনো অপরাধ নাই যে ইউরোপের ওই তথাকথিত সভ্য দেশগুলো করেনি।

আফ্রিকা মহাদেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা হয়-সেটা তো জানোই। আফ্রিকা আসলে পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো না। আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমের সমুদ্র উপকূল থেকেই তো লাখ লাখ লোককে ধরে নিয়ে গেছে আমেরিকায়। উত্তর আফ্রিকায় ছিলো মুসলিম শাসন। তবে আফ্রিকা মহাদেশের ভিতরের বিশাল অংশে কেউ কোনোদিন ঢুকেনি। তবে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে ধীরে ধীরে। ১৮৮৪ সালের মধ্যেই পুরো আফ্রিকা ইউরোপের দেশগুলির দখলে আসে। এখন ইউরোপীয়রা ভাবলো-আফ্রিকা মহাদেশের দখল নিয়ে যদি আমরা মারামারি শুরু করি-তাহলে সবার জন্যই ক্ষতি। আফ্রিকা মহাদেশের দখল নিয়ে এই ডাকাতির কাজটা যদি একটু আপোষ-মীমাংসা করা যায় তাহলে ক্ষতি কি?

যেই কথা সেই কাজ। ১৮৮৪ সালে জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে আফ্রিকা মহাদেশটা কিভাবে ইউরোপীয় দেশগুলি যুদ্ধ ছাড়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করবে-সে ব্যাপারে একটা আলোচনায় মিলিত হয়। সে আলোচনাটি ইতিহাসে "বার্লিন সম্মেলন" নামে পরিচিত। মোট ১৪টি দেশ আলোচনায় অংশ নেয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, জার্মানি, রাশিয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, তুরস্ক, আমেরিকা সহ মোট ১৪টি দেশ অংশ নেয়। **সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার-যে আফ্রিকা মহাদেশ ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে এই মিটিং-সেখানে ছিলো না আফ্রিকা মহাদেশের কোনো দেশ বা প্রতিনিধি। মানে, আফ্রিকার কালো লোকগুলির কিসের দেশ, আর কিসের মতামত?** সাদা ইউরোপীয়ানদের গোলামি করাই ওদের নিয়তি। জন্মদিনের কেকের চারপাশে যেমন লোকজন জড়ো হয়, ঠিক তেমনি আফ্রিকা মহাদেশের মানচিত্র নিয়ে দর কষাকষিতে নেমে পড়লো সাম্রাজ্যবাদীরা। এ বলে এই দেশ আমার, ও বলে ওই দেশ আমার-ইত্যাদি। আমি এই বার্লিন সম্মেলনটাকে নাম দিতে চাই **"আন্তর্জাতিক ডাকাত কমিটির মহাসম্মেলন"**।

কি বলো মামুন?

"কথা সত্য গুরু। অন্যের দেশ দখল করা নিয়ে যারা এরকম কামড়াকামড়ি করে তারা ডাকাত নয় তো কি?"-মামুনের উত্তর ।

এই সম্মেলন সম্পর্কে জানলেই তুমি প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সহ বিংশ শতাব্দীর পুরো ইতিহাস ভালোভাবে জানতে পারবে।

****

পর্বঃ-০২

এবার আফ্রিকার গল্প শুনোঃ-

জারিফ বললো, ‘‘দেখো মামুন! যেহেতু বার্লিনের ওই সম্মেলনটা হয়েছিলো আফ্রিকা মহাদেশের ভাগ-বাটোয়ারাকে ঘিরে, তাই তোমাকে আফ্রিকা মহাদেশ নিয়েই কিছু কথা বলতে চাই।’’

আমাদের রবিবাবু আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে কবিতা লিখতে গিয়ে কি সুন্দর একটা কবিতা লিখেছেন-

উদভ্রান্ত সেই আদিম যুগে-
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করেছিলেন বিধ্বস্ত-
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে-
রুদ্র সমুদের বাহু-
প্রাচী ধরিত্রির বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেলো তোমাকে,আফ্রিকা

আফ্রিকার লোকজন কালো হওয়ার কারণে দুর্দশা তাদের কপালে যুগ যুগ ধরে ছিলো। আফ্রিকা মহাদেশে কালো লোকদের এই দুর্দশা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিলো। তুমি হযরত মুহম্মদ সাঃ এর দরবারে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল রাঃ এর নাম শুনো নি? তিনিও কিন্তু ছিলেন একজন কালো এবং ক্রীতদাস। তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ার তথা বর্তমান ইথিওপিয়া দেশের একজন অধিবাসী। ইথিওপিয়া হচ্ছে পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ। তার মানে পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলের সাথে আরবের যোগাযোগ ছিলো।

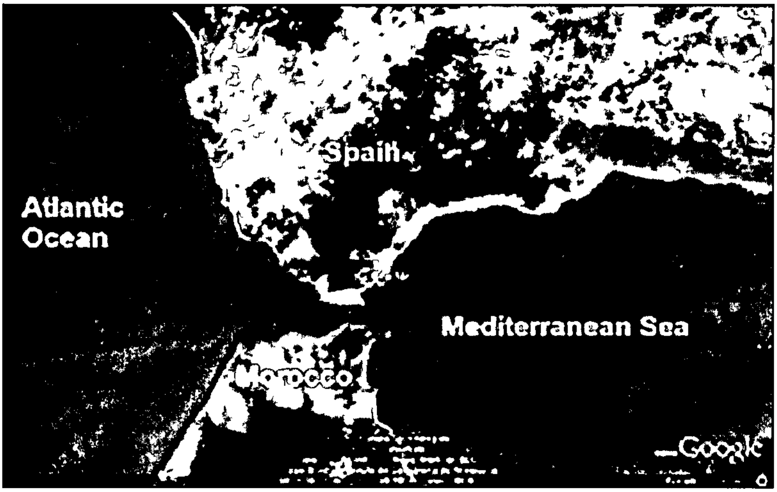
মামুন বললো, তুমি আমাকে আফ্রিকার পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-সবদিক গুলো সম্পর্কে একটা বিস্তারিত ধারণা দাও। তাহলে এগুলো বুঝতে সহজ হবে।

আচ্ছা, তুমি তাহলে মানচিত্রের দিকে তাকাও। পুরো আফ্রিকা সম্পর্কে সহজে একটা ধারণা হয়ে যাক। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরে আছে ভূমধ্যসাগর। ভূ-মধ্যসাগরের ওপারেই আছে ইউরোপ। ইউরোপ থেকে আফ্রিকাকে পৃথক করেছে-মরক্কো আর স্পেনের মাঝে অবস্থিত জিব্রাল্টার প্রণালী।



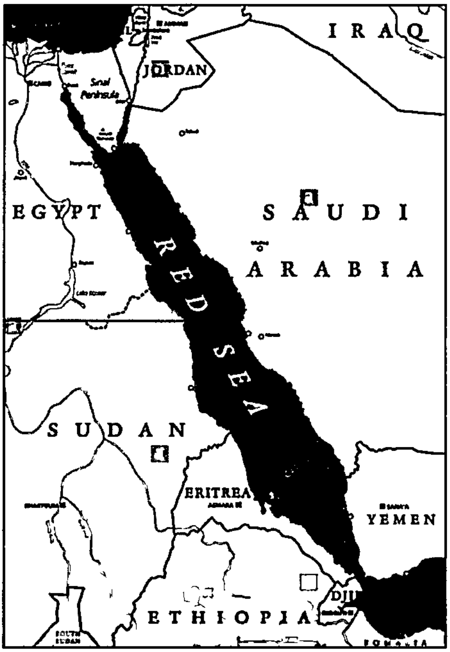
চিত্র – ০১ : মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ যখন স্পেন আক্রমণ করেন-তখন থেকে তার নামানুসারে এই প্রণালীর নামকরণ করা হয়-জাবাল-উত-তারিক বা তারিকের পাহাড়। পরবর্তীতে এই নাম পরিবর্তিত হয়ে-জিব্রাল্টার প্রণালী নামে পরিচিত হয়। এই প্রণালীর মাধ্যমে আফ্রিকা মহাদেশের মরক্কো ইউরোপের স্পেন থেকে পৃথক হয়।

আফ্রিকার পশ্চিম পাশে আটলান্টিক মহাসাগর । আটলান্টিক মহাসাগরের আরও পশ্চিমে আছে নতুন পৃথিবী তথা আমেরিকা মহাদেশ। সর্বদক্ষিনের নগরী কেপটাউনে মিলিত হয়েছে-ভারত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর। আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল পুরোটাই ভারত মহাসাগরের তীরে। এবার তাকাও ইয়েমেনের এডেন বন্দরের দিকে। এডেন বন্দরের দিকে তাকিয়ে দেখো-আফ্রিকা অংশে হচ্ছে ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া দেশ। আবিসিনিয়া ভেঙে এই দুইটি দেশ হয়েছে। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল রাঃ কিভাবে তাহলে মক্কায় পৌঁছলেন? তখন সাগরে যোগাযোগ তেমন একটা ছিলো না। লক্ষ্য করো-মানচিত্রে লম্বা একফালি হয়ে অবস্থান নিচ্ছে লোহিত সাগর।



চিত্র – ০১ : মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ যখন স্পেন আক্রমণ করেন-তখন থেকে তার নামানুসারে এই প্রণালীর নামকরণ করা হয়-জাবাল-উত-তারিক বা তারিকের পাহাড়। পরবর্তীতে এই নাম পরিবর্তিত হয়ে-জিব্রাল্টার প্রণালী নামে পরিচিত হয়। এই প্রণালীর মাধ্যমে আফ্রিকা মহাদেশের মরক্কো ইউরোপের স্পেন থেকে পৃথক হয়।

আফ্রিকার পশ্চিম পাশে আটলান্টিক মহাসাগর । আটলান্টিক মহাসাগরের আরও পশ্চিমে আছে নতুন পৃথিবী তথা আমেরিকা মহাদেশ। সর্বদক্ষিনের নগরী কেপটাউনে মিলিত হয়েছে-ভারত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর। আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল পুরোটাই ভারত মহাসাগরের তীরে। এবার তাকাও ইয়েমেনের এডেন বন্দরের দিকে। এডেন বন্দরের দিকে তাকিয়ে দেখো-আফ্রিকা অংশে হচ্ছে ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া দেশ। আবিসিনিয়া ভেঙে এই দুইটি দেশ হয়েছে। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল রাঃ কিভাবে তাহলে মক্কায় পৌঁছলেন? তখন সাগরে যোগাযোগ তেমন একটা ছিলো না। লক্ষ্য করো-মানচিত্রে লম্বা একফালি হয়ে অবস্থান নিচ্ছে লোহিত সাগর।



চিত্র-০২ : লোহিত সাগরের মাধ্যমে আফ্রিকা মহাদেশ এশিয়া মহাদেশ থেকে পৃথক হয়েছে।

লোহিত সাগরের এশীয় অংশে ইয়েমেন ও সৌদি আরব। আর আফ্রিকা অংশে আছে-মিশর, সুদান, ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়া। তার মানে এশিয়া থেকে আফ্রিকাকে পৃথক করেছে-এই লোহিত সাগর।

আফ্রিকার সাথে এশিয়া যোগাযোগটা ছিলো প্রধানত স্থলপথে। হযরত বিলাল আবিসিনিয়া থেকে সুদান ও মিশর উপকূল ধরে জর্দান হয়ে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। আফ্রিকার কালো মানুষদেরকে ধরে দাস বানানোর প্রথাটা আরবীয়রা ভালোই রপ্ত করেছিলো। ইসলামের আগমনের পর পূর্ব আফ্রিকা থেকে দলে দলে দাস ধরে নিয়ে যেতো আরবরা। পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোতে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে মূলত আরবদের সাথে যোগাযোগের কারণে। কেনিয়া, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, সুদান-এসব দেশগুলোতে ইসলাম ধর্মের লোকজনের সংখ্যা বেশি।



চিত্র-০২ : লোহিত সাগরের মাধ্যমে আফ্রিকা মহাদেশ এশিয়া মহাদেশ থেকে পৃথক হয়েছে।

লোহিত সাগরের এশীয় অংশে ইয়েমেন ও সৌদি আরব। আর আফ্রিকা অংশে আছে-মিশর, সুদান, ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়া। তার মানে এশিয়া থেকে আফ্রিকাকে পৃথক করেছে-এই লোহিত সাগর।

আফ্রিকার সাথে এশিয়া যোগাযোগটা ছিলো প্রধানত স্থলপথে। হযরত বিলাল আবিসিনিয়া থেকে সুদান ও মিশর উপকূল ধরে জর্দান হয়ে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। আফ্রিকার কালো মানুষদেরকে ধরে দাস বানানোর প্রথাটা আরবীয়রা ভালোই রপ্ত করেছিলো। ইসলামের আগমনের পর পূর্ব আফ্রিকা থেকে দলে দলে দাস ধরে নিয়ে যেতো আরবরা। পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোতে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে মূলত আরবদের সাথে যোগাযোগের কারণে। কেনিয়া, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, সুদান-এসব দেশগুলোতে ইসলাম ধর্মের লোকজনের সংখ্যা বেশি।

উত্তর আফ্রিকার দিকে-এক নজর



চিত্র ০৩ : উত্তর আফ্রিকার ৫টি দেশে হাজার হাজার বছর যাবত বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান পতন হয়। এগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা নয়।

মরক্কো, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিশর, আলজেরিয়া-এই দেশগুলো উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত। সবগুলো দেশই মুসলিম। এই অঞ্চলগুলোকে মাগরেব অঞ্চলও বলা হতো। মাগরেব একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে-পশ্চিম। উমাইয়া, আব্বাসীয় খেলাফতের হাত ধরে মুসলিম বিশ্বের শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুরস্কে। দাস ব্যবসার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলো তুরস্কের শাসকেরা। লাখ লাখ কালো আফ্রিকানদেরকে ধরে নিয়ে দাস ব্যবসাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যায় মুসলিমরা। মক্কা, কুফা, বসরা এসব নগরীতে দাসদের হাট বসতো প্রতিদিন। গোসল করিয়ে রঙিন কাপড় পড়িয়ে দাসদেরকে শিকলে বেঁধে বাজারে তুলতো সাদা চামড়ার আরবীয়রা।

নৃশংস দাস ব্যবসা :

দাসদের মালিকরা বিক্রির সময় ক্রেতার কাছে বলতো-"দেখেন ভাই,আমার মালটা কিন্তু শক্তিশালী। গরম খুন্তি দিয়ে দাসকে ছ্যাঁকা দিয়ে বলতো, 'কি বুঝলেন, তার শরীরটা কেমন শক্তিশালী?'

আবার বাচ্চাদেরকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে ক্রেতাকে দেখাতেন, 'দেখেছেন!-বাচ্চাটা কত সহ্যশীল।'

মামুন বললো, "এতো ভারী অন্যায় কাজ। মুসলমানরা এ কাজটা কেন করতো?'

উত্তর আফ্রিকার দিকে-এক নজর



চিত্র ০৩ : উত্তর আফ্রিকার ৫টি দেশে হাজার হাজার বছর যাবত বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান পতন হয়। এগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা নয়।

মরক্কো, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিশর, আলজেরিয়া-এই দেশগুলো উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত। সবগুলো দেশই মুসলিম। এই অঞ্চলগুলোকে মাগরেব অঞ্চলও বলা হতো। মাগরেব একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে-পশ্চিম। উমাইয়া, আব্বাসীয় খেলাফতের হাত ধরে মুসলিম বিশ্বের শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুরস্কে। দাস ব্যবসার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলো তুরস্কের শাসকেরা। লাখ লাখ কালো আফ্রিকানদেরকে ধরে নিয়ে দাস ব্যবসাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যায় মুসলিমরা। মক্কা, কুফা, বসরা এসব নগরীতে দাসদের হাট বসতো প্রতিদিন। গোসল করিয়ে রঙিন কাপড় পড়িয়ে দাসদেরকে শিকলে বেঁধে বাজারে তুলতো সাদা চামড়ার আরবীয়রা।

নৃশংস দাস ব্যবসা :

দাসদের মালিকরা বিক্রির সময় ক্রেতার কাছে বলতো-"দেখেন ভাই,আমার মালটা কিন্তু শক্তিশালী। গরম খুন্তি দিয়ে দাসকে ছ্যাঁকা দিয়ে বলতো, 'কি বুঝলেন, তার শরীরটা কেমন শক্তিশালী?'

আবার বাচ্চাদেরকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে ক্রেতাকে দেখাতেন, 'দেখেছেন!-বাচ্চাটা কত সহ্যশীল।'

মামুন বললো, "এতো ভারী অন্যায় কাজ। মুসলমানরা এ কাজটা কেন করতো?'

জারিফ বললো, "ইসলামের নবী মুহম্মদ সাঃ দাসদের সাথে ভালো আচরণ করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। বলেছেন, তোমরা যা খাবে দাসদের তাই খাওয়াবে। তাদের সাথে এমন জঘন্য আচরণ করার শিক্ষা তো নবী দেন নাই" কিন্তু মুসলমানরা নবীর সে আদেশ মানলে তো?

মনে রাখবে-সভ্যতার ইতিহাসে যুগে যুগে দাস ব্যবসা ছিলো সবচেয়ে লোভনীয় ব্যবসা। অল্প কিছু টাকা দিয়ে লোকটাকে কিনতে পারলেই হলো। পরে চড়া দামে বিক্রি করা যাবে। গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা-ছিলো দাসনির্ভর। যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকরাই হতো দাস। দাসদের বংশে জন্ম নিতো আরও দাস। কিন্তু আফ্রিকার কালো মানুষদেরকে ধরে নিয়ে দাস ব্যবসা শুরু করেছিলো প্রধানত আরবরা। আরবরা আফ্রিকা মহাদেশের দুই প্রান্ত থেকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো-লাখ লাখ কালো অসহায় লোকদেরকে। একদল মিসর, সুদান হয়ে-পূর্ব আফ্রিকা থেকে দাস ধরে আনতো; আরেকদল মাগরেব অঞ্চল হয়ে মৌরিতানিয়া, মালি, সেনেগাল, গিনি, আইভরী কোস্ট-এসব পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চল হতে দাস ধরে মধ্যপ্রাচ্যে চালান দিতো। তুমি লক্ষ্য করে দেখবে-আরবীয় মুসলমানদের পদচারনায় মুখরিত উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা জুড়েই ব্যাপক মুসলমানদের বাস। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা ও তার আশেপাশের দেশগুলিতে কিন্তু মুসলিম নেই বললেই চলে। কারণ, আরবীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চলে যায় নি।

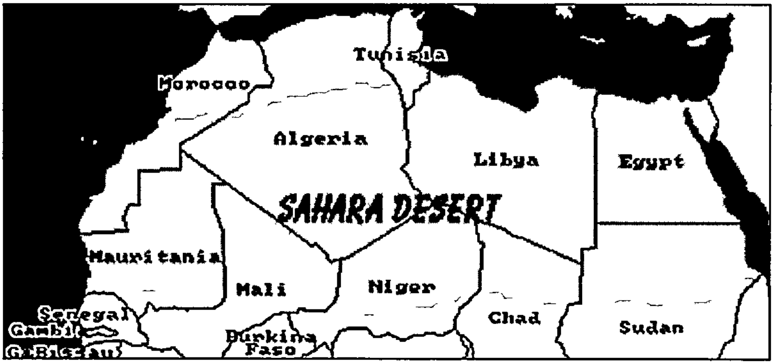
আফ্রিকা মহাদেশের দাস ব্যবসা নিয়ে রবিবাবুর "আফ্রিকা"- শীর্ষক কবিতাটির আরও কয়েকটি লাইন দেয়া হলো।

এল মানুষ ধরার দল-
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করলো আপন নির্লজ্জ অমানুষতা
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হলো ধুলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে
দস্যু-পায়ের কাঁটা মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিন্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেলো তোমার অপমানিত ইতিহাসে-

মামুন এবার জিজ্ঞেস করলো, "আফ্রিকা মহাদেশকে তো অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হয় বলে আমি জানি। এখনতো দেখলাম, তার উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে বিচরণ করছে মানুষজন। আফ্রিকা তাহলে কিভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হলো?"

জারিফ বললো-"ভালো কথা। আফ্রিকা মহাদেশ হলো পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। রোমান শাসন এবং পরে মুসলিম শাসনামলের সময় কেবলমাত্র আফ্রিকার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে দাস ব্যবসায়ী এবং বিজাতীয় শাসন

বিদ্যমান ছিলো। মানচিত্রে তুমি লক্ষ্য করলে দেখবে-লিবিয়া-আলজেরিয়ার নিচে বিশাল এলাকা নিয়ে সাহারা মরুভুমি অবস্থিত। এই মরুভূমি অতিক্রম করে আফ্রিকার ভিতরে কেউ যায় নি। মধ্য আফ্রিকার বিস্তীর্ন ভূ-ভাগ ছিলো সভ্যজগতের বাইরে।"



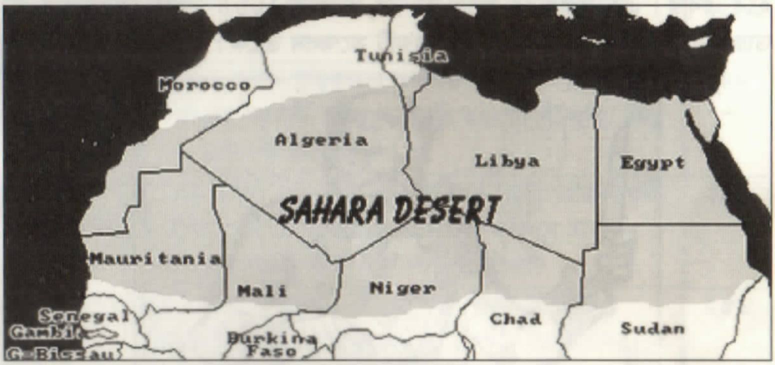
চিত্র-০৪: সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করে কেউ আফ্রিকার নিচের অংশ তথা মধ্য আফ্রিকায় যেতে পারতোনা। তাই বলতে হবে- আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিলো।

মামুন বললো,"*আমার তো মনে হয় অসভ্যজগতের বাইরে ছিলো। যারা সভ্য হওয়ার দাবী করে-কালো মানুষদেরকে গরু-ছাগলদের ধরে বাজারে বিক্রি করতো-এরা আরবীয় মুসলমান হোক-কিংবা ইউরোপীয়ান হোক-তাদেরকে আমি সভ্য বলবো না।*"

জারিফ বললো, তোমার কথা সত্যি। সে যাই হোক-৭০০ খৃস্টাব্দ থেকে প্রায় ১৪০০ সাল পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে কালো মানুষ ধরার ব্যবসাটা চালিয়েছিলো আরবরা। এবার নজর পড়লো ইউরোপীয়ানদের। ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পর নতুন পৃথিবীতে দাস রপ্তানি করতে লাগলো ইউরোপীয়রা। ইউরোপীয়দের দাস ব্যবসা ছিলো পশ্চিম আফ্রিকা উপকূল কেন্দ্রিক। মৌরিতানিয়া, গাম্বিয়া, সেনেগাল, গিনি, আইভরি কোস্ট, ঘানা, মালি-এসব দেশ থেকে লাখ লাখ কালো লোককে জাহাজে ভরে পাঠানো হলো আমেরিকাতে। **'গল্পে গল্পে বিশ্বভ্রমন'** বইয়ের আলোচনায় আমি সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলেছি।

শুধু এটুকুই মনে রাখো-১৮৬৩ সালে আমেরিকায় দাস ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে-ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চরম বিপদে পড়ে। অতিশয় লাভজনক দাস ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। এবার তারা পুরো আফ্রিকা মহাদেশের নাড়ি নক্ষত্র আবিষ্কার করতে নামে। রাবার, ডায়মন্ড, হাতির দাঁত-এসব পণ্যের লোভে বিশাল

বিদ্যমান ছিলো। মানচিত্রে তুমি লক্ষ্য করলে দেখবে-লিবিয়া-আলজেরিয়ার নিচে বিশাল এলাকা নিয়ে সাহারা মরুভুমি অবস্থিত। এই মরুভূমি অতিক্রম করে আফ্রিকার ভিতরে কেউ যায় নি। মধ্য আফ্রিকার বিস্তীর্ন ভূ–ভাগ ছিলো সভ্যজগতের বাইরে। ”



চিত্র-০৪: সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করে কেউ আফ্রিকার নিচের অংশ তথা মধ্য আফ্রিকায় যেতে পারতোনা। তাই বলতে হবে- আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিলো।

মামুন বললো,*“আমার তো মনে হয় অসভ্যজগতের বাইরে ছিলো। যারা সভ্য হওয়ার দাবী করে-কালো মানুষদেরকে গরু-ছাগলদের ধরে বাজারে বিক্রি করতো-এরা আরবীয় মুসলমান হোক-কিংবা ইউরোপীয়ান হোক-তাদেরকে আমি সভ্য বলবো না।”*

জারিফ বললো, তোমার কথা সত্যি। সে যাই হোক-৭০০ খৃস্টাব্দ থেকে প্রায় ১৪০০ সাল পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে কালো মানুষ ধরার ব্যবসাটা চালিয়েছিলো আরবরা। এবার নজর পড়লো ইউরোপীয়ানদের। ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পর নতুন পৃথিবীতে দাস রপ্তানি করতে লাগলো ইউরোপীয়রা। ইউরোপীয়দের দাস ব্যবসা ছিলো পশ্চিম আফ্রিকা উপকূল কেন্দ্রিক। মৌরিতানিয়া, গাম্বিয়া, সেনেগাল, গিনি, আইভরি কোস্ট, ঘানা, মালি- এসব দেশ থেকে লাখ লাখ কালো লোককে জাহাজে ভরে পাঠানো হলো আমেরিকাতে। **‘গল্পে গল্পে বিশ্বভ্রমন’** বইয়ের আলোচনায় আমি সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলেছি।

শুধু এটুকুই মনে রাখো-১৮৬৩ সালে আমেরিকায় দাস ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে-ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চরম বিপদে পড়ে। অতিশয় লাভজনক দাস ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। এবার তারা পুরো আফ্রিকা মহাদেশের নাড়ি নক্ষত্র আবিষ্কার করতে নামে। রাবার, ডায়মন্ড, হাতির দাঁত-এসব পণ্যের লোভে বিশাল

আফ্রিকার সব দেশে ইউরোপীয়রা যার যার মতো অভিযানে নামে। ১৮০০ সালের দিকেও পুরো আফ্রিকা একপ্রকার স্বাধীনই ছিলো। ১৮৭০ সালের মধ্যে ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নিজেদের মতো করে আফ্রিকা দখল করে ফেলে। এখন ইউরোপীয়রা দেখলো-আফ্রিকা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই মারামারি হবে এবার। এই মারামারি যাতে না হয়, সেজন্য-১৮৮৪ সালে ইউরোপীয় সব ডাকাতরা জার্মানির বার্লিন নগরীতে একটি সম্মেলন ডাকে।''



চিত্র-০৫ঃ জন্মদিনের কেকের পাশে যেমন-দাওয়াতী মেহমান জড়ো হয়, ঠিক তেমনি গোটা আফ্রিকা মহাদেশ গিলে খাওয়ার জন্য ইউরোপীয় ডাকাতরা কেক কাটার মতো করে বিশাল আফ্রিকা মহাদেশকে ভাগ করতে বসেছিলো বার্লিন নগরীতে ১৮৮৪ সালে।

এবার বলো, ইউরোপীয় এসব সভ্য দেশ যেমন-ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, জার্মানি, ইতালি-এদেরকে যদি আমি ডাকাত বলে ডাকি-তাহলে কি আমার খুব পাপ হবে?

মামুন উত্তর দিলো, "মোটেই না-"

****

পর্ব-০৩

আফ্রিকায় যখন থাবা বসালো সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয়রাঃ-

জারিফ বললো, গত পর্বে বলেছিলাম, প্রথমে রোমানরা খুব সামান্য পরিসরে, তারপরে আরবীয়রা ব্যাপক আকারে দাস ব্যবসা শুরু করে আফ্রিকাতে। আফ্রিকার কালো মানুষদের ধরে ধরে হাটে বাজারে বিক্রি করতো আরবীয়রা। কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করে, তখন নতুন দুনিয়ায় দাস ব্যবসা সবচেয়ে লাভজনকে ব্যবসায়ে পরিণত হয়। একপর্যায়ে দাস ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আফ্রিকা গিলে খেতে উদ্যত হয় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা। ১৮০০ সাল পর্যন্ত আফ্রিকার উপকূল অঞ্চল ব্যতীত বিশাল ভূ-ভাগ অনাবিস্কৃত ছিলো। কিন্তু আর শেষ রক্ষা হলো না। চলো এবার সেই গল্প শুনি।

পর্তুগীজ দস্যুদের কবলে আফ্রিকাঃ-

সমুদ্রবিদ্যা দিয়ে অন্য দেশ দখল শুরুই হয়েছিলো ছোট্ট দেশ পর্তুগাল দিয়ে। পর্তুগালের সম্রাট হেনরী দ্যা নেভিগেটর এর উদ্যোগে-১৪৪৪ সালে প্রথম আফ্রিকা মিশনে নামে পর্তুগীজ। প্রথমেই তারা দখল করে ঘানা। তারও আগে কেপভার্দে আইল্যান্ড দখল করে তারা। গিনি বিসাউ, এঙ্গোলা ও মোজাম্বিক দখল করে পর্তুগাল। এসব দেশ থেকে সস্তায় কাঁচামাল নিয়ে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে চড়াদামে সেসব দেশেই। শত শত বছর ধরে পর্তুগালের এ লুণ্ঠন প্রক্রিয়া চলছিলো। ১৮৮৪ সালের বার্লিন সম্মেলনে পর্তুগাল উপরের দেশগুলির দাবী নিয়ে হাজির হলো বার্লিনে। পর্তুগালের হাবভাব ছিলো এরকম-আমরাই এসব দেশ দখল করেছি। খবরদার, আমাদের ভূ-খন্ডগুলোতে কেউ হাত দিবে না। চিন্তা করো, দেশ কার আর দাবী করে কারা?

ছোট্ট বেলজিয়ামের দখলে বিশাল কঙ্গো :-

কঙ্গোর সাথে বেলজিয়াম যা করেছে,তা বর্ণনা দেয়ার জন্য কোনো ভাষাই যথেষ্ট নয়। আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করা জরুরী। কঙ্গো নামের সাথে বর্তমানে দুটি সার্বভৌম দেশ জড়িত। একটি হচ্ছে-ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, আরেকটি হচ্ছে-পিপল্স রিপাবলিক অব কঙ্গো। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো-১৯৭১ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত জায়ারে নামেও পরিচিত ছিলো।

দরবেশ বাবার মতো চেহারা, অতি সুদর্শন বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড ১৮৭০ সালের দিকে কঙ্গো অববাহিকায় অভিযান পরিচালনা করেন। লুটপাটের জন্য কঙ্গো কতটুকু উপযোগী-তা যাচাই করতে। কঙ্গো নদীর অববাহিকা জুড়ে বিশাল কঙ্গো দেশটির অবস্থান। রাজা লিওপোল্ড তার দেশ বেলজিয়াম অপেক্ষা প্রায় ৩০ গুন বেশি বড় দেশ কঙ্গোকে দখল করেন। কলোনী নয়, তিনি কঙ্গোকে নিজের

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঘোষণা করেন। কঙ্গো দখলে রাখার জন্য বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড বার্লিন সম্মেলনে তাশরীফ আনয়ন করলেন।

আফ্রিকা মহাদেশের প্রতি স্পেনের দাবীঃ-

স্পেন লুটপাট চালিয়েছে মূলত আমেরিকা মহাদেশে। দুই আমেরিকার বিশাল ভূ-খন্ড শাসন করার কারণে অন্যতম শক্তিশালী এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্পেন আফ্রিকা মহাদেশে কলোনী তৈরীতে কোনো অবস্থানেই ছিলো না। বর্তমানের অমীমাংসিত ভূ-খন্ড পশ্চিম সাহারা ও বিষুবীয় গিনি কেবলমাত্র তার দখলে ছিলো। এই দুই ভূ-খণ্ডের দখল বুঝে নেয়ার জন্য স্পেন বার্লিন সম্মেলনে জড়ো হলো।

ইতালিঃ-

আফ্রিকা মহাদেশে কলোনী তৈরী করার ক্ষেত্রে ইতালি বেশ পিছিয়ে ছিলো। কেবল পূর্ব উপকূলের সোমালিয়া দখল নিতে পারলো ইতালি। আবিসিনিয়া দখল করার উদ্যোগ নিয়েছিলো ইতালি, কিন্তু ইউরোপীয়দের কোন্দলের কারণে ইতালি সে কাজটা সুবিধামতো করতে পারেনি। বরং ১৮৯৬-৯৭ সালের দিকে আবিসিনিয়ার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় ইতালি। সে কাহিনী পরে বলবো।

জার্মানিঃ-

জার্মানি এমন একটা দেশ যে আসলে কলোনী তৈরীতে কিছুই করতে পারেনি। ১৮৭১ সালে তার একত্রীকরণের কাজ সম্পন্ন করেন আধুনিক জার্মানীর প্রতিষ্ঠাতা বিসমার্ক। তানজানিয়া, নামিবিয়া ও ক্যামেরুনে তার কিছু দখল ছিলো।

ফ্রান্সঃ-

আফ্রিকা দখলের সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় ছিলো ফ্রান্স। মনে রেখো, আফ্রিকার অন্তত ১৪টি দেশের মুদ্রার নাম হচ্ছে-ফ্রাঙ্ক।

কেন এতসব দেশের মুদ্রার নাম ফ্রাঙ্ক হলো?

কারণ, এসব দেশের অধিকাংশই ছিলো ফ্রান্সের উপনিবেশ। এ জিনিসগুলো মনে রাখলে ছন্দ মুখস্ত করা থেকে বাঁচা যাবে। উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিম আফ্রিকার মৌরিতানিয়া, বেনিন, গিনি, সেনেগাল, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র সহ আরও বেশ কিছু দেশ ফ্রান্সের দখলে ছিলো।

মামুন বললো, "এবার বুঝতে পারলাম, কিউবা-মেক্সিকোসহ দক্ষিণ আমেরিকার মুদ্রার নাম কেনো পেসো, আর আফ্রিকা মহাদেশের মুদ্রার নাম কেনো ফ্রাঙ্ক?"

জারিফ বললো, "ঠিক তাই! আমেরিকা মহাদেশে ছিলো স্পেনের রাজত্ব আর আফ্রিকা মহাদেশে হচ্ছে ফ্রান্সের রাজত্ব। পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে, মুদ্রা, ভাষার নাম, সীমারেখা, প্রণালী কষ্ট করে অহেতুক মুখস্ত করার দরকার নাই।

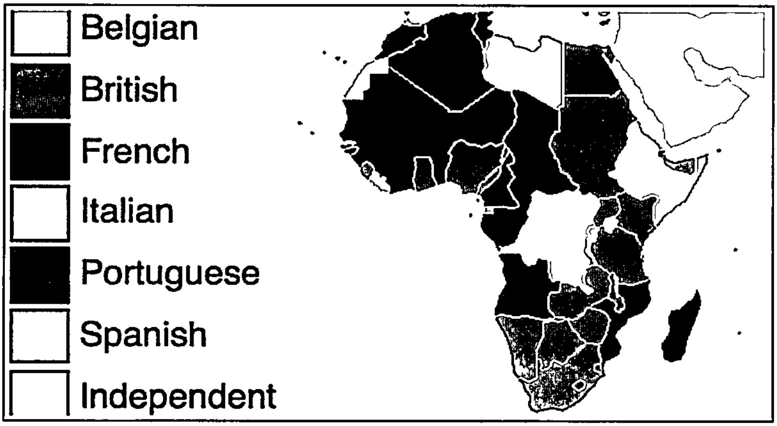
ব্রিটেনঃ-

আফ্রিকা মহাদেশে কলোনী তৈরীতে ফ্রান্সের পরেই অবস্থান ছিলো ব্রিটেনের। **'গল্পে গল্পে বিশ্বভ্রমন'** বইতে আমি বলেছি ইউরোপ থেকে ভারতে আসার ক্ষেত্রে সুয়েজ খালের গুরুত্ব কতটুকু। **সুয়েজ খালের তীর্থভূমি মিসর দখলে নিলো ব্রিটেন ১৮৮২ সালে।** তারপর সুদান, কেনিয়া ও উগান্ডা দখল করে পূর্ব ইউরোপে ভালোমতো নিয়ন্ত্রণে নিলো ব্রিটেন। পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা ও নাইজেরিয়াও বৃটিশ শাসনে চলে গেলো।

এই সাত দেশের দখলের আওতা থেকে রেহাই পেলো কেবল লাইবেরিয়া ও আবিসিনিয়া।

আফ্রিকা মহাদেশের মোট ভূমির ৯২ ভাগ দাবী করে বসলো এই সাতটি দেশ। লাইবেরিয়া যে স্বাধীন, এতেও লাইবেরিয়ার কোনো কৃতিত্ব নাই। কারণ, **লাইবেরিয়া শব্দের অর্থই হচ্ছে-মুক্তভূমি।** আমেরিকা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদেরকে আবার আফ্রিকা ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেয় আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো লাইবেরিয়া ভূখন্ডকে স্বাধীন ঘোষণা করে সেখানে দাসদের ফেরত পাঠান। কৃতজ্ঞ দাসরা এজন্য লাইবেরিয়ার রাজধানীর নাম প্রেসিডেন্টের নামের সাথে মিল রেখে মনরোভিয়া রাখে।

সেজন্য লাইবেরিয়ার দিকে সাম্রাজ্যবাদীরা নজর দেয় নি। আর আবিসিনিয়াকে বশ করতে পারেনি ইতালিয়ানরা। এই দুটি দেশ ছাড়া পুরো আফ্রিকা মহাদেশকে পরাধীনতার শিকল পড়ালো ডাকাতের দলেরা।



চিত্র-০৬: আফ্রিকা মহাদেশের ৯২ ভাগ এলাকা দখল করে ফেলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা।

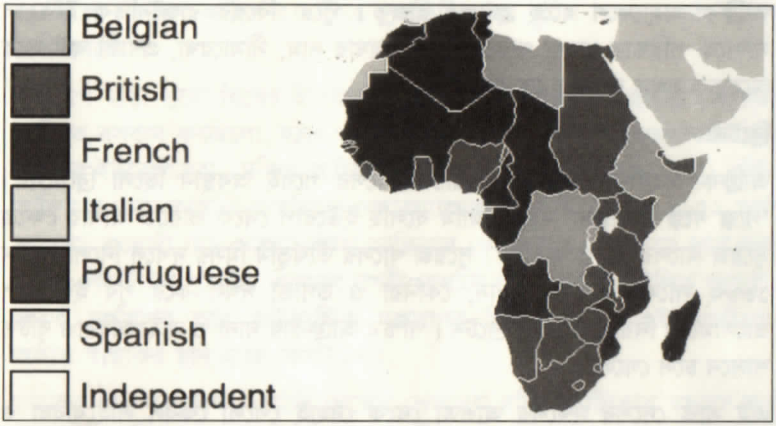
মামুন বললো-"আমার একটা প্রশ্ন আছে, উত্তর আফ্রিকা তো তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফতের অধীনে ছিলো। সে ব্যাপারটা তো উল্লেখ করলে না।"

জারিফ বললো, "আসলে তুরস্ক হয়ে পড়েছিলো ইউরোপের রুগ্ন মানুষ। রাশিয়ানরা তুরস্ককে এই উপাধি দিয়েছিলো। তুরস্কের অটোম্যান সুলতানরা দুর্বল হওয়ার কারণেই-উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়া ফ্রান্স দখল করে। আর মিশর দখল করে ব্রিটেন। বাকী ছিলো শুধু লিবিয়া। ১৮৮৪ সালে লিবিয়াতে নামমাত্র তুরস্কের দখলদারিত্ব ছিলো বটে। লিবিয়াতে দিকে দিকে বিদ্রোহ দানা বাঁধছিলো। লিবিয়ার লোকজন স্বাধীন হতে চেয়েছিলো তুরস্কের কাছ থেকে। তুরস্ক কিন্তু লিবিয়ার দখল নেওয়ার জন্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলো।"

মামুন আবার বললো, "আমি একটা মুভি দেখেছিলাম The Lion of Desert. লিবিয়ার মহান বিপ্লবী উমর মুখতারকে নিয়ে। সেটা সম্পর্কে কিছু বলো।"

জারিফ বললো, "ভেরি গুড। তুরস্কের হাত থেকে লিবিয়াকে শেষমেষ দখল করেই ফেলে ইতালিয়ানরা ১৯১১ সালে। ১৯২২ সালে ক্ষমতায় আসেন ইতালির ফ্যাসিস্ট একনায়ক বেনিতো মুসোলিনী। উমর মুখতারকে বশে আনার সবরকম চেষ্টা চালান মুসোলিনী। শেষমেশ না পেরে-উমর মুখতারকে ফাঁসিতে ঝুলায় ইতালি। সে কাহিনী পরে বলবো।

আর একটা কথা। প্রথম তিনটি পর্বে আমি একটু কঠিন আলোচনা করে ফেললাম মনে হচ্ছে-কিন্তু মনে রেখো-এই কঠিন আলোচনা দরকার ছিলো। আর সামনের



চিত্র-০৬: আফ্রিকা মহাদেশের ৯২ ভাগ এলাকা দখল করে ফেলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা।

মামুন বললো-"আমার একটা প্রশ্ন আছে, উত্তর আফ্রিকা তো তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফতের অধীনে ছিলো। সে ব্যাপারটা তো উল্লেখ করলে না।"

জারিফ বললো, "আসলে তুরস্ক হয়ে পড়েছিলো ইউরোপের রুগ্ন মানুষ। রাশিয়ানরা তুরস্ককে এই উপাধি দিয়েছিলো। তুরস্কের অটোম্যান সুলতানরা দুর্বল হওয়ার কারণেই-উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়া ফ্রান্স দখল করে। আর মিশর দখল করে ব্রিটেন। বাকী ছিলো শুধু লিবিয়া। ১৮৮৪ সালে লিবিয়াতে নামমাত্র তুরস্কের দখলদারিত্ব ছিলো বটে। লিবিয়াতে দিকে দিকে বিদ্রোহ দানা বাঁধছিলো। লিবিয়ার লোকজন স্বাধীন হতে চেয়েছিলো তুরস্কের কাছ থেকে। তুরস্ক কিন্তু লিবিয়ার দখল নেওয়ার জন্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলো।"

মামুন আবার বললো, "আমি একটা মুভি দেখেছিলাম The Lion of Desert. লিবিয়ার মহান বিপ্লবী উমর মুখতারকে নিয়ে। সেটা সম্পর্কে কিছু বলো।"

জারিফ বললো, "ভেরি গুড। তুরস্কের হাত থেকে লিবিয়াকে শেষমেষ দখল করেই ফেলে ইতালিয়ানরা ১৯১১ সালে। ১৯২২ সালে ক্ষমতায় আসেন ইতালির ফ্যাসিস্ট একনায়ক বেনিতো মুসোলিনী। উমর মুখতারকে বশে আনার সবরকম চেষ্টা চালান মুসোলিনী। শেষমেশ না পেরে-উমর মুখতারকে ফাঁসিতে ঝুলায় ইতালি। সে কাহিনী পরে বলবো।

আর একটা কথা। প্রথম তিনটি পর্বে আমি একটু কঠিন আলোচনা করে ফেললাম মনে হচ্ছে-কিন্তু মনে রেখো-এই কঠিন আলোচনা দরকার ছিলো। আর সামনের

পর্বগুলো সহজ ভাষায় বলতে পারবো। ধীরে ধীরে বিংশ শতাব্দীর সবকিছু পরিষ্কার হবে।"

পর্ব- ০৪

বার্লিন সম্মেলনের পূর্বাপরঃ-

জারিফ আজকের আলোচনাটা একটু সহজ করার চেষ্টা করলো। বললো, "মামুন, **গল্পে গল্পে বিংশ** শতাব্দীর প্রথম তিনটি পর্বে আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গির বিরুদ্ধে গিয়ে একটু বেশি পান্ডিত্য দেখিয়েছি। সেটা আসলে দরকারও ছিলো। বিংশ শতাব্দীর আলোচনায় প্রবেশ করবার পূর্বে তার পটভূমিটা ভালো করে জানা থাকলে বিংশ শতাব্দীর সব ইতিহাস তোমার কাছে একদম সহজ মনে হবে। **১৮৮৪ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া বার্লিন সম্মেলন শেষ হয় ১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখে।** ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকা মহাদেশের দখলীকৃত ভূমি নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়। গত পর্বে যে আলোচনা করেছিলাম, সবচেয়ে বেশি দেশ পায় ফ্রান্স ও ব্রিটেন। স্পেন ও পর্তুগাল অল্প ভূখন্ড পেয়েই সন্তুষ্ট থাকে। **কিন্তু মনে রেখো-২টা দেশ ভিতরে ভিতরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের এই জমিদারী সহ্য করতে না পেরে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে।** কিন্তু কিছু বলতেও পারে না, কারণ ওই দুই দেশতো আর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো শত শত বছর ধরে নতুন জনপদ দখল করেনি। এই হিংসা প্রথম মহাযুদ্ধ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ।

মামুন বললো, **"তাই নাকি? তাহলে বলো কোন সে দুই দেশ যারা ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে হিংসা করছিলো।**

"এরা হলো জার্মানী ও ইতালী"-উত্তর দিলো জারিফ।

আমি কারণটা তোমাকে বলছি। জার্মানী দেশটা ঐক্যবদ্ধ হলো এই সেদিন ১৮৭১ সালে। সে নিজেই ছিলো খন্ড বিখন্ড, কিভাবে সে অন্যের দেশ দখল করবে? জার্মানীকে একত্র করেন অটোভন বিসমার্ক, তাই তাকে আধুনিক জার্মানীর জনক বলা হয়। পৃথিবী দখলের অভিযান শুরু হয়েছিলো অনেক আগে। যদিও জার্মানী ১৮৭১ সালে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে পড়েছিলো। ব্রিটেন আর ফ্রান্স-এই দুই দেশ- জার্মানীর উত্থানে শঙ্কিত হয়ে যায়। জার্মানী যতই শক্তিশালী হোক, ঠিক সেই মুহূর্তে দখল করার মতো কোনো দেশতো বিশ্বে ছিলো না। তাই ব্রিটেন আর ফ্রান্সকে হিংসা করা ছাড়া আসলে তাদের আর কোনো গতি ছিলো না।

বিসমার্ক যখন বরখাস্ত হলেনঃ-

যে বিসমার্ক আধুনিক জার্মানীর স্রষ্টা, তাকে লজ্জাজনক ভাবে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হলো ১৮৯০ সালে। বিসমার্ক বলেছিলেন যে তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ। জার্মানীকে নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট। জার্মানীকে তিনি যেরকম করতে চেয়েছিলেন, ঠিক সেরকই তিনি করতে পেরেছিলেন। নতুন কোনো দেশ দখল করতে তিনি রাজি নন। কিন্তু পছন্দ হলো না নবাগত রাজা দ্বিতীয় উইলিয়ামের। বৃদ্ধ ও নিবেদিত প্রাণ বিসমার্ককে তিনি চ্যান্সেলর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। রাজা উইলিয়াম দেখলেন, ইউরোপের মধ্যে জার্মানী সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে। আর জগৎজুড়ে সাম্রাজ্য চালাচ্ছে ব্রিটেন-ফ্রান্স। সেটা হবে না। বিভিন্ন ছুতোয় তিনি ব্রিটেন আর ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ বাধাবার উছিলা খুঁজতে লাগলেন।

মামুন বললো, **"আমি তো জানতাম দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়েছে নাকি জার্মানরা? কতটা সত্যি?**

জারিফ বললো, "প্রায় শতভাগ সত্যি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশ কয়েকটি কারণ আছে। জার্মানীর সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছিলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তাই হিটলার জার্মানদেরকে ক্ষেপিয়ে চাঙ্গা করেছিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিলো একমাত্র জার্মানদের উদ্ধত আচরণের কারণে। জার্মানী গায়ে পড়ে ব্রিটেন আর ফ্রান্সকে বিভিন্ন উছিলায় জ্বালা দিতে লাগলো। শত শত বৎসরের শত্রুতা ভুলে এক হলো ব্রিটেন-ফ্রান্স। নতুন পাগল জার্মানীকে ঠেকানোর জন্য দুই চিরশত্রু ব্রিটেন-ফ্রান্স জোট বাঁধলো।"

মামুন বললো, "ইতালির কি হলো?"

ইতালি হিংসা করেও কিছু করতে পারছিলো না। কারণ, ইতালি তো আর জার্মানীর মতো এত শক্তিশালী ছিলো না। বার্লিন সম্মেলনে ইতালি পেলো পূর্ব আফ্রিকার ছোট্ট দেশ সোমালিয়া। ইউরোপের রুগ্ন মানুষ তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফতের অধীনে ছিলো উত্তর আফ্রিকার ৫টি দেশ। এর মধ্যে মরক্কো, তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়া দখল করলো ফ্রান্স। আর মিশর দখল করলো ব্রিটেন। লিবিয়া থেকে কখন তুর্কীরা বিদায় হয়, সেদিকে নজর রাখছিলো ইতালি। ইতালি ১৯১১ সালে দখল করে ফেলে লিবিয়া। সে কাহিনী গত পর্বে বলেছি। তবে ইতালির ইতিহাসের এক কলংকজনক পরাজয় হয় আবিসিনিয়ার কাছে। বর্তমানে অবশ্য আবিসিনিয়া ভেঙে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া। সে কাহিনীটা শুনে রাখো।

আবিসিনিয়ার কাছে ইতালির লজ্জাজনক পরাজয়:

১৮৭০ সালে যখন ইতালি ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন থেকেই সে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো পররাজ্য দখলে নামতে চাইলো। কিন্তু সেও জার্মানীর মতো একই সমস্যায় পড়লো। দখল করার মতো দেশ নাই তো। বার্লিন সম্মেলনে ইতালি পেলো সোমালিয়ার একটা অংশ। তার পেট ভরলো না। সে স্বাধীন দেশ আবিসিনিয়া দখল করতে চাইলো। কিন্তু আবিসিনিয়া দখল করতে যেয়ে এমন দশা হলো ইতালির যে তা ছিলো কল্পনার বাইরে।

১৮৮৭ সাল থেকেই ইতালি আবিসিনিয়া দখলের ফন্দি আঁটছিলো। রাজা ইয়োহানেস ইতালীয় বাহিনীকে হটিয়ে দেন। এ যাত্রায় রক্ষা পায় আবিসিনিয়া। ১৮৮৯ সালে ক্ষমতায় আসেন রাজা দ্বিতীয় মেনেলিক। তিনি জানতেন ইতালীয়রা আবার আসবে। ফ্রান্সের সহায়তায় ২ লাখ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গড়ে তুলেন। পূর্ব আফ্রিকায় অবস্থানরত ইতালীয় বণিক সম্প্রদায়ের একটা অংশও রাজার পক্ষে ছিলো। ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত ইতালি আর আবিসিনিয়ার মাঝে থেমে থেমে যুদ্ধ চলে। অবশেষে চূড়ান্ত ফায়সালা হয় আদওয়ার যুদ্ধে ১৮৯৬ সালে। ৫২০০ সৈন্য হারায় ইতালী। পুরো বিশ্বে আবিসিনিয়ার বীরত্ব গাঁথা ছড়িয়ে পড়ে। **আবিসিনিয়া হলো একমাত্র আফ্রিকান দেশ, যারা যুদ্ধ করে নিজেদের অখন্ডতা রক্ষা করে। মান সন্মান হারিয়ে ইতালি আবিসিনিয়া দখলের আশা ত্যাগ করে।**

তবে, ইতালীর ফ্যাসিস্ট একনায়ক বেনিতো মুসোলিনী এ হারের বদলা নেন ১৯৩৫ সালে। তিনি আবিসিনিয়া দখল করেছিলেন সেই সময়। সে কাহিনী পরে বলবো।

সোজা কথা-১৮৮৪ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্ন ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের যুগ। বিভিন্ন পরাশক্তির মাঝে দ্বন্দ, অবিশ্বাস, জোট, পাল্টা জোট এসব ঘটতে থাকে। এসব দখল ও পাল্টা দখলের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

চলো, আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী শক্তিশালী দেশগুলোর একটা তালিকা করি (জার্মানি ও ইতালি বাদে)

ব্রিটেন:- সারা বিশ্বে জগৎজোড়া সাম্রাজ্য চালাচ্ছে তখন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য তখন অস্ত যেতো না। ব্রিটেনকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো কেউ নাই। বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশ তার পদতলে। ব্রিটেনের এসব কলোনী দেখে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরতো বাকী ইউরোপীয়রা।

ফ্রান্সঃ- ব্রিটেনের পরই পুরো পৃথিবীতে লুটপাট চালানোতে উস্তাদ ছিলো ফ্রান্স। আফ্রিকা মহাদেশের বিশাল এলাকা তার করতলগত। ব্রিটেন তার কলোনীগুলোর শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি যতটুকু আন্তরিক ছিলো, ফ্রান্সের মধ্যে এরকম ছিলো না। লক্ষ্য করার বিষয়, আফ্রিকা মহাদেশের যে দেশগুলো ব্রিটেন শাসন করেছে; সেগুলো কিন্তু তুলনামুলক উন্নত। যেমন-নাইজেরিয়া, ঘানা, সুদান, মিসর ইত্যাদি। কিন্তু ফ্রান্স কলোনীগুলোতে শুধু লুটপাটই চালিয়েছে।

তুরস্কঃ- এক সময়ের প্রতাপশালী তুরস্ক হয়ে পড়েছিলো ইউরোপের রুগ্ন মানুষ। তবুও জার্মানীর সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরী করে তুরস্কও পরাশক্তিদের কাতারে ছিলো তখন। একে একে তুরস্ক তার দখলকৃত সব ভূ-খন্ড হারিয়েছে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে।

অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যঃ- আজকের ছোট্ট দেশ অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী শাসন করতো হাপ্সবুর্গ বংশের শাসকরা। তার দখলে কলোনী ছিল না ঠিকই, কিন্তু সামরিক দিক দিয়ে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য তখন পরাশক্তি ছিলো।

জাপানঃ- জাপানের ব্যাপারটা ছিলো আরেক তাজ্জব লীলাখেলা। শত শত বছর যাবত বাকী বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে ১৮৬৮ সালে জাপান ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে। অচিরেই তারা সামরিক ও অর্থনৈতিক পাওয়ার হাউসে পরিণত হয়। ১৮৯৪-৯৫ সালে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে জাপান চীনকে হারিয়ে কোরিয়া দখল করে। আবার ১৯০৫ সালে পোর্ট আর্থার যুদ্ধে রাশিয়াকে হারিয়ে সারা বিশ্বে হইচই ফেলে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী বিশ্বে জাপান ছিলো এক ভীতিকর পরাশক্তি।

আমেরিকাঃ- ১৮২৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো-বিচ্ছিন্নতাবাদের নীতি আঁকড়ে থাকেন। ইতিহাসে যা মনরো ডকট্রিন নামে পরিচিত। পৃথিবীর সব জঞ্জাল থেকে দূরে থেকে আমেরিকা নিজগুণে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয় ১৮৭২ সালে। একমাত্র ১৮৬১-৬৫ সালে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময়টাই একটু ভুগিয়েছে আমেরিকাকে। ১৮৯৮ সালে কিউবাকে সাহায্য করতে গিয়ে স্পেনের সাথে যুদ্ধ বাধায় আমেরিকা। আমেরিকার হস্তক্ষেপে কিউবা স্বাধীনতা অর্জন করে স্পেনের কাছ থেকে। আমেরিকার কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে একসময়ের দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্পেন। পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ায় আমেরিকা।

রাশিয়াঃ- অখন্ড রাশিয়া ছিলো আয়তনে আরও বেশি বিশাল। মধ্য এশিয়ার কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান সহ ইউরোপের ইউক্রেন, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া সহ পূর্ব ইউরোপের আরও বেশ কয়েকটা দেশ ছিলো রাশিয়ার অন্তর্গত।

রাশিয়া অর্থনৈতিক ভাবে এত উন্নত ছিলো না, কিন্তু বিশাল আয়তন ও সামরিক শক্তির কারণে তারা পরাশক্তিদের কাতারে ছিলো।

মনে রেখো মিঃ মামুন! পুরো বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ঘুরেফিরে এই কয়েকটা দেশের নাম আসে।

জার্মানী, ইতালী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুরস্ক, আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া-এই আটটি দেশ নিয়ে কথা বললেই পুরো পৃথিবীর ৭০ ভাগ ইতিহাস জানা হয়ে যাবে। কারণ-এই শক্তিধর দেশগুলোই দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ করেছে, পুরো পৃথিবী তাদের দখলেই ছিলো, তারাই আবার সব দেশকে স্বাধীনতা দিয়েছে। তারাই জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্টা করেছে...ইত্যাদি।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "তুমি তো চীনের কোনো নামই নিলে না। চীনের কি অবস্থা ছিলো তখন?"

আরে চীন তো তখন খোদার খাসি! এত বড় দেশ হলে কি হবে- চীন তখন ধুঁকে ধুঁকে মরছে। অপদার্থ চিং ডাইনাস্টি কিছুই করতে পারেনি দেশের উন্নয়নের জন্য। উল্টো জাপানের কাছে হেরে কোরিয়ার দখল হারিয়েছে। তারও আগে ব্রিটেনের কাছে দুইবার হেরে মান সন্মান সব খুইয়েছে। অবশ্য ১৯১২ সালে চীনের রাজতন্ত্রের পতন হয় ডঃ সান ইয়াত সেনের নেতৃত্বে। আর চীন পরাশক্তি হয়েছে আরও অনেক পরে।

পর্ব-০৫

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞ জারিফ আজকে মামুনকে বললো, "আমাদের **এই মুহূর্তের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ১৯১৪ সাল থেকে শুরু হয়ে প্রায় ৪ বছর ব্যাপী চলা ভয়াবহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলো উদঘাটন করা।** কেন যুদ্ধটা শুরু হলো,আর যুদ্ধে তৎকালীন পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোর ভূমিকা নিয়েই মূলত আমরা আলোচনা করছি"

মামুন বললো, "আলোচনাগুলো অবশ্যই কাজের। আমি তৎকালীন পৃথিবীর পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারছি। তোমাকে ধন্যবাদ"

জারিফ এবার বলা শুরু করলো, আমি ইতোমধ্যেই জাপান ও আমেরিকার পরাশক্তি হয়ে উঠার ঘটনাগুলো বলেছি। চলো আজকে আমরা ঐতিহ্যবাহী এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেন সম্পর্কে জেনে নেই। তাহলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে আরও কিছু জানতে পারবো।

ব্রিটেনের সাম্রাজ্য তখন মধ্যগগনেঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটেন কি জাপান-আমেরিকার মতো কোনো নতুন পরাশক্তি ছিলো না। তিনশত বছর যাবত ব্রিটেন দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে পুরো বিশ্ব। ১৫৮৮ সালে ব্রিটেনের হাতে তখনকার পরাশক্তি স্পেনের নৌবাহিনী অপরাজেয় আর্মাডা-র পতন হলে ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যবাদী মিশনে নেমে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর বেশ আগেই আমেরিকা মহাদেশ থেকে সব সাম্রাজ্যবাদীরা বিতাড়িত হলেও বিশ্বের অন্যান্য অংশে তাদের দখলদারিত্ব চলতেই থাকে। অবশ্য কানাডাকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে অনেকটা স্বাধীন করে দিয়েছিলো বৃটিশরা। সার্বভৌমত্ব বৃটিশের হাতে ছিলো।

১৮৮৪ থেকে ১৯১৪ সালের পৃথিবীটার দিকে তুমি তাকাও। যুগটাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের যুগ। আর এই যুগের সবচেয়ে বড় মাতব্বরটার নাম হচ্ছে ব্রিটেন। বিশাল ভারতবর্ষ তার পদতলে। তিন হাজার ব্রিটিশ সিভিলিয়ান অফিসার শাসন করছেন ৩০ কোটি ভারতবাসীকে। সামরিক বাহিনীর কথা আলাদা। ভারতবর্ষ মানে শুধু ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ নয়। শ্রীলংকা, মিয়ানমারসহ নেপাল ভুটান। যদিও নেপাল আর ভুটান ব্রিটেনের সাথে খাতির জমিয়ে নিজেরা শাসন করছিলো। মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, ব্রুনাই শাসন করছে বৃটিশ। আফ্রিকা মহাদেশের মিশর, সুদান, নাইজেরিয়ার মতো বড় বড় দেশ বৃটিশের দখলে। দখলে ছিলো ঘানা, কেনিয়া ও উগান্ডা। আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে উন্নত দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা শাসন করছে বৃটিশরা। মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ন দেশ ইরান ভাগাভাগি করে খাচ্ছে রাশিয়া ও ব্রিটেন। আফিম যুদ্ধে চীনকে হটিয়ে একপ্রকার তাবেদার বানালো বৃটিশরা।

অস্ট্রেলিয়ায় বৃটিশ শাসন পাকাপোক্ত। বিশাল অস্ট্রেলিয়াতে দাগী আসামীদেরকে দিয়ে কলোনী স্থাপন করলো ব্রিটেন। হাজার হাজার আসামীদেরকে জাহাজে ভরে অস্ট্রেলিয়াতে পাঠানো হলো। ব্রিটেনের মাতব্বরী আর দেখে কে!

এই সময়টার দিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়ে থাকে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য অস্ত যেতো না। কথা ১০০% সত্যি। ব্রিটেনের অধীনস্ত দেশগুলোর এক প্রান্তে সন্ধ্যা নামলে আরেকপ্রান্তে সকাল হতো।

হিংসা করেই মরতে লাগলো নতুন পরাশক্তি জার্মানি। কিন্তু ব্রিটেনের এই জয়যাত্রা রুখার সাধ্য কারও ছিলো না।

ব্যতিক্রম কেবল আফগানিস্তানঃ

ভাবা যায়, পরাক্রমশালী ব্রিটেনকে শোচনীয় পরাজয় উপহার দিয়ে বীরদর্পে স্বাধীন হয়ে রইলো আফগানিস্তান। একবার নয়, দুইবার আফগানিস্তানের হাতে প্রচন্ড মার খেলো বৃটিশরা। সে কাহিনীই এখন বলবো।

মামুন বললো, "তুমি তো আগেই বলেছিলো এশিয়ার মধ্যে স্বাধীন দেশ ছিলো দুটি-একটি আফগানিস্তান, অন্যটি থাইল্যান্ড। আর জাপান নিজেই ছিলো সাম্রাজ্যবাদী। ঠিক কিনা?"

রাইট। আমি সেটাও বলেছিলাম, থাইল্যান্ড স্বাধীন থাকার পিছনে থাইল্যান্ডের কোনো কৃতিত্ব নাই, কিন্তু আফগানদের আছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ-ফ্রান্স নিজেদের মধ্যে যাতে কোনো ঝামেলা না হয়, সেজন্য থাইল্যান্ডকে সীমানা ধরে নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিরসন করে। তাই বলেছিলাম, কারো উপনিবেশ না হওয়ার পিছনে থাইল্যান্ডের কোনো কৃতিত্ব নাই। যা হোক, চলো এবার আফগানদের সেই বীরত্বগাঁথা শুনি।

প্রথম বৃটিশ-আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪২):

মামুন! তুমি হলিউডের মহাতারকা সিলভেস্টার স্টালন অভিনীত র‍্যাম্বো-৩ মুভিটি অবশ্যই দেখবে। আফগানিস্তান নিয়ে এরচেয়ে ভালো মুভি আমার চোখে এখনও পড়েনি। সেখানেই বলা হয়েছে, প্রাচীনকালে আফগানিস্তান দখল করতে আসা শত্রুরা স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতো-হে প্রভু! আমাদের অন্তরে তুমি কোবরা সাপের বিষের মতো বিষাক্ত, বাঘের মতো দাঁত আর আফগান জনগণের মতো প্রতিশোধস্পৃহা দাও!

ব্যাপারটা হচ্ছে আফগানিস্তানকে কখনোই কোনো বিদেশী শক্তি দখল করতে পারেনি। আফগানরা বিদেশী শাসকদেরকে বিন্দুমাত্র সহ্য করতে পারতো না। সে শাসক যত শক্তিশালী ও ভালো হোক না কেন! আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট, চেঙ্গিস খান, বৃটিশ, রাশিয়া এবং সবশেষে আমেরিকাও আফগানিস্তানে সফল হতে পারে নি। সবাই পরাজয় আর গ্লানি নিয়ে আফগানিস্তান থেকে ফিরেছে। তাই, আফগানিস্তানকে বলা হয়-সাম্রাজ্যবাদীদের গোরস্তান।

যাই হোক, ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন পাকাপোক্ত হওয়ার পর বৃটিশরা নজর দিতে চাইলো আফগানিস্তানের দিকে। আসলে নজর দিতে চায়নি বৃটিশ, কারণ আফগানিস্তানে রুক্ষ পাহাড় ও মরুভূমির রাজত্ব। উর্বর ভারতবর্ষ ছেড়ে বৃটিশরা যেতে চায়নি প্রথমে। কিন্তু রাশিয়ানরা আফগানিস্তানে তাদের প্রভাব বাড়াচ্ছিলো। ব্রিটেন কোনোভাবেই চাইতো না ভারতের এত কাছে রাশিয়ানরা চলে আসুক। ১৮২৬ সালে আফগানিস্তানের আমীর নিযুক্ত হন দোস্ত মুহম্মদ খান। তিনি ছিলেন

রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। দোস্ত মুহম্মদকে হাত করতে না পেরে বৃটিশরা নির্বাসিত শাহ সুজাকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য ১৮৩৯ সালে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। বৃটিশ আক্রমণে বুখারা নগরীতে পালিয়ে গেলেন দোস্ত মুহম্মদ। ক্ষমতায় বসেন বৃটিশের তাঁবেদার শাহ সুজা। ১৮৪০ সালে আবার দোস্ত মুহম্মদ বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে এবারও হেরে যান তিনি। বৃটিশরা তাকে ভারতে নির্বাসন দেন।

কিন্তু আফগান জনগণ ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো। বিদেশী শাসক যেমন তারা মানে নি, ঠিক তেমনি তারা বিদেশী শাসকের মনোনীত শাসককেও মানতে পারে নি। বিদ্রোহী আফগানদের হাতে বৃটিশ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, নিহত হন তাঁবেদার শাহ সুজা। অবস্থা বেগতিক দেখে বৃটিশ গভর্নর লর্ড এলেনবুরো দোস্ত মুহম্মদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন। ঠান্ডা হয় আফগানিস্তানের পরিস্থিতি। বৃটিশরা জান মাল নিয়ে আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে আসে।

দ্বিতীয় বৃটিশ-আফগান যুদ্ধ(১৮৭৮-৮০):-

ভারতবর্ষে ১৮৭৫ সালে গভর্নর হয়ে আসেন লর্ড লিটন। তিনি আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্ক বাড়াতে চাইলেন। ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটনের দূত স্যার নেভিল চেম্বারলিনকে আফগানিস্তানে ঢুকতেই দেয়া হয়নি। ক্ষিপ্ত হয়ে বেয়াদব আফগানিস্তানকে এবারও শায়েস্তা করতে চাইলেন বৃটিশরা। যুদ্ধ বাধলো ব্রিটেন আর আফগানিস্তানের মধ্যে। ক্ষমতায় তখন দোস্ত মুহম্মদের তৃতীয় পুত্র শের আলী খান। প্রথম দফায় শের আলী খান পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। ক্ষমতায় বসলেন ইয়াকুব। কিন্তু আফগানদের চোরাগোপ্তা হামলার কারণে বৃটিশরা একদিনও শান্তিতে থাকতে পারছিলো না। আফগানরা ব্রিটিশ দূতকে হত্যা করলেন তার বাহিনীসহ। বিশাল ভারতবর্ষ কঠোর হস্তে শাসন করা বৃটিশরা আফগানদের সাথে কোনোভাবেই পেরে উঠছিলেন না। আবারও শান্তিচুক্তি করলেন আফগানরা। আমির নিযুক্ত হন শের আলীর ভাতিজা আবদুর রহমান। ১৮৮০ সালে বৃটিশরা আবার আফগানিস্তান ত্যাগ করে। তবে এবার পরিস্থিতিটা অন্যভাবে সামাল দেয় ব্রিটেন। রাশিয়াকে ঠেকিয়ে রাখাই ছিলো বৃটিশের প্রধান উদ্দেশ্য। রাশিয়া-ব্রিটেন-আফগানিস্তানের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত হয়। স্যার মার্টিমার ডোরান্ডকে দায়িত্ব দেয়া হয় এ কাজটি করতে । এখনও পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী রেখাটির নাম হচ্ছে ডুরান্ড লাইন।

এভাবেই মূলত দুইবার আফগানিস্তানের সাথে পরাজয় বরণ করে বৃটিশরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বৃটিশরা আরেকটা সমস্যার মুখোমুখি হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। ইতিহাসে সেটা বুয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। আগামী পর্বে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করবো।

পর্ব-০৬

সর্বজয়ী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদঃ-

মামুন! আজকে আমি তোমাকে ইতিহাসের পাঠ দেয়ার আগে একটা গল্প বলে নেই। মজলুম জননেতা হিসেবে খ্যাত মাওলানা ভাসানী একবার লন্ডনে গিয়েছিলেন। কোনো একটা হোটেলে অবস্থান করার পর যখন বিদায় নেয়ার সময় এলো,তখন দেখলেন তার সফরসঙ্গীদের কেউ কেউ হোটেল থেকে কিছু জিনিস চুরি করছে। মাওলানা ভাসানী তখন কৌতুক করে ফতোয়া দিলেন, "এ্যাই মিয়া! শরমের কি অইলো। পুরো বৃটিশ সাম্রাজ্য আমাদের ভারতবর্ষকে শোষণ করে গড়ে উঠেছে, এদের দেশ থেকে যাই চুরি করো না কেন, সব হালাল-"

মওলানা সাব কিন্তু মিথ্যা বলেন নি। আজকের ইংল্যান্ড অত্যন্ত সুসভ্য ও সংস্কৃতিমনা। কিন্তু শত শত বছর ধরে তারা দেশে দেশে লুণ্ঠন চালিয়েছে। গড়ে তুলেছে তাদের সভ্যতা। তাদের শহর, বন্দর, নগর সমৃদ্ধ হয়েছে অন্য দেশের সম্পদে।

মামুন বললো, "আসলে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আমার এত বেশি ধারণাই ছিলো না। কি এমন একটা সময় গেছে আসলে যে অল্প কয়েকটা দেশ মিলে পুরো পৃথিবীর সম্পদ লুট করতো। স্থানীয় মানুষের উপর অত্যাচার করতো।"

জারিফ বললো, সাম্রাজ্যবাদীর কিন্তু ভাবতেও পারেনি যে-তাদের সাম্রাজ্য এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। এজন্য আসলে কৃতিত্ব দিতে হয় জার্মানদের। জার্মানী যদি দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধ না লাগাতো তাহলে দখলদারিত্বের অবসান আজও হতো কিনা সন্দেহ! দুইটা বিশ্বযুদ্ধ করতে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে ইউরোপীয় ডাকাতরা, ফলশ্রুতিতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো স্বাধীন হয়।

যা হোক, গত পর্বে আমরা আলাপ করেছিলাম ব্রিটেন কিভাবে আফগানিস্তানের হাতে মার খেয়ে তাদের সাথে শান্তিচুক্তি করে। আজ আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটেনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানবো।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ইউরোপীয়দের আগমনের কাহিনীঃ

১৮১৫ সাল থেকে ১৯১৪-এই নিরান্নব্বইটি বছর বৃটিশ সাম্রাজ্য ছিলো সর্বজয়ী। পরাক্রমশালী নেপোলিয়ানের পতন হয় ১৮১৫ সালে ওয়াটারলুর যুদ্ধে। আর ১৯১৪ সালে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই নিরান্নব্বই বছর বৃটিশরা তেমন কোনো যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়নি। পৃথিবীতে যুদ্ধ প্রচুর হয়েছে এই সময়টায়, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্য ছিলো এসব যুদ্ধের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত। পুরো পৃথিবী চষে বেড়িয়েছে বৃটিশরা। সব মহাদেশে উড়েছে বৃটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক। আফগানিস্তানের সাথেই কেবল হেরে শান্তিচুক্তি করেছে। বৃটিশকে আরেকটা

সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এ যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয়ী হয়েছিলো। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় বৃটিশ শাসন। আজ সেসব কথা বলবো।

ইউরোপ ছাড়া পুরো বিশ্বের ইতিহাসটা মোটামোটি একরকম। স্থানীয় লোকজন শান্তিতে বসবাস করছিলো, হঠাৎ তাদের মাঝে হাজির হলো পররাজ্যলোভী সাদা চামড়ার ইউরোপীয়রা। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসটাও এর ব্যতিক্রম নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম কলোনী করেছিলো নেদারল্যান্ডের অধিবাসী ডাচরা। ১৬৫২ সালে সর্বপ্রথম কলোনী গড়ে ডাচরা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে। মানচিত্রে তুমি লক্ষ্য করো, কেপটাউন পৃথিবীর একমাত্র নগরী যেখানে দুই মহাসাগর মিলিত হয়েছে। ভারত মহাসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগর মিলিত হয়েছে-এই নগরীতে। অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান হচ্ছে কেপটাউন।

ডাচদের পথ ধরে ফ্রান্স, জার্মানী থেকেও শ্বেতাঙ্গরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করা শুরু করে। কিন্তু ডাচরাই ছিলো প্রভাবশালী। তাদের ভাষা ওলন্দাজ হয়ে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অফিসিয়াল ভাষা।

মামুন বললো-"দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসী কালোরা বাধা দেয়নি?-"

দিয়েছে বটে!

কিন্তু তীর, ধনুক দিয়ে কি আর মারমুখী ও গোলাবারুদ সজ্জিত ইউরোপীয়দের সাথে পারা যায়?-

ডাচরা নিজেদেরকে পরিচয় দিতো Boer নামে। বুয়ার একটা ডাচ শব্দ যার অর্থ হচ্ছে কৃষক। ডাচ, ফরাসী ও জার্মান অভিবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের জমি দখল করে কৃষিকাজ করতে লাগলো। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেকটা অংশ এই তিন দেশের অধিবাসীদের দখলে এলো।

যখন আসরে নামলো আসল ডাকাতঃ

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে জয়ের পর বৃটিশদের নজর পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে। একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ-সেটা হচ্ছে ইউরোপ থেকে ভারতে আসতে হলে পুরো আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে আসতে হতো তখন। সুয়েজ খাল তখনও খনন করা হয় নি। কেপটাউন পরিচিত ছিলো 'কেপ অব গুড হোপ বা উত্তমাশা অন্তরীপ।' বৃটিশরা ভাবলো, ভারতবর্ষ যেহেতু আমাদের কলোনী হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলটা তো দখল করতেই হবে। জাহাজগুলো একটু বিশ্রাম নিবে কেপটাউনে। আরাম করে ভারতবর্ষ যাবো আমরা।

যেই কথা সেই কাজ। ১৭৯৫ সাল থেকে আস্তে আস্তে বৃটিশরা দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল জুড়ে বসতি গড়ে। বুয়াররা প্রথম প্রথম বাধা দেয়নি বৃটিশদের। কিন্তু

অচিরেই লাগলো লড়াই বুয়ারদের সাথে বৃটিশদের। ১৮০৬ সালে ডাচদের হটিয়ে বৃটিশ বাহিনী কেপটাউন নগরী দখল করে। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে শুরু হলো বৃটিশ আধিপত্য। ব্রিটেনের কাছে হেরে বুয়াররা চলে যায় আফ্রিকা মহাদেশের আরও ভিতরে ও পূর্বপ্রান্তে। গড়ে উঠে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট নামে দুটি স্বাধীন এলাকা। এসব এলাকায় বসবাস শুরু করে ডাচ, ফরাসী, ও জার্মান বংশোদ্ভূত বুয়াররা। আর দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে কেপটাউনসহ আশপাশের এলাকা নিয়ন্ত্রণে এলো বৃটিশদের। শান্তিতেই চলছিলো সব। বুয়ারদের তুলনায় বৃটিশরা ছিলো উন্নত ও আধুনিক। বুয়াররা ছিলো কৃষক, আর ব্রিটেন শিল্পের সূচনা করলো দক্ষিণ আফ্রিকায়। এটা স্বীকার করতেই হবে, **অন্যসব সাম্রাজ্যবাদীদের তুলনায় ব্রিটেন অনেক অনেক গুন ভালো।**

কিন্তু আবার লাগলো গন্ডগোল!

১৮৬৯ সালে ডায়মন্ডের খনি আবিষ্কৃত হলো অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট রাজ্যে। আর ১৮৮৬ সালে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হলো ট্রান্সভালে। দুটো এলাকাই বুয়ার অধ্যুষিত। স্বর্ণ ও ডায়মন্ড পরিশোধন করা কঠিন কাজ। কৃষক বুয়াররা সেটা পারছিলো না। তাই তাদের রাজ্যে হানা দিলো বৃটিশ বাহিনী। বৃটিশদের সাথে বুয়ারদের দুইবার যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা যাবো না। ১৮৮০-৮১ সালে প্রথম বুয়ার যুদ্ধে বৃটিশরা পরাজিত হয়ে পিছু হটে। তবে **১৮৯৯ থেকে শুরু হয়ে ১৯০২ সাল পর্যন্ত চলা দ্বিতীয় বুয়ার যুদ্ধে প্রাথমিকভাবে বুয়াররা সফল হলেও পরিশেষে জয় হয় ব্রিটেনের।** দক্ষিণ আফ্রিকায় সু-প্রতিষ্ঠি হয় বৃঠিশ শাসন পাকাপোক্তভাবে। কোনঠাসা হয়ে পড়ে বৃটিশ ব্যতীত অন্যান্য সাদা চামড়ার ইউরোপীয়রা।

মামুন বললো, "আমি তাজ্জব হয়ে ভাবছি দেশ কার, অধিবাসী কারা আর যুদ্ধ করে কারা। কালোদের দেশে এসে তাদেরকে সাইডে সরিয়ে রেখে তাদেরই দেশের মালিকানা নিয়ে যুদ্ধ করে বহিরাগত শ্বেতাঙ্গের দল। হায়রে সভ্য ইউরোপীয়ান!"

জারিফ বললো-"সাম্রাজ্যবাদের যুগে এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিলো"

পর্ব-০৭

জার্মানির পাগলামিতে দিশেহারা ফ্রান্সঃ-

জারিফ আজকে মামুনকে বললো, ‘‘আজকে আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী ফ্রান্সের ইতিহাস নিয়ে একটু আলোচনা করব।’’

ওকে।

মামুন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের কাহিনী জানার জন্য ১৮৭১ সালটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ বছর খণ্ড-বিখণ্ড জার্মানী একটা ঐক্যবদ্ধ দেশে পরিণত হয় চ্যান্সেলর বিসমার্কের সুচতুর নেতৃত্বগুণে। জার্মানীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পিছনে ফ্রান্সের পরাজয় লুকায়িত।

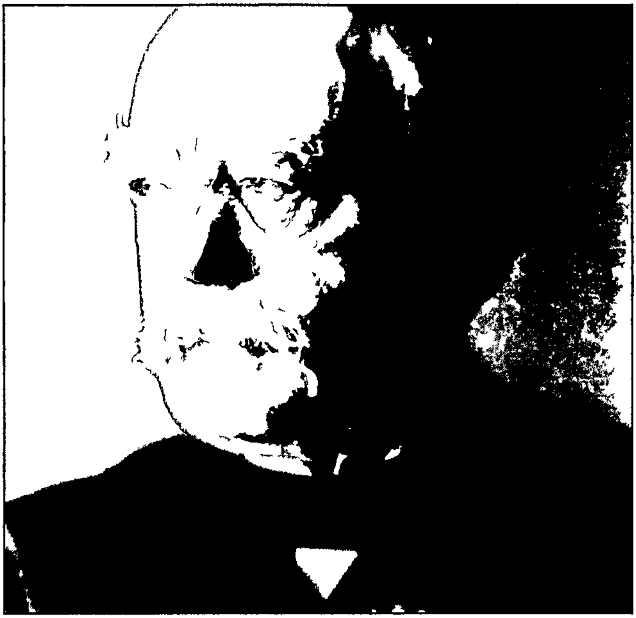
ফ্রান্স কোনোদিন চায় নি, জার্মানী একটা ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হোক। আর এদিকে বিসমার্কের নেতৃত্বে একের পর এক জার্মান রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে জার্মানীর ছায়ায় চলে আসে। চিরশত্রু ফ্রান্সকে খেপিয়ে তার সাথে যুদ্ধ বাধাবার পাঁয়তারা করতে চাইলেন সুচতুর বিসমার্ক। ফলাফল তাই হলো, লাগলো লড়াই ফ্রান্স আর জার্মানীর মধ্যে। যুদ্ধে জার্মানীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো ফ্রান্স। একেবারে ফ্রান্সের মাটিতে বসে জার্মানরা দাপটের সাথে চুক্তি করলো। চুক্তি মোতাবেক জার্মানীর সব শর্ত মেনে নিলো ফ্রান্স। অত্যন্ত সমৃদ্ধ আলসেস লোরেন প্রদেশ জার্মানিকে দেওয়া হলো।

ফ্রান্সকে পরাজয়ের স্বাদ দিয়ে এবং আলসেস-লোরেন প্রদেশ নিজের দখলে নিয়েই ক্ষান্ত হলো না জার্মানি। ফ্রান্স যাতে ইউরোপের আর কোনো দেশের সাথে কোনোরকম বন্ধুত্বমূলক চুক্তি করতে না পারে সেজন্য বিসমার্ক ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা চালালেন। নতুন পাগল জার্মানির তৎপরতায় ঐতিহ্যবাহী সাম্রাজ্যবাদী দেশ ব্রিটেন ইউরোপের রাজনীতি থেকে দূরে থেকে জগৎজোড়া তার সাম্রাজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ১৮৮২ সালে গড়ে উঠলো জার্মানি-ইতালি-অস্ট্রো/হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব। ১৮৮৭ সালে বিসমার্ক রাশিয়ার সাথে আরেকটা গোপনীয় সামরিক চুক্তি করলেন। ব্রিটেন যেহেতু ইউরোপের রাজনীতিতে আপাতত নাক না গলানোর সিদ্ধান্ত নিলো তাই দেখা গেলো পুরো ইউরোপ মহাদেশে ফ্রান্স একঘরে হয়ে পড়লো। কিন্তু এই ফাঁকে ঘটলো এক অন্যরকম ঘটনা। ১৮৯০ সালে জামার্নির নতুন সম্রাট হয়ে আসলেন দ্বিতীয় উইলহেম। ২৯ বছরের এই ক্ষাপাটে সম্রাট বিসমার্কের এরকম শান্তিপূর্ণ কূটনীতির খেলা পছন্দ করলেন না। অর্থনৈতিক শক্তিতে বলীয়ান জার্মানি পারলে গিলে খেতে চায় সমগ্র বিশ্ব । কিন্তু উপায় যে নেই! বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে ব্রিটেন-ফ্রান্স। এখন এই দুই শক্তিকে হিংসা করা ছাড়া আর কি করবে জার্মানি? যা হোক, জার্মান সম্রাট বিসমার্ককে পদত্যাগ করতে বললেন। এই সেই

বিসমার্ক যিনি তার সারাজীবন ব্যয় করছেন জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে, আজ ৭৫ বছর বয়সে তাকে পদত্যাগ করতে হলো ২৯ বৎসর বয়স্ক একজন নাবালক সম্রাটের নির্দেশে।

মামুন বললো, "বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসটাই আসলে ষড়যন্ত্র আর নিষ্ঠুরতার ইতিহাস। মোঘল সম্রাট আকবরকে লালন পালন করে রাজ্যশিক্ষা দিলেন তার পিতৃবন্ধু বৈরাম খান-শেষমেষ তাকে গুপ্তঘাতক দিয়ে হত্যা করে উপযুক্ত(!) প্রতিদান দিলেন সম্রাট আকবর।"

জারিফ বললো, "তুমি ঠিক উপমাটাই দিয়েছো। আধুনিক জার্মানীর প্রতিষ্ঠাতা বিসমার্কের এরকম অপমানজনক বিদায় প্রাপ্য ছিলো না।"



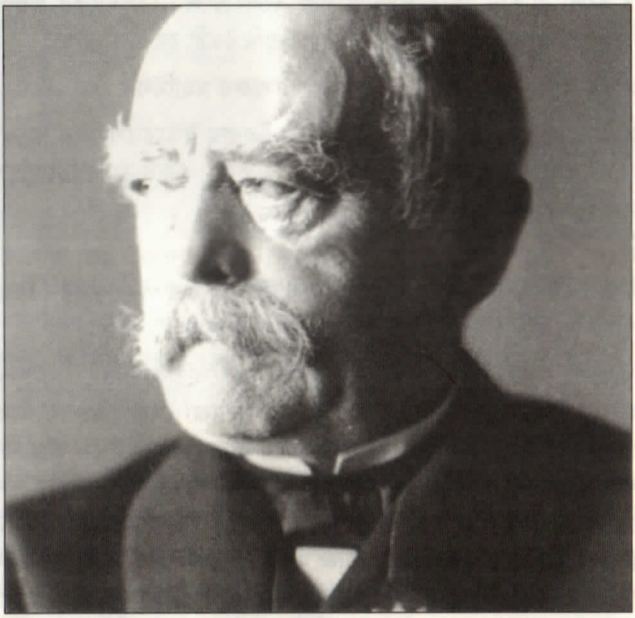
চিত্র ০৭ : আধুনিক জার্মানীর জনক বিসমার্ক যার নেতৃত্বে ১৮৭১ সালে খণ্ডবিখণ্ড জার্মান জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়।

কিন্তু এটাই হয়ে গেলো বাস্তব। বিসমার্কের পদত্যাগের পরপরই বদলে যেতে লাগলো ইউরোপের রাজনীতির দৃশ্যপট। দোর্দন্ডপ্রতাপে পুরো ইউরোপে মাতব্বরি করছিলেন বিসমার্ক। কিন্তু এবার জার্মানীর যুদ্ধবাজ পাগলা সম্রাটের কারণে জার্মানী ইউরোপের রাজনীতিতে তার বন্ধু হারাতে লাগলো।

বিসমার্ক যিনি তার সারাজীবন ব্যয় করছেন জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে, আজ ৭৫ বছর বয়সে তাকে পদত্যাগ করতে হলো ২৯ বৎসর বয়স্ক একজন নাবালক সম্রাটের নির্দেশে।

মামুন বললো, "বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসটাই আসলে ষড়যন্ত্র আর নিষ্ঠুরতার ইতিহাস। মোঘল সম্রাট আকবরকে লালন পালন করে রাজ্যশিক্ষা দিলেন তার পিতৃবন্ধু বৈরাম খান-শেষমেষ তাকে গুপ্তঘাতক দিয়ে হত্যা করে উপযুক্ত(!) প্রতিদান দিলেন সম্রাট আকবর।"

জারিফ বললো, "তুমি ঠিক উপমাটাই দিয়েছো। আধুনিক জার্মানীর প্রতিষ্ঠাতা বিসমার্কের এরকম অপমানজনক বিদায় প্রাপ্য ছিলো না।"



চিত্র ০৭ : আধুনিক জার্মানীর জনক বিসমার্ক যার নেতৃত্বে ১৮৭১ সালে খণ্ডবিখণ্ড জার্মান জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়।

কিন্তু এটাই হয়ে গেলো বাস্তব। বিসমার্কের পদত্যাগের পরপরই বদলে যেতে লাগলো ইউরোপের রাজনীতির দৃশ্যপট। দোর্দণ্ডপ্রতাপে পুরো ইউরোপে মাতব্বরি করছিলেন বিসমার্ক। কিন্তু এবার জার্মানীর যুদ্ধবাজ পাগলা সম্রাটের কারণে জার্মানী ইউরোপের রাজনীতিতে তার বন্ধু হারাতে লাগলো।

কোনঠাসা ফ্রান্স এবার মাথা তুলে দাঁড়ালোঃ

বিসমার্কের পদত্যাগের পর জার্মানী রাশিয়ার সাথে যে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি করেছিলো, তা আর নবায়ন হয়নি। জার্মান সম্রাট উইলহেম বললেন, রাশিয়ার জারের সাথে তাঁর যে সুসম্পর্ক আছে, তাতেই জার্মানীর চলবে। কিন্তু তা আর হয়নি। সুযোগ বুঝে ফ্রান্স রাশিয়ার সাথে মৈত্রী গড়ে তুললো। রাশিয়া ছিলো ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশ। ফ্রান্স রাশিয়াকে শিক্ষা-কারিগরি খাত-অবকাঠামো নির্মানে ব্যপক সহযোগিতা করে তার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লো। **১৮৯৪ সালে গড়ে উঠে ফ্রান্স-রাশিয়া আঁতাত।** কোনো দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হলে দুই দেশ একে অপরকে সম্পূর্ণ সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলো। কেউ কেউ বলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের বীজ পুঁতা ছিলো এই দুই দেশের আঁতাত। জার্মানীর পূর্বে শত্রু সৃষ্টি হলো রাশিয়া, আর পশ্চিমে শত্রু হলো ফ্রান্স। বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি জলাঞ্জলি দিলো জার্মানী; প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমি তৈরী হতে লাগলো।

১৯০৪ সালঃ- হাজার বছরের দুই ঐতিহ্যবাহী শত্রুর মহামিলন

জার্মানীর কাছে পরাজিত হয়ে কোনঠাসা ফ্রান্স এবার ইউরোপে তার বন্ধুর সংখ্যা বাড়াতে চাইলো। রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব তো হলোই, এবার ফ্রান্স ব্রিটেনের সাথে সম্পর্ক গড়ার উদ্যোগ নিলো।

মামুন বললো, "ব্রিটেন আর ফ্রান্সের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরী হওয়াটা তো আসলে বিরাট ঘটনা। এই দুইটা দেশ এক হাজারের বেশি বছর যাবত পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তারা কিভাবে পারলো এই অসাধ্য সাধন করতে-?"

জারিফ বললো, "কারণ হচ্ছে সেই জার্মানি।" অর্থনৈতিক শক্তিতে বলীয়ান নব্য ধনী জার্মানরা ব্রিটেন আর ফ্রান্সের জগৎজোড়া সাম্রাজ্য দেখে হিংসায় মাথা কুটে মরতো। ফ্রান্স ভাবলো, একমাত্র ব্রিটেনের সাথে বন্ধুত্ব থাকলেই সে জার্মানীর হাত থেকে বাঁচতে পারবে। জার্মানীর প্রবল প্রতাপের সামনে ইউরোপীয় দেশগুলি খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। তাই, ফ্রান্স ব্রিটেনের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ালো। ব্রিটেন ফ্রান্সের প্রস্তাব পেয়ে সানন্দে রাজি হলো। ব্রিটেন ইতোমধ্যে বুঝে ফেলেছে জার্মানরা ফরাসিদের তুলনায় ইংরেজদেরকে আরও বেশি ঘৃণা করে। সুযোগ পেলে জার্মানরা, ব্রিটেনের উপর চড়াও হবে। অবশেষে ১৯০৪ সালে এপ্রিলের ৪ তারিখ ফ্রান্স-ব্রিটেন ঐতিহাসিক মৈত্রী চুক্তিতে উপনীত হলো। দু'দেশ তাদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য সমস্ত মতপার্থক্য সরিয়ে দিলো। ১৮৮২ সালে ব্রিটেন যখন মিশর দখল করে, তখন ফ্রান্স নাখোশ হয়েছিলো। এবার ফ্রান্স মিশরে বৃটিশ শাসন মেনে নিলো। বিনিময়ে ব্রিটেন আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কোসহ আফ্রিকার আরও অনেক দেশে ফ্রান্সের শাসন মেনে নিলো। ফরাসীদের দখলে থাকা ইন্দোচীনের তিনটি দেশ-লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামে ফরাসী

শাসন পাকাপোক্ত হলো। ব্রিটেনও খুশি মনে মেনে নিলো। ব্রিটেনের দখলে থাকা মিয়ানমার ও মালয়েশিয়ার সাথে যাতে কোনো রকম সংঘর্ষ না হয়, সেজন্য দু'দেশ মিলে থাইল্যান্ডকে বাফার স্টেট বানালো। সিদ্ধান্ত হলো থাইল্যান্ড কেউ দখল করবে না। থাইল্যান্ড হবে মুক্তভূমি। দু'দেশের সীমানা নিয়ে সংঘাত যাতে না হয়, সেজন্য থাইল্যান্ডকে দখলমুক্ত রাখবে দু'পক্ষ।

মামুন বললো, ''এজন্যই তুমি বলো থাইল্যান্ড যে স্বাধীন এতে থাইল্যান্ডের কোনো কৃতিত্ব নাই?''

এক্সাক্টলি-

তৃতীয় কোনো দেশের মোকাবেলায় ব্রিটেন–ফ্রান্স একে অপরকে সাহায্য করবে, চুক্তিতে এটাও বলা ছিলো।

১৯০৭ সাল:-গড়ে উঠলো ব্রিটেন-রাশিয়া আঁতাত:

৩১ আগস্ট-১৯০৭ সাল:

ইউরোপের ইতিহাসে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি হলো নতুন করে। আমরা আগেই দেখেছি, ফ্রান্সের সাথে শত্রুতার অবসান ঘটালো ব্রিটেন ১৯০৪ সালে। তারও আগে ১৮৯৪ সালে ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি হয় রাশিয়ার। এবার তৈরি হলো ব্রিটেনের সাথে রাশিয়ার বন্ধুত্ব তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপট।

মামুন বললো, "ব্রিটেনের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কও তো ভালো থাকার কথা না। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তুরস্কের পক্ষ নিয়ে ব্রিটেন-ফ্রান্স রাশিয়াকে জন্মের শিক্ষা দিয়েছিলো। তাছাড়া ইরানের ভূ-খন্ড নিয়ে ব্রিটেন-রাশিয়ার মধ্যে ঠোকাঠুকি চলছিলো। আফগানিস্তান দখল করে রাশিয়া ভারতবর্ষে ব্রিটেনের অস্তিত্বকে নাজেহাল করার চেষ্টা চালিয়েছিলো যুগের পর যুগ"

জারিফ বললো, "কথা সত্যি। কিন্তু যেইমাত্র নতুন পাগল জার্মানির আগমন ঘটলো ইউরোপের রাজনীতির মঞ্চে,তখনি ব্রিটেন-ফ্রান্সের মতো রাশিয়াও শংকিত হয়ে পড়লো। ফ্রান্সের সাথে শত্রুতা মিটিয়ে রাশিয়া মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো সেই ১৮৯৪ সালে।"

১৯০৭ সালের ৩১ আগস্ট রাশিয়ার সাথে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় রাশিয়া আর ব্রিটেনের মাঝে।

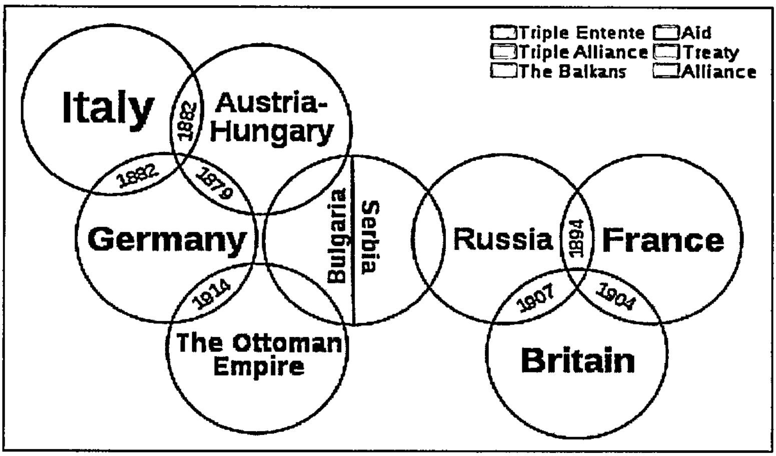
প্রথম চুক্তিটা ছিলো ইরানকে ঘিরে। ইরানকে তিনটি জোনে বিভক্ত করা হয়। ককেশাস সংলগ্ন অঞ্চল দখল করে রাশিয়া, আর পার্সিয়ান উপসাগর সংলগ্ন অঞ্চল দখল করে ব্রিটেন। এই দুই পরাশক্তির অবস্থানকে পৃথক করার জন্য আরেকটা নিরপেক্ষ জোন তৈরি করা হয়। ইরানকে নিয়ে ব্রিটেন-রাশিয়ার এই দখলদারিত্বকে কূটনীতির ভাষায়, 'Great game' বলা হয়। একটা কথা মনে রাখা

প্রয়োজন, ইরান পুরোপুরি কলোনী ছিলো না ব্রিটেন-রাশিয়ার। ইরানের নিজস্ব সরকার ছিলো, ১৯০৬ সালের পর পার্লামেন্টও ছিলো। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি হাসিলের জন্য দুর্বল ইরানকে এ তিনভাগে ভাগ করেছিলো ব্রিটেন-রাশিয়া। চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া ইরানের আর কিছু করার ছিলো না।

দ্বিতীয় চুক্তিটা ছিলো তিব্বতকে নিয়ে। তিব্বত তখন ছিলো স্বাধীন ভূ-খন্ড। তিব্বতে রাশিয়া ও ব্রিটেন কেউ হস্তক্ষেপ করবে না-এ মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় চুক্তিটা ছিলো আফগানিস্তানকে ঘিরে। স্বাধীনচেতা আফগানদের না পারলো বৃটিশরা দখলে রাখতে, না পারলো রাশিয়া দখলে রাখতে। আফগানিস্তানের সাথেই ব্রিটেনের মহামূল্যবান উপনিবেশ ভারতবর্ষের সীমানা। তাই ব্রিটেন চেয়েছিলো আফগানিস্তানের দিকে কোনোভাবেই যাতে নজর না দেয় রাশিয়া। কারণ, ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত রাশিয়ানরা চলে আসুক সেটা ব্রিটেন কোনোভাবেই চায় নি। রাশিয়া ব্রিটেনের এই দাবী মেনে নিলো।

এভাবেই ব্রিটেন-রাশিয়া ঘনিষ্ট মিত্রে পরিণত হয়।



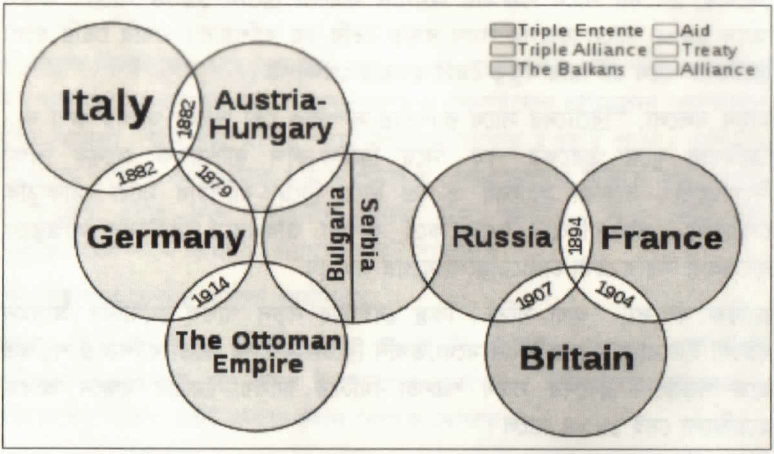
চিত্র-০৮ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পরাশক্তিগুলোর জোটবদ্ধ অবস্থান দেখানো হচ্ছে উপরের ছবিতে। ডানপাশের চিত্রে দেখা যাচ্ছে- ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ। তারা কাছে টেনেছে সার্বিয়াকে। বামপাশের চিত্রে দেখা যাচ্ছে- ইতালি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরী, জার্মানী ও তুরস্ক একসাথে জোটবদ্ধ। এই দলে ভিড়েছে বুলগেরিয়া। যদিও ইতালি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার দলে ভিড়ে যায়।

প্রয়োজন, ইরান পুরোপুরি কলোনী ছিলো না ব্রিটেন-রাশিয়ার। ইরানের নিজস্ব সরকার ছিলো, ১৯০৬ সালের পর পার্লামেন্টও ছিলো। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি হাসিলের জন্য দুর্বল ইরানকে এ তিনভাগে ভাগ করেছিলো ব্রিটেন-রাশিয়া। চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া ইরানের আর কিছু করার ছিলো না।

দ্বিতীয় চুক্তিটা ছিলো তিব্বতকে নিয়ে। তিব্বত তখন ছিলো স্বাধীন ভূ-খন্ড। তিব্বতে রাশিয়া ও ব্রিটেন কেউ হস্তক্ষেপ করবে না-এ মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় চুক্তিটা ছিলো আফগানিস্তানকে ঘিরে। স্বাধীনচেতা আফগানদের না পারলো বৃটিশরা দখলে রাখতে, না পারলো রাশিয়া দখলে রাখতে। আফগানিস্তানের সাথেই ব্রিটেনের মহামূল্যবান উপনিবেশ ভারতবর্ষের সীমানা। তাই ব্রিটেন চেয়েছিলো আফগানিস্তানের দিকে কোনোভাবেই যাতে নজর না দেয় রাশিয়া। কারণ, ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত রাশিয়ানরা চলে আসুক সেটা ব্রিটেন কোনোভাবেই চায় নি। রাশিয়া ব্রিটেনের এই দাবী মেনে নিলো।

এভাবেই ব্রিটেন-রাশিয়া ঘনিষ্ট মিত্রে পরিণত হয়।



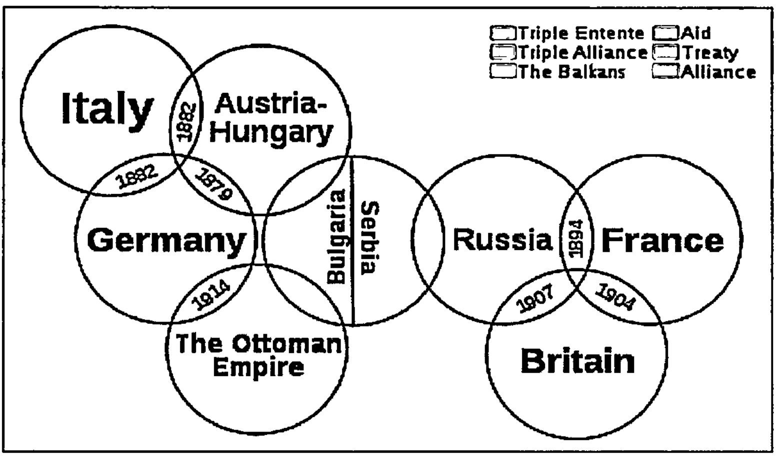
চিত্র-০৮ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পরাশক্তিগুলোর জোটবদ্ধ অবস্থান দেখানো হচ্ছে উপরের ছবিতে। ডানপাশের চিত্রে দেখা যাচ্ছে- ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ। তারা কাছে টেনেছে সার্বিয়াকে। বামপাশের চিত্রে দেখা যাচ্ছে- ইতালি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরী, জার্মানী ও তুরস্ক একসাথে জোটবদ্ধ। এই দলে ভিড়েছে বুলগেরিয়া। যদিও ইতালি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার দলে ভিড়ে যায়।

প্রয়োজন, ইরান পুরোপুরি কলোনী ছিলো না ব্রিটেন-রাশিয়ার। ইরানের নিজস্ব সরকার ছিলো, ১৯০৬ সালের পর পার্লামেন্টও ছিলো। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি হাসিলের জন্য দুর্বল ইরানকে এ তিনভাগে ভাগ করেছিলো ব্রিটেন-রাশিয়া। চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া ইরানের আর কিছু করার ছিলো না।

দ্বিতীয় চুক্তিটা ছিলো তিব্বতকে নিয়ে। তিব্বত তখন ছিলো স্বাধীন ভূ-খন্ড। তিব্বতে রাশিয়া ও ব্রিটেন কেউ হস্তক্ষেপ করবে না-এ মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় চুক্তিটা ছিলো আফগানিস্তানকে ঘিরে। স্বাধীনচেতা আফগানদের না পারলো বৃটিশরা দখলে রাখতে, না পারলো রাশিয়া দখলে রাখতে। আফগানিস্তানের সাথেই ব্রিটেনের মহামূল্যবান উপনিবেশ ভারতবর্ষের সীমানা। তাই ব্রিটেন চেয়েছিলো আফগানিস্তানের দিকে কোনোভাবেই যাতে নজর না দেয় রাশিয়া। কারণ, ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত রাশিয়ানরা চলে আসুক সেটা ব্রিটেন কোনোভাবেই চায় নি। রাশিয়া ব্রিটেনের এই দাবী মেনে নিলো।

এভাবেই ব্রিটেন-রাশিয়া ঘনিষ্ট মিত্রে পরিণত হয়।



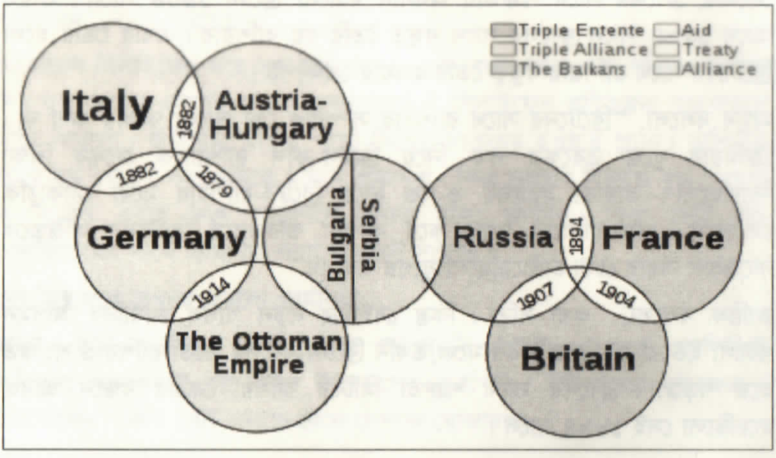
চিত্র-০৮ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পরাশক্তিগুলোর জোটবদ্ধ অবস্থান দেখানো হচ্ছে উপরের ছবিতে। ডানপাশের চিত্রে দেখা যাচ্ছে- ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ। তারা কাছে টেনেছে সার্বিয়াকে। বামপাশের চিত্রে দেখা যাচ্ছে- ইতালি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরী, জার্মানী ও তুরস্ক একসাথে জোটবদ্ধ। এই দলে ভিড়েছে বুলগেরিয়া। যদিও ইতালি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার দলে ভিড়ে যায়।

প্রয়োজন, ইরান পুরোপুরি কলোনী ছিলো না ব্রিটেন-রাশিয়ার। ইরানের নিজস্ব সরকার ছিলো, ১৯০৬ সালের পর পার্লামেন্টও ছিলো। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি হাসিলের জন্য দুর্বল ইরানকে এ তিনভাগে ভাগ করেছিলো ব্রিটেন-রাশিয়া। চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া ইরানের আর কিছু করার ছিলো না।

দ্বিতীয় চুক্তিটা ছিলো তিব্বতকে নিয়ে। তিব্বত তখন ছিলো স্বাধীন ভূ-খন্ড। তিব্বতে রাশিয়া ও ব্রিটেন কেউ হস্তক্ষেপ করবে না-এ মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় চুক্তিটা ছিলো আফগানিস্তানকে ঘিরে। স্বাধীনচেতা আফগানদের না পারলো বৃটিশরা দখলে রাখতে, না পারলো রাশিয়া দখলে রাখতে। আফগানিস্তানের সাথেই ব্রিটেনের মহামূল্যবান উপনিবেশ ভারতবর্ষের সীমানা। তাই ব্রিটেন চেয়েছিলো আফগানিস্তানের দিকে কোনোভাবেই যাতে নজর না দেয় রাশিয়া। কারণ, ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত রাশিয়ানরা চলে আসুক সেটা ব্রিটেন কোনোভাবেই চায় নি। রাশিয়া ব্রিটেনের এই দাবী মেনে নিলো।

এভাবেই ব্রিটেন-রাশিয়া ঘনিষ্ট মিত্রে পরিণত হয়।



চিত্র-০৮ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পরাশক্তিগুলোর জোটবদ্ধ অবস্থান দেখানো হচ্ছে উপরের ছবিতে। ডানপাশের চিত্রে দেখা যাচ্ছে- ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ। তারা কাছে টেনেছে সার্বিয়াকে। বামপাশের চিত্রে দেখা যাচ্ছে- ইতালি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরী, জার্মানী ও তুরস্ক একসাথে জোটবদ্ধ। এই দলে ভিড়েছে বুলগেরিয়া। যদিও ইতালি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার দলে ভিড়ে যায়।

জার্মানির পাগলা রাজা দ্বিতীয় উইলহেমের তামাশা চলছেই:

জার্মানির বিরুদ্ধে যখন একের পর এক জোট হচ্ছে ব্রিটেন-ফ্রান্স আর রাশিয়ার মাঝে, জার্মান সম্রাট উইলহেম তখন সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছেন। ব্রিটেনের সাথে পাল্লা দিয়ে নৌ-বাহিনী বানাচ্ছেন। একের পর এক অস্ত্র কারখানা তৈরী হচ্ছে জার্মানীতে। ১৯০৫ সালে জার্মান সম্রাট এক প্রমোদতরীতে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত মরক্কোর তাঞ্জিয়ার্স নগরীতে তাশরীফ আনয়ন করেন। মরক্কো তখন নামমাত্র স্বাধীন, যদিও ফ্রান্স তাঁর ঘাঁটি তৈরী করে রেখেছে। জার্মান সম্রাট মরক্কো গিয়েই উস্কানি দিলেন স্থানীয় লোকদের। "তোমরা সব স্বাধীন হও, ফ্রান্সকে বিতাড়িত করো; জার্মানি তোমাদের সাহায্য করবে।"

তড়িঘড়ি করে ফ্রান্স ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করলো। সমর্থন যোগালো ব্রিটেন-রাশিয়া-আমেরিকা। জার্মানীর বিরুদ্ধে সরব হয় সব দেশ। একমাত্র ঘনিষ্ঠ মিত্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরী বাদে। সবদেশ মিলে মরক্কোকে ঘিরে একটা চুক্তি করে। সিদ্ধান্ত হয়, মরক্কোতে সব দেশ ব্যবসা বাণিজ্য করবে। কোনো দেশ মরক্কোতে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। মরক্কো সংকট নিয়ে লজ্জায় পড়লো উদ্যত জার্মানী। কারণ, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারলো না তারা।

আফ্রিকান দেশ মরক্কোকে নিয়ে দ্বিতীয় বার আরেকটা সংকট সৃষ্টি হলো ১৯১১ সালে। মরক্কোর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো। ফ্রান্স সুলতানকে সাহায্য করতে সৈন্য পাঠালো। জার্মানী বললো, "হতেই পারে না। ফ্রান্স নিজেই মরক্কোতে সংকট সৃষ্টি করে এখন তা দখল করার পাঁয়তারা করছে"। জার্মানরা এক শক্তিশালী নৌ-বাহিনী পাঠালো। আবার ফ্রান্সের পাশে দাঁড়ালো ব্রিটেন-রাশিয়া। কয়েক বছরের মধ্যে জার্মানি হয়ে পড়লো ইউরোপে বন্ধুহীন। জার্মান নৌ-বাহিনী পিছু হটলো। মরক্কোকে নিয়ে দ্বিতীয়বার এই সংকটের কারণে বোঝা গেলো বিশ্ব নতুন একটি যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। কোন উছিলায় কোন সময় যে যুদ্ধ লেগে যায় তার কোনো ঠিক নাই।

মামুন বললো, **"তাহলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইউরোপের জোটবদ্ধ রাজনীতির অবস্থাটা ছিলো এরকম-ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া একপক্ষে, আর জার্মানি-ইতালি-অস্ট্রো/হাঙ্গেরী অপরপক্ষে।"**

জারিফ বললো-ঠিক তাই। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে জোটের মধ্যে একটু অদল বদল হয়। সুযোগ বুঝে ইতালি জার্মানির নেতৃত্বাধীন পক্ষ ত্যাগ করে ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার দলে ঢুকে পড়ে। আর জার্মানির সাথে চরম দোস্তি গড়ে তুলে তুরস্কের উসমানীয়া সালতানাত। ধীরে ধীরে সব বলবো।

প্রথম মহাযুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ (১৯১৪ থেকে ১৯১৮)

****

পর্ব-০৮

মামুন প্রশ্ন করলো, ‘‘মিঃ জারিফ-তোমার প্রতি আমার একটা প্রশ্ন আছে।”

বলো।

প্রশ্নটা হচ্ছে-বিংশ শতাব্দীর কাহিনী বলতে গিয়ে তুমি আমাকে যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর বর্ণনা দিলে তা এককথায় অসাধারণ। কিন্তু আমার মনে খটকা হচ্ছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তো এসব শক্তিশালী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মাটিতে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছে পূর্ব ইউরোপের ছোট্ট দেশ বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে ।

আমরা সবাই জানি-অস্ট্রো-হাঙ্গেরী রাজবংশের যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্দ ও তার স্ত্রী সুফি পূর্ব ইউরোপের দেশ বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে পৌঁছান ১৯১৪ সালের ২৮ জুন। নগরীর মেয়র কর্তৃক আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় যোগ দেয়ার প্রাক্কালে সার্বিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্যাবিয়েল ফ্রিন্সিপ যুবরাজ ও তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হয়।

আমার প্রশ্ন হলো, এই ঘটনায় পরবর্তীতে কিভাবে পরাশক্তিগুলো জড়িয়ে পড়লো?

জারিফ বললো, ‘‘সার্বিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্তৃক অস্ট্রো-হাঙ্গেরী বংশের যুবরাজ স্ত্রীসহ নিহত হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়নি। যুদ্ধ শুরু হয়েছে-ঠিক ১ মাস পর। কেন এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো বিশ্বে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো-এটা বুঝতে হলে তোমাকে অত্র অঞ্চলের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিন্যাস জানতে হবে। চলো আমরা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।”

বলকান অঞ্চলের ইতিকথা ও তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফতঃ

বলকান একটি তুর্কি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে-পার্বত্যাঞ্চল। বলকান রাষ্ট্রগুলো পূর্ব ইউরোপে অবস্থিত। আলবেনিয়া, বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, কসোভো, উত্তর মেসিডোনিয়া, মন্টেনিগ্রো, রোমানিয়া, সার্বিয়া, স্লোভেনিয়া-এই দেশগুলি বলকান অঞ্চলের দেশ নামে পরিচিত। তুমি মানচিত্রে এ দেশগুলোর অবস্থান লক্ষ্য করে মনে রাখো কারণ পরীক্ষায় এ সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে।



চিত্র-০৯: বলকান অঞ্চলের দেশগুলো তুরস্কের উসমানীয়া সুলতানরা শাসন করতো বিধায়-এসব এলাকা হয়ে পড়েছিলো মুসলিম অধ্যুষিত; যেটা রাশিয়ার কাছে খুব বিরক্তিকর ছিলো। **এ অঞ্চলগুলো শত শত বছর যাবত শাসন করতো তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফত।**

যেহেতু তুরস্ক ছিলো মুসলমান দেশ, তাই পূর্ব ইউরোপের এই বলকান রাষ্ট্রগুলিতে ইসলামী সংস্কৃতি ও ধর্ম আসন গেড়ে নেয়। প্রচুর খৃস্টান লোক মুসলমান হয়ে পড়ে তুরস্কের শাসনে। বিশেষ করে আলবেনিয়া, বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা, কসোভো-এ দেশগুলোতে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

কিন্তু পূর্ব ইউরোপের মাটিতে তুরস্কের শাসন একদম পছন্দ করতোনা বিশাল দেশ রাশিয়া।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, ''তুরস্কের প্রতি রাশিয়ার এত ক্ষোভের কারণ কি?''

জারিফ বললো, ''এই প্রশ্নের উত্তর জানার সাথে প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পর্কে ভালো ধারণা হয়ে যাবে। এবার বলছি শোনো।''



চিত্র-০৯: বলকান অঞ্চলের দেশগুলো তুরস্কের উসমানীয়া সুলতানরা শাসন করতো বিধায়-এসব এলাকা হয়ে পড়েছিলো মুসলিম অধ্যুষিত; যেটা রাশিয়ার কাছে খুব বিরক্তিকর ছিলো। **এ অঞ্চলগুলো শত শত বছর যাবত শাসন করতো তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফত।**

যেহেতু তুরস্ক ছিলো মুসলমান দেশ, তাই পূর্ব ইউরোপের এই বলকান রাষ্ট্রগুলিতে ইসলামী সংস্কৃতি ও ধর্ম আসন গেড়ে নেয়। প্রচুর খৃস্টান লোক মুসলমান হয়ে পড়ে তুরস্কের শাসনে। বিশেষ করে আলবেনিয়া, বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা, কসোভো-এ দেশগুলোতে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

কিন্তু পূর্ব ইউরোপের মাটিতে তুরস্কের শাসন একদম পছন্দ করতোনা বিশাল দেশ রাশিয়া।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "তুরস্কের প্রতি রাশিয়ার এত ক্ষোভের কারণ কি?"

জারিফ বললো, "এই প্রশ্নের উত্তর জানার সাথে প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পর্কে ভালো ধারণা হয়ে যাবে। এবার বলছি শোনো।"

পূর্ব ইউরোপের বলকান অঞ্চলের লোকজন ছিলো জাতিতে স্লাভ জনগোষ্ঠীর লোক। একেবারে রাশিয়ার জাত ভাই। রাশিয়ানদের মতো বলকান অঞ্চলের লোকগুলিও ছিলো খৃস্টান। রাশিয়া চাইতো-পূর্ব ইউরোপের লোকগুলিকে নিয়ে তুরস্ককে হটিয়ে স্বাধীন খৃস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করতে। ১৫৬৮ সাল থেকে রাশিয়া তুরস্কের উসমানী সুলতানদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ শুরু করলো। এরপরে রাশিয়ানরা তুরস্কের বিরুদ্ধে কত যুদ্ধ যে করলো তার কোনো হিসাব নাই। তুরস্ককে সারাক্ষণ রাশিয়াকে নিয়ে চিন্তা করতে হতো। মূলত রাশিয়ার তৎপরতায় তুরস্ক ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। **তুরস্ককে ইউরোপের রুগ্ন মানুষ উপাধিটাই দিয়েছে রাশিয়া।**

তুরস্ক যখন প্রকৃতই ইউরোপের রুগ্ন মানুষঃ

ধীরে ধীরে একসময়কার মহাপ্রতাপশালী তুরস্ক ইউরোপের আধুনিক রাষ্ট্রগুলো অপেক্ষা পিছিয়ে পড়লো। বলকান অঞ্চলের দেশগুলো তুরস্কের কবল থেকে মুক্ত হতে চাইলো। রাশিয়া তো তুরস্ককে দুর্বল করে দেয়ার জন্য সারাক্ষণ তৈরী। ১৮৭৮ সালে স্বাধীন হয়ে পড়লো সার্বিয়া। ১৯০৮ সালে স্বাধীন হয় বুলগেরিয়া। সার্বিয়া ছিলো রাশিয়ার অনুগত এবং তীব্র তুরস্ক বিদ্বেষী। **সার্বিয়ানরা চাইতো এ অঞ্চল থেকে তুরস্ক সরে গেলেই সার্বিয়ার নেতৃত্বে স্লাভ জনগোষ্ঠী নিয়ে বিশাল এক স্বাধীন দেশ গড়ে তুলবে। সার্বিয়ার পাশে তুরস্কের চিরশত্রু রাশিয়া তো আছেই। তুরস্কের হাত থেকে একটার পর একটা বলকান দেশগুলো স্বাধীন হতে থাকে, আর সার্বিয়া রাশিয়ার সহায়তায় সুখস্বপ্ন দেখা শুরু করে, কবে সে তুরস্ককে হটিয়ে অত্র অঞ্চলের মাতব্বর হবে।**

কিন্তু হলো না!

জার্মানীর মিত্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ১৯০৮ সালে বলকান অঞ্চলের দেশ বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা দখল করলো। সার্বিয়া ভেবেছিলো, তুরস্কের পতনের পর সেই দখল করবে অত্র অঞ্চলের সব দেশ। কিন্তু অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য তার বাড়াভাতে ছাই দিয়ে ফেললো। নব্য পরাশক্তি জার্মানীর ঘনিষ্ট মিত্র হওয়ায় অস্টো-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতেও পারলো না।

সার্বিয়া তার বড় ভাই রাশিয়ার কাছে বিচার দিলো। বললো, **"বড় ভাই! অস্ট্রো-হাঙ্গেরী যে আমার পড়শি বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা দখল করলো, আমি এখন কি করবো?"**

রাশিয়া তখন সার্বিয়াকে দুটি বুদ্ধি দিলো, প্রথম বুদ্ধিটাই ছিলো খুব মারাত্মক। রাশিয়া সার্বিয়াকে বললো, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর সম্রাট ও তাঁর অনুগতদের প্রতি সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে কিছু ঘাতক বাহিনী তৈয়ার করতে। মনে রেখো মামুন, ঘাতক বাহিনীর ধারণা যুগে যুগেই ছিলো। আমাদের

ভারতবর্ষেও ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশসহ অজস্র বিপ্লবীরা ঔপনিবেশিক শাসকদেরকে হত্যা করতে এরকম বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলো।

মামুন বললো, ‘‘এখন তাহলে বুঝতে পারছি কেন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর যুবরাজকে হত্যা করতে চেয়েছিলো সার্বিয়ান বিপ্লবী গ্যাব্রিয়েল ফ্রিন্সিপ।’’

জারিফ বললো, “এখন তো হিসাব সহজ। বলকান অঞ্চলের স্লাভ জাতির লোকজন ছিলো রাশিয়ার জাত ভাই। আর বলকান অঞ্চল শাসন করতো তুরস্ক। তুরস্ক যখন দুর্বল হয়ে পড়লো-রাশিয়া তার ঘনিষ্ট মিত্র সার্বিয়াকে অত্র অঞ্চলের নেতা বানাতে চাইলো। রাশিয়া চাইতো-তুরস্কের পতন হওয়ার পর সার্বিয়াই হবে স্লাভ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যবিধাতা। নিয়মমাফিক সব এগোচ্ছিলো।

কিন্তু অস্ট্রো-হাঙ্গেরী ১৯০৮ সালে বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা দখল করলে পাশার দান উল্টে যায়। সার্বিয়ার স্বপ্ন মার খায়। তাই সার্বিয়া অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে গোপনে ঘাতক বাহিনী তৈয়ার করে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯১৪ সালের ২৮ জুন যুবরাজ ফার্দিনান্দ স্বস্ত্রীক একজন সার্বিয়ান বিপ্লবী কর্তৃক নিহত হন।’’

স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বলকান অঞ্চলে দু'টি যুদ্ধঃ

সার্বিয়াকে দেওয়া রাশিয়ার দ্বিতীয় বুদ্ধিটা ছিলো একটা বলকান লীগ গঠন। বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, গ্রীস এবং মন্টেনিগ্রো এই চার দেশকে নিয়ে রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় বলকান লীগ গঠিত হলো ১৯১২ সালে। **এই বলকান লীগ গঠন করার উদ্দেশ্যে ছিলো, ইউরোপের মাটি থেকে তুরস্ককে চিরতরে বিদায় করে দেওয়া।**

১৯১২ সালের ৮ অক্টোবর মন্টেনিগ্রো প্রথমে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরে সব দেশ যোগ দেয়। দুই মাসের মধ্যেই যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়। পরে ১৯১৩ সালের মে মাসে লন্ডনে তুরস্কের সাথে বিবদমান দেশগুলোর একটা চুক্তি হয়। **ইউরোপের মাটি থেকে সব ভূ-খন্ড হারায় তুরস্ক।**

মামুন বললো, ‘‘রাশিয়া তো তাহলে ভারী শয়তান। তুরস্কের বিরুদ্ধে কিছু না করলে বুঝি তার দিন যায় না।’’

জারিফ বললো, ‘‘ঠিক তাই! রাশিয়ার ক্রমাগত যুদ্ধ ও কূটনামিতেই তুরস্ক একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে।’’

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের পটভূমি আরও অদ্ভুত-

তুরস্কের বিরুদ্ধে পাওয়া ভূ-খন্ড মেসিডোনিয়ার ভাগাভাগি নিয়ে বলকান লীগের রাষ্ট্রগুলো নিজেরা নিজেরা মারামারি শুরু করে। মেসিডোনিয়ার ভাগ নিয়ে বুলগেরিয়ার সাথে সার্বিয়ার প্রথম সংঘাত শুরু হয়। ১৯১৩ সালের জুনের ১

তারিখ এ সংঘাতের শুরু। সার্বিয়ার সাথে যোগ দেয় গ্রীস ও রুমানিয়া। শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধে বুলগেরিয়া পরাজিত হয় সার্বিয়ার কাছে।

আজকের আলোচনায় শেষমেশ এটাই বলতে চাই যে রাশিয়ার উস্কানিতে সার্বিয়া হয়ে পড়ে বলকান অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। রাশিয়া-ফ্রান্স-ব্রিটেন মিলে ত্রিপক্ষীয় একটা জোট তো ছিলোই। যেহেতু অস্ট্রো-হাঙ্গেরী জোট সার্বিয়ার পড়শি বসনিয়া দখল করলো, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর মিত্র জার্মানি চুপ করে থাকলো। ইউরোপে সব হারিয়ে তুরস্ক এবার সরাসরি জার্মানীর আশ্রয়ে চলে গেলো। তুরস্ক বুঝে গেলো, জার্মানীর সাথে না মিশলে তার অস্তিত্বই আর রাখবে না রাশিয়ানরা। অবশ্য জার্মানির সাথে তুরস্কের সব সময়ই একটা ভালো সম্পর্ক ছিলো।

আশা করি-প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বের প্রেক্ষাপট আমি বোঝাতে পেরেছি।

পর্ব-০৯

জারিফ বললো, আবারো গত পর্বের কথাগুলো আবার স্বরণ করি। অস্ট্রো-হাঙ্গেরী বংশের যুবরাজ ফার্দিনান্দ ১৯১৪ সালের ২৮ জুন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো সফরে গেলে উগ্র সার্বিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্যাবিয়েল ফ্রিন্সিপ কর্তৃক সস্ত্রীক নিহত হন। সার্বিয়ানরা অস্ট্রো-হাঙ্গেরীকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলো না । **কেন অস্ট্রো-হাঙ্গেরী ১৯০৮ সালে বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা দখল করে বলকান অঞ্চলে শক্তি বাড়াচ্ছিলো, এটাই ছিলো সার্বিয়ার মন খারাপের মুল কারণ।**

সার্বিয়া ছিলো রাশিয়ার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র। যাই হোক, যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো ১ মাস পরে ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই। এই একমাস চলেছিলো যুদ্ধ বন্ধের জন্য নাটক। সে কাহিনীই শোনো।

তলে তলে যুদ্ধ প্রস্তুতি, বাস্তবে যুদ্ধ বন্ধের নাটকঃ

মামুন তোমাকে মনে রাখতে হবে। একমাত্র ব্রিটেন ছাড়া সবাই যুদ্ধ করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলো। ১৮১৫ সালে নেপোলিয়ানের অবসানের পর ইউরোপে বড় আকারের কোনো যুদ্ধ হয়নি। ১৮৫৪ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বৃহৎ শক্তিগুলো জড়িয়ে পড়েছিলো ঠিকই, কিন্তু সেটা পশ্চিম ইউরোপের মূল ভূ-খন্ডে নয়। ইউক্রেনের ক্রিমিয়ায় সে যুদ্ধে রাশিয়ানরা হেরে যায় ফ্রান্স-ব্রিটেন-তুরস্কের কাছে।

জার্মানী যুদ্ধে নামার জন্য অজুহাত খুঁজছিলো বহু বছর ধরেই। একটা উছিলা পেলেই সে যুদ্ধে নামবে-এটাই ছিলো জার্মানীর মূলনীতি। ব্রিটেনের সাথে পাল্লা দিয়ে নৌ-শক্তি বাড়াচ্ছিলো জার্মানী। ব্রিটেনের উপনিবেশগুলো দখল করার একটা লোভ জার্মানীর ছিলোই। সার্বিয়াতে যখন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর যুবরাজ নিহত হলো,

জার্মানী আগ বাড়িয়ে তার মিত্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললো। যে যুদ্ধের জন্য জার্মানরা অপেক্ষা করছিলো, সে সুযোগ অবশেষে এসে গেলো।

যুদ্ধ করার জন্য রাশিয়াও ছিলো আগ্রাসী। রাশিয়ান জার দ্বিতীয় নিকোলাস ঘোষণা করলেন, সার্বিয়ার জন্য আমরা সবকিছু করার জন্য প্রস্তুত। পুরো বলকান অঞ্চলে সার্বিয়াকে শক্তিশালী করা ছিলো রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

যুদ্ধ করার জন্য ফ্রান্সও প্রস্তুত। ফ্রান্স ১৮৭১ সালে জার্মানীর হাতে যে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে, তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে হন্যে হয়ে উঠলো। ফ্রান্সের মনে এবার জোশ উঠলো কারণ তার পাশে আছে পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেন। এবার সে হারবে না এই মনোভাব নিয়ে ফ্রান্স তার সৈন্যবাহিনী সাজাতে লাগলো।

অস্ট্রো-হাঙ্গেরী রাজবংশ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। যেহেতু বলকান অঞ্চল থেকে তুরস্ককে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে লজ্জাজনক পরাজয়ের মাধ্যমে এবার বলকান অঞ্চল দখল করবে অস্ট্রো-হাঙ্গেরী। এছাড়াও শক্তিশালী জার্মানি তার পক্ষে থাকায় সে আরও আগ্রাসী হয়ে উঠলো।

সার্বিয়াও যুদ্ধ চায়। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন যখন সার্বিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদী অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর যুবরাজকে হত্যা করলো, প্রতি উত্তরে অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সার্বিয়াকে চরমপত্র দেওয়ার পর এসবের ব্যাপারে গা ছাড়া ভাব দেখায় সার্বিয়া। চরমপত্রকে সার্বিয়া তার সার্বভৌমত্বের লংঘন বলে মনে করে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিলো। তাছাড়া সার্বিয়া জানতো তাকে ছায়ার মতো আশ্রয় দিচ্ছে রাশিয়া। আর রাশিয়ার সাথে মিত্রতা আছে দুই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের। এই যুদ্ধে জার্মানি ও তার মিত্ররা হারবেই-এ আশায় সার্বিয়া প্রস্তুত।

মুমূর্ষু তুরস্কও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ইউরোপে সব হারিয়ে তুরস্ক ধুঁকছিলো। নিজের দেশে ছিলো গণঅভ্যুত্থানের আশংকা। শক্তিধর জার্মানীর সাথে জোট বাধায় তুরস্ক আশায় ছিলো-কিছু একটা পাবে সে এ যুদ্ধ থেকে।

একমাত্র ব্রিটেন যুদ্ধ চায় নি। ব্রিটেন জানতো যুদ্ধ লাগলে তার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যুদ্ধ থামানোর জন্য ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড গ্রে হন্যে হয়ে সব পক্ষকে বোঝাতে লাগলেন। রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াকে নমনীয় রাখার জন্য ব্যাপক চেষ্টা করেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

ইতালি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপাতত নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিলো।

অবশেষে বাজলো যুদ্ধের দামামাঃ

১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর যুবরাজ নিহত হওয়ার পর সার্বিয়াকে চরমপত্র দেয় অস্ট্রো-হাঙ্গেরী। বলাই বাহুল্য-সার্বিয়া এ চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করে।

সার্বিয়া যদি সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীকে ঠান্ডা করতে পারতো তাহলে হয়তো জল এতদূর নাও গড়াতে পারতো। চরমপত্রের সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে-অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সার্বিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। সার্বিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশের ঘোষণা দেয় অস্ট্রো-হাঙ্গেরী। যুদ্ধ ঘোষণার আগমুহূর্তে ভিয়েনার জনগণ সাময়িক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে, বিশাল জনতা ভোর পর্যন্ত দেশপ্রেমিক গানের তালে তালে মিছিল সহকারে রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।

২৮ জুলাই, ১৯১৪ সাল!

সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অস্ট্রো-হাঙ্গেরী। শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা। মানব ইতিহাসের অন্যতম এক প্রাণঘাতী যুদ্ধ। প্রায় সাড়ে চার বছর চলে এই যুদ্ধ। যুদ্ধে মারা যায় অন্তত ১ কোটি ৮০ লাখ লোক। আহত, অথবা পঙ্গুত্ব বরণ করে আরও ৫ কোটি লোক। নাগরিক জীবনকে বিষিয়ে তুলে এই যুদ্ধ।

রাশিয়া যখন দেখলো তার ঘনিষ্ট মিত্র সার্বিয়ার উপর যুদ্ধ ঘোষণা করলো অস্ট্রো-হাঙ্গেরী, পরের দিন ২৯ জুলাই সার্বিয়ার সমর্থনে সৈন্য পাঠানোর কথা ঘোষণা করে। নাটক আবার শুরু।

একদিকে সৈন্য সমাবেশ, আরেকদিকে সংকট মোকাবেলার জন্য ব্রিটেনকে মধ্যস্থতা করার আহবান জানায় রাশিয়া। রাশিয়ার কথামতো ব্রিটেন জার্মানিকে অনুরোধ করে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীকে শান্ত করতে।

এবার জার্মানি শুরু করলো নাটক। ব্রিটেনের নিকট জার্মানি প্রতিশ্রুতি দেয় – অস্ট্রো-হাঙ্গেরীকে সে থামাবে। আসলে ঘটনা উল্টো। জার্মানি মূলত যুদ্ধে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ৩০ জুলাই অস্ট্রো-হাঙ্গেরী জার্মানিকে খবর দেয়-রাশিয়ানরা বিশাল সৈন্য সমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই, রাশিয়ার ফাঁদে পা দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করা হবে বোকামি। ফ্রান্স ও ব্রিটেন রাশিয়াকে সৈন্য সমাবেশ করতে নিষেধ করে।

এবার মাঠে নেমে পড়ে জার্মানি। আগস্ট মাসের ১ তারিখ জার্মানি রাশিয়াকে চরমপত্র দেয় ১২ ঘন্টার মধ্যে সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করতে। রাশিয়া কোনো উত্তর দেয় নি। আগস্টের ২ তারিখ এবার জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধ বন্ধ করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। রাশিয়া-সার্বিয়া একপাশে, অন্যপাশে জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরী। ব্রিটেন-ফ্রান্স তখনও মাঠে নামে নাই। কিন্তু জার্মানীই এই দুই পরাশক্তিকে যুদ্ধে নামালো গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে।

পর্ব-১০

জার্মানির ভয়ংকর "সিলাইফেন" পরিকল্পনাঃ

মামুন প্রশ্ন করলো জারিফকে, "১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সাথে সাথে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজেছে উঠে। তারপর দেখলাম-অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর সমর্থনে জার্মানি আর সার্বিয়ার সমর্থনে রাশিয়া যুদ্ধে নেমে পড়ে।"

আজ তাহলে বলো, ''ইউরোপের দুই ঐতিহ্যবাহী শক্তি ফ্রান্স-ব্রিটেন কিভাবে যুদ্ধে নামলো?"

জারিফ উত্তর দিলো, ''একটু সাহিত্যিক আলাপ করে নেই প্রথমে। বলো-দামামা শব্দের অর্থ কি?"

মামুন বললো, "হতে পারে -সূচনা। প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা মানে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা।"

হয় নাই। দামামা একটি ফারসি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে-ঢোলবাদ্য। যুদ্ধের সমর্থনে ঢোলবাদ্য বাজানোই হচ্ছে-দামামা। **আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের একটি কবিতার লাইন হচ্ছে-**

''বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান।"

এখানে আরেকটা নতুন শব্দ ঢুকে গেলো 'আমামা'। আমামাও ফারসি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে 'পাগড়ি'।

আচ্ছা, বাদ দাও। এবার ব্রিটেন-ফ্রান্সের যুদ্ধে জড়িয়ে যাবার কাহিনী শোনো।

কোনো সন্দেহ নেই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মূল কারিগর জার্মানরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাও বৃহৎশক্তিগুলোর কিছু ভূমিকা আছে। জার্মানীর প্রতি অবিচার করার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। **কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধটাকে ভয়ংকর করার শতভাগ কৃতিত্ব জার্মানদের।** লক্ষ্য করো, আগস্টের ২ তারিখ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানী। কিন্তু রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করার কোনো উদ্দেশ্যেই আপাতত ছিলো না জার্মানীর। জার্মানী রাশিয়ান বাহিনীকে একটু চোখে চোখে রাখার জন্য উপদেশ দিলো তার মিত্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরীকে।

জার্মানীর উদ্দেশ্যে ছিলো চিরশত্রু ফ্রান্স-

১৮৭১ সালে ফ্রান্সকে জন্মের শিক্ষা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর জন্ম হলো। এরপরেও ফ্রান্সের প্রতি ক্ষোভ যায় নি জার্মানীর। যেকোনো মূল্যে ফ্রান্সের সাথে দুশমনি চলছেই তার। জার্মানীর ভয়ে ফ্রান্স ব্রিটেনের সাথে হাত মেলায় ১৯০৪ সালে। অবশ্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স-এই দুই দেশকেই তীব্রভাবে ঘৃণা করতো জার্মানরা।

এই দুই দেশ লুটেপুটে খাচ্ছে পুরো পৃথিবী। হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে উঠা জার্মানীর তো এগুলো সহ্য হয় না। মনে মনে জার্মানরা যুদ্ধের উছিলা খুঁজে এই দুই দেশকে শায়েস্তা করতে চাইলো। ঠিক তখনই ঘটলো-সার্বিয়ার ঘটনা।

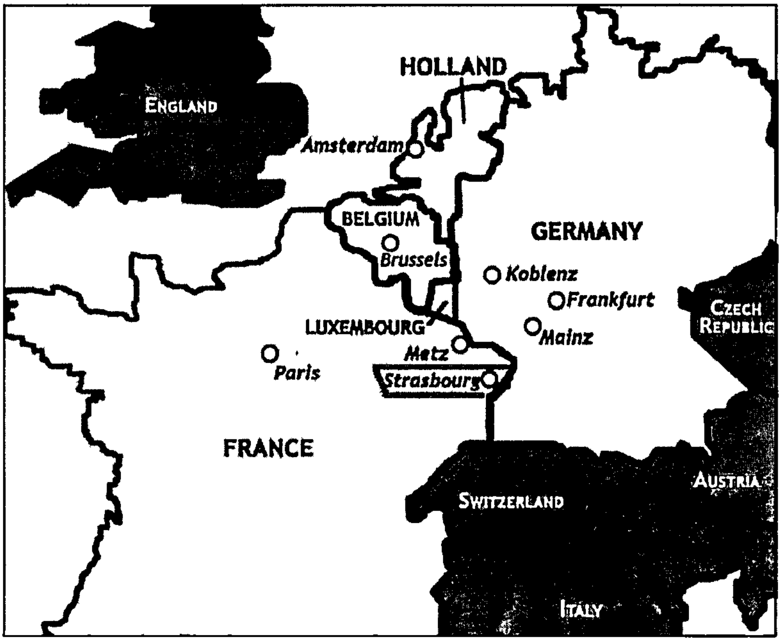
সে যাই হোক। জার্মানীর একজন চিফ অব আর্মি স্টাফ ছিলেন জেনারেল সিলাইফেন। ১৮৯১ সাল থেকে শুরু করে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন জার্মান সেনাবাহিনীর হর্তাকর্তা। তিনি ভবিষ্যৎ জার্মান সেনাপতিদের জন্য একটা পরিকল্পনা বানিয়ে দিয়ে যান। তিনি জার্মানীর যুদ্ধলিপ্সা সম্পর্কে জানতেন। তিনি বলে গিয়েছিলেন, ইউরোপে যদি কখনো যুদ্ধ লাগে, আর জার্মানী যদি ইউরোপের যুদ্ধ জিততে চায়, তার উচিত হবে প্রথমেই বিদ্যুৎগতিতে ফ্রান্সকে আক্রমণ করা। কারণ, দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর সামনে ফ্রান্স ১৫ দিনও ঠিকতে পারবে না। ফ্রান্সকে বশে এনে তারপর জার্মানীর উচিত হবে পুরো শক্তি নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। একসাথে ফ্রান্স-রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ হলে জার্মানরা অবশ্যই হেরে যাবে। তাই এক এক করে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে জিতে তারপর ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়া উচিত। তাহলেই ব্রিটেনকে পরাজিত করে জার্মানরা সারা পৃথিবী শাসন করবে। জার্মানীর সামরিক ইতিহাসে এই কর্মপদ্ধতি "সিলাইফেন পরিকল্পনা" নামে পরিচিত।

জেনারেল সিলাইফেন মরে ভূত হয়ে যান ১৯১৩ সালে, কিন্তু তার পরিকল্পনা মরে নি। যুদ্ধ যেহেতু লেগেই গেলো-এবার জার্মানী সিলাইফেন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মাঠে নামলো। জার্মানীর মাথায় পুরো বিশ্বের মাতব্বর হওয়ার প্ল্যান। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেও যুদ্ধে যায়নি জার্মানরা। কিন্তু ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করেও এবার ফ্রান্স আক্রমনে উদ্যত হলো জার্মানি। কিন্তু ছোট্ট রাষ্ট্র বেলজিয়ামের সাথে জার্মানীর লাগলো একটু সংঘাত।

বেলজিয়ামকে তছনছ করলো জার্মানরাঃ

মামুন! তুমি মানচিত্রে বেলজিয়ামের অবস্থানটা দেখো। তোমার এমসিকিউ পরীক্ষায় অনেকবার প্রশ্ন আসে ইউরোপের ককপিট / ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্র / ইউরোপের বাফার স্টেট বলতে কোন দেশকে বোঝায়?

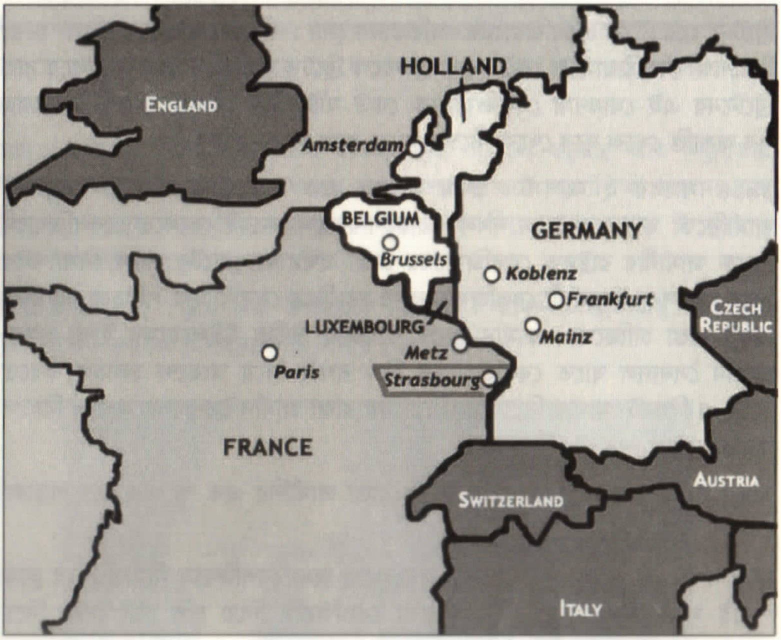
উত্তর হবে-বেলজিয়াম।



চিত্র-১০ : বেলজিয়ামের একপাশে জার্মানী আর এক পাশে ফ্রান্স। এই দুই চিরশত্রু দেশের মাঝে পড়ে বেলজিয়ামের উপর ঝড়ঝাপ্টা যায় দুটি বিশ্বযুদ্ধেই। জার্মানরা বেলজিয়ামের ভূমি মাড়িয়ে ফ্রান্সকে আক্রমণ করে। এজন্য বেলজিয়ামকে বলা হয় 'ইউরোপের ককপিট বা যুদ্ধক্ষেত্র'।

এর পিছনে কারণ আছে। ১৮৩৯ সালে ব্রিটেনের সাথে বেলজিয়ামের একটা মৈত্রী চুক্তি হয়। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ানের আশকারা পেয়ে বেলজিয়ামকে অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছিলো নেদারল্যান্ড। ১৮৩৯ সালে বেলজিয়াম স্বাধীন হয়। ব্রিটেন ইউরোপের সব পরাশক্তিদের বলে দেয়, বেলজিয়াম হবে পুরোপুরি নিরপেক্ষ একটা দেশ। সে কারো সাথে যুদ্ধে জড়াবে না। তারপর থেকে বেলজিয়াম হলো ইউরোপের বাফার স্টেট।

বাফার স্টেট মানে তো জানোই, কোনো একটি দেশ যখন চারপাশে শক্তিশালী দেশ দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তখন সে কোনো শক্তিশালী দেশের পক্ষে না গিয়ে নিরপেক্ষ থাকে। বেলজিয়ামের একপাশে ফ্রান্স, অন্যপাশে জার্মানী। উত্তরদিকে নেদারল্যান্ড, আর নৌ-সীমানা আছে ব্রিটেনের সাথে। এই চারটি শক্তিধর দেশের সাথে ছোট্ট বেলজিয়ামের সীমান্ত।



চিত্র-১০ : বেলজিয়ামের একপাশে জার্মানী আর এক পাশে ফ্রান্স। এই দুই চিরশত্রু দেশের মাঝে পড়ে বেলজিয়ামের উপর ঝড়ঝাপ্টা যায় দুটি বিশ্বযুদ্ধেই। জার্মানরা বেলজিয়ামের ভূমি মাড়িয়ে ফ্রান্সকে আক্রমণ করে। এজন্য বেলজিয়ামকে বলা হয় 'ইউরোপের ককপিট বা যুদ্ধক্ষেত্র'।

এর পিছনে কারণ আছে। ১৮৩৯ সালে ব্রিটেনের সাথে বেলজিয়ামের একটা মৈত্রী চুক্তি হয়। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ানের আশকারা পেয়ে বেলজিয়ামকে অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছিলো নেদারল্যান্ড। **১৮৩৯ সালে বেলজিয়াম স্বাধীন হয়। ব্রিটেন ইউরোপের সব পরাশক্তিদের বলে দেয়, বেলজিয়াম হবে পুরোপুরি নিরপেক্ষ একটা দেশ। সে কারো সাথে যুদ্ধে জড়াবে না। তারপর থেকে বেলজিয়াম হলো ইউরোপের বাফার স্টেট।**

বাফার স্টেট মানে তো জানোই, কোনো একটি দেশ যখন চারপাশে শক্তিশালী দেশ দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তখন সে কোনো শক্তিশালী দেশের পক্ষে না গিয়ে নিরপেক্ষ থাকে। বেলজিয়ামের একপাশে ফ্রান্স, অন্যপাশে জার্মানী। উত্তরদিকে নেদারল্যান্ড, আর নৌ-সীমানা আছে ব্রিটেনের সাথে। এই চারটি শক্তিধর দেশের সাথে ছোট্ট বেলজিয়ামের সীমান্ত।

ব্রিটেন হয়ে উঠে বেলজিয়ামের অভিভাবকতুল্য। ব্রিটেন সবাইকে বলে দেয়, নিরপেক্ষ বেলজিয়ামকে কেউ আঘাত করলে ব্রিটেন তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। ব্রিটেনের এই ঘোষণায় বেলজিয়ামকে কেউ ঘাঁটায়নি। বেলজিয়ামও ইউরোপের সব অশান্তি থেকে দূরে থেকে নিজের মতো করে চলতে থাকে।

১৯১৪ সালের ২ আগস্ট। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে মাত্র ৫ দিন হলো। জার্মানিতো মনে মনে ফ্রান্স দখল করার পরিকল্পনা করেই রেখেছে। বেলজিয়ামে নিযুক্ত জার্মানীর রাষ্ট্রদূত বেলজিয়ামের রাজা প্রথম আলবার্টের সাথে দেখা করে গিয়ে বললেন, "জার্মানী বেলজিয়ামের ভিতর দিয়ে সেনাবাহিনী পরিচালনার জন্য একটু রাস্তা চাচ্ছিলো। জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলহেমের ইচ্ছা হলো, জার্মান সৈন্যদল যাতে বেলজিয়ামের লিগ নগরী দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারে-এ বিষয়টা মাথায় নিয়ে বেলজিয়ামের রাজা জার্মান সৈন্যদের অবাধে বিচরণ করার সুযোগ দেন।"

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "বেলজিয়ামের রাস্তা জার্মানির এত দরকার হয়ে পড়লো কেন?"

ফ্রান্স দখল করার জন্য। ফ্রান্স আক্রমণ করার জন্য বেলজিয়াম সীমান্ত দিয়ে ঢুকে পড়াই সুবিধাজনক। জার্মানি চাইছিলো বেলজিয়াম দিয়ে চুপি চুপি সৈন্য নিয়ে ফ্রান্সকে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ধরাশয়ী করা।

কিন্তু বেলজিয়াম জার্মানিকে এই সুযোগটা দিলো না। বেলজিয়ামের রাজা-জার্মানীর রাষ্ট্রদূতকে বলে দিলেন-"I rule a nation, not a road."

মানে, তুমি তোমার রাজাকে বলে দিও। আমি একটি দেশ চালাই, রাস্তার পাহারাদার না।

বেলজিয়ামে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের কাছে এমন টেলিগ্রাম পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যুদ্ধ উন্মাদ জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেম। তিনি তড়িগড়ি করে এক রাতের মধ্যে বেলজিয়াম দখল করার নির্দেশ দিলেন। জার্মানীর সমস্ত আর্মি অফিসাররা তাদের বাহিনী সাজিয়ে আগস্টের ২ তারিখ রাতের বেলা বেলজিয়াম আক্রমন করলেন। ছোট্ট দেশ বেলজিয়াম। আমাদের রাঙ্গামাটি জেলার মতো ৫টা জেলার সমান। ৩ তারিখ ভোরবেলাতেই জার্মান সৈন্যরা মার্চ করতে করতে ফ্রান্সের সীমান্তে পৌঁছে গেলো। জার্মান সৈন্যরা তছনছ করে গেলো বেলজিয়ামের বিস্তীর্ণ জনপদ। বেশকিছু বেসামরিক লোকজন নিহত হলো।

আগস্টের ৩ তারিখই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দিলো জার্মানী। জার্মানীর অফিসাররা এমনভাবে যুদ্ধ পরিকল্পনা সাজালেন যাতে এক সপ্তাহের মধ্যে তারা

প্যারিসে গিয়ে নাস্তা করবেন। পালে পালে জার্মান সৈন্য বেলজিয়ামে ঢুকতে লাগলো।

হতবিহ্বল ফ্রান্স এই পরিস্থিতির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। জার্মানী যেহেতু ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই ফেলেছে, জার্মান সেনাবাহিনী বেলজিয়াম সীমান্ত পর্যন্ত চলে এসেছে, মান সন্মান বাঁচানোর জন্য ফ্রান্সও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। কিন্তু ব্রিটেনের প্রতি কাতর কণ্ঠে অনুরোধ জানালো ফ্রান্স এই বলে যে এবার পাগলা জার্মানীকে থামাও, তোমরাও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো। তা না হলে উন্মাদ জার্মানী পুরো ইউরোপ গিলে খাবে। কেউ বাঁচতে পারবে না জার্মানীর হাত থেকে। ”

নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বেলজিয়ামের ভিতর দিয়ে অন্যায়ভাবে সৈন্য সমাবেশ করার কারণে ব্রিটেন জার্মানীর প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হলো। ব্রিটেন জানতো জার্মানীকে থামাতেই হবে। কারণ, জার্মানী পরবর্তীতে ব্রিটেনকেও ছেড়ে কথা বলবে না। কিন্তু ফ্রান্সের কাতর আহবানে সাড়া দিয়ে সাথে সাথেই যুদ্ধ ঘোষণা করেনি সর্বজয়ী বৃটিশরা। আগস্টের ৩ তারিখ ব্রিটেন জার্মানীর প্রতি ১২ ঘন্টার চরমপত্র দিলো। ব্রিটেন বললো, "নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বেলজিয়ামকে অসহায় বানিয়ে কেন সৈন্য সমাবেশ ঘটালো জার্মানরা? ১২ ঘন্টার মধ্যে বেলজিয়াম থেকে জার্মানী যদি সৈন্য প্রত্যাহার না করে, তাহলে ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হবে।"

ব্রিটেনের এই চরমপত্র মানতে বয়েই গেছে জার্মানদের। জার্মান বাহিনী তখন পুরো ফ্রান্স দখল করার স্বপ্নে ভরপুর। কবে তারা প্যারিস দখল করবে-সে দিন গুনছে তারা। বলাই বাহুল্য, ব্রিটেনের চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করে জার্মানি।

আগস্টের ৪ তারিখ অবশেষে ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হলো। এবার পুরোদমে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো।

পর্ব-১১

দুর্দান্ত জার্মানীর সিলাইফেন পরিকল্পনা ব্যর্থ:

জারিফ আজকের আলোচনা শুরু করলো। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলো ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই। অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য যুদ্ধ ঘোষণা করলো সার্বিয়ার বিরুদ্ধে। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে ইউরোপের সব শক্তিশালী দেশগুলো দুই ফ্রন্টে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "গতপর্বে আমরা জেনেছিলাম, জার্মানি যখন ফ্রান্স দখল করার লক্ষ্যে বেলজিয়ামের ভিতর দিয়ে অন্যায়ভাবে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে ফ্রান্স সীমান্তের কাছে চলে গেলো, ঠিক তখনই জার্মানি ৩ আগস্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করে। তার পরের দিনই বৃটিশরা জার্মানির বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর পর কি হলো?"

জারিফ বললো, আসলে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুই হয়েছিলো জার্মানীর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার জন্য। এরকম একটা যুদ্ধ করার জন্য জার্মানীর হাত নিশপিশ করছিলো। জার্মানী ভেবেছিলো, তার সামরিক শক্তির সামনে ফ্রান্স খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। তাই সে বেলজিয়ামের ভিতর দিয়ে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে ফ্রান্সকে আক্রমন করতে চাইলো। এক সপ্তাহের ভিতর জার্মানরা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গিয়ে নাস্তা করবে। হয়তো হতেও পারতো।

কিন্তু বেলজিয়ামের ভিতর দিয়ে সেনা পাঠানোর কারণে ব্রিটেন ক্ষেপে গেলো। তাছাড়া ব্রিটেন জানতো, এই দুর্দান্ত জার্মানীকে এখনই প্রতিহত করা না হলে ভবিষ্যতে সে ব্রিটেনকেও জ্বালিয়ে মারবে। তাই, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো অপশন ব্রিটেনের হাতে ছিলো না।

যে ফ্রান্সের সাথে ব্রিটেনের হাজার বছরের দুশমনির ইতিহাস, এবার সেই ফ্রান্সকে জার্মানীর আক্রমন থেকে রক্ষা করার জন্য ১ লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী পাঠালো ব্রিটেন। জার্মান বাহিনী ততক্ষনে প্যারিস নগরী থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে। সিলাইফেন পরিকল্পনার প্রথম কথাই ছিলো, তাড়াতাড়ি ফ্রান্স দখল করো; তারপর রাশিয়া। সে অনুযায়ী এগোচ্ছিলো জার্মানরা। নিজের দেশের সম্ভাব্য পতন দেখে পুরো ফ্রান্স আতংকে নীল। ব্রিটেনের সহায়তা আসায় কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো ফ্রান্স। এবার জার্মানীকে বাধা দিতে হবে। ফ্রান্সের ভিতরে ঢুকে পড়েছে জার্মানরা। লাখ লাখ সৈন্য নিয়ে ফ্রান্স প্রস্তুত। প্যারিস নগরীর সব ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ফ্রান্সের সৈন্যদের নিয়ে গেলো যুদ্ধক্ষেত্রে। দেশপ্রেম কাকে বলে! লাগলো লড়াই জার্মানীর সাথে ব্রিটেন-ফ্রান্সের। প্রথম মহাযুদ্ধের সবচেয়ে বড় মোকাবেলার নাম "ব্যাটল অব মার্ন-"

কিন্তু হায়! এ যুদ্ধে জার্মানী হেরে গেলো। সিলাইফেন পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। এক সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্স দখল করার আশা বাদ দিয়ে জার্মানরা পিছু হটলো। রক্ষা পেলো ফ্রান্স। চলো এবার সেই কাহিনী শুনি।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম সংঘাতঃ- ব্যাটল অব মার্নঃ

জার্মানরা যখন প্যারিস নগরীতে নাস্তা করার স্বপ্নে বিভোর, তখন ব্রিটেন-ফ্রান্সের পরিকল্পনা ছিলো অন্য। ফ্রান্সের ছিলো বাঁচামরার লড়াই, ব্রিটেনের ছিলো দুনিয়াজোড়া তার কলোনী রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা। এই দুই দেশ জার্মানীকে বাধা দেয়ার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করলো। তারা জার্মানীকে এমন শিক্ষা দিতে চাইলো, যাতে জার্মানী যুদ্ধ ভুলে বাড়ির পথ ধরে।

মার্ন একটি নদীর নাম। নদীটি প্যারিস নগরীর পূর্বদিকে অবস্থিত। জার্মান সেনাপতি হেলমুট মল্টকে'র নেতৃত্বে ৯ লক্ষ দুর্ধর্ষ জার্মান সেনা প্যারিস অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো। ব্রিটেনের ১ লক্ষ ২০ হাজার বিশ হাজার সৈনিকের সাথে ফ্রান্স তার নিজস্ব ১০ লক্ষ সৈন্য নিয়ে জার্মানীকে বাধা দেয়ার মিশনে নামলো। এ যুদ্ধে হারলেই ফ্রান্সের সব শেষ। জার্মানীর কলোনী হওয়া ছাড়া উপায় নাই। সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখ যুদ্ধ শুরু হলো। প্রায় ৬ দিন ব্যাপী চললো এ যুদ্ধ। উভয়পক্ষে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো। আহতদের আর্তনাদে প্রকম্পিত হলো ফ্রান্সের ভূ-খন্ড। উভয়পক্ষে প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য নিহত হলো। যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখে জার্মানরা পিছু হটতে শুরু করলো। ফ্রান্সের মাটি থেকে সমস্ত জার্মান সৈন্য পিছু হটতে হটতে বেলজিয়ামের দিকে সরে পড়লো। এবার ক্ষুদ্র বেলজিয়াম বৃটিশ-ফ্রান্স বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে লাগলো। ত্রিমুখী আক্রমনে জার্মানরা দিশেহারা। সিলাইফেন পরিকল্পনা ব্যর্থ, বোঝা গেলো অতি তাড়াতাড়ি ইউরোপের মাটিতে যুদ্ধ শেষ হবে না।

কিন্তু জার্মানরা শান্ত হলো না!

মার্নের যুদ্ধে জার্মানরা হেরেও দমে যাবার পাত্র নয়। বেলজিয়ামের মাটি থেকে তারা সরেনি। **বেলজিয়ামকে কেন ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্র বলা হয়, এবার শোনো। এটা বলার কারণ হচ্ছে, প্রথম মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামকে কেন্দ্র করে বছরের পর বছর যুদ্ধ চালায় ব্রিটেন-ফ্রান্স ও জার্মানরা।** বেলজিয়ামও জার্মানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়। বেলজিয়ামের ইয়াপ্রেস নগরীকে কেন্দ্র করে ৫টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মার্নের যুদ্ধে হেরে যাবার কারণে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেম সেনাপতি মল্টকেকে বরখাস্ত করেন। নতুন সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেন ফলকানহেইনকে। জার্মানী স্কুল পেরোনো কিশোরদেরকে নিয়ে ইয়াপ্রেস নগরী দখলের আক্রমণ করে। জার্মানীর উদ্দেশ্য ছিলো যুদ্ধটাকে সমুদ্র অভিমুখী করা। উত্তর সাগরে ব্রিটেনের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য তারা বেলজিয়ামের ইয়াপ্রেস নগরীকে ঘাঁটি বানাতে চায়। আবারও শুরু হলো-ব্রিটেন-ফ্রান্স-বেলজিয়ামের বিরদ্ধে জার্মানীর লড়াই। ১৭ থেকে ২০ বছর বয়সী আড়াই লাখ কিশোরকে জার্মানরা যুদ্ধে ঠেলে দেয়। দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে সুদর্শন জার্মান কিশোররা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অক্টোবরের ১৪ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ নভেম্বরের ৯ তারিখ পর্যন্ত চলে। প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার জার্মান কিশোরদের মৃত্যু হয় এ যুদ্ধে, যেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে- **Massacre of the innocents**- নামে পরিচিত। বিরোধী পক্ষেরও প্রায় সমসংখ্যক মৃত্যু ঘটে।

দুই দুইটি যুদ্ধে হেরেও জার্মানরা যুদ্ধ পরিত্যাগে রাজি নয়। এবার যুদ্ধ হলো থেমে থেমে। জার্মানী তার সীমানার পশ্চিম প্রান্ত থেকে অনেক সেনা সরিয়ে পূর্বপ্রান্তে রাশিয়ার দিকে নিয়ে গেলো। আগস্টের ৬ তারিখে জার্মানীর মিত্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরী

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। খন্ড খন্ড যুদ্ধ চলতেই লাগলো। ইতিহাসবিদরা এর নাম দিয়েছেন- **War of attrition-** বা শক্তিক্ষয়ের যুদ্ধ। কেউ যুদ্ধ থামাতে এগিয়ে আসে না, অহেতুক শক্তিক্ষয় চলতেই লাগলো। বেলজিয়ামে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে জার্মানরা। তাদের সাথে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হয় ব্রিটেন-ফ্রান্স-বেলজিয়ামের। বেলজিয়ামের মাটিতে অজস্র বাংকার তৈরী করে জার্মানরা দিন যাপন করতে লাগলো।

যুদ্ধে নামলো মুমূর্ষু তুরস্কঃ

ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে যখন এরকম ম্যাড়ম্যাড়ে শক্তিক্ষয়ের লড়াই চলতে লাগলো, ঠিক তখনি রাশিয়ার বন্দরনগরী সেবাস্তিপোলে বোমাবর্ষণ করলো তুরস্ক। তুরস্কের বিরুদ্ধে শত শত বছর শত্রুতা করেছে রাশিয়ার। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই তুরস্ক গোয়েন্দা মারফত খবর পেলো-তুরস্কের অতি গুরুত্বপূর্ণ দার্দানেল্‌স প্রনালী দখলে নেওয়ার জন্য ফন্দি আঁটছে রাশিয়ানরা। সে জন্য বন্দরনগরী সেবাস্তিপোলে সেনা সমাবেশ করছে রাশিয়া। দার্দানেল্‌স প্রণালী হাতছাড়া হয়ে যাওয়া তুরস্কের জন্য মৃত্যু সমতুল্য। তাই, তুরস্কের সামরিক অধিনায়ক এনভার পাশা শুরুতেই রাশিয়াকে ঠেকিয়ে দিতে চাইলেন। আর তুরস্ক জানতো, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেই সে জার্মানী ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর সহায়তা পাবে। এজন্য তুরস্ক আগ বাড়িয়ে রাশিয়ার ভূ-খন্ডে হামলা চালালো। ফলশ্রুতিতে নভেম্বরের ১ তারিখ রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। রাশিয়ার দেখাদেখি সার্বিয়াও তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো পরের দিন নভেম্বরের ২ তারিখ।

যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো পুরো বিশ্বে। চীনের শ্যাংডং প্রদেশে জার্মানীর তত্ত্বাবধানে চিংডাও শহর গড়ে উঠেছিলো। সে শহরে জার্মান স্থাপনায় বোমা হামলা শুরু করলো জাপান। ইতালি ও আমেরিকা তখন পর্যন্ত নিরপেক্ষ ছিলো। তারা কোনো পক্ষের হয়ে যুদ্ধে নামেনি। যুদ্ধ যেহেতু বহুদিন যাবত চলবে-সে ধারণা নিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের কলোনীগুলো থেকে সৈন্য সংগ্রহের দিকে নজর দেয়। **মনে রেখো, আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক রিক্রুট করা এরকম একজন সৈনিক ছিলেন।** ভারত উপমহাদেশ থেকে অজস্র সৈন্য ব্রিটিশের হয়ে যুদ্ধে নামে। পরবর্তীতে এ নিয়ে আলোচনা করবো।

শীত ও ক্রিসমাসের ছুটি :

৫ মাস হয়ে গেলো প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার। ততদিনে ডিসেম্বরের শীত ঝাঁকিয়ে বসেছে ইউরোপে। তারপরে আবার ক্রিসমাস। ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতেও উৎসবের আমেজ। দুপক্ষই আর অস্ত্র চালাতে রাজি নয়। অঘোষিত যুদ্ধ বিরতি শুরু হলো। যুদ্ধক্ষেত্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈনিকরা বিরোধী

শিবিরগুলোতে গিয়ে মিষ্টি আর কেক বিতরণ করলো। শীত আর ক্রিসমাসের দাপটে আপাতত যুদ্ধবিরতি।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "যুদ্ধ কি কোনো রং তামাশার জিনিস নাকি যে তার জন্য আবার ছুটিও দরকার? যুদ্ধটা বন্ধ হয়ে গেলে কি ভালো হতো না?-"

জারিফ বললো, "সাধারণ জনগণের জন্য হয়তো যুদ্ধটা বিভীষিকা, কিন্তু ক্ষমতাবানদের জন্য যুদ্ধ একটা মজার খেলা। রাজধানীতে বসে তারা যুদ্ধের খবর নিবে,জিতলে বলবে আমাদের জয় হয়েছে,হারলে চুক্তি করে নিজেরা নিরাপদ থাকবে। ফাঁকতালে মরবে সাধারণ সৈনিক আর নিরীহ জনগন।"

বৃটিশ নাট্যকার জর্জ বার্নাড শ-প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিয়েই বলেছিলেন-War is a trade like any other trade.- মানে অন্য আরেকটা ব্যবসার মতো যুদ্ধও একটা ব্যবসা।

যা হোক, কোনো চূড়ান্ত ফলাফল ছাড়াই ১৯১৪ সালটা শেষ হলো। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হতে এখনও অনেক বাকী।

পর্ব-১২

নতুন বছর শুরু হলোঃ-১৯১৫ সাল

জারিফ বললো, ''মামুন, প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় ৬ মাস কেটে গেলো, যুদ্ধ তো চলতেই থাকলো। শীত, ক্রিসমাস ও নতুন বছরের উৎসব শেষে আবারও ফ্রন্টগুলোতে বাজলো যুদ্ধের দামামা। যুদ্ধ সারা পৃথিবীতেই আসলে ছড়িয়ে পড়লো, কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে। "

মামুন বললো, "যুদ্ধের পূর্ব ও পশ্চিম ফ্রন্ট সম্পর্কে আমাকে একটু বিস্তারিত ধারণা দাও।"

ভালো কথা। তুমি মানচিত্র নিয়ে বসো। জার্মানীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত ব্রিটেন-ফ্রান্স-বেলজিয়াম। তাই জার্মানীর বিরুদ্ধে এই তিন দেশের যুদ্ধফ্রন্টগুলো পশ্চিম ফ্রন্ট নামে পরিচিত। আবার জার্মানীর পূর্ব দিকে রাশিয়া-তুরস্ক-সার্বিয়ার অবস্থান। তাই রাশিয়া-সার্বিয়ার যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে জার্মানী-অস্ট্রো-হাঙ্গেরী ও তুরস্কের লড়াইয়ের পটভূমি হচ্ছে পূর্ব ফ্রন্ট। পশ্চিম ফ্রন্টে ফ্রান্স দখল করতে জার্মানরা পিছু হটায় পশ্চিম ফ্রন্ট একপ্রকার শান্তই থাকে ১৯১৫ সালে। তবে ১৯১৫ সালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পূর্ব ফ্রন্ট। জার্মানীর সহায়তায় তুরস্ক বীরদর্পে তার ভূ-খন্ড রক্ষা করে। জার্মানী পাশে না থাকলে আজকে তুরস্কের কি অবস্থা হতো তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। একশো টুকরা হয়ে যেতো তুরস্ক। আর তুরস্কের অন্যতম ত্রাতা হয়ে মাঠে লড়াই করেছিলেন মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক।

মামুন জিজ্ঞেস করলো-"এই কি সেই কামাল আতাতুর্ক যাকে ইসলামপন্থীরা তাকে মুসলিমবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে? আবার যিনি আধুনিক তুর্কি জাতির পিতা হিসেবে চিহ্নিত"?

জারিফ বললো, "ঠিক তাই। কামাল আতাতুর্ককে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবোই। তার আগেই তুরস্কের মাটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম মহাযুদ্ধের অন্যতম সেরা যুদ্ধ-ব্যাটল অব গ্যালিপোলি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব দেখায় তুরস্ক। ব্রিটেন-ফ্রান্স যৌথ বাহিনীর হামলার মুখে দাঁড়িয়ে দার্দানেল্স প্রণালী রক্ষা করে তুরস্ক। আর এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক। চলো এবার সেই কাহিনী শুনি।"

মামুন বললো, "তার আগে তুমি বলো যুদ্ধটা কিভাবে পুরো বিশ্বে ছড়ালো এটা সম্পর্কে আরেকটু ধারণা দাও"

জারিফ বললো যে পূর্ব ও পশ্চিম ফ্রন্ট সম্পর্কে ধারণা তো পেলেই। যুদ্ধ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিলো মধ্যপ্রাচ্যে। আজকের মক্কা-মদিনাসহ সৌদি আরবের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিলো তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফতের অধীনে। তুরস্কের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে স্বাধীন হতে চাইলো সৌদি আরব। ফিলিস্তিন-সিরিয়া-লেবানন-ইয়েমেন এসব অঞ্চলকে তুর্কীদের অধীন থেকে মুক্ত করার মিশনে আদাজল খেয়ে লাগলো ব্রিটেন। তাই পুরো মধ্যপ্রাচ্য অস্থির হয়ে পড়লো। আজকের মধ্যপ্রাচের বিস্তারিত জানতে হলে তাই প্রথম মহাযুদ্ধের পাঠ নেওয়া ফরজ। অবাক করা ব্যাপার দেখো, মুসলিম খেলাফতের দাবীদার তুরস্ক যখন ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছে, ঠিক তখনই মক্কা-মদিনার মুসলিম শাসকেরা তুরস্কের অধীন থেকে মুক্ত হতে ব্রিটেনের সাথে হাত মিলালো। একদিকে তুরস্ক জীবনপন লড়াই করছে তার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে, আর অন্যদিকে মুসলমানরাই তুরস্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। মোস্তফা কামাল কেন ইসলাম বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন, এর পিছনে এসব ঘটনার দায় আছে।

এদিকে যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে ব্রিটেনের রাজকোষ খালি হতে লাগলো। ব্রিটেনকে সহায়তা করতে সাহায্যের হাত বাড়ালো আমেরিকা। ইহুদী ধনকুবেররা ঋণভারে জর্জরিত ব্রিটেনের কাছ থেকে ফিলিস্তিনে স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলো ১৯১৭ সালে। ১৯১৭ সালে আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো।

ব্রিটেন তার উপনিবেশ ভারত থেকে সৈন্য রিক্রুট শুরু করলো। আবার ব্রিটেনের অধীনে থাকা, কিন্তু প্রায় স্বাধীন; অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড থেকে প্রচুর সৈন্য আমদানি করা হলো ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ করতে। ১৯১৫ সালে ইতালি অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। এভাবেই মূলত এন্টার্কটিকা মহাদেশ

ব্যতীত সব মহাদেশেই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো। যা হোক, এগুলো ধীরে ধীরে আলোচনার বিষয়।

ব্যাটল অব গ্যালিপোলিঃ- প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির এক যুদ্ধ

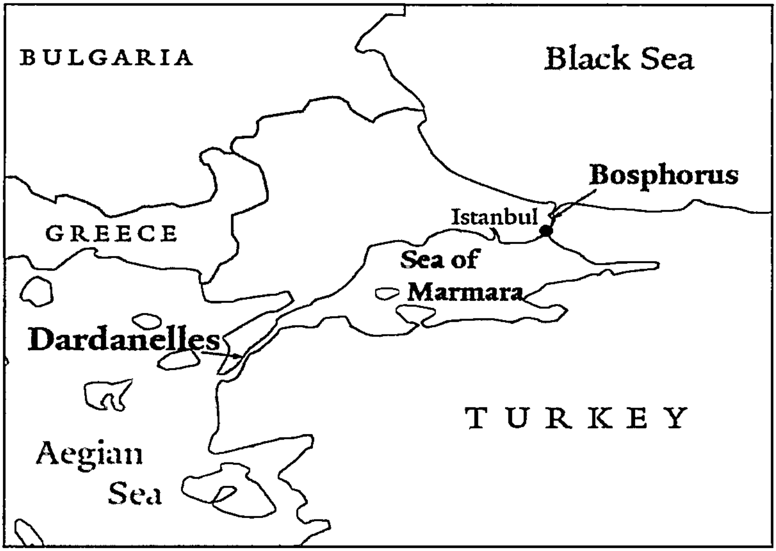
১৯১৫ সালের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে গ্যালিপোলির যুদ্ধ। গ্যালিপোলি হচ্ছে একটা উপদ্বীপ, যেটা তুরস্কে অবস্থিত। এখানের যুদ্ধটা প্রথম মহাযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্যালিপোলির যুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে আমাদের ফিরে যেতে হবে চার হাজার বছর আগে। তার আগে তুমি আমাকে বলো মামুন, **গ্রীক মহাকবি হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াডে যে ট্রয় নগরীর কথা বলা আছে, সে ট্রয় নগরী কোথায় অবস্থিত বলতে পারো?**

মামুন বললো, "ট্রয় নগরী তো গ্রীসেই হওয়ার কথা; নাকি?"-

জারিফ বললো, "না, তোমার উত্তর হয় নি। ট্রয় নগরী তুরস্কে অবস্থিত। এটা বিভিন্ন পরীক্ষায় কিন্তু আসে। চলো আজ আমরা ট্রয় নগরী থেকেই আমাদের আলোচনা শুরু করি"

দেখো-তুরস্ক এমন একটা দেশ, যার ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে আর কোনো দেশের তুলনা হয়না। গোটা পৃথিবীর প্রায় মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত তুরস্ক। তুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ নগরী ইস্তাম্বুল দুই মহাদেশে অবস্থিত। এশিয়া ও ইউরোপকে ভাগ করেছে বসফরাস প্রণালী, যেটা ইস্তাম্বুল নগরীকেও দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। আবার ইস্তাম্বুল নগরী থেকে আফ্রিকা মহাদেশও বেশি দূরে নয়। আফ্রিকার দেশ মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া উপকূল তুরস্কের এককালীন উপনিবেশ সিরিয়া-ফিলিস্তিন পার হয়েই। মানচিত্র ছাড়া এসব আলোচনা করা বৃথা। তুমি লক্ষ্য করো বসফরাস প্রণালী যুক্ত করেছে-কৃষ্ণ সাগর ও মর্মর সাগরকে।



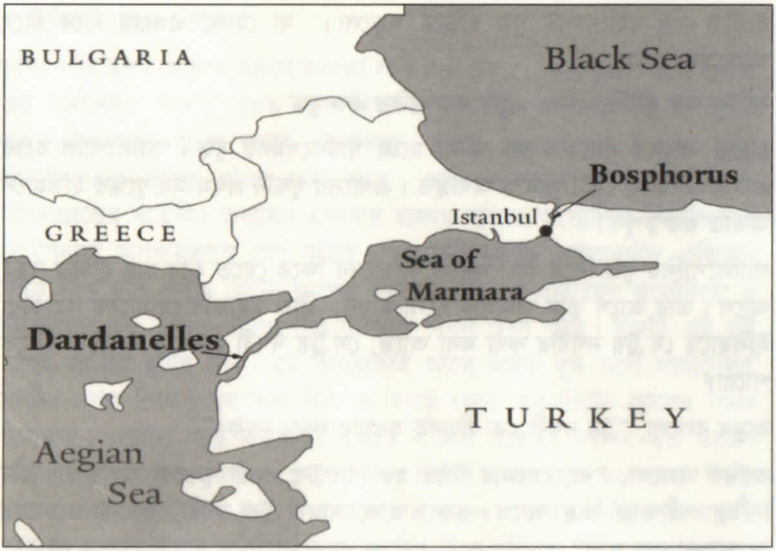
চিত্র-১১: মর্মর সাগর এক জায়গায় এসে অত্যন্ত সরু হয়ে পড়েছে। ঠিক এখানেই একটা প্রণালী আছে, সেই প্রণালী তুরস্কের এশিয়া অংশকে ইউরোপের গ্রীস থেকে পৃথক করেছে। সেই প্রণালীর নাম অতিবিখ্যাত দার্দানেল্স প্রণালী। দার্দানেল্স প্রণালী আবার যুক্ত করেছে এজিয়ান সাগর ও মর্মর সাগরকে। এজিয়ান সাগরের অপর পারেই হচ্ছে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি গ্রীস।

হলিউডের সুপারস্টার ব্র্যাড পিট অভিনীত বিখ্যাত মুভি ট্রয়ে তুমি দেখবে, রাণী হেলেনকে যখন ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের পুত্র চুরি করে নিয়ে আসে, সে সংবাদ শুনে গ্রীকরা ট্রয় নগরী আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রীকদের ঝাঁকে ঝাঁকে নৌবহর এই দার্দানেল্স প্রণালী দিয়েই ট্রয়ে অবতরণ করে। ট্রয় মুভির সবচেয়ে আইকনিক দৃশ্যই হচ্ছে-গ্রীকদের নৌবহরের পাল।

সে যাই হোক, প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়, ঠিক তখনই তুরস্কের দখলে থাকা দুইটি মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রণালী-বসফরাস ও দার্দানেল্স প্রণালী দখলে নেয়ার জন্য হন্যে হয়ে পড়ে বৃটিশ-ফ্রান্স যৌথ বাহিনী। তাতে ইন্ধন যোগায় রাশিয়া।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "তুরস্কের এই দুইটি প্রণালী এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়লো কেন?"

জারিফ বললো, "যুদ্ধ যখন পূর্ব ও পশ্চিম-দুইটি ফ্রন্টে ছড়িয়ে পড়লো আর ব্রিটেন ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে পড়লো রাশিয়া, তখন রাশিয়ার সাথে সবরকম যোগাযোগ রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই দুই প্রণালী। রাশিয়া ইতোমধ্যে তুরস্কের সাথে



চিত্র-১১: মর্মর সাগর এক জায়গায় এসে অত্যন্ত সরু হয়ে পড়েছে। ঠিক এখানেই একটা প্রণালী আছে, সেই প্রণালী তুরস্কের এশিয়া অংশকে ইউরোপের গ্রীস থেকে পৃথক করেছে। সেই প্রণালীর নাম অতিবিখ্যাত দার্দানেল্‌স প্রণালী। দার্দানেল্‌স প্রণালী আবার যুক্ত করেছে এজিয়ান সাগর ও মর্মর সাগরকে। এজিয়ান সাগরের অপর পারেই হচ্ছে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি গ্রীস।

হলিউডের সুপারস্টার ব্র্যাড পিট অভিনীত বিখ্যাত মুভি ট্রয়ে তুমি দেখবে, রাণী হেলেনকে যখন ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের পুত্র চুরি করে নিয়ে আসে, সে সংবাদ শুনে গ্রীকরা ট্রয় নগরী আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রীকদের ঝাঁকে ঝাঁকে নৌবহর এই দার্দানেল্‌স প্রণালী দিয়েই ট্রয়ে অবতরণ করে। ট্রয় মুভির সবচেয়ে আইকনিক দৃশ্যই হচ্ছে-গ্রীকদের নৌবহরের পাল।

সে যাই হোক, প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়, ঠিক তখনই তুরস্কের দখলে থাকা দুইটি মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রণালী-বসফরাস ও দার্দানেল্‌স প্রণালী দখলে নেয়ার জন্য হন্যে হয়ে পড়ে বৃটিশ-ফ্রান্স যৌথ বাহিনী। তাতে ইন্ধন যোগায় রাশিয়া।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "তুরস্কের এই দুইটি প্রণালী এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়লো কেন?"

জারিফ বললো, "যুদ্ধ যখন পূর্ব ও পশ্চিম-দুইটি ফ্রন্টে ছড়িয়ে পড়লো আর ব্রিটেন ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে পড়লো রাশিয়া, তখন রাশিয়ার সাথে সবরকম যোগাযোগ রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই দুই প্রণালী। রাশিয়া ইতোমধ্যে তুরস্কের সাথে

যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে ককেশাস অঞ্চলে, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর সাথে লড়ছে রাশিয়া ও সার্বিয়া তাই রাশিয়াতে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠানো ফরজ হয়ে পড়েছে ব্রিটেন-ফ্রান্সের জন্য। রাশিয়া ও সার্বিয়াকে যদি সহায়তা করতে না পারে ব্রিটেন-ফ্রান্স, তাহলে রাশিয়ার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর রাশিয়ার পরাজয় মানেই ব্রিটেন-ফ্রান্সের পরাজয়, আর জার্মানী, অস্ট্রো-হাঙ্গেরী ও তুরস্কের উল্লাস।"-

এখন রাশিয়ার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য এই দুই প্রণালীর দখল দরকার। কিন্তু এই দুই প্রণালীর মালিক তুরস্কতো জার্মানীর সাথে দোস্তি করে বসে আছে। এখন তাহলে উপায় কি?

উপায় একটা আছে, সেটা হলো তুরস্ককে ভয় দেখিয়ে প্রচুর সেনা সমাবেশ করিয়ে দার্দানেল্‌স প্রণালীর দখল নেওয়া। তাহলেই বসফরাস প্রণালীও দখলেও আসবে, আর রাশিয়ার সাথে যোগাযোগও ঠিক থাকবে।

তুরস্কের কাছ থেকে দার্দানেল্‌স প্রণালী দখলে নেয়ার নীলনকশা প্রথমে মাথায় আসে বিখ্যাত ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর সর্বময় কর্তা উইনস্টন চার্চিলের। এই সেই চার্চিল যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ পরিকল্পনার অনুমোদন দেন-ব্রিটিশ যুদ্ধ সচিব লর্ড কিচেনার।

১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫ সাল:-

ব্রিটেন-ফ্রান্সের যৌথ বাহিনী দার্দানেল্‌স প্রণালীর উপর নৌ-আক্রমণ শুরু করেন। এই দুই দেশের নৌ-আক্রমণের পূর্বেই তুরস্ক তার বড় ভাই জার্মানীকে জানায় দার্দানেল্‌স প্রণালী দখলের জন্য মরিয়া ব্রিটেন-ফ্রান্সের যৌথ আক্রমণ না ঠেকাতে পারলে মহাবিপদ। জার্মানী পুরো মাত্রায় তুরস্কের পাশে দাঁড়ায়। জার্মান সেনাপতি লিমন স্যান্ডার্‌স ও তুর্কি সেনাপতি মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক যৌথভাবে ব্রিটেন-ফ্রান্সের সামনে বাধার পাহাড় হয়ে দাঁড়ালেন। তুর্কি সৈন্যরা উঁচু স্থানে ছিলো বিধায় সাগর থেকে নেমে ব্রিটেন-ফ্রান্স নৌ-আক্রমণ করে সুবিধা করতে পারেনি। টানা দুইমাস কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় ব্রিটেন-ফ্রান্স এবার স্থলবাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিলো।

সে এক এলাহি কারবার! ফ্রান্সের নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়াও তার আফ্রিকান উপনিবেশ থেকে প্রচুর সৈন্য জড়ো হলো। ব্রিটেন তার আয়ত্তাধীন অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড থেকে প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য জড়ো করলো। প্রায় ৫ লক্ষ্য সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে ব্রিটেন-ফ্রান্স তুরস্কের গ্যালিপোলি উপত্যকায় অবতরণ করে তুরস্কের হাত থেকে দার্দানেল্‌স প্রণালীর দখল নিতে চাইলো। জার্মানীর সার্বিক সহায়তায় তুরস্কও ৩ লক্ষ্য সৈন্যের এক বাহিনী প্রস্তুত করলো।

২৫ এপ্রিল, ১৯১৫ সালঃ

গ্যালিপোলি উপত্যকায় অবতরণ করলো লাখ লাখ সৈন্য। কিন্তু যুদ্ধ করতে সুবিধা হলো তুরস্কের। কারণ, তুরস্ক তার নিজ ভূ-খন্ডে উঁচু জায়গায় শিবির স্থাপন করেছে। লাগলো তুমুল লড়াই। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের সৈন্যরা তুর্কি ইতিহাসে এক বীরত্ব গাঁথা রচনা করে। প্রথম অবতরণ করে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের বাহিনী। তুরস্কের হামলায় হাজার হাজার অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড এর সৈন্যরা অসহায়ভাবে প্রাণ হারায়। তুরস্কের মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণে এজিয়ান সাগরে লাশ হতে থাকে ব্রিটেন-ফ্রান্সের সৈন্যরা। আজও প্রতিবছর অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ২৫ এপ্রিল গ্যালিপোলি ট্রাজেডি দিবস স্মরণ করে। দিনটি এই দুই দেশের জাতীয় ছুটির দিন। মে-জুন-জুলাই মাসে প্রচন্ড যুদ্ধ চলে দার্দানেল্‌স প্রণালীর দখল নিয়ে। তুরস্কের বীরত্বের কাছে হেরে যায়-ব্রিটেন-ফ্রান্সের সমস্ত পরিকল্পনা। এভাবে আর কতদিন? ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখ গ্যালিপোলি অভিযান পরিত্যাক্ত ঘোষণা করে ব্রিটেন-ফ্রান্স। প্রায় ৬০ হাজার সৈন্য হারায় তুরস্ক; আর ব্রিটেন-ফ্রান্স সৈন্য হারায় প্রায় ৫০ হাজার। দার্দানেল্‌স প্রণালী দখলমুক্ত রাখতে পারায় তুর্কিদের কাছে জাতীয় বীরে পরিণত হন মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক; যা পরবর্তীতে তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহজ হয়।



ছবি-১২ : গ্যালিপোলি যুদ্ধে ব্রিটেন-ফ্রান্সের যৌথ বাহিনীকে ঠেকিয়ে দিয়ে তুরস্কের জাতীয় বীরে পরিণত হন কামাল আতাতুর্ক।

---

২৫ এপ্রিল, ১৯১৫ সাল:

গ্যালিপোলি উপত্যকায় অবতরণ করলো লাখ লাখ সৈন্য। কিন্তু যুদ্ধ করতে সুবিধা হলো তুরস্কের। কারণ, তুরস্ক তার নিজ ভূ-খন্ডে উঁচু জায়গায় শিবির স্থাপন করেছে। লাগলো তুমুল লড়াই। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের সৈন্যরা তুর্কি ইতিহাসে এক বীরত্ব গাঁথা রচনা করে। প্রথম অবতরণ করে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের বাহিনী। তুরস্কের হামলায় হাজার হাজার অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড এর সৈন্যরা অসহায়ভাবে প্রাণ হারায়। তুরস্কের মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণে এজিয়ান সাগরে লাশ হতে থাকে ব্রিটেন-ফ্রান্সের সৈন্যরা। আজও প্রতিবছর অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ২৫ এপ্রিল গ্যালিপোলি ট্রাজেডি দিবস স্মরণ করে। দিনটি এই দুই দেশের জাতীয় ছুটির দিন। মে-জুন-জুলাই মাসে প্রচন্ড যুদ্ধ চলে দার্দানেল্‌স প্রণালীর দখল নিয়ে। তুরস্কের বীরত্বের কাছে হেরে যায়-ব্রিটেন-ফ্রান্সের সমস্ত পরিকল্পনা। এভাবে আর কতদিন? ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখ গ্যালিপোলি অভিযান পরিত্যাক্ত ঘোষণা করে ব্রিটেন-ফ্রান্স। প্রায় ৬০ হাজার সৈন্য হারায় তুরস্ক; আর ব্রিটেন-ফ্রান্স সৈন্য হারায় প্রায় ৫০ হাজার। দার্দানেল্‌স প্রণালী দখলমুক্ত রাখতে পারায় তুর্কিদের কাছে জাতীয় বীরে পরিণত হন মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক; যা পরবর্তীতে তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহজ হয়।



ছবি-১২ : গ্যালিপোলি যুদ্ধে ব্রিটেন-ফ্রান্সের যৌথ বাহিনীকে ঠেকিয়ে দিয়ে তুরস্কের জাতীয় বীরে পরিণত হন কামাল আতাতুর্ক।

পর্ব-১৩

দুর্বল রাশিয়া বনাম শক্তিশালী জার্মানীর অসম লড়াই:

মামুন তোমাকে গত দুই পর্ব ধরেই বলেছিলাম, ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, জার্মানী যখন সিলাইফেন পরিকল্পনা নিয়ে দুরন্তগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলো ফ্রান্স দখল করতে, ঠিক সে সময়ই তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কার্যত ডিফেন্সিভ গেমে পরিণত হয়। পশ্চিম ফ্রন্টে জার্মান সৈন্যরা পরিখা খনন করে মাসের পর মাস অলস পড়ে থাকে, কোনো আক্রমণ হয় নি। ফ্রান্স-ব্রিটেনের সতর্ক প্রহরায় জার্মানরা আর অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯১৫ সাল শুরু হওয়ার আগে থেকেই জার্মানী তার অনেক সৈন্যকে পশ্চিম ফ্রন্ট থেকে পূর্ব ফ্রন্টে নিয়ে আসে।

মামুন জিজ্ঞেস করলো-"**পূর্ব ফ্রন্ট মানেই তো রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ?**"

জারিফ বললো,"ঠিক তাই। পশ্চিম ফ্রন্টে জার্মানরা বিজয় অর্জন করতে না পারলেও,পূর্ব ফ্রন্টে রাশিয়াকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলো জার্মানী। জার্মানদের হাতে চরমভাবে পরাজিত হয়ে-রাশিয়ার মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিলো। এই পরাজয়ের কারণেই রাশিয়ার ভিতরে বাইরে ব্যাপক অসন্তোষের জন্ম হয়। রাশিয়ান সম্রাট জার দ্বিতীয় নিকোলাসের বিরুদ্ধে সাধারন জনগন ও সৈন্যরা ক্ষেপে উঠে। যার কারণেই ১৯১৭ সালে মূলত লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় রাশিয়াতে। আর রাশিয়াও ১৯১৭ সালে যুদ্ধ থেকে সরে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার অভিজ্ঞতা ছিলো একদম বাজে। সে কাহিনীই এবার বলছি।"

ব্যাটল অব টানেনবার্গ:-

যুদ্ধটা শুরু করেছিলো দুর্বল রাশিয়াই। আধুনিক ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে রাশিয়াই সবচেয়ে পিছনে ছিলো। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী থেকে বহুগুন পিছনে ছিলো। রাশিয়া যখন দেখলো, জার্মানরা পশ্চিম ফ্রন্টে ব্রিটেন-ফ্রান্সের হাতে ব্যাপক মার খাচ্ছে, তখনই জার্মানদের জমি দখল করার খায়েশ জাগলো রাশিয়ার। রাশিয়া ভাবলো, জার্মানীকে শায়েস্তা করার এই তো সুযোগ।

২৬ আগস্ট, ১৯১৫ সাল!

২ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলেকজান্ডার সামসনভ্ এর নেতৃত্বে রাশিয়ান বাহিনী জার্মানীর সীমানায় চলে আসে পোলান্ড দিয়ে। পশ্চিম ফ্রন্টে ব্রিটেন-ফ্রান্সের সাথে লড়াইরত জার্মান বাহিনীর জন্য এটা ছিলো মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। জার্মানীর প্রবাদপ্রতিম জেনারেল হিন্ডেনবুর্গ অবসর ভেঙে আবার সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নেন দেশপ্রেমের টানে। হিন্ডেনবুর্গ তার যোগ্য সহচর পেয়ে

যান আরেক জেনারেল লুডেনডর্ফের মাঝে। হিন্ডেনবুর্গ-লুডেনডর্ফ জুটি ১ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য নিয়েই রাশিয়াকে মোকাবেলা করার গুঁটি সাজান। পোলান্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চল টানেনবার্গের গ্রামীন এলাকায় লাগলো লড়াই রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে। এটা সেই এলাকা যেখানে ৫০০ বছর আগে জার্মানীর টিউটোনিক নাইটদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলো রাশিয়ার স্লাভিক জনগোষ্ঠী। কিন্তু এবার জার্মানিরা রাশিয়ানদের কাছে ৫০০ বছর আগের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলো। বর্ষীয়ান জার্মান জেনারেল হিন্ডেনবুর্গ রাশিয়ার সেনাবাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দিলেন একটা খালকে দখলে নিয়ে। তারপর জার্মান পদাতিক বাহিনী উন্নত মেশিনগানের সাহায্যে আক্রমণের ঢেউ তুলে অনভিজ্ঞ রাশিয়ানদেরকে কচুকাটা করলেন। মাত্র তিনদিন স্থায়ী এ যুদ্ধে প্রায় ৫০ হাজার রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয়। জার্মানদের হাতে বন্দী হয় অন্তত ৯০ হাজার রাশিয়ান সৈন্য। রাশিয়ান সেনাপতি সামসনভ্ যুদ্ধের পরাজয় সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসেন। এ যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের সংবাদে মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। জার্মানদের কাছে এই অপমানজনক পরাজয়ে রাশিয়া একেবারে কাবু হয়ে পড়ে।

তারপর যখন ১৯১৫ সালে গ্যালিপোলি যুদ্ধে ব্রিটেন-ফ্রান্স রাশিয়াকে সহায়তা করার জন্য তুরস্কের কাছ থেকে দার্দানেল্স প্রণালী দখল করার যুদ্ধেও হেরে যায়, তখন রাশিয়া আর যুদ্ধ করার মতো কোনো অবস্থানেই ছিলো না। প্রথম মহাযুদ্ধে অংশ নেওয়াটাই রাশিয়ার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ১৯১৬ সাল ব্যাপী রাশিয়া আর বড় কোনো যুদ্ধে জড়ায়নি। রাশিয়ার নিজের অভ্যন্তরীন অবস্থা ছিলো খুব খারাপ। ক্ষুধা-দারিদ্রের কবলে পড়ে রাশিয়ান জনগণ। ১৯১৭ সালে ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয় রাশিয়ায়। লেনিন তখন এই যুদ্ধকে পুঁজিবাদী কুকুরদের কামড়া কামড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ান। প্রথম মহাযুদ্ধে রাশিয়ার ইতিহাস এখানেই শেষ।

২৩ মে, ১৯১৫: ইতালি যখন যুদ্ধে নামলো

ইতালি মূলত ১৮৮২ সাল থেকেই জার্মানী আর অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর সাথে মিত্রতায় ছিলো। পরে যখন তুরস্কও এই জোটে যোগ দেয় তখন আসলে ইতালির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় শক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলার। কারণ, ইতালির সাথে তুরস্ক ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর বিরোধ দীর্ঘদিনের। জার্মানী, অস্ট্রো-হাঙ্গেরী ও তুরস্ক ছিলো প্রথম মহাযুদ্ধের কেন্দ্রীয় শক্তি। আর বাকীরা ছিলো মিত্রশক্তি। ইতালি ছিলো অত্যন্ত সুবিধাবাদী চরিত্রের। যুদ্ধ শুরুর দিকে সে নিরপেক্ষ হবার ভান করে ফন্দি আঁটছিলো, কোন জোটে গেলে তার সুবিধা হবে। তুরস্কের কাছ থেকে উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়া দখল করায় ইতালি ছিলো তুরস্কের জন্মের দুশমন। আবার অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর সাথে ইতালির ছিলো সীমান্ত বিরোধ। ইতালি

যখন বুঝে গেলো জার্মানী কিছুতেই তার পরম মিত্র তুরস্ক ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করবে না, তখনই ইতালি মিত্র বাহিনীর পক্ষে চলে গেলো। অস্ট্রিয়ার পার্বত্য এলাকা টাইরল অঞ্চলে বিশাল বাহিনী মোতায়েন করলো ইতালি। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর কবল থেকে এসব অঞ্চল দখল করতে চাইলো ইতালি। প্রায় ৬০০ কিলোমিটার পাহাড়ি অঞ্চলে ইতালিয়ানরা ঘাঁটি গেড়ে কিছু এলাকা দখল করল বটে, কিন্তু অস্ট্রো-হাঙ্গেরী ইতালিকে ঠেকিয়ে দিলো। শুরু হলো আরেক ডিফেন্সিভ গেম। কোনো পক্ষই সুবিধা করতে পারলো না, শক্তিক্ষয় চলতেই লাগলো। ১৯১৭ সালে জার্মানরা ইতালিকে এই অঞ্চল থেকে বিদায় করে দিতে চাইলো। শুরু হলো তুমুল লড়াই। ইতালির ৭ লক্ষ সৈন্য জার্মানী ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরী বিরুদ্ধে লড়াই করে কিছুই করতে পারলো না। উল্টো পিছু হটলো। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় ইতালি নতুন করে শক্তি পেলো। আমেরিকান বাহিনী ইতালিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলো। আবার ইতালিয়ানরা অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর ভূমি দখল করলো।

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন ইতালি অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর দখলকৃত জমি নিজেদের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলো। কিন্তু আমেরিকার শান্তিবাদী প্রেসিডেন্ট উড্রো-উইলসন ইতালির এই আবদার মেনে নেননি। ফলে ইতালির জনগনের মাঝে ক্ষোভ জমতে লাগলো। জনগনের এই ক্ষোভকে পুঁজি করেই ১৯২২ সালে ইতালিতে উত্থান ঘটে চরম ফ্যাসিবাদী শাসক বেনিতো মুসোলিনীর। এই মুসোলিনী পরে জোট গড়েন জার্মানীর একনায়ক হিটলারের সাথে। যে হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিয়েছিলেন। সে কাহিনী পরে হবে।

পর্ব-১৪

প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশদের পক্ষে ভারতীয়দের অবদানঃ-ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া এক অধ্যায়ঃ

জারিফ বললো, "মামুন, আজকে তোমাকে ইতিহাসের এক হারিয়ে যাওয়া অধ্যায় সম্পর্কে বলবো। এটা ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া অধ্যায় এজন্য যে এটা নিয়ে ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকেরা কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি। আমাদের দেশের কোনো ইতিহাস বইতেও সেভাবে বলা নাই। যুদ্ধ যখন শুরু হলো ১৯১৪ সালে তখন থেকেই জনবল ও টাকা পয়সার সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো ব্রিটেন। ব্রিটেন তো মূলত ছোট্ট একটা দ্বীপ রাষ্ট্র। যেভাবেই হোক, বিশাল ভারতবর্ষ তখন ব্রিটেনের সম্পূর্ণ করায়ত্ত। তাই মহা শক্তিশালী জার্মানদের মোকাবেলার জন্য ব্রিটেন এবার ভারতবর্ষ থেকে লোক সংগ্রহ শুরু করলো।"

মামুন বললো, "তাজ্জব ব্যাপার! আমি তো কোনোদিন শুনিই নি, ভারতবর্ষের লোকজন প্রথম মহাযুদ্ধে অংশ নিয়েছে।"

জারিফ বললো, "এজন্যই তো বললাম, এটা ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া এক অধ্যায়। লক্ষ্য করো, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সৈন্যরা গ্যালিপোলিতে যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তা প্রথম মহাযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কত বইপত্র যে লেখা হয়েছে গ্যালিপোলি যুদ্ধ নিয়ে তার কোনো ইয়ত্তা নেই, অথচ ভারতীয় উপমহাদেশের লোকজন তার চেয়ে বেশি অবদান রেখেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার। গ্যালিপোলি যুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের মোট নিহত সেনার সংখ্যা ১১ হাজার। অথচ প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় ৭৫ হাজার ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে গিয়ে। প্রায় ১৩ লক্ষ্য ভারতীয় সিপাহী প্রথম মহাযুদ্ধের বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। বৃটিশ সরকার ভারতীয় জনগণ ও রাজনীতিবিদদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে হাতে পায়ে ধরে সৈন্যবাহিনী সাজিয়েছে। বিপদ কেটে যাবার পর ব্রিটেন আর ভারতীয় জনগণের কথা শোনেনি।"

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো ব্রিটেন যে পরে আর রক্ষা করতে পারেনি?"

অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। যেমন-ব্রিটেন ভারতের রাজনীতিবিদদের আশ্বাস দিয়েছিলো যুদ্ধ শেষে ভারতকে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়ন বানাবে। সেটা আর হয় নি। উল্টো প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরই ১৯১৯ সালে কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে মর্মে মর্মে পুড়িয়েছিলো পরাধীনতা। তিনিও বলেছিলেন, "হায়! আমরা এমনই এক জাতি যে আমাদের কথা শোনার মতো কেউ নাই বিশ্বসভায়।"

তবে প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী বৃটিশকে সাহায্য করায় এ উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন আরও বেগবান হয় পরবর্তীতে। উপমহাদেশের লোকজন বুঝে যায় যে বাবার উপরেও বাবা আছে। তেমনি বৃটিশদের বাবা হলো জার্মানরা। জার্মানীকে ভয় পাচ্ছে বৃটিশরা এটা ভেবে পরাধীন ভারতের লোকজন কিছুটা মজাও পেতো। জার্মানীর প্রতি মনের অজান্তে অনুরাগ সৃষ্টি হলো ভারতীয়দের। আর, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় রাজনীতিবিদগণ বৃটিশদের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলতো, যেটা যুদ্ধের পূর্বে কল্পনায়ও ছিলো না।

শুরু হলো ১৯১৬ সালঃ এবার জার্মানদের পরাজয় শুরু

মামুন, আমরা আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছি। প্রায় দেড় বছর হতে চললো প্রথম মহাযুদ্ধের। কোনো চূড়ান্ত ফায়সালা হওয়ার লক্ষণ নেই। শুধুমাত্র রাশিয়া দুর্বল হয়ে আর যুদ্ধ করতে চাইছিলো না, আর তুরস্ক মিত্রবাহিনীর আক্রমনের মুখে তার

দার্দানেল্স প্রণালী রক্ষা করলো মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এর নেতৃত্বে। এ দুটি ঘটনা ছাড়া যুদ্ধ হয়ে পড়েছিলো ম্যাড়ম্যাড়ে। যুদ্ধ বন্ধ করতেও কেউ এগিয়ে আসেনি।

তবে, ১৯১৬ সালে দৃশ্যটা পাল্টে যেতে লাগলো। জার্মান চিফ অব স্টাফ ফলকেনহাইন আবার পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধে জড়াতে চাইলেন। তিনি জার্মানীর যুদ্ধবাজ সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেমকে জানালেন, ফ্রান্সের মাটিতেই সবকিছুর ফায়সালা হবে। যদিও প্রথমদিকে সিলাইফেন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিলো। এখন ঠাণ্ডা মাথায় রয়ে-সয়ে ফ্রান্সকে আক্রমণ করতে হবে। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে ফ্রান্স আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। পুরো ১৯১৬ সাল জুড়ে ব্রিটেন–ফ্রান্স মিলিত শক্তির সাথে জার্মানীর তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষে প্রায় ৩০ লক্ষ সৈন্য এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। শেষমেশ পরাজয় হয় জার্মানদের। তাই ১৯১৬ সালের শেষ সময়টাকে বলা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের শুরু।

'ব্যাটল অব ভার্দুন' প্রথম মহাযুদ্ধের সবচেয়ে রক্তাক্ত সংঘাত:

১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এ যুদ্ধ ডিসেম্বরের ১৮ তারিখ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। হায়রে যুদ্ধ! লাখ লাখ মানবসন্তান অকালে প্রাণ হারায় ভার্দুনের যুদ্ধে। প্রচুর শক্তিক্ষয় হতে লাগলো দু পক্ষের। জার্মানরা ফ্রান্স দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো শেষবারের মতো ফ্রান্স ব্রিটেনের সহযোগিতায় আবারও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। জার্মানরা জানতো এবার ফ্রান্স দখল করতে না পারলে হয়তো আর সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রিটেন জার্মানীকে মোকাবেলার জন্য এবার মরণকামড় দিলো। বেলজিয়াম ও ফ্রান্স সীমান্তে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা জার্মান সৈন্যগণ ফ্রান্সের ভিতরে ঢুকতেই পারেনি। এ যুদ্ধের পুরো বর্ণনা দেয়ার দরকার নেই। শুধু এটুকুই জেনে নাও, ভার্দুনের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেলো, উভয়পক্ষে প্রায় ১০ লাখ সৈন্য নিহত হয়েছে। ১৯১৬ সালের সারা বছর ধরেই এ যুদ্ধ চলছিলো। **প্রথমবারের মতো ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হয় এ যুদ্ধে।**

একটা ব্যাপার হচ্ছে, যদিও যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলো ব্রিটেন-ফ্রান্স, তাদের সামরিক শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়েছিলো। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়েছিলো এই দুটি দেশ। এত সৈন্য হারিয়ে, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে এরকম বিজয়ের কি মানে? পুরো ইউরোপের আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিলো সৈনিকদের আহাজারিতে।

১৯১৭ সাল শুরু হওয়ার পর সবার মনে শুধু একটা প্রশ্নই ছিলো-ক্ষয়ক্ষতি তো হলোই-এবার যুদ্ধ বন্ধ হবে কবে?

পর্ব-১৫

জার্মানীর অপরাজেয় সাবমেরিনঃ

প্রথমেই জারিফ জিজ্ঞেস করলো, ''মামুন, তোমাকে নিয়োগ পরীক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করি।"

বাংলাদেশ কবে সাবমেরিন যুগে প্রবেশ করে?

মামুন বললো, "এটা কোনো প্রশ্ন হলো? মুখস্থবিদ্যার জন্য আল্লাহর এই দুনিয়ায় বইয়ের কি অভাব আছে? "

২০১৭ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ ৪১ তম দেশ হিসেবে সাবমেরিন যুগে প্রবেশ করে। চীনের পিপলস আর্মি কর্তৃক ব্যবহৃত দুটি পুরোনো সাবমেরিন বাংলাদেশ কিনে নেয় যার নাম হচ্ছে-নবযাত্রা ও জয়যাত্রা-"

মামুন আবার পাল্টা প্রশ্ন করলো, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনার সাথে বাংলাদেশের সাবমেরিন কেনার কি সম্পর্ক?

আছে, সম্পর্ক আছে। আসলে ব্যাপারটা কি জানো? পৃথিবীতে আমরা যে কত পিছিয়ে আছি তথ্যপ্রযুক্তির দিক দিয়ে, জাতি হিসেবে আমরা যে কত নবীন সেটাই বলতে চাই। দুটি সাবমেরিন কিনে বাংলাদেশের লোকজন যে লাফালাফি করছে, মনে হচ্ছিলো বাংলাদেশ বুঝি বিশ্ব পরাশক্তিই হয়ে গেলো। এজন্য অল্প কিছু পেলে এত গরিমা দেখানো ঠিক না, এটাই বলতে চাই আমি।

যে দুই পুরোনো সাবমেরিন নিয়ে বাংলাদেশের তাবৎ বুদ্ধিজীবী সমাজের এত লম্ফঝম্প সেটা আমার ভালো লাগেনি। যদিও বাংলাদেশের এই দুই সাবমেরিন ক্রয়ে দেশের নৌ-বাহিনীর ক্ষমতা অনেকখানি বৃদ্ধি পেলো সমুদ্রে অন্তত ভারত ও মিয়ানমারের চোখে চোখ রেখে কথা বলা যাবে, এটা সত্যি। এটা অবশ্যই আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। কিন্তু এই সাবমেরিন দিয়ে পাগলা জার্মানী পুরো বিশ্বকে আতংকিত করে তুলেছিলো সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ঠিক বাংলাদেশ যে বছর সাবমেরিন কিনে, তার প্রায় ১০০ বছর পূর্বে ১৯১৭ সালে জার্মান সাবমেরিনের আক্রমনে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো মিত্র বাহিনী। সে গল্পই বলবো এবার।

জার্মান নৌ-বাহিনীর পাগলা খেলাঃ

আমি আগেই বলেছিলাম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিলো জার্মানীর কাছে ছিলো এক রোমান্টিসিজম। ব্রিটেন-ফ্রান্সের জগতজোড়া কলোনীগুলো যাতে জার্মানরা দখলে আনতে পারে এবং দুই শক্তিকে পরাজিত করে জার্মানরা যাতে বিশ্বের প্রভু হতে পারে সে নেশায় উন্মাতাল ছিলো জার্মানী। প্রথমেই সিলাইফেন পরিকল্পনা মোতাবেক ফ্রান্স দখল করতে ব্যর্থ হয়। এরপর জার্মান নৌ-বাহিনী যুদ্ধ উন্মাদ জার্মানীর সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেমকে বোঝাতে সক্ষম হয়, স্থলবাহিনী যাই করুক

না কেন নৌবাহিনী যদি ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে পুরো আটলান্টিক মহাসাগরে পরাজিত করতে পারে তাহলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স দুর্বল হতে বাধ্য। এই দুই শয়তান সারা পৃথিবীতে লুণ্ঠন চালাচ্ছে সমুদ্রপথে, তাই সমুদ্রপথেই তাদেরকে শায়েস্তা করতে হবে। প্রস্তাবটি মেনে ধরলো-জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেমের। নৌ-বাহিনীর জন্য তিনি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢাললেন। সাবমেরিন তখন তার উদ্ভাবনের প্রাথমিক পর্যায়ে। সম্রাটের হুকুমে জার্মান প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীরা সাবমেরিন বানাতে লেগে গেলেন।

জার্মানি জাতটার কারবার দেখো! কয়েক মাসের ব্যবধানে জার্মানরা ইউ-বোট নামে সাবমেরিন বানিয়ে ফেললেন। এরপর একটার পর একটা সাবমেরিন দাপিয়ে বেড়াতে লাগলো ব্রিটেনের উপদ্বীপের আশপাশ। উত্তর সাগর ও ফ্রান্স সন্নিহিত আটলান্টিক মহাসাগরকে ওয়ার জোন বানিয়ে হুংকার দিলো জার্মানরা এই এলাকায় কোনো বিদেশী জাহাজ আসতে পারবেনা। আসলেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

জার্মান স্থলবাহিনী কিন্তু একের পর এক মার খাচ্ছে। সিলাইফেন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯১৭ সালে ভার্দুন ও সোমের যুদ্ধে জার্মান স্থলবাহিনী যখন পরাজিত হলো, তখন ব্রিটেন আর ফ্রান্সের উল্লাস দেখে কে!! কিন্তু তখনই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিলো জার্মানীর ইউ-বোট নামক সাবমেরিন।

মনে রেখো, ব্রিটেন সেই রাণী এলিজাবেথের আমল থেকেই সমুদ্রের ডন। ১৫৮৮ সালে স্পেনীশ নৌবাহিনীকে পরাজিত করেই বিশ্বে মাস্তানি করা শুরু করে ব্রিটেন। সেই তিনশত বছর যাবত বৃটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীকে হারানোর কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বীরদের অন্যতম ফ্রান্সের নেপোলিয়ান বৃটিশ নৌবাহিনীকে কখনোই বশে আনতে পারেন নি। অথচ জার্মানী মাত্র কয়েক মাসে ব্রিটেনের ৩০০ বছরের ইতিহাসকে মাটিতে নামিয়ে ফেললো। যত ধ্বংসলীলাই করুক না কেন জার্মান জাতির সৃজনশীলতাকে নতমস্তকে কুর্নিশ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ব্রিটেনের স্থলযুদ্ধের সমস্ত অর্জন জার্মানীর সাবমেরিন আক্রমণে ফলহীন হয়ে পড়লো।

যুদ্ধে নামলো আমেরিকাঃ

কিন্তু এই সাবমেরিন দিয়ে মাস্তানি করে জার্মানী নিজের জন্য আরেক বিপদ ডেকে আনলো। ১৯১৫ সালের শুরুর দিকে জার্মানী যখন উত্তর সাগরকে ওয়ার জোন ঘোষণা করলো, তার কয়েক মাস পরই ব্রিটিশ যাত্রীবাহী জাহাজ লুসিতানিয়াকে ডুবিয়ে মারলো জার্মান সাবমেরিন। তারিখটি ছিলো ১৯১৫ সালের ৭ মে। ১২০১ জন যাত্রী ডুবে মারা যায়, তার মধ্যে ১২৮ জন ছিলেন আমেরিকান। ক্ষেপে উঠলেন আমেরিকান শান্তিবাদী প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন। জার্মানীর কাছে

ক্ষতিপূরণ চাইলো আমেরিকা। জার্মানী ক্ষতিপূরণ তো দিলই না, উল্টো ঘোষণা দিলো যে উত্তর সাগরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স অভিমুখী যে কোনো যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী জাহাজকে সে ডুবিয়ে মারবে। জার্মানীর কাছে আছে সাবমেরিন যেটার সাথে কেউ পাল্লা দিতে পারতো না। শত শত জাহাজ ধ্বংস করেছে জার্মানী। সাবমেরিন দিয়ে ব্রিটেনের কত বড় অর্থনৈতিক ক্ষতি যে করেছে জার্মানরা, তা ছিলো অতুলনীয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, জার্মানীর এই মাস্তানী আমেরিকা সহ্য করবে কেন? ব্রিটেন ছিলো আমেরিকার সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক অংশীদার। আমেরিকার জাহাজগুলো অবশ্যই ব্রিটেন যাবে। যখন আমেরিকা দেখলো জার্মানী তাকেও পাত্তা দিচ্ছে না; জার্মান সাবমেরিন একটার পর একটা জাহাজ ডুবিয়েই যাচ্ছে অনেক ধৈর্য ধরার পর ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখ জার্মানীর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলো আমেরিকা। জার্মানীর সাথে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলো আমেরিকার। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসের ২ তারিখ মার্কিন কংগ্রেসে যুদ্ধ প্রস্তাব নিয়ে গেলেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন। তিনি বললেন- "It is a war against all nations. American ships have been sunk, American lives taken, in ways which it has stirred us very deeply to learn of, but the ships and people of other neutral and friendly nations have been sunk and overwhelmed in the waters in the same way. There has been no discrimination. The challenge is to all mankind."

কংগ্রেসে যুদ্ধ প্রস্তাব পাশ হলো। প্রায় ২০ লাখ সৈনের বিশাল বাহিনী নিয়ে এবার জার্মানীকে শায়েস্তা করতে মাঠে নামলো আমেরিকা।

যুদ্ধ থেকে সরে গেলো রাশিয়া :

আমেরিকা যখন আঁটঘাঁট বেঁধে যুদ্ধে নামলো রাশিয়ার সামনে তখন আরেক বাস্তবতা। রাশিয়া অন্যান্য পরাশক্তির মতো এতো উন্নত ছিলো না। তার উপর জার্মানীর কাছে মার খেয়ে চরম হতাশ ছিলো রাশিয়া। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ান জারের পতন ঘটে। অন্তর্বর্তী সরকার দেশ চালাচ্ছিলো।

সেই অন্তর্বর্তী সরকারকে হটিয়ে সমাজতন্ত্রের অন্যতম মহানায়ক লেনিন ক্ষমতা দখল করেন ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে (রাশিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অক্টোবর মাস)। বিশ্বের বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে রাশিয়া। ক্ষমতা নিয়েই লেনিন এই যুদ্ধ থেকে রাশিয়াকে সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করেন। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে রাশিয়া। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসের ৩ তারিখ জার্মানীর সাথে একটি চুক্তি করে রাশিয়া, যেটির নাম 'ব্রেস্ট-লিটভস্ক চুক্তি'। এই চুক্তির মাধমে রাশিয়া চূড়ান্তভাবে যুদ্ধ থেকে সরে যায়।

পর্ব-১৬

যেভাবে শেষ হলো যুদ্ধঃ

আগেই যেটা বলেছিলাম, ১৯১৭ সালে তিনটি বড় ঘটনা প্রথম মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। প্রথম ঘটনাটা ছিলো সাবমেরিন নিয়ে জার্মানীর মাস্তানি। জার্মানীর অব্যাহত সাবমেরিন আক্রমনে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো মিত্র শক্তি। ব্রিটেনের জলসীমায় কেউ আসতে পারতোনা জার্মানীর ভয়ে। এই তালিকায় ছিলো আমেরিকার মতো নব্য পরাশক্তি। জার্মানীর আগ্রাসী আচরণে আমেরিকাও যুদ্ধে যোগ দেয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল, আমেরিকার যোগদান। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেয়ার কারণে ব্রিটেন-ফ্রান্সের শক্তি অনেকখানি বেড়ে যায়।

তৃতীয় ঘটনাটা ছিলো, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাশিয়ার সরে যাওয়া। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসের ৩ তারিখ রাশিয়া জার্মানীর সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করে। যুদ্ধের পূর্ব ফ্রন্ট অনেকটাই শান্ত হয়ে পড়ে। জার্মানী সব সৈন্য পশ্চিম প্রান্তে সরিয়ে আনে। আবার শুরু হয় ফ্রান্স সীমান্ত বরাবর তুমুল যুদ্ধ। জার্মানীর সাবমেরিন আক্রমনের বিপরীতে অবশেষে ব্রিটেনও পাল্টা আঘাত দিতে থাকে।

১৯১৮ সালের শুরুতেও মনে হচ্ছিলো জার্মানরা অপরাজেয়। কিন্তু দিন যতই যেতে লাগলো জার্মানদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ততই ভেঙে পড়লো। ব্যাপারটা হচ্ছে টানা ৪ বছরে জার্মানরা কেবল যুদ্ধই করে গেছে। এই ফাঁকে কখন যে তাদের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, লোকবল ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, সে হিসাব করার ফুরসত পায়নি কেউ। প্রতি ঘন্টায় গড়ে ৫৫ জন লোক নিহত হচ্ছিলো জার্মানীর। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে জার্মানীর বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদন ছিলো ব্রিটেন-ফ্রান্সের সম্মিলিত শক্তির সমান। কিন্তু ধনী রাষ্ট্র আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে নামায় জার্মানদের পতন শুরু হয়। যুদ্ধের কারণে শ্রমশক্তি নিয়োজিত থাকায় শিল্প উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যায়।

জার্মানির মিত্র তুরস্ক ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীও যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়। জার্মানী হয়ে পড়লো একদম একা। এমন অবস্থা হয়ে গেলো যে খোদ জার্মানীর মাটিতে ঢুকে পড়বে ব্রিটেন-ফ্রান্স-আমেরিকার সম্মিলিত বাহিনী। জার্মান নাগরিক সমাজে অসন্তোষ দেখা দিলো। অথচ যুদ্ধ শুরুর দিকে জার্মানীর আপামর জনসাধারণ যুদ্ধকে সমর্থন জানিয়েছিলো। তারা ভেবেছিলো, এই বুঝি মাসখানেকের মধ্যেই জার্মানীর দুর্বার আক্রমণে পুরো ইউরোপ ঠান্ডা হবে। কিন্তু সেটা আর হয়নি। তাই জার্মানী যুদ্ধবিরতি করতে বাধ্য হলো।

১৯১৮ সালে এগারো মাসের এগারো তারিখের বেলা এগারোটা। ১১ নভেম্বর, ১৯১৮ বেলা এগারোটা। জার্মানী যুদ্ধবিরতি ঘোষনা করলো। শেষ হলো মানব ইতিহাসের প্রলয়ংকরী এক যুদ্ধের।

যুদ্ধবিরতি হলে, শান্তি কি আসলো?

জার্মানী যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার সাথে সাথে লন্ডন-প্যারিসে আনন্দ মিছিল শুরু হলো। মনে হলো, পৃথিবীটা আবার শান্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু সে আশা ছিলো আসলে সুদূর পরাহত। ৯০ লক্ষ সৈন্য মারা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। নিরীহ লোক মারা যায় আরও ৫০ লক্ষ। আহতদের তালিকা বাদই দিলাম। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক বাড়িতে গিয়ে কি করবে? কারণ তার পরিবারের সদস্যরা বেঁচে নেই। প্রথম মহাযুদ্ধের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা ছিলো মনোজাগতিক। মানুষের মনে হতাশা, দু:খ ও অসহায়বোধ গ্রাস করতে লাগলো। শিল্পে-সাহিত্যে এর প্রভাব পড়ে।

প্যারিসে শান্তি সম্মেলন আহবান করা হলো। শান্তি সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন। পরাজিত জোট-জার্মানী, তুরস্ক, অস্ট্রো-হাঙ্গেরী-এই তিন দেশকে শাস্তি দেয়ার জন্য পাগলপ্রায় হয়ে উঠলো ব্রিটেন-ফ্রান্সের নেতৃত্বে মিত্রশক্তি। উড্রো উইলসন সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে শান্তি সম্মেলন আহবান করা হলো, সে প্রত্যাশিত শান্তি আর আসলো না।

প্যারিসের শান্তি চুক্তি ও লীগ অব নেশনস্ প্রতিষ্ঠা
পর্ব-১৭

যুদ্ধ-বিগ্রহের আলাপ করতে করতেই আমাদের ১৬টি পর্ব কেটে গেলো। বিগত ১৬টি পর্বে আমরা মূলত দেখিয়েছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্ত সমীকরণ। কোন কোন দেশগুলি একে অপরের শত্রু মিত্র ছিলো, সেগুলোও আলোচনা করেছি।

১১ নভেম্বর, ১৯১৮ সাল:

এদিনই জার্মানী আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয় ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইতালি-আমেরিকা কর্তৃক নেতৃত্বদানকারী মিত্রশক্তির কাছে। জার্মানীর সঙ্গী তুরস্ক আরো ১২ দিন পূর্বেই ব্রিটেনের কাছে আত্মসমর্পন করে। ৮ দিন আগে নভেম্বরের ৩ তারিখ আত্মসমর্পন করে জার্মানীর আরেক জোটসঙ্গী অস্ট্রো-হাঙ্গেরী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তির তিন খেলোয়াড় যথা জার্মানী-তুরস্ক-অস্ট্রো/হাঙ্গেরী যখন পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ধুঁকছে, তখন মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি আহত বাঘের মতো ফুঁসছে। যদিও মিত্রশক্তির দেশগুলি যুদ্ধে জিতেও শান্তিতে নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ লোক মারা যায়, যার অর্ধেকই হচ্ছেন সামরিক বাহিনীর লোকজন। ৫ কোটিরও বেশি লোক আহত হয়। পুরো ইউরোপ জুড়ে হাহাকার পড়ে যায়। সবার মুখেই একই কথা-এ কি হলো? এভাবে কোটি কোটি মানুষ বেহুদা প্রাণ হারানোর জন্যই কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি? কেন মানুষ যুদ্ধে জড়াবে আর সাধারণ মানুষ ও সৈনিক মরবে?

এমনও হয়েছে, একজন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখলো-তার পরিবারের কোনো সদস্য বেঁচে নেই তাহলে সে কিভাবে বেঁচে থাকবে? সেই সৈনিক বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে ফেলে। মোটকথা হলো জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা তৈরি হয় পুরো ইউরোপে।

কয়েকদিন এরকম বিষণ্ন ও অবসাদের মুহূর্ত কেটে যাবার পর মানুষজন দৈনন্দিন কাজে আবারও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মিত্রশক্তির রাজনীতিবিদরা ভাবলেন, এমন এক নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্তা গড়ে তুলতে হবে যাতে আর কোনোদিন পৃথিবীতে যুদ্ধ না হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে তারা আখ্যা দিয়েছেন- **A war to end all war.**

১৮ জানুয়ারি, ১৯১৯:- প্যারিস শান্তি সম্মেলন শুরু:

শান্তি সম্মেলন শুরুর আগেই ভয়াবহ স্প্যানিশ ফ্লু শুরু হলো পুরো ইউরোপ জুড়ে। লাখ লাখ মানুষ মরতে শুরু করলো আবার। যুদ্ধের চেয়ে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠলো স্প্যানিশ ফ্লু। আজকের মতো বিশ্বের দেশগুলির মাঝে তখন এত বেশি যোগাযোগ ছিলো না বিধায় এই মহামারী ইউরোপের বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। প্রায় ২ বছর স্থায়ী এই স্প্যানিশ ফ্লুতে প্রায় ৫ কোটির কাছাকাছি লোক মারা যায়।

সে যাই হোক, এর মধ্যেও শান্তি আলোচনা শুরু হলো। তৎকালীন পৃথিবীতে স্বাধীন দেশের সংখ্যা অনেক কম ছিলো। ৩২টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা জড়ো হলো প্যারিসে। এই শান্তি সম্মেলনের প্রধান নেতা হয়ে উঠলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।

১৮২৩ সালে মনরো ডকট্রিনের আওতায় আমেরিকা পুরো বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের উন্নতি সাধনে মনোযোগ দিয়েছে। ১৮৭২ সালে আমেরিকা হয়ে যায় বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ। জার্মানী যখন আমেরিকার বেশ কয়েকটি জলযান ডুবিয়ে দেয় তখনই মূলত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১৯১৭ সালে আমেরিকা যুদ্ধে নামে। যুদ্ধ শেষে দেখা যায় আমেরিকা যুদ্ধে খুব কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আবার সে অনেক সম্পত্তির মালিক; ভূ-খন্ডও তার বেশি। সব দেশগুলি বিনা বাক্যে আমেরিকার মাতব্বরি মেনে নিলো।

শান্তি সম্মেলনের মূল খেলোয়াড় আমেরিকান নেতৃত্বাধীন বিগ ফোরঃ

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ-
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ক্লিমেনশো-
ইতালির প্রধানমন্ত্রী অরল্যান্ডো- আর
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।



চিত্র-১৩ : (৪)-আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, (৩) ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ক্লিমেনশো, (২) ইতালির প্রেসিডেন্ট অরল্যান্ডো ও (১) ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে এই চার নেতা যুদ্ধোত্তর পৃথিবী পুনর্গঠনের জন্য একত্রে প্রচুর সময় ব্যায় করেন। এই চার নেতাই বিগ ফোর নামে পরিচিত।

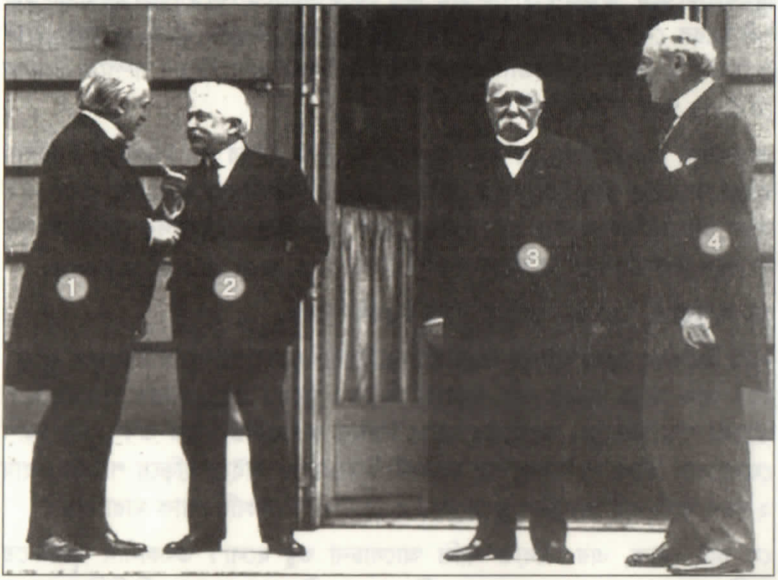
মিত্রশক্তির এর চার খেলোয়াড় পুরো বিশ্ব ভাগ বাটোয়ারা করতে বসলেন। তারা সারা পৃথিবীতে শান্তি আনবেন এবার।

কিন্তু শান্তি আনার পূর্বশর্ত ছিলো-জার্মানীর নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তিগুলোকে আগে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া।

শাস্তি দিতে হবে জার্মানীকে-কারণ জার্মানরাই যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে। জার্মানী তার মিত্রদেরকে বারংবার উস্কানি দিয়ে শান্তির পথকে পদদলিত করেছে।

শান্তি সম্মেলনের মূল খেলোয়াড় আমেরিকান নেতৃত্বাধীন বিগ ফোরঃ

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ-
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ক্লিমেনশো-
ইতালির প্রধানমন্ত্রী অরল্যান্ডো- আর
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।



চিত্র-১৩ : (৪)-আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, (৩) ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ক্লিমেনশো, (২) ইতালির প্রেসিডেন্ট অরল্যান্ডো ও (১) ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে এই চার নেতা যুদ্ধোত্তর পৃথিবী পুনর্গঠনের জন্য একত্রে প্রচুর সময় ব্যায় করেন। এই চার নেতাই বিগ ফোর নামে পরিচিত।

মিত্রশক্তির এর চার খেলোয়াড় পুরো বিশ্ব ভাগ বাটোয়ারা করতে বসলেন। তারা সারা পৃথিবীতে শান্তি আনবেন এবার।

কিন্তু শান্তি আনার পূর্বশর্ত ছিলো-জার্মানীর নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তিগুলোকে আগে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া।

শাস্তি দিতে হবে জার্মানীকে-কারণ জার্মানরাই যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে। জার্মানী তার মিত্রদেরকে বারংবার উস্কানি দিয়ে শান্তির পথকে পদদলিত করেছে।

শাস্তি দিতে হবে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীকে, কারণ তাদের যুবরাজকে মেরেছিলো এক বিচ্ছিন্নতাবাদী সার্বিয়ান। একজন লোকের ভুল কাজ করার পরিণতি কখনোই পুরো জাতির উপর বর্তায় না। কেন অস্ট্রো-হাঙ্গেরী আগ বাড়িয়ে সার্বিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো? গুরু জার্মানীকে শাস্তি দিলে তার শিষ্যকেও ছাড় দেওয়া যাবে না।

শাস্তি দিতে হবে ইউরোপের রুগ্ন মানুষ তুরস্ককে কারণ তুরস্ক হচ্ছে জার্মানীর ঘনিষ্ট মিত্র। জার্মানী যা বলেছে তুরস্ক তাই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে।

শাস্তি দিতে হবে বুলগেরিয়াকেও-কারণ বুলগেরিয়া জার্মানী, অস্ট্রো-হাঙ্গেরী আর তুরস্কের সাথে তাল মিলিয়েছ।

এতে কি বোঝা যায়?

আসলে কি তারা শান্তি আনার জন্য জড়ো হয়েছিলেন?

মোটেই নয়।

তারা বসেছিলেন-নাটের গুরু জার্মানীকে চরম শাস্তি দেয়ার জন্য। জার্মানীকে জন্মের শিক্ষা দেয়ার জন্য ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ক্লিমেনশো আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "এই বেজন্মার জাতেরা শুধু শুধু যুদ্ধ লাগিয়েছে, ওরা আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। আজ ফ্রান্সের ২৫ লক্ষ লোক মারা গেছে, ফ্রান্সের নারীরা আজ বিধবা- । এই জার্মানীকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে যুদ্ধ করার সাধ তাদের চিরতরে মিটে যায়।"

ইতালির প্রধানমন্ত্রী ক্ষেপে উঠলেন। ৭ লক্ষ ইতালিয়ান প্রাণ হারিয়েছে এই অনর্থক যুদ্ধে। জার্মানীর দোস্ত অস্ট্রো-হাঙ্গেরী আমাদের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছে। আমরা যুদ্ধ করতে চাইনি। এখন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে। আর যুদ্ধ বাধানোর দায়ে আমাদেরকে দিতে হবে বিশাল ক্ষতিপূরণ।

দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্য পরিচালনাকারী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ একটু নরম। তিনি শুধু চান-জার্মানীকে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করতে। ক্ষতিপূরণ পেলেই তিনি খুশী। জার্মানীর কাছ থেকে ভূ-খন্ড কেড়ে নেওয়ার পক্ষে তিনি নন। আবার লয়েড জর্জ ভাবলেন, তিনি যদি জার্মানীর প্রতি কঠোর না হন তাহলে বন্ধুরাষ্ট্র ফ্রান্স হয়তো তাকে ভুল বুঝতে পারে। তাই, ফ্রান্সের চিল্লাচিল্লিকে তিনি মৌন সমর্থন দিয়ে যান।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো-উইলসন খুব ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। সবার কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। হাজারো সমস্যায় জর্জরিত ইউরোপকে তিনি কিভাবে ঠান্ডা করবেন তা ভেবেই পাচ্ছেন না। একটা ব্যাপারে তিনি একমত,

কাউকে কঠোর শাস্তি দেয়াটা তিনি সমর্থন করছেন না। জার্মানীর প্রতি এতটা নির্দয় হওয়া যাবে না এটা তিনি ফ্রান্সকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, সম্মেলনে পরাজিত শক্তি জার্মানী, তুরস্ক এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর কোনো প্রতিনিধি নাই। উইলসন চান জার্মান ও তার জোটভুক্ত দেশগুলো যদি কোনো ভুলও করে থাকে তবুও তারা আসুক। তাদের উপস্থিতিতেই বরং চুক্তি হোক। আর সব দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত হবে লীগ অব নেশনস্ ।

কিন্তু ফ্রান্সকে কোনোমতেই ঠান্ডা করা যাচ্ছে না। আসলে জার্মানী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই ফ্রান্স দখল করার লক্ষ্যে দুর্বার অভিযান পরিচালনা করেছিলো। এত কষ্ট করতে হয়েছে জার্মানীকে মোকাবেলা করতে গিয়ে ফ্রান্সের তা এককথায় অবিশ্বাস্য। ফ্রান্স পারলে জার্মানীকে ১০০ টুকরা করে ফেলে।

শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের ইচ্ছাশক্তির কাছে উড্রো উইলসনকে পরাজিত হতে হয়। জার্মানীকে চরম অপমানজনক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয় মিত্রশক্তি। সে কাহিনী পরের পর্বে বলবো।

তবে আরেকটা কথা জেনে রাখা ভালো- জার্মানীর বিরুদ্ধে যখন একের পর এক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিলো, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক সামান্য সৈনিক; ল্যান্স কর্পোরাল যার পদ- তিনি তখন এক হাসপাতালে চোখের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনিও জার্মানীর হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। জার্মানী যে আত্মসমর্পন করে ফেলেছে মিত্রশক্তির কাছে, সেটা তার কাছে মোটেও ভালো লাগেনি। জার্মান জনগণের একটা অংশ এই আত্মসমর্পনকে ভালো চোখে দেখেনি। তিনিও ছিলেন তাদেরই দলে। কয়েক বছরের মধ্যেই এই সামান্য ল্যান্স কর্পোরাল হয়ে উঠেছিলেন জার্মান জাতির ভাগ্যবিধাতা। যার নাম এডলফ হিটলার।

পর্ব-১৮

মামুন জারিফকে জিজ্ঞেস করলো, ''সবাই একটা জিনিস বলাবলি করে-প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত শক্তি জার্মানীকে বিভিন্ন মেয়াদে ও শর্তে কঠোর শাস্তি দেয়ার কারণেই নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি?''

এটা কতটুকু সত্যি?

জারিফ বললো, ''এটা অনেকাংশেই সত্যি। তোমাকে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয় তখন সব পক্ষই বিভিন্ন অপরাধ করে। জার্মানী যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির হোতা তবুও একথা মানতেই হবে ব্রিটেন-ফ্রান্স-

আমেরিকার নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তিও জার্মানীর প্রচুর ক্ষতি করেছে। সব পক্ষই যুদ্ধাপরাধ করেছে কিন্তু জার্মানী পরাজিত হওয়ায় তাকেই দোষারোপ করে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে চাইছিলো মিত্র শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নিহিত আছে মিত্রশক্তির এ ইচ্ছাশক্তির মাঝে।

জার্মান প্রতিনিধিদের জন্য রেলস্টেশনে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাঃ

প্যারিস শান্তি চুক্তি যে পরবর্তীতে কার্যকর শান্তি চুক্তি হতে পারলো না এর অন্যতম কারণ হচ্ছে-এ সম্মেলনে জার্মানী ও তার জোটসঙ্গীদের কোনো মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়নি। শান্তি সম্মেলনের প্রথমদিকে জার্মানীকে আমন্ত্রণ পর্যন্ত জানানো হয়নি। ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করার দাবী জানালো। যদিও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন জার্মানীর প্রতি অনেকটা নমনীয় ছিলেন। উইলসন আশঙ্কা করেছিলেন জার্মানরা যে রকম একগুঁয়ে জাতি তাদের প্রতি শাস্তি দিতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

উড্রো উইলসনের আন্তরিক ইচ্ছায় অবশেষে জার্মানীর প্রতিনিধিরা প্যারিস আসলেন। প্যারিসে খবরটা পৌঁছে গেলো যে জার্মান প্রতিনিধি দল আসছে। বিক্ষুব্ধ প্যারিসবাসীদের একটা দল পুরো ট্রেনটিকে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত কঠোর নিরাপত্তায় জার্মানীর প্রতিনিধি দলটি হোটেলে আস্তানা গাড়লো।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "একটা জিনিস আমার মাথায় আসছেনা। আজকের পৃথিবীতে ফ্রান্সের সাথে জার্মানীর এত বন্ধুত্ব যে আমি ভাবতেও পারছিনা কিভাবে এই দু'টো দেশ একসময় এত শত্রু ছিলো? আমাদের বাংলাদেশেই ফ্রান্স আর জার্মানীর দূতাবাস পর্যন্ত একসাথে, যার নাম ফ্রাঙ্কো-জার্মান দূতাবাস।

জারিফ বললো, আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফ্রান্স আর জার্মানী বন্ধুত্বের পথে পা বাড়ায়। এই দুই দেশ বুঝতে পারে তারা যদি এভাবে ঝগড়া করে তাহলে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই দুই দেশের শত্রুতা আরও ভয়াবহ ছিলো। ফ্রান্সকে অধীনস্ত দেশ বানিয়ে আইফেল টাওয়ারে উঠে প্রস্রাব করে জার্মানরা। সে কাহিনী বলবো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়।

যা হোক, উইলসন পারলেন না ফ্রান্সকে থামাতে। ফ্রান্স তাঁর স্বার্থসিদ্ধির জন্য জার্মানীর প্রতি কঠোর মনোভাব পোষন করলো; এবং শেষপর্যন্ত ফলাফল পেয়ে গেলো। দেখো-জার্মানীর প্রতি কি ভয়াবহ রকম শাস্তির বিধান জারী হলোঃ–

১. আলসেস-লোরেন প্রদেশটি ফ্রান্সের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হলো। এই প্রদেশটি ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে দখল করেছিলো জার্মানী।

২. জার্মানীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন কয়লাখনি সমৃদ্ধ শহর সার-কে ১৫ বছরের জন্য ফ্রান্সের হাতে তুলে দেয়া হলো। ১৫ বছর পরে গণভোট হবে-এই শহরটি কোন দেশের অধীনে থাকবে।
৩. জার্মানীর রাইন নদীর পশ্চিম তীর ধরে মিত্রবাহিনীর সংরক্ষিত এলাকা থাকবে। জায়গাটা ছিলো ফ্রান্সের সীমান্ত সংলগ্ন। জার্মানীর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত ফ্রান্স এ জায়গাটার নামকরণ করলো রাইনল্যান্ড।
৪. জার্মানীর সমস্ত কলোনীগুলো কেড়ে নেয়া হলো।
৫. ১লক্ষের বেশি সেনাবাহিনী গঠন করতে পারবে না জার্মানরা।
৬. ৩৬ টা জাহাজ নিয়ে ছোট্ট একটা নৌবাহিনী চালাতে পারবে জার্মানরা, তবে কখনোই সাবমেরিন ব্যবহার করতে পারবে না।
৭ জার্মানীর কোনো বিমান বাহিনী থাকতে পারবে না।
৮. জার্মানীকে অবনত মস্তকে যুদ্ধ বাধানোর সমস্ত দায় স্বীকার করে নিতে হবে।
৯. শুধু দায় স্বীকারই যথেষ্ট নয়, মিত্রবাহিনীকে ৬৬০ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে হবে জার্মানদের।

মামুন বললো, ‘‘সর্বনাশ! একটা জাতির উপর এতো সর্বনাশা চুক্তি চাপিয়ে দিলে যুদ্ধ তো আরেকটা হবেই।"

জারিফ বললো, ‘‘ব্রটেন-ফ্রান্স ভেবেছিলো, এই শাস্তি দিলে জার্মানী আগামী ১০০ বছরেও দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু কে জানতো এই অপমানজনক চুক্তির বলেই জার্মানীতে উত্থান ঘটবে আর এক উন্মাদ হিটলারের? পরাজিত জার্মান জাতির আশা ভরসার স্থল হয়ে উঠবেন এই হিটলার।

যা হোক, ১৯১৯ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখে জার্মান প্রতিনিধিদল বাধ্য হয়ে এই চুক্তিতে সই করে। জার্মানীর কাছ থেকে ভূমি কেড়ে নেয়ার কারণে জার্মানী হারালো তার ৮০ লক্ষ নাগরিক ও ১০ শতাংশ জমির মালিকানা।

মামুন প্রশ্ন করলো, ‘‘জার্মানীর প্রতি এত শাস্তি দেওয়া হলো; কিন্তু জার্মানীর অপর দুই সঙ্গী তুরস্ক এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর প্রতি কিরকম শাস্তি দেওয়া হলো সে ব্যাপারে তো কিছু বললে না এখনও।"

জারিফ উত্তর দিলো যে মোট চুক্তি হয়েছিলো আসলে পাঁচটি। ভার্সাই চুক্তির কথা একটু আগেই জানলে। অস্ট্রিয়ার সাথে চুক্তি হয়েছিলো-**ট্রিটি অব সেন্ট জার্মেইন, হাঙ্গেরীর সাথে হয়েছিলো ট্রিটি অব ট্রিয়ানন**।

যেহেতু অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ছিলো তুরস্কের মিত্র, তাই উপরের দুই চুক্তির মাধ্যমে এই সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছিলো।

চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীর মতো স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছিলো। সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়াকে নিয়ে গঠিত হয়েছিলো যুগোশ্লাভিয়া।

প্রভাবশালী এক সাম্রাজ্যের চারণভূমি অস্ট্রো-হাঙ্গেরী ভেঙে হলো আলাদা দুটি স্বাধীন দেশ। আজকের অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী।

আর বুলগেরিয়ার সাথে হয়েছিলো 'ট্রিটি অব নিউয়িলি'। বুলগেরিয়ার কাছ থেকে জমি নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসকে দিয়ে দেওয়া হলো।

তুরস্কের সাথেও অত্যন্ত কঠোর শর্ত মোতাবেক 'ট্রিটি অব সভ্রেস' স্বাক্ষরিত হলো। এই চুক্তি ছিলো তুরস্কের কাছে মৃত্যু সমতুল্য।

তুরস্কের কপাল ভালো ঠিক সেই সময়েই গর্জে উঠেছিলেন তাদের ইতিহাসের অন্যতম মহানায়ক মোস্তফা কামাল পাশা। তিনি এই চুক্তির শর্তের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার বাহিনী নিয়ে।

১৯১৯ সালের মে মাসের ১৯ তারিখ থেকে শুরু হয় তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রাম; যেটা শেষ হয় ১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই মাসে।

তুরস্কের সেইসব সংগ্রামের ইতিহাস মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস বলার সময় আলোচনা করবো।

উড্রো উইলসনের ১৪ দফা:

ফ্রান্সের অধিকাংশ শর্তাবলী মেনে নিয়ে জার্মানী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের এবার শায়েস্তা করা তো হলোই, কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন চেয়েছিলেন পৃথিবীতে শান্তি ফেরাতে। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি সংস্থা গড়বেন তিনি, যেখানে বিশ্বের সব স্বাধীন দেশই এর সদস্য হবে। এ লক্ষ্যে ১৪ দফা প্রস্তাব ঘোষণা করলেন তিনি। প্রস্তাবগুলো ছিলো অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ছিলো কোনো গোপন চুক্তি হতে পারবেনা দুটি দেশের মধ্যে, নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে, সমুদ্রে সব দেশের অবাধ যাতায়াত থাকবে, ইউরোপের দেশগুলি যাতে কোনো সংঘর্ষে না জড়ায়, সেজন্য তাদের মধ্যকার সীমান্ত বিরোধ নিরসন করতে হবে, এবং বেশ কয়েকটা স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরী করতে হবে।

সেই মহান উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখ লীগ অব নেশনস্ এর যাত্রা শুরু হয়। আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতো কার্যকর সংস্থাগুলি অদ্যাবধি টিকে আছে।

দুটি বড় ধরণের ত্রুটি নিয়ে লীগ অব নেশনস্ এর যাত্রা শুরু হলো:

প্রথমটি হলো, এর প্রস্তাবক আমেরিকাই এটার সদস্য ছিলো না। যে দেশ এ সংস্থার জন্ম দিলো তারাই নিরপেক্ষতা ও বিশ্বের ঝামেলা থেকে দূরে থাকার

দোহাই দিয়ে সদস্য হয়নি। তাই বলা যায়, লীগ অব নেশনস্ অভিভাবকহীন ভাবে তার পথচলা শুরু করলো।

দ্বিতীয় ত্রুটিটা ছিলো জার্মানীকে নিয়ে। ফ্রান্সের কঠোর আপত্তিতে জার্মানীকে সদস্যই করা হয়নি। ফ্রান্সের দাবী ছিলো আগে জার্মানরা সব শর্ত মেনে চলুক, ক্ষতিপূরণ দিতে থাকুক, তারপরে তাদেরকে সদস্য করা যাবে।

১৯২৬ সালে জার্মানরা অবশেষে লীগ অব নেশনস্ এর সদস্য হয়, কিন্তু এই অপমানের জ্বালা জার্মানরা ভুলতে পারেনি।

সাড়াজাগানো রাশিয়ান বিপ্লব

পর্ব-১৯

মামুন বললো, "আমার এক চাচা বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন এক হাইস্কুলের শিক্ষক। আমি আমার চাচার মধ্যে রাশিয়ার প্রতি বিপুল আবেগ লক্ষ্য করেছিলাম। তাকে দেখে আমার মনে হতো তিনি বুঝি রাশিয়ার ভূ-খণ্ডেই ছুটাছুটি করছেন সারাক্ষণ।"

চাচা বলতেন "দেখো! পৃথিবীর বুকে এক টুকরো স্বর্গ তৈরি করেছিলেন লেনিন। সেখানে কোনো সম্পত্তির মালিকানা নাই। সবাই সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রের অধীনে থেকে কাজ করে। মানুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন, যার নাম-*'রাশিয়ার চিঠি।'* সেখানে তিনি রাশিয়ার সমাজব্যবস্থাকে খুব প্রশংসা করেছিলেন।

চাচা খুব দাপটের সাথে বলতেন, একদিন সারা পৃথিবীতেই সমাজতন্ত্র কায়েম হবে। পুঁজিবাদের সব দুঃশাসন শেষ হবে, মানুষে মানুষে সমতা ফিরে আসবে। কোনো অভাব অভিযোগ থাকবে না..ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আরে! থামো, থামো!! চেঁচিয়ে উঠলো জারিফ।

প্রশ্ন করলো মামুনকে, "তোমার চাচা এসব কথাগুলো কবে বলতেন?"

মামুন উত্তর দিলো-"এই ২০০৪/০৫ সালের দিকে। যখন আমি হাইস্কুলে উনার ছাত্র ছিলাম। আমি অবশ্য উনার কথা এতকিছু বুঝতামনা। কিন্তু উনার কথাগুলো মনে আছে।"

জারিফ বললো, ''দেখো-তোমার চাচার স্বাধের রাশিয়া ও তার সমাজতান্ত্রিক মতবাদের পতন ঘটেছে ১৯৯০/৯১ সালে। রাশিয়া ভেঙে ১৯ টুকরো হয়েছে। এরপরেও তোমার চাচার মতো রোমান্টিক সমাজতন্ত্রীরা এখনও স্বপ্ন দেখে সারা পৃথিবীতে নাকি সমাজতন্ত্র কায়েম হবে? এগুলো দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।"

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে বিংশ শতাব্দীতে কোটি কোটি মানবসন্তানকে হত্যা করা হয়েছে। আসলে সমাজতন্ত্রের কথাগুলো শুনতে খুব ভালো শোনায়।

পৃথিবীতে সবাই সমান, সমাজে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কোনো কিছু থাকবে না। রাষ্ট্রের দখলে থাকবে সব সম্পদ। রাষ্ট্র সবাইকে সমহারে বন্টন করবে। কেউ না খেয়ে থাকবে না।

কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য সরকার দরকার, সরকারের প্রতিনিধি দরকার। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলে, কিছু লোক হয়ে পড়ে বেশি

সমান। ভালো ভালো কথার আড়ালে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসকেরা হয়ে উঠে নরদানব। বিংশ শতাব্দীর প্রত্যেকটা সমাজতান্ত্রিক দেশে তাই হয়েছে।

রাশিয়াকে নিয়ে বয়ান শুরু :

দেখো জার্মান দার্শনিক লাইবনিৎস একবার রাশিয়াকে খুব হিংসা করতেন। বলতেন, ''দেশটার নাই কোনো সভ্যতা, নাই কোনো ইতিহাস, তবুও কেন এ দেশটা এত বিশাল আয়তনের হবে?

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, ইউরোপের ইতিহাসে রাশিয়ার নামই উচ্চারিত হয় না আঠারো শতাব্দীর আগে। ইউরোপীয় আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা থেকে রাশিয়া ছিলো যোজন যোজন পেছনে।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, ''এই দেশটা এত বড় কেন? জগৎজোড়া সাম্রাজ্য পরিচালনাকারী বৃটিশদের চোখের সামনে রাশিয়া এত বড় হলো কিভাবে?"

জারিফ উত্তর দিলো, "ব্যাপারটা হচ্ছে, রাশিয়ার মূল ভূ-খন্ডের বড় একটা অংশই পড়েছে তুষারশুভ্র সাইবেরিয়া অঞ্চলে, যেটা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। এয়োদশ শতকে হিংস্র মোঙ্গলরা যেভাবে অতি তাড়াতাড়ি বিশাল এলাকা দখল করেছিলো, ঠিক সেভাবেই তাদের দখলীকৃত সভ্যতার পতন হয়। আর সেই সুযোগটাই কাজে লাগায় রাশিয়া। মঙ্গোলদের রেখে যাওয়া পুরো মধ্যএশিয়া রাশিয়ার হাতে চলে আসে। বরফাচ্ছন্ন অঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে কোনোভাবেই লাভজনক ছিলো না। তাই ব্রিটেন-ফ্রান্স-পর্তুগাল-স্পেন-জার্মানী এসব দেশ রাশিয়ার বিশাল অঞ্চলের দিকে ফিরেও তাকায়নি।



চিত্র-১৪ : ১৯৯১ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পূর্বে রাশিয়া ছিলো আরও বেশি বিশাল।

বিপ্লব পূর্ববর্তী রাশিয়াঃ

ইউরোপ মহাদেশের সবচেয়ে পশ্চাদপদ দেশ ছিলো রাশিয়া। ইউরোপের অন্যান্য দেশ যেখানে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সময়কালেই সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে আধুনিকতার পথে পা বাড়িয়েছিলো, রাশিয়াতে সামন্ততন্ত্রের পতন হয় ১৮৬১ সালে।

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে রাশিয়াতে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। রুশ জনগোষ্ঠী গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হয়। হঠাৎ করে শহরগুলোর জনসংখ্যা দ্বিগুন হয়ে পড়ে। মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবুর্গের মতো শহরগুলো এরকম বাড়তি জনসংখ্যা নিয়ে ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়ে। অসন্তুষ্ট জনগণ সবকিছুর জন্য রাশিয়ার জারকে দোষারোপ করতে থাকে।

জানিয়ে রাখি, রাশিয়ান সম্রাটের উপাধি ছিলো জার। বিভিন্ন রাজবংশ ও শাসকের হাত ঘুরে ১৬১৩ সাল থেকে রাশিয়া শাসন করতো রোমানভ রাজবংশের শাসকেরা। ১৮৯৪ সাল থেকে রোমানভ রাজবংশের শেষ সম্রাট জার দ্বিতীয় নিকোলাস দেশ শাসন করে আসছিলেন।

১৯০৫ সাল: জারের বিরুদ্ধে প্রথম বিপ্লব

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি মানুষই জারের অপশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্দ ছিলো। এদেরকে মোটাদাগে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।



চিত্র-১৪ : ১৯৯১ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পূর্বে রাশিয়া ছিলো আরও বেশি বিশাল।

বিপ্লব পূর্ববর্তী রাশিয়া:

ইউরোপ মহাদেশের সবচেয়ে পশ্চাদপদ দেশ ছিলো রাশিয়া। ইউরোপের অন্যান্য দেশ যেখানে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সময়কালেই সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে আধুনিকতার পথে পা বাড়িয়েছিলো, রাশিয়াতে সামন্ততন্ত্রের পতন হয় ১৮৬১ সালে।

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে রাশিয়াতে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। রুশ জনগোষ্ঠী গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হয়। হঠাৎ করে শহরগুলোর জনসংখ্যা দ্বিগুন হয়ে পড়ে। মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবুর্গের মতো শহরগুলো এরকম বাড়তি জনসংখ্যা নিয়ে ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়ে। অসন্তুষ্ট জনগণ সবকিছুর জন্য রাশিয়ার জারকে দোষারোপ করতে থাকে।

জানিয়ে রাখি, রাশিয়ান সম্রাটের উপাধি ছিলো জার। বিভিন্ন রাজবংশ ও শাসকের হাত ঘুরে ১৬১৩ সাল থেকে রাশিয়া শাসন করতো রোমানভ রাজবংশের শাসকেরা। ১৮৯৪ সাল থেকে রোমানভ রাজবংশের শেষ সম্রাট জার দ্বিতীয় নিকোলাস দেশ শাসন করে আসছিলেন।

১৯০৫ সাল: জারের বিরুদ্ধে প্রথম বিপ্লব

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি মানুষই জারের অপশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্দ ছিলো। এদেরকে মোটাদাগে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিলো কৃষককুল-যারা বিগত শতকে সামন্ততন্ত্রের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হয়েছিলো। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের পতন কৃষকদের সামান্যই মুক্তি দিতে পেরেছিলো। কৃষকেরা তাদের বরাদ্দকৃত জমি পায়নি। তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিলো-বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, যারা রুশ জাতীয়তাবাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। বিশাল দেশ রাশিয়া নিজেই ছিলো এক পৃথিবীর সমান। তাজিক, উজবেক, কাজাখ, মঙ্গোলিয়ান, পোলিশ, সুইডিশ, ইউক্রেনিয়ান, বেলারুশিয়ান, আজারি, পার্সিয়ান এরকম হাজারো জাতিসত্ত্বার বাস ছিলো রাশিয়াতে। সব জাতিসত্ত্বার লোকজন লক্ষ্য করেছিলো-রুশ জাতীয়তাবাদের দাপট সর্বত্রই।

তৃতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিলো-শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক শ্রেণি যারা রাশিয়াতে সংঘটিত বিলম্বিত শিল্প বিপ্লবের যোদ্ধা। বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে তারা, ধর্মঘট ও কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছিলো।

চতুর্থ ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিলো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি; যারা জারের বিভিন্ন স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতো। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে বাক স্বাধীনতা না থাকার কারণে তারা জারের বিরুদ্ধে সংঘটিত হতে পারছিলো না।

অবশেষে গর্জে উঠলেন একজন। তিনি হলেন ধর্মগুরু গ্রেগরি গ্যাপন।

২২ জানুয়ারি-১৯০৫!

রাশিয়ার ইতিহাসে এই দিনটি ব্ল্যাক সানডে হিসেবে স্বরণীয়। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকশ্রেণী সেন্ট পিটার্সবুর্গ নগরীর রাস্তায় নেমে আসে। তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ধর্মগুরু ফাদার গ্যাপন। জনতার উপর গুলি চালায় জারের পুলিশ বাহিনী। কতজন মারা গিয়েছিলো সে ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও ধারণা করা হয়, প্রায় ৫০০ এর মতো লোক মারা যায়।

দাবানলের মতো রাশিয়ার শ্রমিক বিদ্রোহ পুরো রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। ৪ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যায়। বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী গ্রুপগুলো সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে। ইহুদীদের বিরুদ্ধেও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ৩ হাজার ইহুদী নিহত হয়।

পরিস্থিতি যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছিলো, তখন রাশিয়ান জার দ্বিতীয় নিকোলাস সাংবিধানিক সংস্কারের পথে হাঁটেন।

১৯০৫ সালের ৩০ অক্টোবর জার নতুন সংবিধান সংস্কারে সম্মত হন। রাশিয়ার পার্লামেন্ট ডুমা তৈরি হয়। জার প্রতিশ্রুতি দেন, ডুমার সাথে আলোচনা না করে কোনো আইন কানুন প্রণয়ন করা হবে না।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, **"এই বিপ্লবের সময় লেনিন কোথায় ছিলেন? তার কি কোনো ভূমিকা ছিলো না?**

জারিফ উত্তর দিলো-"লেনিন তখন নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছিলেন। এই বিপ্লবের প্রেক্ষাপটটা ছিলো স্বতস্ফূর্ত। সাধারণ জনগনের বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এই বিজয়কে। লেনিন এবং তার দলের কোনো ভূমিকা ছিলো না এই বিপ্লবে।"

রহ্যসময় রাসপুতিনঃ-



চিত্র-১৫ : রহস্যময় পুরুষ রাসপুতিনের ছবি।

জারিফ বললো, এবার আমি তোমাকে শোনাবো নব্বই দশকের বাংলা সিনেমার একটি গান; যেখানে নবাগত শিল্পী ডলি সায়ন্তনী গেয়েছিলেন"-

রংচটা জিনসের প্যান্ট পড়া
জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে ধরা
লাল শার্ট গায়ে তার বুক খোলা
সানগ্লাস কপালে আছে তোলা
রাখনা কেন ঢেকে ওই দুটি চোখ
হেই যুবক-

মামুন জিজ্ঞেস করলো, **"এই বিপ্লবের সময় লেনিন কোথায় ছিলেন? তার কি কোনো ভূমিকা ছিলো না?**

জারিফ উত্তর দিলো-"লেনিন তখন নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছিলেন। এই বিপ্লবের প্রেক্ষাপটটা ছিলো স্বতস্ফুর্ত। সাধারণ জনগনের বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এই বিজয়কে। লেনিন এবং তার দলের কোনো ভূমিকা ছিলো না এই বিপ্লবে।"

রহস্যময় রাসপুতিনঃ-



চিত্র-১৫ : রহস্যময় পুরুষ রাসপুতিনের ছবি।

জারিফ বললো, এবার আমি তোমাকে শোনাবো নব্বই দশকের বাংলা সিনেমার একটি গান; যেখানে নবাগত শিল্পী ডলি সায়ন্তনী গেয়েছিলেন"-

রংচটা জিনসের প্যান্ট পড়া
জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে ধরা
লাল শার্ট গায়ে তার বুক খোলা
সানগ্লাস কপালে আছে তোলা
রাখনা কেন ঢেকে ওই দুটি চোখ
হেই যুবক-

পরের লাইনই আছে-

দৃষ্টিতে যেন যে রাসপুতিন
খুন হয়ে যাই আমি প্রতিদিন-

মামুন জিজ্ঞেস করলো, " ইতিহাস বলার সাথে ডলি সায়ন্তনীর এই গানের কথা তোমার কেন মনে পড়লো?"

কারণ হচ্ছে, ডলি সায়ন্তনীর গানে একজন নারীর চোখে আকর্ষনীয় পুরুষকে কল্পনা করা হয়েছে যেখানে রাসপুতিনের দৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

তুমি কি জানো, এ হচ্ছে সেই রাসপুতিন, যিনি প্রায় ১১ বছর ধরে রাশিয়ান রাজনীতির পিছনে কলকাঠি নেড়েছিলেন-। ১৯০৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে ১৯১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাশিয়ান সম্রাট জার দ্বিতীয় নিকোলাসের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। আধুনিক যুগে একজন কৃষককে নিয়ে রাজপরিবারের এই যে মোহাবিষ্ট হয়ে থাকা – তা ছিলো এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

শত শত ইতিহাসবিদ আজও রহস্য উদঘাটন করতে পারেন না-কেন রাসপুতিনের এত পাগলা ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও তার স্ত্রী আলেকজান্দ্রা। শুরুটা হয়েছিলো রাজপুত্র অ্যালেক্সির রোগ নিরাময়কে কেন্দ্র করে। শিশু বয়স থেকেই অ্যালেক্সি একের পর এক রোগে ভুগতে থাকেন। কোনোভাবেই তাকে সুস্থ করা সম্ভব হয়নি। ঠিক এরকম অবস্থায় রাজপরিবারে ডাক পড়ে রাসপুতিনের। নেহায়েত একজন কৃষক আমাদের দেশের গ্রাম্য কবিরাজদের মতো ঝাঁড়-ফুক করেন অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তুলতে।

কি তাজ্জবের ব্যাপার! রাজপুত্র অ্যালেক্সিকেও তিনি ঝাঁড়-ফুক দিয়ে ভালো করে ফেললেন। জার রাসপুতিনকে উপাধি দিলেন 'Man of God' নামে।

রাসপুতিন ঢুকে পড়লেন জারের অন্দরমহলে। রানী আলেকজান্দ্রাও রাসপুতিনের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করেন না। রানীর কাছে রাসপুতিন ছিলেন সাক্ষাৎ দেবতা; যার মধ্যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করতেন রানী।

রাশিয়ার অভিজাত আমলাকুল ও সামরিক কর্মকর্তারা ভেবেই পান না-এ কি হলো?

এক গ্রাম্য কৃষক এসে রাজা-রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করবে-এটাই কি এখন তাদের দেখতে হবে? কেউ কেউ রটিয়ে দিলো রাণীর সাথে রাসপুতিনের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে।

রাসপুতিন ছিলেন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ। রাশিয়ানরা কোনো রকম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক-এটা তিনি চাইতেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে তিনি জারকে নিষেধ

করেছিলেন যুদ্ধে জড়াতে। জার তাঁর কথা মানতে চাইছিলেন, কিন্তু সামরিক অফিসারদের কারণে রাশিয়া যুদ্ধে জড়ায়।

ধীরে ধীরে রাসপুতিনের শত্রুর সংখ্যা বেড়ে যায়। ১৯১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর রাসপুতিনের লাশ পাওয়া যায়। তাকে হত্যা করে রাশিয়ান অভিজাতদের একটি অংশের প্রতিনিধি।

ভ্লাদিমির লেনিনের ইতিকথাঃ-



চিত্র-১৬ : লেনিনের ছবি।

বিপ্লবী হওয়া কি অবধারিত ছিলো লেনিনের জন্য?
হয়তোবা তাই।

এবার আমরা ফিরে আসবো পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ার নেতা লেনিনকে নিয়ে আলোচনায়।

লেনিনের ভাইকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় ১৮৮৭ সালে; জার তৃতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যাচেষ্টায় জড়িত থাকার অভিযোগে। লেনিন হচ্ছে ছদ্মনাম, আসল নাম হচ্ছে ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানোভ। লেনিন জন্মগ্রহন করেন ১৮৭০ সালে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। লেনিনের পিতা ছিলেন স্কুল পরিদর্শক।

লেনিন হচ্ছেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের একজন। কারো কাছে তিনি হিরো, কারো কাছে তিনি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শয়তানদের একজন।

করেছিলেন যুদ্ধে জড়াতে। জার তাঁর কথা মানতে চাইছিলেন, কিন্তু সামরিক অফিসারদের কারণে রাশিয়া যুদ্ধে জড়ায়।

ধীরে ধীরে রাসপুতিনের শত্রুর সংখ্যা বেড়ে যায়। ১৯১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর রাসপুতিনের লাশ পাওয়া যায়। তাকে হত্যা করে রাশিয়ান অভিজাতদের একটি অংশের প্রতিনিধি।

ভ্লাদিমির লেনিনের ইতিকথা:-



চিত্র-১৬ : লেনিনের ছবি।

বিপ্লবী হওয়া কি অবধারিত ছিলো লেনিনের জন্য?
হয়তোবা তাই।

এবার আমরা ফিরে আসবো পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ার নেতা লেনিনকে নিয়ে আলোচনায়।

লেনিনের ভাইকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় ১৮৮৭ সালে; জার তৃতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যাচেষ্টায় জড়িত থাকার অভিযোগে। লেনিন হচ্ছে ছদ্মনাম, আসল নাম হচ্ছে ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানোভ। লেনিন জন্মগ্রহন করেন ১৮৭০ সালে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। লেনিনের পিতা ছিলেন স্কুল পরিদর্শক।

লেনিন হচ্ছেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের একজন। কারো কাছে তিনি হিরো, কারো কাছে তিনি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শয়তানদের একজন।

যা বলছিলাম, ভাই মারা যাওয়ার সময় লেনিন তখন কাজান ইমপেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছাত্র আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়।

ধীরে ধীরে লেনিন কার্ল মার্কসের রচনাবলীর সাথে পরিচিত হয়ে উঠেন। ১৮৮৯ সালে লেনিন নিজেকে মার্কসবাদী হিসেবে ঘোষণা করেন।

পরবর্তীতে লেনিন সেন্ট পিটার্সবুর্গ ইউনিভার্সিটিতে আইন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেন।

মার্কসবাদী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে আবার তিনি গ্রেপ্তার হন। সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয় তাকে।

পর্ব-২০

দুর্দশার প্রথম বিশ্বযুদ্ধঃ–

জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডে নির্বাসন জীবন কাটাচ্ছিলেন লেনিন। প্রথম মহাযুদ্ধে রাশিয়া জড়িয়ে পড়ে মহাবিপর্যয়ের শিকার হয়। অন্য পরাশক্তিদের মতো রাশিয়া সবদিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছিলো। লেনিন তখন মনে মনে খুশি হচ্ছিলেন। কারণ, লেনিন অভিমত দিয়েছিলেন, যুদ্ধে পরাজিত হলেই অত্যাচারী জারের কবল থেকে মুক্তি পাবে রাশিয়া। বিপ্লব অনিবার্য হবে তখন।

হলোও তাই। নিজ জ্ঞাতিভাই স্লাভ জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সার্বিয়াকে সমর্থন দেওয়ার জন্য রাশিয়া যুদ্ধে জড়ায়। ১৯১৪ সালে যুদ্ধের একদম শুরুতে। কিন্তু পরের বছর থেকেই বিপর্যয় শুরু।

রাশিয়ার খুব ইচ্ছা ছিলো তুরস্কের কাছ থেকে বসফরাস প্রণালী ও দার্দানেলস প্রণালীর দখল দারিত্ব নিয়ে নেওয়ার। রাশিয়ার মিত্র ব্রিটেন-ফ্রান্স সে লক্ষ্যে চেষ্টাও করেছিলো। কিন্তু তুর্কি বীর মোস্তফা কামাল পাশার অকুতোভয় নেতৃত্বে তুর্কি বাহিনী ঘুরে দাঁড়ায়। ব্রিটেন-ফ্রান্সকে রুখে দেয় তারা। রাশিয়ার জন্য মহাবিপর্যয় শুরু হয় সে ঘটনায়। মিত্রবাহিনী রাশিয়ার সাথে কার্যকর কোনো যোগাযোগ করতে পারছিলোনা।

রাশিয়ার প্রত্যেকটি শহরে তীব্র খাদ্যাভাব। না খেতে পেয়ে লোকজন থালা বাসন নিয়ে রাস্তায় নামলো। যুদ্ধ করার দরকার নাই। আগে খেতে দাও – এগুলোই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো মিছিলে মিছিলে।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসঃ প্রথম বিপ্লব

রাশিয়া বিখ্যাত হয়ে আছে তার কুখ্যাত শীতের জন্য। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা মাইনাস ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। সে বছর শীতের তীব্রতা আরও ভয়ানক ছিলো। লাখ লাখ লোক রাস্তায় নামলো জারের অপশাসনের বিরুদ্ধে। ১৯১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর রাসপুতিন মারা যাওয়ায় ভয় পেয়ে গেলেন জার দ্বিতীয় নিকোলাস। সামরিক অফিসারদের সাথে রাজা আলোচনায় বসলেন-তার কি করণীয় সে ব্যাপারে।

সবাই একযোগে রাজাকে পদত্যাগ করার পরামর্শ দিলো। রাজা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন। ক্ষমতায় বসলো গ্রেগরী লুভবের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার।

অক্টোবর বিপ্লবঃ সব দোষ জার্মানীর?

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "সারা দুনিয়ার মানুষ জানে লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়। তুমি এখানে জার্মানীর নাম নিয়ে এসেছ কেন? আমি তো জানতাম জার্মানরা ছিলো সমাজতন্ত্রের ঘোরতর শত্রু। তাহলে জার্মানরা কিভাবে অক্টোবর বিপ্লবের জন্য দায়ী হয়?" শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু-এই নীতির কারণে জার্মানরা লেনিনকে সহায়তা করে।

জার্মানরা চাইতো রাশিয়া যাতে যুদ্ধ থেকে তাড়াতাড়ি সরে যায়। তাহলে যুদ্ধের পূর্ব ফ্রন্ট একেবারে খালি। এরকম পরিস্থিতিতে লেনিনকে সহায়তা করা ছিলো জরুরি। কারণ লেনিন ছিলেন যে কোনো রকম যুদ্ধের বিরোধী। লেনিনের মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধটা ছিলো সাম্রাজ্যবাদী কুকুরদের মধ্যে কামড়াকামড়ি।

জারকে হটিয়ে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছিলো। তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

লেনিনকে দিয়ে জার্মান সেনাবাহিনী যুদ্ধ থেকে রাশিয়াকে সরানোর পরিকল্পনা আঁটলো। যদিও রাশিয়ার তৎকালীন রাজধানী পেট্রোগ্রাদে (সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরের পরিবর্তিত নাম) টেনেটুনে ৫০ হাজার বলশেভিক সমর্থক ছিলো।

বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্য জার্মান বাহিনী লেনিনকে বেশকিছু অর্থসহায়তাও দিলো। তারপর একটা ভাঙাচোরা ট্রাকে করে চোরাইপথে লেনিন রাশিয়া ঢুকে।

তাই বলা যায়, রাশিয়ায় সংঘটিত বিপ্লবে জার্মানীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বৃটিশ নেতা উইনস্টন চার্চিল ছিলেন সমাজতন্ত্রের কট্টর বিরোধী। তিনি জার্মানদের এই গোপন তৎপরতায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন।

"They turned upon Russia the most grisly of weapons. They transported Lenin in a sealed truck like a plague bacillus.

তারা (জার্মানরা) রাশিয়াকে সবচেয়ে ভয়ানক অস্ত্র যোগান দিলো। তারা প্লেগ রোগের জীবানুর মতো লেনিনকে একটি গোপন ট্রাকে করে পাচার করেছিলো।



চিত্র-১৭ : বলশেভিকরা রাশিয়ান জার দ্বিতীয় নিকোলাস, তার স্ত্রী আলেকজান্দ্রা, চার কন্যা ও একমাত্র পুত্র কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

স্ট্যালিনঃ মানুষ, না দানব?

জার্মান সহায়তায় বলীয়ান লেনিন ১৯১৭ সালের অক্টোবরের ২৫ তারিখ পেট্রোগ্রাদ দখল করেন। ইতিহাসে সেটাই অক্টোবর বিপ্লব, বলশেভিক বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নামে পরিচিত।

কিন্তু তারপর থেকে টানা প্রায় ৫ বছর গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাশিয়া।

বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে রাশিয়ানরা যুদ্ধে জড়ায়। ক্ষমতাশালী বলশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী দল গড়ে উঠে।

পোল্যান্ড-বেলারুশ-ইউক্রেন এসব অঞ্চলের মুক্তিকামী মানুষেরাও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

প্রায় ১০ লক্ষ লোক মারা যায় এসব ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে। ১৯২০-২১ সালের খরা ও টাইফাস জ্বরে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ লোক মারা যায়।

মৃত্যুর পর মৃত্যু দেখে অভ্যস্ত রাশিয়া ১৯২২ সালের দিকে কিছুটা শান্ত হয়। ১৯২২ সালে USSR-(Union of Soviet Socialist Republic) প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ১৯২৪ সালে লেনিন মারা যাওয়ার পর রাশিয়ার বুকে নেমে আসে সাক্ষাৎ এক আযরাইল।

"They turned upon Russia the most grisly of weapons. They transported Lenin in a sealed truck like a plague bacillus.

তারা (জার্মানরা) রাশিয়াকে সবচেয়ে ভয়ানক অস্ত্র যোগান দিলো। তারা প্লেগ রোগের জীবানুর মতো লেনিনকে একটি গোপন ট্রাকে করে পাচার করেছিলো।



চিত্র-১৭ : বলশেভিকরা রাশিয়ান জার দ্বিতীয় নিকোলাস, তার স্ত্রী আলেকজান্দ্রা, চার কন্যা ও একমাত্র পুত্র কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

স্ট্যালিন: মানুষ, না দানব?

জার্মান সহায়তায় বলীয়ান লেনিন ১৯১৭ সালের অক্টোবরের ২৫ তারিখ পেট্রোগ্রাদ দখল করেন। ইতিহাসে সেটাই অক্টোবর বিপ্লব, বলশেভিক বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নামে পরিচিত।

কিন্তু তারপর থেকে টানা প্রায় ৫ বছর গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাশিয়া।

বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে রাশিয়ানরা যুদ্ধে জড়ায়। ক্ষমতাশালী বলশেভিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী দল গড়ে উঠে।

পোল্যান্ড-বেলারুশ-ইউক্রেন এসব অঞ্চলের মুক্তিকামী মানুষেরাও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

প্রায় ১০ লক্ষ লোক মারা যায় এসব ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে। ১৯২০-২১ সালের খরা ও টাইফাস জ্বরে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ লোক মারা যায়।

মৃত্যুর পর মৃত্যু দেখে অভ্যস্ত রাশিয়া ১৯২২ সালের দিকে কিছুটা শান্ত হয়। ১৯২২ সালে USSR-(Union of Soviet Socialist Republic) প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ১৯২৪ সালে লেনিন মারা যাওয়ার পর রাশিয়ার বুকে নেমে আসে সাক্ষাৎ এক আযরাইল।

নাম যার স্ট্যালিন।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, ''কোথায় যেন পড়েছিলাম, স্ট্যালিন ছিলেন মানসিক রোগী। অহেতুক লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেন তিনি।"

জারিফ উত্তর দিলো, "মানসিক রোগী না হলে আসলে এভাবে অনর্থক লাখ লাখ মানুষকে মেরে ফেলার কথা না।"

লেনিন মারা যাওয়ার পর ক্ষমতা পাওয়ার কথা ছিলো লিওন ট্রটস্কির। তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি যোগ্য। কিন্তু স্ট্যালিনের কূটকৌশলে তিনি হেরে যান। ১৯২৭ সালে ট্রটস্কিকে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয়। তারপর থেকে দেশত্যাগ করেন। মেক্সিকোতে তিনি বসবাস শুরু করেন। ১৯৪০ সালে সম্ভবত স্ট্যালিনেরই কোনো গুপ্তঘাতক তাকে হত্যা করে।

১৯৩৬ সাল থেকে স্ট্যালিন শুরু করেন গণহত্যা। সামান্য সন্দেহের বশে লোকজনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে স্ট্যালিনের চ্যালা-চামুন্ডুরা।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। দশ লক্ষের বেশি মানুষকে সাইবেরিয়ার গুলাগে নির্বাসন দেওয়া হয়।

মামুন বললো, "ছিঃ একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এভাবে অনর্থক মানুষ হত্যা? সমাজতন্ত্রের মহান(!) কমরেডরা পারেও বটে!"

কিছু অর্থনৈতিক মুক্তি:

১৯২২ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে একটা ব্যাপার ইতিবাচক হয়েছিলো। সেটা হলো শিল্পায়িতকরণ। যদিও সেই শিল্পায়িতকরণ ছিলো লাখ লাখ কৃষক ও মেহনতী জনতার শ্রমের বিনিময়ে।

সমস্ত কৃষিজমিকে রাষ্ট্রের মালিকানায় এনে, ব্যক্তি সম্পদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে ভারী শিল্পে উন্নতি ঘটিয়েছিলো রাশিয়া। কোনো কৃষক জমি দিতে রাজি না হলেই তার উপর চলতো পাশবিক নির্যাতন। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা ছিলো ডালভাত।

বাধ্য হয়ে লোকজন সরকারি শিল্প-কারখানায় কাজ করতো। সরকারিভাবে পৃথিবীর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় সোভিয়েত রাশিয়ায়। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এ পরিকল্পনার আওতায় রাশিয়াতে ব্যাপক শিল্পোৎপাদন হয়। পুঁজিবাদী বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিশ্বমন্দা রাশিয়াকে স্পর্শ করতে পারেনি।

মহামন্দা যেহেতু রাশিয়াকে স্পর্শ করতে পারেনি, এজন্য বিভিন্ন দেশে দেশে রাশিয়ার কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়।

****

মহামন্দার যত সব চাঞ্চল্যকর সংবাদ ও অস্থির পৃথিবী
পর্ব-২১

আজকে আলাপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো মামুন। জিজ্ঞেস করলো যে জারিফ, তুমি তো বললে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার পৃথিবীতে সমশক্তির দেশ ছিলো বেশ কয়েকটি। আমার একটা ব্যাপারে আজ জানতে ইচ্ছে করছে তা হলো আমেরিকা কিভাবে পরাশক্তির মর্যাদা পেলো? কারণ, আমি তো জানি ১৮২৩ সালে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো-বিশ্বরাজনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য একটি নীতি গ্রহন করেছিলেন, যার নাম হচ্ছে – মনরো ডকট্রিন। এ নীতি অনুসারে আমেরিকা ইউরোপীয় শক্তিদেরকে হুমকি দিয়েছিলো, আমেরিকার ভূ-খন্ডে ইউরোপীয়রা যাতে আর কোনো উপনিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা না করে, আমেরিকাও ইউরোপের কোনো নীতির ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। এভাবে আমেরিকা বিশ্ব রাজনীতি থেকে দূরে থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্নতার নীতি গ্রহন করে।

কি এমন হলো যে আমেরিকা বিশ্ব রাজনীতিতে প্রবেশ করলো এবং পরাশক্তির ভূমিকা পালন করলো? ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলো।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে চরম অভিজ্ঞ জারিফ এবার তার বয়ান শুরু করলো। বললো, তোমার কথা পুরোটাই ঠিক। মনরো ডকট্রিনের কারণে আমেরিকা বিশ্বের জঞ্জাল থেকে দূরে থেকে নিজের উন্নতি সাধন করে। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার ১৩টি কলোনী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ডাক দেয়। সে কাহিনী আমি **'গল্পে গল্পে বিশ্বভ্রমণ'**-বইয়ে বলেছি। মনে রেখো, ১৩টি কলোনী ছিলো খুব ছোট ছোট। তুমি মানচিত্র নিয়ে বসলে দেখবে ১৩টি কলোনীই আমেরিকার পূর্ব উপকূল তথা আটলান্টিকের তীরে অবস্থিত। আমেরিকা কিন্তু খুব ছোট্ট দেশ ছিলো যখন ১৭৮৩ সালে তারা স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু ইউরোপের এক ঘনঘটা আমেরিকান জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়।

নেপোলিয়ানের উত্থান আমেরিকার জন্য আশীর্বাদঃ

১৭৯৯ সাল থেকেই ফ্রান্সের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন সম্রাট নেপোলিয়ান। পুরো ইউরোপ তখন নেপোলিয়ানের ভয়ে তটস্থ। তুমি হয়তো জানই, আমেরিকা ভূ-খন্ডে বিশাল এক ভূ-খন্ডের মালিক ছিলো ফ্রান্স। লুইজিয়ানা প্রদেশটির মালিক ছিলো ফ্রান্স। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে (১৭৫৪-১৭৬৩) ফ্রান্স যখন ব্রিটেনের কাছে হেরে যায়, এই প্রদেশটি ফ্রান্সের কাছ থেকে কেড়ে স্পেনকে দেওয়া হয়। কিন্তু নেপোলিয়ান ক্ষমতায় বসেই স্পেনের কাছ থেকে লুইজিয়ানা দখল করেন। ব্রিটেনের সাথে নেপোলিয়ানের যুদ্ধ লেগেই থাকতো। নেপোলিয়ান ভাবলেন, এত দূর থেকে আর কলোনী শাসন করা সম্ভব নয়, তার চেয়ে বরং আমেরিকার কাছে

বিক্রি করে দেই। তাই হলো অবশেষে। ১৮০৩ সালে লুইজিয়ানা প্রদেশটি বিক্রি করে দিলেন নেপোলিয়ান। লুইজিয়ানা প্রদেশটির আয়তন ছিলো প্রায় ২১ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। ১৪টি বাংলাদেশের সমান। এক ধাক্কায় আমেরিকার আয়তন অনেক বেড়ে গেলো। বর্তমানে অবশ্য লুইজিয়ানা প্রদেশটি এত বড় নয়। ১১টির মতো রাজ্য হয়েছে লুইজিয়ানা ভেঙে।

নেপোলিয়ানের ধাক্কায় স্পেন দুর্বল হয়ে গেলো দিনদিন। যদিও নেপোলিয়ানের পতন হয় ১৮১৫ সালে ওয়াটারলুর যুদ্ধে, স্পেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। বর্তমান আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ছিলো স্পেনের দখলে। বর্তমান ক্যালিফোর্নিয়া, মনটানা, নেভাদা, টেক্সাসসহ বিস্তীর্ণ এলাকা শাসন করতো স্পেন। ১৮২০ সালের পর থেকে আমেরিকা ভূ-খণ্ডে থাকা স্পেনের পুরো কলোনী স্বাধীন হতে চাইলো। স্বাধীনতার এই ঢেউ স্পেন বাধা দিতে পারলো না। মেক্সিকোসহ পুরো মধ্য আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা স্পেনের কাছ থেকে স্বাধীন হয়ে গেলো। স্পেনের দখলে রইলো কেবল ফিডেল ক্যাস্ট্রোর দেশ কিউবা।

কিন্তু এখানে ঘটলো আরেক বিপত্তি। স্পেন চলে যাওয়ার পর মাথা তুলে দাঁড়ালো মেক্সিকো। আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দখল করলো এবার মেক্সিকো। কিন্তু মেক্সিকোর মাতব্বরী আমেরিকা মানবে কেন? ১৮৪৬-৪৮ সালে আমেরিকা বনাম মেক্সিকো যুদ্ধে মেক্সিকো শোচনীয় পরাজয় বরণ করলো। পুরো পশ্চিম উপকূল আমেরিকার দখলে এলো। মেক্সিকো দেশটাকেই দখল করতে পারতো আমেরিকা। কিন্তু তা আর করেনি। আমেরিকা আয়তনে হয়ে গেলো বিশাল এক দেশ।

এরপর আমেরিকার ইতিহাস কেবল সম্পদ বানানোর ইতিহাস। কোনো ঝামেলা নাই, আমেরিকানরা ধুমসে কাজ করে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কেবল ১৮৬১-৬৫ সালে গৃহযুদ্ধের টালমাটাল সময়টুকু ছাড়া আমেরিকার ইতিহাস একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট। ১৮৬৭ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা ক্রয় করে। স্পেনের কাছ থেকে ফ্লোরিডা ক্রয় করে। আমেরিকা ১৮৭২ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রের খেতাব অর্জন করে। আমেরিকানদের সুখ আর সমৃদ্ধির সামনে কোনো দেশের সাথেই তুলনা চলে না।

কিউবাকে নিয়ে ১৮৯৮ সালে স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধঃ

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দেশ কিউবাকে নিয়ে পুরো পৃথিবীর বাম রাজনীতিবিদদের মনে রোমান্টিসিজমের কোনো অন্ত নাই। মার্কসবাদ,লেনিনবাদের পূজারীদের চোখে কিউবা সাক্ষাৎ স্বর্গ। কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বামদের কাছে স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক দেবদূত। কুখ্যাত ‘গুয়ানতানামো বে’

কারাগারটির অবস্থানের জন্যও কিউবা বিখ্যাত। আমেরিকার ফ্লোরিডা উপকূল থেকে মাত্র ৯০ কিলোমিটার দূরে বর্তমান কিউবার অবস্থান। প্রায় ১০ লক্ষ স্পেনীশ জনগোষ্ঠী কিউবাতে বসতি স্থাপন করেছে। মেক্সিকোর মতো কিউবাও হয়ে উঠেছিলো স্পেনীশ ভাষা ও সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল।

স্পেনের অধীনে প্রায় ৪০০ বছর একটি পরাধীন দেশ হিসেবে শাসিত হয় কিউবা। দাস ব্যবসার এক জঘন্য স্থান ছিলো কিউবা। অবশ্য পুরো আমেরিকা মহাদেশেই তো আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদেরকে ধরে নিয়ে দাস বানানোর কাজ করেছে ইউরোপীয়রা। চিনি শিল্পের জন্য কিউবা খুব বিখ্যাত। ১৮৪০ সালে দেখা যায়, প্রায় ৪ লক্ষ ৩০ হাজার দাস চিনি উৎপাদনে জড়িত ছিলো। ১৮৩০ সালের দিকে আমেরিকার ভূ-খণ্ড থেকে অনেক দেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও কিউবাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ স্পর্শ করেনি। দাসদেরকে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে গড়ে উঠা ধনিক শ্রেনিদের কেউ কেউ আমেরিকার সাথেও যুক্ত হতে চাইলো। কিন্তু আমেরিকার মাটি থেকে ১৮৬৩ সালে দাসপ্রথা নির্মুল হলে সে সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়। ১৮৬৮ সাল থেকে কিউবাতে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। প্রায় ১০ বছর ব্যাপী চলা যুদ্ধে কোনো ফল আসেনি। ২ লক্ষ লোক মারা যায় এই দশ বছরের যুদ্ধে। কিউবার অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়ে।

এই ঘটনায় আমেরিকা কিউবার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিউবাতে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করে কিউবার চিনি ও তামাক শিল্প বাঁচিয়ে তুলে আমেরিকানরা। সে তুলনায় শাসক হয়েও স্পেন কিছুই করতে পারে নি। এবার স্পেন ক্ষিপ্ত হয়ে ১৮৯৪ সালে কিউবা ও আমেরিকার মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করে। স্পেনের এই পদক্ষেপে আমেরিকা ও কিউবা উভয়েই অসন্তুষ্ট হয়। কিউবানরা অস্ত্র হাতে তুলে নেয় স্পেনের বিরুদ্ধে। আমেরিকাও এই যুদ্ধে জড়ানোর অজুহাত খুঁজতে থাকে। একটি মার্কিন রণতরীর রহস্যময় ডুবে যাওয়াকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ১৮৯৮ সালে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসে এটা স্পেনীশ-আমেরিকান যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্পেন কিউবা ছেড়ে চলে যায় ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বরে। আমেরিকান বাহিনী তিন বছর কিউবাতে অবস্থান করে। নতুন সংবিধান রচিত হয়। ১৯০২ সালের মে মাসের ২০ তারিখ স্বাধীন দেশ হিসেবে কিউবার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

আর স্পেনকে পরাজিত করে আমেরিকা সারা পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষ প্রথমবারের মতো বুঝতে পারলো, আটলান্টিকের ওপারে ক্ষমতার নতুন ভরকেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকা আর বিশ্ব রাজনীতি থেকে নিরপেক্ষ থাকলো না। আমেরিকান জনগণের মনে অনুভূতি তৈরী হলো যে তারাও পৃথিবীতে মাস্তানি করতে পারে। আমেরিকানদের সেই মাস্তানি আজ অব্দি চলছে। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা ভালোমতেই জড়িয়ে পড়ে। তবে আমেরিকান

জনগণের অনুভূতি নিয়ে সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিলো। চলো, এবার সেই ইতিহাস পড়ি।

মামুন বললো, "তুমি কি আমাকে এবার সাংবাদিকতা শিখাবে নাকি?"

না, ব্যাপারটা তা নয়। মাঝে মাঝে ইতিহাসের মাঝে অন্য ব্যাপারেও গাল গপ্পো করতে হয়।

হলুদ সাংবাদিকতা ও পুলিৎজার পুরস্কারঃ

যারা সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশুনা করেছেন, তারা এবার একটু নড়েচড়ে বসুন। কিউবাকে কেন্দ্র করে ১৮৯৮ সালে স্পেন-আমেরিকার মধ্যকার যে যুদ্ধটা হয়েছিলো, তাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকতার ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে যা ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী।

মামুন বললো, "এমসিকিউ পরীক্ষায় এমন একটা প্রশ্ন আমি পেয়েছি যে পুলিৎজার পুরস্কার কিসের জন্য দেওয়া হয়? তুমি কি সেই পুলিৎজারের কথা বলবে?"

রাইট। আগে শোনো।

জোসেফ পুলিৎজার (১৮৪৭-১৯১১) ছিলেন একজন হাঙ্গেরীয়ান ইহুদী। আমেরিকায় ঢুকেন তিনি গৃহযুদ্ধের সময়ে। সাংবাদিকতা করা ছিলো তার নেশা। ছোটখাটো পত্রিকা চালিয়ে তিনি অবশেষে নিউইয়র্কে বসতি গড়েন। ১৮৮৩ সালে তিনি 'দ্যা নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার মালিক হন। নিজের জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাত ছিলো। তিনি সংগ্রামী মানুষের জীবন কাহিনী তুলে ধরতেন। অচিরেই তার পত্রিকা সবচেয়ে বেশি প্রচার সংখ্যার অধিকারী হয়। পুলিৎজার হয়ে পড়েন নিউইয়র্কের পত্রিকা জগতের মিডিয়া 'মোঘল'। কিন্তু তাকে অনুসরণ করছিলেন সাংবাদিকতা জগতের আরেক দিকপাল 'উইলিয়াম হার্স্ট'। ১৮৮৭ সালে তিনি নিউইয়র্ক আসেন। 'দ্যা নিউ ইয়র্ক জার্নাল' নামের পত্রিকাটি কিনে পুলিৎজারকে টেক্কা দিতে চাইলেন।

শুরু হলো পুলিৎজার বনাম হার্স্ট দ্বন্দ। দ্যা নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড বনাম দ্যা নিউ ইয়র্ক জার্নাল। পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্য সাংবাদিকতা জগতের দুই গুরু নোংরা যুদ্ধ শুরু করলেন। পুলিৎজারের পত্রিকা ছিলো ৮ পৃষ্ঠা; দাম ছিলো ২ সেন্ট। উইলিয়াম হার্স্ট তার পত্রিকাকে ১৬ পৃষ্ঠা বানিয়ে দাম রাখেন ১ সেন্ট। পুলিৎজারের পত্রিকায় কার্টুন আঁকতেন রিচার্ড আউটকাল্ট। হলুদ রংয়ের পোশাক পড়ে বাচ্চাদের মুখ দিয়ে খুব মুখরোচক কথা বলিয়ে নিতেন পুলিৎজার। হলুদ রংয়ের কার্টুনটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। উইলিয়াম হার্স্ট বেশি বেতন দিয়ে রিচার্ড আউটকাল্টকে নিয়ে আসেন তার পত্রিকায়। হলুদ রংয়ের কার্টুন এবার

ছাপা হতে লাগলো হার্স্টের পত্রিকায়। হলুদ রংয়ের কার্টুনকে কেন্দ্র করে দুই সাংবাদিকের এই দ্বন্দ পরবর্তীতে 'ইয়েলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা' নামে পরিচিতি লাভ করে। আজও ভুয়া ও রংচং মার্কা সাংবাদিকতা হলুদ সাংবাদিকতা নামে পরিচিত।

পুলিৎজার বনাম হার্স্টের দ্বন্দ নতুন রুপ পায় ১৮৯৮ সালে কিউবাকে কেন্দ্র করে। কিউবার হাভানা উপকূলে ১৮৯৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজে আগুন লেগে প্রায় ২৫০ জন নাবিক নিহত হয়। মার্কিন সরকারের নিযুক্ত তদন্তদল সিদ্ধান্ত দেয় যে, বিস্ফোরণটা ছিলো জাহাজের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার গোলযোগের ফল। এতে কারো কোনো হাত নেই। কিন্তু থামলেন না পুলিৎজার ও হার্স্ট। স্পেনকে দোষী সাব্যস্ত করে একটার পর একটা গালগল্প ছাপা হতে লাগলো তাদের দুই পত্রিকায়। কে কার চেয়ে বেশি মিথ্যা কথা বলে সংবাদকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে, এই প্রতিযোগিতা শুরু হলো। দুই পত্রিকার কাটতি ছিলো লাখ লাখ কপি। মার্কিন নাগরিক সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুললেন এই দুই সাংবাদিক। কেউ কেউ বলেন, স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য মার্কিন সরকারকে অহেতুক চাপ দেয়ার দায় এই দুই সাংবাদিকের। এই দ্বন্দ্বের একটা লাভ ছিলো-পত্রিকায় গুনগত মানের উন্নয়ন। তার আগে পত্রিকার শিরোনাম আর ভিতরের খবর একই ফন্টে লেখা থাকতো। পুলিৎজার শুরু করলেন চটকদার শিরোনাম, বোল্ড করে মনোযোগ আকর্ষণের নানা পদ্ধতি। তৎকালীন সময়ে সাংবাদিকরা ছিলো তারকার মতো। সাংবাদিকরা যা লিখতেন, লোকজন গোগ্রাসে সব গিলতেন।

কিন্তু মিথ্যার ইতিহাস আর কতদিন!

স্পেন-আমেরিকান যুদ্ধ শেষ হলে হলুদ সাংবাদিকতার বাজার নষ্ট হয়ে যায়। উইলিয়াম হার্স্ট পেশা বদল করে চলে গেলেন হলিউডে। আর পুলিৎজারের মনে অনুতাপ দেখা দিলো। কেন তিনি তার স্বপ্নের সাংবাদিকতা পেশাটাকে কলুষিত করতে গেলেন, এই ভাবনা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিলো। পরে তিনি ২ মিলিয়ন ডলার দান করেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাংবাদিকতা পেশা নিয়ে কোর্স চালু করেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯১১ সালে মারা যান পুলিৎজার। আর ১৯১৭ সাল থেকে পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। পুলিৎজার হচ্ছে সাংবাদিকতার সবচেয়ে সন্মানজনক পুরস্কার। তবে, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবদানের জন্যও এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এ পুরস্কারের একটা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, পুরস্কারগুলো কেবল আমেরিকা ভিত্তিক পারফরম্যান্সের উপর দেয়া হয়। যার জন্য বিশ্বের অন্যান্য এলাকার লোকজন পুরস্কারটা পায় না। তবে, সাংবাদিকতার ইতিহাসে পুলিৎজার একজন নমস্য ব্যক্তি।

পর্ব-২২

জারিফ বললো, আমেরিকার ইতিহাস নিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বলার মতো কিছুই নাই। কারণ আমেরিকা তখনও বিশ্ব রাজনীতির ডামাডোল থেকে অনেক দূরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কিভাবে আমেরিকা জড়িয়ে গেলো তার বর্ণনা আগেই দিয়েছি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা প্রথমেই বিশ্ব রাজনীতিতে অংশ নিতে শুরু করে। আর আমেরিকার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছিলো অবিশ্বাস্য। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের শেষে আমেরিকা ছিলো পুরো বিশ্বের কাছে ঈর্ষণীয়।

মামুন বললো, "আমি অনেক আগে থেকেই বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের মহামন্দার ব্যাপারে অনেক কিছু শুনেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে বিস্তারিত ধারণা নেই আমার। আমেরিকার লোকজন আচমকা পথের ফকির হয়ে পড়েছিলো। যে আমেরিকা প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপকে পথের দিশা দেখিয়েছিলো, টাকার বস্তা নিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপকে অর্থনৈতিকভাবে বলীয়ান করার যে উদারত দেখিয়েছিলো তা নজিরবিহীন। কিন্তু কি এমন হলো যে,আমেরিকা ১৯২৯ সালে নিজেই পথের ফকির হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো?"

জারিফ বললো, "আসলে আমেরিকা পথের ফকির হওয়ার মতো দশায় পড়েনি সেসময়। তবে একটি ঘটনায় আমেরিকার মধ্যবিত্ত হঠাৎ গরীব হয়ে পড়ে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে শেয়ারবাজারে টাকা বিনিয়োগ করেছিলো। কিন্তু সেই শেয়ারবাজারের পতন হয় আচমকা। মধ্যবিত্ত শ্রেণির টাকা গায়েব হয়ে যায়। তার প্রথম প্রভাব পড়ে ব্যাংকে। তারপর একে একে অর্থনীতির সব সূচকে ধস নামে। পুরো আমেরিকা হয়ে এই মন্দা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এশিয়া-আফ্রিকার হতদরিদ্র দেশ থেকে এই মন্দার কবলে পড়ে ইউরোপ আমেরিকার উন্নত দেশগুলি।"

চলো আমরা বিংশ শতাব্দীর সেই নজিরবিহীন ঘটনার দিকে আলোকপাত করি।

মন্দা-পূর্ববর্তী আমেরিকা :

আমেরিকার শেয়ার বাজার আমাদের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মতো ফটকা ব্যবসায় ছিলো না। আমাদের এক সময়ের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের একসময় তিরস্কার করেছিলেন এই বলে যে তোমরা কেন এই ফটকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করো?

কিন্তু আমেরিকান মধ্যবিত্ত কেন শেয়ারবাজারে এভাবে গণহারে টাকা বিনিয়োগ করছিলো সেটা বুঝতে হলে আমাদেরকে আমেরিকার অর্থনীতির অবস্থা ও মধ্যবিত্ত আমেরিকার জীবন মান সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে?

Artificial boom :

জারিফ বললো, "পৃথিবীর ইতিহাসের যে কোনো অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ে আলোচনা করার সময় তোমাকে মনে রাখতে হবে, এই মন্দার পূর্বে এমন একটা তেজি ভাব ছিলো, যেটা আসলে বাস্তবিক ছিলো না। তেজি ভাবটা ছিলো মেকি; এই মেকি তেজিভাবকে আমরা বলতে পারি – Artificial boom. "

বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে ধস নামার পূর্বে দেখা গিয়েছিলো শেয়ার বাজারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা নিয়ে গণ হিস্টিরিয়া আরম্ভ হয়েছিলো।

আর অর্থনীতির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে ফ্রি-তে কোনো জিনিস পেতে নেই। যদি তুমি কোনো জিনিস ফ্রিতে পাও, তাহলে ধরে নিতে হবে এর মধ্যে কোনো না কোনো ভেজাল আছে, যেটা আজ হোক-কাল হোক উদ্ঘাটিত হবে।

আমেরিকাতেও এরকম একটা 'Artificial boom' ছিলো। সেই মেকি তেজিভাবটা ছিলো শেয়ারবাজারের বিনিয়োগ করাকে কেন্দ্র করে। আমেরিকান মধ্যবিত্ত পাগলের মতো শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করে এই তেজিভাবটা সৃষ্টি করেছিলো।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "এই পাগলের মতো বিনিয়োগ করার পিছনে নিশ্চয়ই কিছু কারণ ছিলো? কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ বা লোভের মোহে না পড়লে কেউ এই বিনিয়োগ করতো না"

জারিফ উত্তর দিলো, ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে আমেরিকার অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠে। যুদ্ধের পরে প্রত্যেকটা ইউরোপীয়ান পরাশক্তি বিধ্বস্ত হয়। আমেরিকা সবাইকে লোন দিয়ে তাদের পুনর্গঠনে সাহায্য করে।

১৯১৯-১৯২৯ এই দশ বছরে আমেরিকার অর্থনীতির উন্নতি আজও পুরো বিশ্বের কাছে বিস্ময়। জিডিপি দ্বিগুন হয়ে পড়ে। আমেরিকান সমাজে বেকারত্ব একদম দৃশ্যমান ছিলো না।

Roaring 20s :

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে হঠাৎ যেন কি এক ভোজবাজিতে বদলে যায় আমেরিকা। ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, রেডিও, ওভেনসহ বাজারে নানা পণ্যে সয়লাব হয়ে যায় আমেরিকার বাজার। লোকজনের হাতে প্রচুর টাকা জমেছে। অফিস থেকে বেরিয়ে নির্বাক মুভি দেখতে লোকজন সিনেমায় যাচ্ছে। চার্লি চ্যাপলিন তখন আমেরিকান বিনোদন জগতের অবিসংবাদিত সম্রাট। সংগীতে তখন নতুনত্বের ছোঁয়া।

ভোক্তাদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বাজারে বিবিধ ইলেকট্রিক পণ্যের বিক্রি তুঙ্গে। ভোক্তা চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় শিল্প উৎপাদন দ্বিগুন। শিল্প উৎপাদন দ্বিগুন মানে বেশি কর্মসংস্থান।

১৯১৯ সালে আমেরিকাতে গাড়ির সংখ্যা ছিলো ৬০ লক্ষ, ১৯২৯ সালে সেই সংখ্যাটা দাঁড়ায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ।

বিশাল বিশাল দালান মাথা উঁচ করে দাঁড়াতে শুরু করলো নিউইয়র্ক নগরীতে। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ও রকফেলার সেন্টার সে সময়েই নির্মিত হয়েছিলো।

সারা পৃথিবী যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা, সেখানে আমেরিকান নারী-পুরুষ মনের আনন্দে ঘুরছে আর টাকা খরচ করছে।

এতসব ঠিক ছিলো। যার কাছে টাকা থাকবে, তার মন চায় আনন্দ করুক তাতে কার কি?

সমস্যাটা হলো, নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিছু টাকা বিনিয়োগ করা শুরু করলো।

শেয়ার বাজারে ইনভেস্ট করলে তো ভারী মজা!

টাকা দিয়ে শেয়ার কিনো তারপর দাম বেড়ে গেলে শেয়ার বিক্রি করে দাও। বসে বসে টাকা ইনকাম। এই খবর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো পুরো আমেরিকায়। আমেরিকার সর্বস্তরের জনগণ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

ব্যাংকগুলো শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীদের ঋন দেওয়া শুরু করলো। শেয়ার বাজারের উত্থান তখন দেখে কে! ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে জনগণ কিনলো শেয়ার, আর শেয়ার বাজার থেকে অর্জিত মুনাফা দিয়ে সেই ব্যাংকের লোন পরিশোধ করছিলো।

শেয়ার বাজারকে এজন্যই ফটকা বাজার বলা হয় কারণ শেয়ারের দাম পড়ে গেলে কি হতে পারে এটা নিয়ে যেন কারো কোনো মাথাব্যাথা নাই। সবাই আছে- শেয়ারবাজারের লাভ নিয়ে।

শেয়ারবাজার হয়ে পড়ে সস্তায় টাকা কামানোর মেশিন।

১৯২৯ সালে প্রায় ৪০ লক্ষ আমেরিকান শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেছিলো।

কিন্তু আর কতদিন?

আমেরিকায় যেখানে রকেট গতির অর্থনীতি, সেখানে ইউরোপ সহ পুরো বিশ্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঝাপটা বিরাজমান। জার্মানি হয়ে গেলো দেউলিয়া। ইউরোপ ছিলো আমেরিকান অর্থনীতির প্রধান বাজার। ইউরোপে আমেরিকান পণ্যের

চাহিদা গেলো কমে। সেই প্রভাবে আমেরিকায় শিল্প উৎপাদন কমতে শুরু করলো। আমেরিকার অভ্যন্তরেও ভোক্তা চাহিদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছার পর কমতে শুরু করলো। শিল্পের কাঁচামাল যোগাতো আমেরিকান কৃষকগণ। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মুল্য আর পেলো না। কৃষি এবং শিল্পখাত একসাথে সংকুচিত হতে শুরু করলো চাহিদার অভাবে।

কথা হচ্ছে, অর্থনীতি একটা চক্র মেনে চলে। নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারে শিল্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনেই টাকা কামাচ্ছিলো জনতা। অর্থনীতির অ-না বোঝা এসব জনতার দরকার কাঁচা টাকা। এত বিশ্লেষণের দরকার নেই। শেয়ার বাজারের এসব অবস্থা বোঝার আগেই শেয়ারের দাম কমতে শুরু করলো। লোকজন ভাবলো, আর কিছুদিন সবুর করি। দামটা বাড়ুক, তারপর না হয় শেয়ার বেচে দেবো। কিন্তু হায় হায়! দাম খালি কমতেই লাগলো। শুরু হলো আতংক।

পর্ব-২৩

২৪ অক্টোবর-১৯২৯-Black thrusday-

বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে এক স্বরণীয় দিন। নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে একদিনে ১ কোটি ২৯ লক্ষ শেয়ারের হাতবদল হলো। শেয়ারের দাম পড়ে গেলো। লাখ লাখ লোক দেউলিয়া হয়ে গেলো একদিনে। একদিনের ধাক্কায় এজন্য দেউলিয়া হলো যে, শেয়ারবাজারের বিনিয়োগ করা অংশটা ছিলো ব্যাংক থেকে ধার করা টাকা। এই যে শেয়ারের দাম পড়ে গেলো, এখন ব্যাংকলোন পরিশোধ করবে কিভাবে? শয়ে শয়ে লোক আত্মহত্যা করতে লাগলো।

আর অবশ্যই প্রথম কোপটা পড়লো ব্যাংকের উপরঃ

আগেই বলেছি ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া টাকার উপর ভিত্তি করেই চাঙ্গা হচ্ছিলো শেয়ারবাজার। শেয়ারবাজার পড়ে যাওয়ায় এখন ব্যাংকগুলোকে কে টাকা পরিশোধ করবে? ব্যাংকিং বিদ্যার সামান্য জ্ঞান যাদের আছে তারা জানেন আমেরিকায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা আমাদের দেশের মতো নয়। সোনালী ব্যাংকের ১৫০০ শাখা আছে সারাদেশে, কিন্তু আমেরিকায় শাখা ব্যাংকিং নেই, আমেরিকায় আছে একক ব্যাংকিং। কোনো একটা নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে একটা নির্দিষ্ট ব্যাংক। হঠাৎ শেয়ারবাজারের পতন হওয়ায় এসব ব্যাংককে সাহায্য করার কেউ ছিলো না। তাদের রিজার্ভেও অর্থ সঞ্চিত নেই।

রুজভেল্টের নিউ ডিল পলিসিঃ

বিশ্বমন্দার আঘাতটা ছিলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর চপেটাঘাত। ১৭৭৬ সালে আধুনিক অর্থনীতির জনক এ্যাডাম স্মিথের হাত ধরে পুঁজিবাদের যে ভিত্তি স্থাপিত

হয়েছিলো, তাকে একেবারেই নাড়িয়ে দিয়ে যায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল কথা ছিলো, অর্থনীতির গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হবে বাজারের চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে। সরকারের এখানে কোনো কিছু করার নেই।

তাই বিশ্বমন্দার কারণে আমেরিকান মধ্যবিত্ত যখন পথের ফকির হবার উপক্রম হয়, তখনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোভার সরকারের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করতে রাজি ছিলেন না।

১৯৩২ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন রুজভেল্ট। ১৯৩৩ সালে ক্ষমতা বুঝে পাওয়ার পর রুজভেল্টের উদ্দেশ্যে ছিলো তিনটি।

ইংরেজিতে বলা হয় 'Relief,Recovery and Reform.'

এসব উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্য ১০০ দিনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়।

ক. চরম দরিদ্র ও কর্মহীন লোকদেরকে আয়ের সংস্থান করা। কারণ বেকারত্বের হার চরমে পৌঁছেছিলো। ১৯৩২ সালে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের হাতে কোনো চাকরি ছিলো না।

খ. অর্থনীতির নন-ব্যাংকি খাত তথা-কৃষি এবং ঘরবাড়ি নির্মানের মাধ্যমে অর্থনীতির চাকাকে চাঙ্গা করা।

গ. অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরিবর্তন করা। যে কারণে এই মন্দা সংঘটিত হয়েছে, তা থেকে উত্তরণ লাভের চেষ্টা করা।

রুজভেল্টের নিউ ডিলের মূল কথা হলো, নাগরিকের যেকোনো ধরণের নিরাপত্তা বিধানে রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে। সবকিছু বেসরকারি খাতের উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক না।

১৯৩৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা আইন পাশ হয়। কর্মীরা অবসরে গেলে বা চাকরি হারালে ফেডারেল সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য পাবেন।

রুজভেল্টের গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যানমূলক পদক্ষেপের কারনে আমেরিকার অর্থনীতিতে গতি ফিরে আসে। ১৯৩৮ সালে আমেরিকা আবার আর অর্থনীতির চাকাকে সচল করতে সচেষ্ট হয়।

উত্থান ঘটলো হিটলার ও মুসোলিনীর

পর্ব-২৪

পরাবাস্তব পৃথিবী: বাইরে শান্তি ভিতরে অশান্তির আগুন:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ংকরী ধ্বংসলীলার পর প্যারিসে প্রায় বছরখানেক (জানুয়ারি-১৮, ১৯১৯ থেকে জানুয়ারি ২১, ১৯২০) ধরে যে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো, সেই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যেই ছিলো পৃথিবীতে যাতে আর কোনোদিন কোনো যুদ্ধ না হয়। কিন্তু খুব আফসোসের বিষয় হলো- প্যারিস শান্তি সম্মেলন সেই কাঙ্খিত শান্তি আনতে পারেনি। বরং বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছিলো। ধীরে ধীরে আমরা বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক নিয়ে আলোকপাত করবো। ত্রিশের দশকের ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মাঝে লুকিয়ে ছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির ঘটনা। এ পর্যায়ে আমরা ইতালি নিয়ে আলোকপাত করবো।

ইতালিতে ফ্যাসিস্ট একনায়ক বেনিতো মুসোলিনীর উত্থান:

জারিফ আলোচনার শুরুতেই বললো, ‘‘মামুন, তুমি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই ইতালির দ্বিচারিতার দিকে নজর দাও। ইতালি মূলত ছিলো জার্মানীর পক্ষে। কিন্তু যুদ্ধের শুরুর দিকে সে নিরপেক্ষ থাকার ভান ধরে। আসলে ইতালি হিসাব কষছিলো যে কোন পক্ষে গেলে তাদের সুবিধা হবে। তুরস্কের উসমানীয় খেলাফতের প্রতি অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন ইতালি তুরস্কের জমি দখল করার উছিলা খুঁজছিলো। তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলো যখন পুরো উত্তর আফ্রিকা গ্রাস করলো, তখন ইতালিও সেই দলে যোগ দিতে তৎপর হলো। উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া দখল করলো ফ্রান্স, মিশর ও সুদান দখল করলো ব্রিটেন। সুযোগ বুঝে লিবিয়া দখল করলো ইতালি ১৯১১ সালে। অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাকে বাধা দেয় নি।’’



চিত্র ১৮ : প্যারিস শান্তি সম্মেলনে মিত্র শক্তির ভাগবাটোয়ারায় অসন্তুষ্ট হয় ইতালিয়ানরা। সেই অসন্তোষকে পুঁজি করে উত্থান ঘটে ফ্যাসিস্ট একনায়ক বেনিতো মুসোলিনীর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে জার্মানী আর তুরস্কের দোস্তি অবিচ্ছেদ্য, তখন ইতালি বুঝে নিলো শত্রুভাবাপন্ন তুরস্কের দলে যোগ দিলে তার কোনো লাভ হবে না। তাই সে ব্রিটেন ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়লো। তারপরের কাহিনী তো সবার জানা।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ইতালি যোগ দিয়ে জার্মানীর অপর মিত্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অনেক ভূমি জোর করে দখলে নিতে চাইলো। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ছিলেন চরম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। তিনি ইউরোপীয়দের এসব ডাকাতিকে প্রশ্রয় দিতে চাইলেন না। ইতালি কিছুই পেলো না প্যারিস শান্তি সম্মেলনে। বলাই বাহুল্য ইতালির জনগণ ক্ষুব্ধ হলো প্যারিস শান্তি সম্মেলনের এসব সিদ্ধান্তে। ইতালির জনগণের সেই ক্ষোভের পরিণতিতে দেশে অশান্তি শুরু; আর ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনীর জন্ম।

মুসোলিনীর জন্ম ১৮৮৩ সালে। চরম দারিদ্রের মধ্যেই কেটেছে তার শৈশব। বড় হয়ে ইতালির সোশালিস্ট পার্টিতে যোগ দিন। পত্রিকায় কাজও করেন। রাশিয়ার পর সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম ঘাঁটি ছিলো ইতালি। ইতালির সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধে যোগ দিতে প্রচার চালায়। এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে মুসোলিনীর সাথে তার সোশালিস্ট পার্টির ভাঙ্গন শুরু হয়।



চিত্র ১৮ : প্যারিস শান্তি সম্মেলনে মিত্র শক্তির ভাগবাটোয়ারায় অসন্তুষ্ট হয় ইতালিয়ানরা। সেই অসন্তোষকে পুঁজি করে উত্থান ঘটে ফ্যাসিস্ট একনায়ক বেনিতো মুসোলিনীর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে জার্মানী আর তুরস্কের দোস্তি অবিচ্ছেদ্য, তখন ইতালি বুঝে নিলো শত্রুভাবাপন্ন তুরস্কের দলে যোগ দিলে তার কোনো লাভ হবে না। তাই সে ব্রিটেন ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়লো। তারপরের কাহিনী তো সবার জানা।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ইতালি যোগ দিয়ে জার্মানীর অপর মিত্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অনেক ভূমি জোর করে দখলে নিতে চাইলো। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ছিলেন চরম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। তিনি ইউরোপীয়দের এসব ডাকাতিকে প্রশ্রয় দিতে চাইলেন না। ইতালি কিছুই পেলো না প্যারিস শান্তি সম্মেলনে। বলাই বাহুল্য ইতালির জনগণ ক্ষুব্ধ হলো প্যারিস শান্তি সম্মেলনের এসব সিদ্ধান্তে। ইতালির জনগণের সেই ক্ষোভের পরিণতিতে দেশে অশান্তি শুরু; আর ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনীর জন্ম।

মুসোলিনীর জন্ম ১৮৮৩ সালে। চরম দারিদ্রের মধ্যেই কেটেছে তার শৈশব। বড় হয়ে ইতালির সোশালিস্ট পার্টিতে যোগ দিন। পত্রিকায় কাজও করেন। রাশিয়ার পর সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম ঘাঁটি ছিলো ইতালি। ইতালির সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধে যোগ দিতে প্রচার চালায়। এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে মুসোলিনীর সাথে তার সোশালিস্ট পার্টির ভাঙ্গন শুরু হয়।

মামুন বললো, ''বিশ্বের অধিকাংশ মার্কসবাদী, সমাজতন্ত্রীরাই একটা বয়সে মহা শয়তানে পরিণত হয়। মুসোলিনীর অবস্থা কি সেই রকমই ছিলো?''

জারিফ বললো, অবশ্যই। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রীদের কাজকর্ম নিয়ে হাজার হাজার পৃষ্টা বই লেখা যাবে। এক জীবনে মহা সাধু পুরুষ সাজে, কয়েক বছর পর হয় নিকৃষ্ট পুঁজিবাদীর চেয়েও খারাপ।

মুসোলিনীর দল বললো, ''ইতালির উচিত নয় প্রথম মহাযুদ্ধে জড়ানো।'' কিন্তু মুসোলিনী বললো, ''ইতালি অবশ্যই ব্রিটেন-ফ্রান্সের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে এবং তার প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনবে।'' যাক শেষমেষ ইতালি যুদ্ধে জড়ালো এবং মুসোলিনী একজন সৈনিক হয়ে যুদ্ধে অংশ নিলেন। যদিও ইতালির যুদ্ধে জড়ানোর পিছনে মুসোলিনীর কোনো হাত নেই। মুসোলিনী ছিলেন একটা পত্রিকার সামান্য কলাম লেখক।

কিন্তু দলের সাথে বিতর্কের জেরে মুসোলিনী সোশালিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। তারপর থেকে ইতালির রাজনীতিতে মুসোলিনীর আবির্ভাব যেন এক ঝড়ের মতো। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি হয়ে যান এক ডিক্টেটর।

১৯১৯ সালে ব্ল্যাক শার্ট নামে এক সমর্থক গোষ্ঠ তৈরী করেন। অল্প কয়েকজন ছিলো তার সদস্য। এই অল্পসংখ্যক সমর্থকদের নিয়েই তিনি 'ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টি' নামে এক দল গঠন করেন ১৯২১ সালে। তারপর থেকেই নতুন ইতিহাস শুরু ইতালির। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি অস্থিতিশীলতা তখন ইতালির নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

বামপন্থীদের নিয়ে গঠিত সরকারের প্রতি কোনো আস্থা নেই জনগণের। রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল রাজনৈতিক দলগুলোর এসব কর্মকাণ্ডে বিরক্ত।

১৯২২ সালঃ রোম অভিমুখে মুসোলিনীর লংমার্চ ও ক্ষমতা দখল -

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ঘটনা এই যে মাত্র এক বছর আগে একটা দল গঠন করে মুসোলিনী চল্লিশ হাজার সমর্থক নিয়ে রোম যাত্রা করেন। মুসোলিনী ছিলেন অত্যন্ত সুবক্তা। ইতালির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জনগণকে স্বরণ করিয়ে তিনি মুহুর্তেই উত্তেজিত করে দিতেন সমবেত জনতাকে। কোনো নির্বাচন নাই, বিপ্লব নাই, শুধুমাত্র একটা লংমার্চের উপর ভিত্তি করে রীতিমতো সাড়া ফেলে দেন মুসোলিনী। রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল তাকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসার আমন্ত্রণ জানান। একটা লংমার্চ করেই মুসোলিনী হয়ে যান ইতালির প্রধানমন্ত্রী। এ এক নজীরবিহীন ঘটনা বিশ্বে। অবশ্য ইতালির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনেকটা দায়ী। ইতালির লোকজন একজন স্ট্রংম্যান খুঁজছিলো, যিনি ইতালির গৌরব

ফিরিয়ে আনেন। মুসোলিনীর অনুগত ব্ল্যাকশার্ট বাহিনী জনগনকে ভয় দেখিয়ে, বিরোধী মতকে দমন করে একনায়কতন্ত্রের যুগকে ফিরিয়ে আনেন।

ঠিক এমন অবস্থায় ১৯২৪ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়। একদম বাংলাদেশী স্টাইলে নির্বাচন যাকে বলে! দুই-তৃতীয়াংশ আসনে মুসোলিনী নির্বাচিত হন। বিরোধীরা প্রার্থীই দিতে পারেনি ঠিকঠাকমতো। মুসোলিনীর অনুগত ব্ল্যাকশার্ট বাহিনী পুরো ইতালিতে ভয়ের রাজত্ব কায়েম করে। সব দলকে বিলুপ্ত করে ১৯২৫ সালে মুসোলিন হয়ে যান 'দ্যা গ্রেট ডিক্টেটর'। ইতালিয়ানরা মুসোলিনীকে ডাকতে শুরু করে এল দুচে; যার বাংলা অর্থ 'নেতা'।

১৯২৫ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত মুসোলিনীর দুর্দান্ত দাপটে কাঁপতো পুরো ইতালি।

পর্ব-২৫

মুসোলিনী-পূর্ব ইতালির সাম্রাজ্যবাদী রুপঃ

জারিফ বললো, যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিটলারের অন্যতম দোস্ত ছিলেন ইতালির ফ্যাসিস্ট একনায়ক-বেনিতো মুসোলিনী, তাই বেনিতো মুসোলিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়া একদম জরুরি। আর মুসোলিনী সম্পর্কে জানতে হলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী বিশ্বে ইতালির অবস্থান সম্পর্কে জানা জরুরি। আমরা এখন সেদিকটাতেই আলোকপাত করবো।

আমরা **'গল্পে গল্পে বিশ্বভ্রমণ'** বইয়ে ইউরোপের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করার বেলায় দেখেছি, পঞ্চদশ শতকেই ইউরোপে কিভাবে শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, স্পেন এবং পর্তুগাল এসব দেশগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের নেশায় বিশ্বজয়ের অভিযানে নামে। ইতালি ও জার্মানি ছিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দুই দেশ ছিলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত। তাই এই দুই দেশের পক্ষে অন্য দেশ দখল করে কলোনী বানানো আর হয়ে উঠেনি।

১৮৭০ সালে ইতালি আর ১৮৭১ সালে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয়। তারপর এই দুই দেশ উপলব্দি করে যে দখল করার মতো ভূ-খন্ড পৃথিবীতে খুব বেশি বাকী নেই। সারা পৃথিবী দখল করে বসে আছে ব্রিটেন-ফ্রান্স-স্পেন-হল্যান্ড ইত্যাদি গুটিকয়েক দেশ। জার্মানি পুরো বিশ্বের মাতব্বর হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়েই মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধায়। সে কাহিনী আগেই বলেছি। জার্মানি সবদিক দিয়ে শক্তিশালী হওয়ার কারণে সবকিছু উলটপালট করতে পেরেছিলো কিন্তু ইতালি ছিলো দুর্বল। সে না পারছিলো শক্তির দাপট দেখাতে, না পারছিলো অন্য ভূ-খন্ড দখল করতে। তুলনামুলক দুর্বল ইতালি নজর দিলো আরেক দুর্বলের দিকে। দুর্বল ইতালি তার

থেকে আরও দুর্বল তুরস্কের দখলে থাকা ভূমির দিকে নজর দিলো। ইউরোপের রুগ্ন মানুষ তুরস্ক একে একে তার জমি হারাচ্ছে পূর্ব ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে। এখানেও ইতালি খুব একটা সুবিধা করতে পারছিলো না। তুরস্কের কবল থেকে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি স্বাধীন হয়ে পড়লো, ফ্রান্স দখল করলো উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়া, ব্রিটেন দখল করলো মিশর। কেবলমাত্র উত্তর আফ্রিকার লিবিয়াতে তুরস্কের শাসন জারি ছিলো। তাই যেকোনো মূল্যে তুরস্কের কাছ থেকে লিবিয়া দখল করার জন্য হন্যে হয়ে উঠলো ইতালি। লিবিয়া দখল করা নিয়ে শুরু হলো ইতালি-তুর্কি যুদ্ধ (১৯১১)। এ যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে লিবিয়াতে ইতালির দখলদারিত্ব শুরু হয়। কিন্তু ইতালির বিরুদ্ধে অবিস্মরণীয় লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইতিহাস বিখ্যাত এক জবরদস্ত আলেম, কুরআনের পাখি এবং মর্দে মুজাহিদ। নাম তার উমর মুখতার।

কুরআনের সৈনিক উমর মুখতারঃ ইতালির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক অদম্য সিপাহসালার

জারিফ বললো, আজকের আলোচনার শুরুতেই আমি তোমাকে একটি মুভি দেখার জন্য অনুরোধ করবো। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হলে-এ মুভিটি দেখা ফরয। মুভিটির নাম-The lion of desert বা মরুভূমির সিংহ। লিবিয়ার কিংবদন্তীতুল্য সংগ্রামী নেতা উমর মুখতার এর জীবন কাহিনী অবলম্বনে মুভিটি নির্মিত।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অত্যাচার-নিপীড়ন নিয়ে মুভিরতো কোনো অভাব নেই, কিন্তু 'লায়ন অব ডেজার্ট' মুভিটি ব্যতিক্রম। কারণ, এখানে সাম্রাজ্যবাদী ইতালির দখল নিপীড়নতো দেখানো হয়েছেই, কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে উমর মুখতারের ব্যক্তিত্ব।



চিত্র ১৯ : উমর মুখতার ইতালিয়ান দখলদারদের হাতে জীবন দিলেন, কিন্তু কোনোক্রমেই আদর্শের সাথে আপোষ করেন নি।

১৯১১ সালের দিকে ক্ষয়িষ্ণু তুরস্কের শাসন বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই ইতালি লিবিয়াতে কয়েক লক্ষ সৈন্যের ঘাঁটি গড়ে তোলে। ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখ ইতালি তুরস্ককে আলটিমেটাম দেয় যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে লিবিয়ার মাটি থেকে সরে দাঁড়াতে। আলটিমেটাম ছিলো লোক দেখানো। যুদ্ধের পুরো প্রস্তুতি আগেই নিয়ে রেখেছিলো ইতালি। আজকের লিবিয়া তখন ত্রিপলিতানা ও সিরোনাইকা প্রদেশে বিভক্ত ছিলো।

বিমান বাহিনীর ইতিহাসে এ যুদ্ধের একটা অন্যরকম গুরুত্ব আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বিমান বাহিনীকে যুদ্ধে কাজে লাগানো হয় এ যুদ্ধে। ইতালির দখলে ছিলো তখন ৯টির মতো বিমান। যুদ্ধে ঘায়েল হয় তুরস্ক। ১৯১২ সালে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ শুরু হলে তুরস্ক আর লিবিয়া দখলে রাখার মতো কোনো পরিস্থিতিতে ছিলো না। বাধ্য হয়ে ইতালির সাথে শান্তি চুক্তি করে লিবিয়া ছেড়ে চলে যায় তুরস্ক। তাই ১৯১২ সাল থেকে লিবিয়ার হর্তাকর্তা হয়ে পড়ে ইতালি।

ইতালির জন্য বাধার বিন্ধ্যাচল হয়ে উঠলেন উমর মুখতারঃ

১৮৬২ সালে লিবিয়ার পূর্ব উপকূলে জন্ম হয় উমর মুখতারের। শৈশবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন কুরআনের হাফেয। লিবিয়াতে তখন সেনুসি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। দখলদার তুরস্কের বিরুদ্ধে লিবিয়ার লোকজনের অন্তহীন ঘৃণা, তাই ইতালিয়ানদের আগমনকে খুব বেশি অপছন্দ করেনি লিবিয়ার লোকজন।



চিত্র ১৯ : উমর মুখতার ইতালিয়ান দখলদারদের হাতে জীবন দিলেন, কিন্তু কোনোক্রমেই আদর্শের সাথে আপোষ করেন নি।

১৯১১ সালের দিকে ক্ষয়িষ্ণু তুরস্কের শাসন বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই ইতালি লিবিয়াতে কয়েক লক্ষ সৈন্যের ঘাঁটি গড়ে তোলে। ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখ ইতালি তুরস্ককে আলটিমেটাম দেয় যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে লিবিয়ার মাটি থেকে সরে দাঁড়াতে। আলটিমেটাম ছিলো লোক দেখানো। যুদ্ধের পুরো প্রস্তুতি আগেই নিয়ে রেখেছিলো ইতালি। আজকের লিবিয়া তখন ত্রিপলিতানা ও সিরোনাইকা প্রদেশে বিভক্ত ছিলো।

বিমান বাহিনীর ইতিহাসে এ যুদ্ধের একটা অন্যরকম গুরুত্ব আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বিমান বাহিনীকে যুদ্ধে কাজে লাগানো হয় এ যুদ্ধে। ইতালির দখলে ছিলো তখন ৯টির মতো বিমান। যুদ্ধে ঘায়েল হয় তুরস্ক। ১৯১২ সালে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ শুরু হলে তুরস্ক আর লিবিয়া দখলে রাখার মতো কোনো পরিস্থিতিতে ছিলো না। বাধ্য হয়ে ইতালির সাথে শান্তি চুক্তি করে লিবিয়া ছেড়ে চলে যায় তুরস্ক। তাই ১৯১২ সাল থেকে লিবিয়ার হর্তাকর্তা হয়ে পড়ে ইতালি।

ইতালির জন্য বাধার বিন্ধ্যাচল হয়ে উঠলেন উমর মুখতারঃ

১৮৬২ সালে লিবিয়ার পূর্ব উপকূলে জন্ম হয় উমর মুখতারের। শৈশবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন কুরআনের হাফেয। লিবিয়াতে তখন সেনুসি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। দখলদার তুরস্কের বিরুদ্ধে লিবিয়ার লোকজনের অন্তহীন ঘৃণা, তাই ইতালিয়ানদের আগমনকে খুব বেশি অপছন্দ করেনি লিবিয়ার লোকজন।

উমর মুখতার বাচ্চাদের কুরআন পড়াতেন, সামান্য যব আর আটার রুটি খেয়ে দিন কাটাতেন। উমর মুখতারের নেতৃত্বাধীন গেরিলা বাহিনী লিবিয়াকে ইতালিমুক্ত করতে চাইলেন যে কোনো মূল্যে। প্রায় ২০টি বছর (১৯১১ থেকে ১৯৩১) দখলদার ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন উমর মুখতার। ১৯২২ সালে মুসোলিনী যখন ক্ষমতায় এলেন, তখন তিনি উমর মুখতারকে ঘুষ দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে যে কোনো মূল্যে বশ করতে চাইলেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা উমর মুখতার দখলদার ইতালির সাথে কোনো প্রকার আপোষে যেতে চাইলেন না।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে লিবিয়ার মুসলিম জনগণের মন পাওয়ার জন্য ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনী রোম নগরীতে মসজিদ নির্মানের কথাও ঘোষণা করেন। যদিও ভ্যাটিকানের বিরোধিতার কারণে মুসোলিনী তার সে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারেন নি।

উমর মুখতারের ব্যক্তিত্ব ও আপোষহীনতার জন্য তার শত্রুপক্ষরাও তাঁকে প্রশংসা করতো। তিনি কখনো বন্দীদেরকে হত্যা করতেন না। নিরীহ লোকজনের উপর বিন্দুমাত্র আক্রমন বরদাশত করতে পারতেন না। নিজ দেশ লিবিয়ার সমস্ত ভৌগোলিক জটিলতা তার নখদর্পনে ছিলো। উমর মুখতারের গেরিলা বাহিনীর আক্রমণে নাস্তানাবুদ হয়ে উঠেছিলো ইতালি।

উমর মুখতারের শেষ দেখার জন্য সংকল্প বদ্ধ হয়ে উঠে ইতালি। ২০ বছর ব্যাপী চলা যুদ্ধে বহু লোক মারা যায়। লক্ষ লক্ষ লোককে বন্দী করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। অবশেষে ১৯৩১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর উমর মুখতারকে ধৃত করে ইতালিয়ান বাহিনী। উমর মুখতারকে হত্যা করতে চায়নি ইতালি। তাঁকে আত্মসমর্পনের সুযোগ দিয়ে লিবিয়া থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়। কিন্তু সিংহহৃদয় উমর মুখতার ইতালিয়ানদের বলে ছিলেন, "আমরা কখনোই আত্মসমর্পন করবো না, হয় মরবো নতুবা বিজয়ী হবো। আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, আর আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরতে হবে। "

তাই উমর মুখতারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ৭৩ বৎসর উমর মুখতারকে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। প্রায় ২০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি পরেন উমর মুখতার।

আর লোভী ইতালিও অবশেষে একটা উপনিবেশ পেলো-লিবিয়া। যদিও একনায়ক মুসোলিনী আরও বেশ কয়েকটা দেশ দখলের জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন।

পর্ব-২৬

হিটলার-মুসোলিনী দোস্তির গোঁড়ার কথাঃ

আমরা গত পর্বে দেখলাম, ১৮৭০ সালে ইতালি একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হবার পর উপনিবেশ তৈরির জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু দখল করার মতো ভূ-খন্ড আর বাকি ছিলো না বিশ্বে। ১৮৯০ সালে আবিসিনিয়া দখল করতে গিয়ে চরম পরাজয়ের স্বীকার হলো ইতালি। তারপরে ১৯৩১ সালে উমর মুখতারকে ফাঁসি দেওয়ার পর লিবিয়া পুরোপুরি ইতালির দখলে এলো। এই ফাঁকে ১৯২২ সালে ইতালির ক্ষমতায় বসলো মুসোলিনী। মুসোলিনী ছিলেন অত্যন্ত সুবক্তা ও ক্যারিশম্যাটিক নেতা। তিনি ইতালির জনগনকে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের গৌরবগাঁথা মনে করিয়ে দিতেন। জনগন মুসোলিনীকেই মুক্তিদাতা হিসেবে মনে করতো। পুরো ইতালির জনগণকে মন্ত্রমুগ্ধ রাখার ক্ষমতা ছিলো মুসোলিনীর।

ইতালিতে যখন মুসোলিনী তার রাজত্বকে পাকাপোক্ত করে ফেলেছিলেন, সেই সময়েই ধীরে ধীরে জার্মানীতে শক্তি সঞ্চয় করছিলেন এডলফ হিটলার। হিটলারের পুনরুত্থান নিয়ে বিস্তারিত বলবো আলাদা পর্বে, আজকে শুধু এটুকুই জানব যে ১৯৩৩ সাল থেকে হিটলার হয়েছিলেন জার্মানীর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। প্রথম পর্যায়ে হিটলার কিংবা মুসোলিনী কেউ কাউকে পছন্দ করতেন না, কিন্তু ধীরে ধীরে এই দুই গণতন্ত্র ধ্বংসকারী ও একনায়ক বিশ্বস্ত মিত্রে পরিণত হন।

ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ

হিটলারের সাথে মুসোলিনীর বন্ধুত্ব শুরু হয় মূলত ১৯৩০ সালের পর থেকে। বেশ কয়েকটি ঘটনা তাদেরকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। আসলে হিটলার আর মুসোলিনীর মধ্যে মিলও ছিল বেশ কয়েকটি ব্যাপারে। প্রথমত হিটলার ছিলেন কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী এবং মুসোলিনীও তাই। দ্বিতীয়ত; হিটলার ছিলেন বিরুদ্ধমত দমনকারী একনায়ক এবং মুসোলিনীও তাই। দুজনই নিজ দেশের মানুষের কাছে ছিলেন সুপারহিরো যারা নিজেদের কথার যাদুতে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন সবাইকে।

১৯৩১ সালে লিবিয়া দখল পাকাপোক্ত করার পর ইতালির একনায়ক মুসোলিনী নজর দিলেন আফ্রিকার আরেক দেশ আবিসিনিয়ার দিকে।

মামুন বললো, "বর্তমানে আবিসিনিয়া নামটি পরিবির্তত হয়ে ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া হয়ে গেছে। তুমি কি সেই আবিসিনিয়া দেশটাকেই বুঝাচ্ছো?"

এক্সাক্টলি।

আবার মনে রেখো, ১৮৮৪-৮৫ সালে বার্লিন সম্মেলনে যখন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা পুরো আফ্রিকা ভাগবাটোয়ারা করছিলো তখন পুরো আফ্রিকাতে মাত্র ২টা দেশ স্বাধীন ছিলো। একটি হচ্ছে লাইবেরিয়া এবং আরেকটি হচ্ছে আবিসিনিয়া।

১৮৮৯ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত ইতালি আর আবিসিনিয়ার মাঝে থেমে থেমে যুদ্ধ চলে। অবশেষে চূড়ান্ত ফায়সালা হয় আদওয়ার যুদ্ধে ১৮৯৬ সালে। ৫২০০ সৈন্য হারায় ইতালী। পুরো বিশ্বে আবিসিনিয়ার বীরত্ব গাঁথা ছড়িয়ে পড়ে। আবিসিনিয়া হলো একমাত্র আফ্রিকান দেশ, যারা যুদ্ধ করে নিজেদের অখণ্ডতা রক্ষা করে। মান সন্মান হারিয়ে ইতালি আবিসিনিয়া দখলের আশা ত্যাগ করে।

ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনী এবার আবিসিনিয়ার হাতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। গড়ে তুলতে চাইলেন ইতালিয়ান কলোনী। আবিসিনিয়ার পার্শ্ববর্তী সোমালিয়া ও বর্তমান ইরিত্রিয়ার কিছু অংশ ইতালির কব্জায় ছিলো। এবার হবে পুরো আবিসিনিয়া দখল। ১৯৩৫ সালের ৩ অক্টোবর ইতালি বিপুল সমরসজ্জা নিয়ে আবিসিনিয়ার উপর হামলে পড়ে। আফ্রিকার এই দেশটির উপর রাসায়নিক হামলা শুরু করে ইতালি। পার্শ্ববর্তী সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে গড়ে উঠে রাসায়নিক কারখানা। আবিসিনিয়ার উপর এই বর্বরোচিত হামলা চালানোর সময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইতালির উপর বলতে গেলে কোনো পদক্ষেপই নেয় নি। গলির ডাকাতের মতো আবিসিনিয়া দখল করে ইতালি। নামকাওয়াস্তে নিন্দা জানায় ব্রিটেন-ফ্রান্স।

মুসোলিনী যখন আবিসিনিয়া দখল করেন, সেই মুহূর্তে হিটলার জার্মান জাতিকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন প্যারিস শান্তি চুক্তির বিভিন্ন ধারার বিরুদ্ধে। হিটলার জার্মানীর জনগণকে বোঝালেন শক্তির খেলা দেখিয়েই ব্রিটেন-ফ্রান্সকে শায়েস্তা করতে হবে। হিটলার নির্লজ্জভাবে মুসোলিনীর আবিসিনিয়া দখলকে সমর্থন দিলেন। আবিসিনিয়া দখলকে কেন্দ্র করেই মূলত হিটলারের সাথে মুসোলিনীর কাছে আসা শুরু হয়।

জাপান-জার্মানি-ইতালিকে নিয়ে কমিউনিস্ট-বিরোধী মোর্চা গঠন :

হিটলার মুসোলিনী দুজনই ছিলেন কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী। রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়ার পরে পশ্চিম ইউরোপে কমিউনিজম জুজু ছড়িয়ে পড়ে। জার্মানী ও ইতালি এই দুই দেশেই কমিউনিস্টরা ছিলেন সক্রিয়। হিটলার-মুসোলিনী দুই একনায়ক প্রথম থেকেই কমিউনিস্টদের প্রতি খড়গহস্ত ছিলেন। কমিউনিস্ট বিরোধিতাকে আন্তর্জাতিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য প্রথমে জাপানকে সাথে নিয়ে ১৯৩৬ সালের ৬ নভেম্বর একটি চুক্তি সই করে জার্মানী। এই জোটে ইতালিও যোগ দেয় ২৫ নভেম্বর। ব্রিটেন-ফ্রান্স-পোলান্ডের মতো

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে এই জোটে নিমন্ত্রণ জানানো হলেও তাঁরা জাপান-জার্মান-ইতালি'র ত্রিপক্ষীয় জোটে শামিল হতে রাজি হয় নি। মূলত ১৯৩৬ সাল থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তি পাখা মেলতে শুরু করে। সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে উঠে জাপান-জার্মানি-ইতালি'র মধ্যে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপঃ

হিটলার-মুসোলিনী বন্ধুত্ব গাঢ় হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে স্পেনের গৃহযুদ্ধ। ১৯৩৬ সালে স্পেনীশ সেনাশাসক জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিরোধী ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা অঞ্চলগুলোর বিরুদ্ধে নির্মুল অভিযান শুরু হয়। ক্যাটালান প্রদেশ অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দাবী করে। ক্যাটালান প্রদেশের রাজধানী বার্সেলোনা ফুটবল ক্লাবের সদরদপ্তরে স্পেনীশ রাজতন্ত্র ও অভিজাত পন্থীদের বিরুদ্ধে জড়ো হতো বিদ্রোহীরা। সামরিক একনায়ক ফ্রাঙ্কোর সমর্থনে ৭০ হাজার সৈন্যের বাহিনী প্রেরণ করে ইতালি। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সাথে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো হিটলারের। ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করা নিয়ে আবারও একজোট হয় হিটলার-মুসোলিনী।

লীগ অব নেশনস্ থেকে নাম প্রত্যাহারঃ

জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা হিটলার ১৯৩৩ সাল থেকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পর থেকেই প্যারিস শান্তি চুক্তির বিভিন্ন শর্ত মানতে চাইলেন না। সেনাবাহিনী বাড়াতে লাগলেন, বিমানবাহিনী গঠন করলেন, অস্ত্র কারখানা গড়ে তুললেন বেশুমার। হিটলার ক্ষমতায় আসার নয় মাস পর ১৯৩৩ সালের অক্টোবরে লীগ অব নেশনস্ থেকে সরে দাঁড়ায় জার্মানী। হিটলার জানিয়ে দেন, "তিনি লীগ অব নেশনস্ এর কোনো শর্ত মানতে রাজি নন।" জার্মানীকে তিনি নিজের মতো করেই চালাবেন। হিটলারের পথ ধরে ১৯৩৬ সালে ৭ ডিসেম্বর ইতালিও লীগ অব নেশনস্ থেকে নাম প্রত্যাহার করে। ইউরোপজুড়ে হাহাকার শুরু হয়। আহারে! না জানি আবার কবে যুদ্ধ শুরু হয়। লীগ অব নেশনস্ থেকে নাম প্রত্যাহার করে হিটলার-মুসোলিনী দোস্তির রসায়ন আরও গাঢ় হয়।

অবশেষে ইস্পাতকঠিন বন্ধুত্ব হলো হিটলার-মুসোলিনীরঃ

২২ মে, ১৯৩৯। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আরও ৩ মাস ৯ দিন পূর্বের ঘটনা। হিটলারের জার্মানী ও মুসোলিনীর ইতালি এবার গভীর বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়ে। মুসোলিনী এই বন্ধুত্বকে **Pact of Steel** - আখ্যা দেন। বাংলা সিনেমার ডায়লগ থেকে ধার নিয়ে বলা যায়, জনম জনমের সাথী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এই দুই একনায়ক। এই দুই একনায়কের হাত ধরে বিশ্বজুড়ে প্রলয়নৃত্য ঘটে ছয়টি বছর। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে নির্মম পতন হয় এই দুই বন্ধুর। সে কাহিনী বাকী থাকলো আপাতত।



চিত্র-২০: হিটলার(ডান পাশে) ও মুসোলিনী-দুজনই বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ধ্বংসলীলার নায়ক হিসেবে কুখ্যাত হয়ে থাকবেন চিরকাল।

পর্ব-২৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসল খেলোয়াড়-জার্মানীর-হাঁড়ির খবরঃ

জারিফ বললো, গত কয়েকটি পর্বে আমরা ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনী ও তার দেশ ইতালির সাম্রাজ্যবাদী অভিযান নিয়ে কথাবার্তা বলেছি। আজকে থেকে আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মান জাতির সব খবরাখবর জানবো। হিটলারের উত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলো এখন পুরোপুরি উন্মোচন করবো তোমার সামনে।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "আমরা জানি প্যারিস শান্তি সম্মেলনে জার্মানীর উপর বিভিন্ন শাস্তির বিধান চালু করেছিলো মিত্রপক্ষ। জার্মানী কিভাবে এই শাস্তির মোকাবেলা করলো? আর হিটলারের উদয় হলো কিভাবে?"

দেখো মামুন, জার্মানীর প্রতি অর্থনৈতিক, সামরিক, ভূ-খন্ডগত, রাজনৈতিকসহ বিবিধ শাস্তির বিধান জারী করা হলো। সামরিক শাস্তির আওতায় জার্মানীর প্রতিরক্ষা খাতের শক্তি কমানোর ধারা যোগ হলো। জার্মানীর কাছ থেকে অনেক ভূ-খন্ড কেড়ে নেওয়া হলো, রাজনৈতিকভাবে একঘরে হলো জার্মানী। এসব শাস্তি জার্মানীর জন্য অবধারিতই ছিলো। কিন্তু জার্মানীর জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর শাস্তিটা



চিত্র-২০: হিটলার(ডান পাশে) ও মুসোলিনী-দুজনই বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ধ্বংসলীলার নায়ক হিসেবে কুখ্যাত হয়ে থাকবেন চিরকাল।

পর্ব-২৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসল খেলোয়াড়-জার্মানীর-হাঁড়ির খবর:

জারিফ বললো, গত কয়েকটি পর্বে আমরা ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনী ও তার দেশ ইতালির সাম্রাজ্যবাদী অভিযান নিয়ে কথাবার্তা বলেছি। আজকে থেকে আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মান জাতির সব খবরাখবর জানবো। হিটলারের উত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলো এখন পুরোপুরি উন্মোচন করবো তোমার সামনে।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, ‘‘আমরা জানি প্যারিস শান্তি সম্মেলনে জার্মানীর উপর বিভিন্ন শাস্তির বিধান চালু করেছিলো মিত্রপক্ষ। জার্মানী কিভাবে এই শাস্তির মোকাবেলা করলো? আর হিটলারের উদয় হলো কিভাবে?’’

দেখো মামুন, জার্মানীর প্রতি অর্থনৈতিক, সামরিক, ভূ-খন্ডগত, রাজনৈতিকসহ বিবিধ শাস্তির বিধান জারী করা হলো। সামরিক শাস্তির আওতায় জার্মানীর প্রতিরক্ষা খাতের শক্তি কমানোর ধারা যোগ হলো। জার্মানীর কাছ থেকে অনেক ভূ-খন্ড কেড়ে নেওয়া হলো, রাজনৈতিকভাবে একঘরে হলো জার্মানী। এসব শাস্তি জার্মানীর জন্য অবধারিতই ছিলো। কিন্তু **জার্মানীর জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর শাস্তিটা**

ছিলো অর্থনৈতিক। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হলো জার্মানী মিত্রপক্ষকে ৬.৬ বিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিবে।

৬.৬ বিলিয়ন পাউন্ড! অবাক হলো মামুন।

এই ২০২০ সালে ১ পাউন্ড সমান ১১০ টাকা । ১৯২০ সালে ১ পাউন্ড সমান যদি ১০ টাকাও ধরি তাহলে জার্মানীর ক্ষতিপূরণের অংক দাঁড়ায় ৬৬০০ কোটি টাকা। ১৯২০ সালের ৬৬০০ কোটি টাকা আজকের কত লক্ষ কোটি টাকায় পরিণত হয় তা ভাবতেই তো গা শিউরে উঠে।

পরাজিত জার্মানী অবনত মস্তকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য ছিলো। কিছুই করার নেই। বিজয়ী পক্ষের ফায়সালা এটা।

মামুন প্রশ্ন করলো, "যুদ্ধ করলো সব পক্ষ-আর ক্ষতিপূরণ দিবে একা জার্মানী-এটা কি কোনো ন্যায্য বিচার হলো?"

জারিফ উত্তর দিলো, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন জার্মানীকে এত কঠোর অর্থনৈতিক শাস্তি দেয়ার বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের জেদের কারণে শেষমেষ এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে সবাই এ কথা স্বীকার করে যে জার্মানীর প্রতি এত কঠোর শাস্তির কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।

কিন্তু মনে রেখো, এটা হলো অদম্য জার্মান জাতি। এই টাকা কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে অনেকটা পরিশোধও করে ফেলেছিলো জার্মানী। কিন্তু এই বিপুল টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে জার্মানীর অর্থনীতির বারোটা বেজে যায়। দেশে শুরু হয় অরাজকতা আর নৈরাজ্য। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। হিটলারের উত্থানের পিছনে এসব নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি অনেকাংশে দায়ী।

গণতান্ত্রিক জার্মানীর যাত্রাঃ ভাইমার রিপাবলিক-

জার্মনী সম্পর্কে আরেকটা অদ্ভুত তথ্য জেনে রাখো মামুন, জার্মানীতে কখনোই গণতন্ত্র ডালাপালা মেলেনি। একটা কার্যকর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলো ব্রিটেনে। ফ্রান্স এবং হল্যান্ডসহ পশ্চিম ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে পার্লামেন্টারি পদ্ধতি গড়ে উঠছিলো ধীরে ধীরে। কিন্তু জার্মানীর সংস্কৃতিটা ছিলো রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র আর অভিজাততন্ত্রের যুগ। জনগণের ভোটাধিকার ও মতামতের কোনো দাম ছিলো না।

গণতন্ত্র সম্পর্কে বিলকুল অনভিজ্ঞ একটা রাষ্ট্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। জার্মান যুদ্ধবাজ সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেম ক্ষমতা ছেড়ে হল্যান্ড পালিয়ে যান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর প্রায় ২০ লক্ষ তরুণ জনগোষ্ঠী মারা যায়। মিত্রশক্তির কারণে জার্মানী তার ভূ-খন্ড হারায়। জার্মানীর খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি

কেড়ে নেওয়া হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত জার্মান জাতিকে পুনরায় ঠিক করে তোলার ক্ষেত্রে ভাইমার রিপাবলিকের ভূমিকা অপরিসীম।

মামুন, তুমি কি প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার এর নাম শুনেছো?

হ্যাঁ, শুনেছি। সমাজবিজ্ঞানের যে ত্রিরত্ন আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ম্যাক্স ওয়েবার। বাকী দুজন হলেন 'অগাস্ট কোঁত ও কার্ল মার্কস'।

ভেরি গুড।

ঘটনা হলো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন জার্মানীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো তখন জার্মান সেনাপতি হিন্ডেনবুর্গ আর তার সঙ্গী লুডেনডর্ফ দায়দায়িত্ব কোনো বেসামরিক সরকারের হাতে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর মূল হোতা রাজা দ্বিতীয় উইলিয়াম দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারসহ ২৫ জনের একটি কমিটি সংবিধান রচনার কাজে হাত দিলো। ১৯১৯ সালের ১১ আগস্ট সংবিধান কার্যকর হলো। মধ্য জার্মানীর ভাইমার শহরে তারা মিলিত হয়েছিলো বলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানীর গণতান্ত্রিক সরকারকে ভাইমার রিপাবলিক বলা হয়। নতুন গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়ে জার্মানীতে ব্যাঙের ছাতার মতো রাজনৈতিক দল গজিয়ে উঠলো।

জার্মানদের সম্পর্কে একটা কথা আছে-একজন জার্মান নাগরিক যখন একা থাকে, তখন সে দার্শনিক-

যখন দুজন জার্মান নাগরিক একত্রিত হয়, তখন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়-আর তিনজন জার্মান একত্রিত হলেই বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা আসে। ভাইমার রিপাবলিকের সেই সময়টাতেই হিটলারের নাৎসী পার্টি গঠিত হয়।

পরাজিত জার্মানী যখন ক্ষতিপূরণ দিতে শুরু করলোঃ

তবে ভাইমার রিপাবলিকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা ছিলো অর্থনৈতিক। মিত্রশক্তিকে বিপুল অংকের টাকা পরিশোধ করতে হবে। চিরশত্রু ফ্রান্স জার্মানীর কাছ থেকে টাকা আদায়ে বদ্ধপরিকর। মোট টাকা পরিশোধ করতে ৯২ বছর সময় লাগবে। ৬৬০ কোটি পাউন্ড।

ভাইমার রিপাবলিকের সরকার টাকা পরিশোধের জন্য এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিলো। দেদারসে নোট ছাপাতে লাগলো। নোট ছাপিয়ে ঋণ পরিশোধের এই সিদ্ধান্তে জার্মানী কয়েক বছরের মধ্যেই দেউলিয়া হয়ে পড়লো। ১৯২৩ সালে জার্মানীতে দেখা গেলো অতি মুদ্রাস্ফীতি। দেখা গেলো, এক জোড়া জুতা কিনলে তিন বস্তা টাকা লাগে। বর্তমানে জিম্বাবুয়েতে যে দশা ঠিক সেরকম আর কি।

১৯১৮ সালে ১ ডলার সমান ছিলো জার্মানীর ৪ মার্কস । কিন্তু চার বছর পর ১ ডলার সমান দাঁড়ালো ৪.২ ট্রিলিয়ন ডলার। ১ ডলার = ৪২০০,০০০,০০০,০০ মার্কস। এবার বোঝো অতি মুদ্রাস্ফীত কাকে বলে?

হিটলারের উত্থান তো এমনি এমনি হয় নাই। রাগে দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে জার্মানরা ফোঁস ফোস করছিলো ফ্রান্সসহ বাদবাকী মিত্রশক্তির উপর।

মরার উপর খাঁড়ার ঘাঃ- ফ্রান্স ও বেলজিয়াম মিলে দখল করলো-জার্মানীর রুর অঞ্চল-

নোট ছাপিয়ে ঋণ পরিশোধ করার ফলে অর্থনীতির তো বারোটা বাজলোই। জার্মানী ১৯২২ সালে মিত্রশক্তির কাছে অনুরোধ পাঠায় যেন তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যাপারটা আপাতত মূলতবি রাখা হয়। ভবিষ্যতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে জার্মানী আবারও ঋণ পরিশোধ করবে।

রাগে গজগজ করলো ফ্রান্স! যুদ্ধ লাগানোর সময় হুঁশ থাকে না? এখন ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে গড়িমসি?

৯ জানুয়ারি, ১৯২৩ সাল। ফ্রান্স-বেলজিয়াম মিলে জার্মানীর শিল্প ও কলকারখানা সমৃদ্ধ অঞ্চল রুর দখল করলো। ক্ষতিপূরণের টাকা যেহেতু দিতেই পারবে না বাপু, এবার তোমাদের কল কারখানার দখল নিয়ে নিলাম, তোমাদের উৎপাদিত পণ্যগুলি আমাদের দিয়ে দাও।

জার্মানীর কোনো ক্ষমতা নাই ফ্রান্সের এসব মাস্তানির জবাব দেয়ার। কি আর করা! টাকা না থাকলে সব মাস্তানি ব্যর্থ। রুর অঞ্চলের শ্রমিকেরা ফ্রান্স-বেলজিয়ামের দখলদারিত্বের প্রতিবাদে ধর্মঘটে গেলো। পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করলো। জার্মানী জুড়ে শুধু অনাহার আর হাহাকার।

মামুন প্রশ্ন করলো, ‘‘তাহলে তো আমরা বলতে পারি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানীর প্রতি ধারাবাহিকভাবে যে শাস্তির বিধান জারী করা হয়েছিলো এগুলোই মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির অন্যতম কারণ।’’

অবশ্যই। জার্মানীকে এত বেশি শাস্তি না দিয়ে সহযোগিতামূলক আচরণ করলে হিটলারের উত্থানও হতো না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও সৃষ্টি হতো না।

পর্ব-২৮

জার্মানীর অতি মুদ্রাস্ফীতি বোঝার আগে বিলিয়ন ডলারের গল্পঃ-

জারিফ আজকের আলোচনা শুরু করলো, কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া এক কাহিনী নিয়ে। কয়েকদিন আগে আমার এক ভাগিনা ফোন করে বললো, "মামা, ৩ বিলিয়ন ডলার টাকা আছে একটা লোকের কাছে। তুমি সেই লোকটাকে কল দাও আর কোনো একটা মানি এক্সচেঞ্জে গিয়ে ডলারটা ভাঙ্গিয়ে নাও। তোমাকেও কিছু পার্সেন্টেজ দেয়া হবে।

আমি তো উত্তেজনায় কাঁপছি। ভাগিনাকে ধমক দিলাম। বললাম, কোনো মিথ্যা গল্প আমার কাছে বললে এবার আর রক্ষা নাই। আমাকে ১ লক্ষ ডলার পার্সেন্টেজ দিলেই হবে। আমেরিকার ১ লক্ষ ডলার বাংলাদেশের ৯০ লক্ষ টাকার সমান। তোমার লোক বিলিয়ন ডলার নিয়ে পড়ে থাকুক।

যাই হোক, লোকটাকে ফোন দিলাম। মূর্খসুর্খ লোক। আমাকে বললো, ''স্যার, ১ বিলিয়ন ডলার করে ৩ বিলিয়ন ডলারের তিনটা নোট আছে।"

আমি তো রেগে আগুন। জিজ্ঞেস করলাম, আরে! টাকা না ব্যাংকে আছে? ১০০ ডলারের উপর কোনো নোট নাই, সেখানে ১ বিলিয়ন ডলারের নোট কিভাবে হয়? তুমি ছবি পাঠাও।

আহারে! লোকটির পাঠানো ছবি দেখে আমার অন্তর ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। এতো জিম্বাবুইয়ান ডলার! ভাগিনাকে দিলাম ধমক। বললাম, মনে করেছিলাম ভাগ্য বোধহয় ফিরলো আমার। তুমি আমাকে জিম্বাবুইয়ান বিলিয়ন ডলারের ম্যাজিক দেখালে? ব্যাটা! জিম্বাবুইয়ান তিন বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশী মুদ্রামানে তিন হাজার টাকা হয় কিনা সন্দেহ।

যা হোক! আমার বিলিয়ন ডলারের গল্প সেখানেই শেষ।

বর্তমান জিম্বাবুয়েতে অতি মুদ্রাস্ফীতি চলছে। টাকার কোনো মূল্য নাই। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে সব। তাই, জিম্বাবুয়ের সরকার বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন ডলারের নোট ছাপে। ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিলো ১৯২৩ সালের জার্মানীতে। সেটা বোঝার জন্য কিছুটা অর্থনৈতিক জ্ঞান রাখাও জরুরী।

মুদ্রাস্ফীতি-অতি মুদ্রাস্ফীতি কিঃ-

মুদ্রাস্ফীতির সাধারণ অর্থ জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি। জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি খুব স্বাভাবিক ঘটনা অর্থনীতিতে। জিনিসপত্রের দাম কেন বাড়ে?

চাহিদা-যোগানের উঠানামার কারণে। কিন্তু এই চাহিদা-যোগানের উঠানামা যদি অস্বাভাবিক হয়? ৫০ টাকা কেজির চাল যদি আগামী সপ্তাহে ৭০ টাকা ও পরের সপ্তাহে ১০০ টাকা কেজি হয়, তাহলে?

মামুন বললো, "এটা কি সম্ভব? চালের দাম ১৫ দিনের ব্যবধানে ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা হবে কেনো?"

বাবারে! সম্ভব বলেই তো অতি-মুদ্রাস্ফীতি। এই ফাঁকে আরেকটা জিনিস জানতে হবে। একটা দেশ স্বর্ণের মজুদমানের উপর ভিত্তি করে কাগজের নোট ছাপায়। এটা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাপার। কাগজের মুদ্রা ছাপিয়ে যদি সরকার সব ঝামেলা মেটাতে চায় তাহলে অর্থনীতির জন্য এটা মহা বিপদ। জার্মানী এই ভারসাম্যকে অস্বীকার করে বদ্দ পাগলের মতো নোট ছাপিয়ে সব সমস্যা সমাধান করছিলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই জার্মানী এই কাজ করছিলো। পরে মিত্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়েও এই কাজটা করে। ধীরে ধীরে টাকার মূল্য কমে যায়। **প্রতি ৪ দিন অন্তর অন্তর জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুন হতে থাকে।** নোট ছাপিয়ে আর কাজ হচ্ছেনা। ঘটতে থাকে যতসব আজগুবি ঘটনা।

ঘটনাঃ-০১

এক জার্মান নাগরিক ১০ টা স্যুটকেস ভর্তি টাকা নিয়ে বাজার করতে গেলো। দোকানের সামনে স্যুটকেস গুলো রাখলো। এক চোর এসে চারটা স্যুটকেস নিয়ে সরে পড়লো। কিন্তু টাকাগুলি ফেলে রাখলো কারণ, স্যুটকেসগুলো কাজে লাগবে কিন্তু স্যুটকেসের টাকাগুলো তো কোনো কাজে আসবে না।

ঘটনাঃ-০২

১৯২২ সালের মে মাসে একটি পত্রিকা কিনতে জার্মান মুদ্রায় ১ মার্ক লাগতো, ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে সেই পত্রিকা কিনতে লাগতো ১০ লাখ মার্ক।

ঘটনাঃ-০৩

একটা খাতা কিনতে যে টাকা লাগবে, সেই তুলনায় সেই টাকাগুলি নিয়ে নোটখাতা বানালে ভালোই আয় পাওয়া যেতো। বাচ্চারা জার্মান নোটগুলো নিয়ে দেয়াল সাজাতো।

মোদ্দাকথা হলোর মূদ্রার মান এতো নিচে নেমে গিয়েছিলো যে তা বর্ণনা করতে গেলে রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করা ছাড়া গতি নেই।

সব তামাশার শেষ আছে?

মামুন বললো, "তার মানে জার্মান অর্থনীতি বলতে আর কিছুই রইলোনা। জার্মানী হয়ে পড়লো পুরোদস্তুর দেউলিয়া। তার পরে কি হলো?"

জারিফ বললো, জার্মানী দেউলিয়া হয়ে পড়াতে লোভী ফ্রান্সসহ মিত্রশক্তিদেরও বিপদ হলো। কারণ, জার্মানী নিজেই খেতে পায় না। মিত্রশক্তিদের ক্ষতিপূরণ দিবে কিভাবে? জার্মানীর কাছ থেকে টাকা না পেয়ে ফ্রান্সের খারাপ অবস্থা। কারণ ফ্রান্স আমেরিকার কাছ থেকে প্রচুর ঋণ নিয়েছে। এখন সে আমেরিকার ঋণ পরিশোধ করতে পারছেনা। ঠিক সেই মুহূর্তেই জার্মানী তথা পুরো ইউরোপের জন্য গৌরি সেন হয়ে আসলো আমেরিকা।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের কারণে নাকি আমেরিকার খুব লাভ হয়। সেটা কতটুকু সত্যি?"

অনেকটাই সত্যি। তবে মনে রাখতে হবে, ১৮২৩ সালে প্রবর্তিত মনরো ডকট্রিনের কারণে বিগত ১০০ বছর আমেরিকা বিশ্ব রাজনীতির ঝামেলা থেকে দূরে থেকে ব্যাপক সম্পদশালী হয়ে উঠে। বিশ্বযুদ্ধ না লাগলে আমেরিকা আরও ধনী হতো। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই।

আমেরিকা ভাবলো, তার যে বিপুল সম্পদ আছে। তা থেকে যদি সে জার্মানীকে লোন দেয় তাহলে জার্মান অর্থনীতি ঠিক হবে। আবার মিত্রশক্তিও জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা পাবে। যেই কথা সেই কাজ। জার্মানীকে লোন দেয়া যায় কিনা সেজন্য আমেরিকা একজন পরামর্শক নিয়োগ করলো। সেই পরামর্শকের নাম চার্লস জি ডয়েস। ডয়েস একজন আমেরিকান ব্যাংকার। তিনি আমেরিকান সরকারকে পরামর্শ দিলেন যে জার্মানীকে লোন দেয়া যায়। তার কথার উপর ভিত্তি করে আমেরিকা জার্মানীকে ২৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিহাসে এটা 'ডয়েস পরিকল্পনা' নামে পরিচিত।

লাগে টাকা দেবে গৌরি সেন (পড়ুন আমেরিকা!):- জার্মান অর্থনীতির পুনরুত্থান:

এই ফাঁকে জার্মানীর রাজনৈতিক পরিবেশটা জেনে নেয়া জরুরি। সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির গুস্তাভ স্ট্রেসম্যান ১৯২৩ সালে জার্মানীর চ্যান্সেলর ও বিদেশ সচিব নিযুক্ত হন। অচিরেই তিনি চ্যান্সেলর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিদেশ সচিব পদে থেকে যান। তবে তিনি একা হাতে অস্থির জার্মানীকে ঠাণ্ডা করার মিশনে নামেন। জার্মানীর সব নোটকে বাতিল করে দিয়ে নতুন নোটের প্রচলন করেন। নতুন নোটের নাম হয় রেন্টেনমার্ক। স্বর্নমানের সাথে মিল রেখে অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ মেনে সীমিত আকারে নোট ছাপা হয়। অল্প করে হলেও জার্মান মুদ্রা জনগণের আস্থা অর্জন করতে থাকে। আর আমেরিকার লোনের টাকা জার্মান অর্থনীতিতে ঢুকার পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও বেগবান হয়। শুধু কি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার? রাজনৈতিকভাবেও স্ট্রেসম্যান জার্মানীকে মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করান। জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি ও বেলজিয়ামকে নিয়ে 'লোকার্নো প্যাক্ট' সাক্ষরিত হয় ১৯২৫ সালের ১ ডিসেম্বর। জার্মানীর প্রতি ঘৃণা ও

বিদ্বেষ কমিয়ে ফেলে ফ্রান্স ও ব্রিটেন। জার্মানীও ১৯১৯ সালের সীমানা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেয়। জার্মান শিল্প কারখানাগুলো আবার স্ব-মহিমায় জেগে উঠে। শুরু হয়-Economic boom.

মামুন বললো, ''জার্মানরা পারেও বটে! ১৯২৩ সালেই না খেয়ে মরে। আবার কয়েকদিনের মধ্যেই Economic boom! এই জাতিকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না!''

জারিফ বললো, ১৯২৩ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে জার্মানীর শিল্প উৎপাদন দ্বিগুন হয়ে যায়। এসব কিছুই গুণী রাজনীতিবিদ স্ট্রেসম্যানের অবদান। সবার সাথে মিলেমিশে চলতে পারতেন তিনি।

ক্ষতিপূরণ দেয়ার নতুন পরিকল্পনাঃ

জার্মানীর সেই ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ দিনগুলোতে স্ট্রেসম্যানের অবদানের কথা জার্মানরা ভুলতে পারবে না। শুধুমাত্র অতি মুদ্রাস্ফীতি দূর করাই নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অন্য দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে জার্মানীকে আবার গৌরবের আসনে অভিষিক্ত করেন। স্ট্রেসম্যানের আরেকটা স্বরণীয় কাজ ছিলো ক্ষতিপূরণ দেয়ার নতুন ফর্মুলা প্রবর্তন। অনেক দরকষাকষি করে ৬৬০ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণের অংক ২০০ কোটিতে নিয়ে আসেন। প্রতি বছরে পাঁচ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেয়ার নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় জার্মানী। সেই ফর্মুলা অনুযায়ী ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জার্মানী এই ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে থাকবে।

কিন্তু হায়! আচমকা একদিন স্ট্রোক করে মারা যান গুস্তাভ স্ট্রেসম্যান। তারিখটা ছিলো ১৯২৯ সালের ৩ অক্টোবর। তারপর থেকে জার্মানীর ইতিহাসে নতুন ঝড়-তুফানের ঘনঘটা দেখা দেয়। জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা হওয়ার দৌড়ে সবাইকে পিছনে ফেলে দেন হিটলার। খেলা মাত্র শুরু। আগামী পর্ব থেকে হিটলারের উত্থানকাহিনী শুরু।

পর্ব-২৯

এবার হিটলারের গল্প শোনোঃ

মামুন জিজ্ঞেস করলো, ''আমরা ১৯২৯ সাল পর্যন্ত জার্মানীর ইতিহাস জেনে গেলাম। ১৯১৯ সালের ১১ নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধের পুরো দায় জার্মানীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। জার্মানী নতশিরে সব মেনে নেয়। জার্মানী তার ভূ-খণ্ডের অনেকখানি অংশ হারায়, বিপুল পরিমান ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয় মিত্রশক্তিকে। ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে জার্মানী দেউলিয়া হয়ে পড়ে। তারপর মাঠে নামলেন গুস্তাভ স্ট্রেসম্যান যার নেতৃত্বে জার্মানী অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠে। অপরদিকে, টাকার বস্তা নিয়ে জার্মানীকে

সাহায্য করতে নামে আমেরিকা। আর স্ট্রেসম্যান মারা যান ১৯২৯ সালে। ....এতটুকু আমরা জানলাম-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানি সম্পর্কে।

....আমার প্রশ্ন হলো-১৯৩৩ সাল থেকেই জার্মানীর সর্বময় ক্ষমতার অধিকার হন এডলফ হিটলার। তাহলে ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত হিটলার কি করেছিলো? কেমন ছিলো তাঁর কর্মকাণ্ড-? কিভাবে তিনি জার্মানীর সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন? আর কেনইবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করলেন তিনি?"

জারিফ বললো, সবই বলবো আজ থেকে। আসলে হিটলার অত্যন্ত সাধারণ মানুষই ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। জার্মানীর ব্যাভারিয়ান রেজিমেন্টের একজন ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করেন। তার কাজ ছিলো বাহিনীর মধ্যকার সংবাদ আদান প্রদান করা যার অফিসিয়াল নাম-'Despatch runner.'

হিটলার আদতে জার্মান নয়, অস্ট্রিয়ান-

১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল হিটলার জন্মগ্রহন করেন অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাও আম ইনন্ শহরে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে-অস্ট্রিয়ার সকল লোক জার্মান ভাষায় কথা বলে। আর অস্ট্রিয়ানরা নৃতাত্ত্বিকভাবে জার্মান বংশোদ্ভূত। হিটলারের শৈশব কেটেছে অস্ট্রিয়ার ছোট্ট শহর লিনজে্। হিটলারের বাবা মারা যান ১৯০৩ সালে। পিতা মারা যাবার পর হিটলারের পরিবার অথৈ জলে পড়লেন। টাকার সংস্থান নাই। অত্যন্ত সাধারণ মানের ছাত্র হিটলার মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোতে পারেন নি। ছবি আঁকার প্রতি মনোযোগী ছিলেন কিন্তু স্রষ্টা হয়তো তাকে সেই প্রতিভা দেন নি। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার চারুকলা একাডেমীতে ভর্তি হবার জন্য দুবার চেষ্টা চালান, তবে পারেন নি। হাপুসবুর্গ সাম্রাজ্যের রাজধানী ভিয়েনার তখন ব্যাপক শান শওকত। হিটলারের মতো ব্যর্থ চিত্রশিল্পী ভিয়েনার রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়াতেন। বন্ধু-বান্ধবদের সংশ্রব পছন্দ ছিলো না তাঁর।

মামুন বললো, "আসলে যে লোকটা পরবর্তীতে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় সৃষ্টি করবে,সে কি আর এতো সামাজিক ও বন্ধুবৎসল হতে পারে?"

জারিফ বললো, ঠিক তাই। হাইস্কুল ড্রপআউট ও ব্যর্থ চিত্রশিল্পী হিটলার জীবনের কোনো কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না ভিয়েনায় এসে। ১৯১৩ সালে জার্মানীর ব্যাভারিয়ান প্রদেশের রাজধানী মিউনিখে বসবাস করা শুরু করলেন হিটলার।

জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগদানঃ

কিন্তু হিটলার তো ছিলেন সবদিক দিয়ে অযোগ্য। গড়পড়তা জার্মান/অস্ট্রিয়ানদের তুলনায় হিটলার ছিলেন খাটো, গায়ের রং ফর্সা ছিলো না, শারীরিকভাবেও ছিলেন দুর্বল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার ইচ্ছা

পোষণ করলেন। সেনাবাহিনীতে প্রবেশের জন্য তিনি আনফিট বলে ঘোষিত হলেন। কোনোভাবেই হিটলার জীবনের হিসাব মেলাতে পারছিলেন না।

তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান সৈন্য মরতে শুরু করলো তখন হিটলার সেনাবাহিনীর অসামরিক শাখায় সংবাদ পৌছে দেয়ার একটা দায়িত্ব পেলেন। সেনাবাহিনীর মধ্যকার দূতও বলা যেতে পারে। বিভিন্ন যুদ্ধফ্রন্টে দায়িত্ব পালনও করেছেন। হিটলারের পদটি ছিলো কর্পোরাল পদমর্যাদার। দায়িত্ব পালনের জন্য হিটলার পুরস্কারও পান। আয়রন ক্রস উপাধিতে ভূষিত হন। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর আত্মসমর্পনের বেশ কিছুদিন আগে হিটলার আহত হয়ে হাসপাতালে সেবা নিচ্ছিলেন।

নভেম্বর ক্রিমিনাল থিওরিঃ-হিটলার ও জার্মান জাতি-

এবারের ঘটনাবলী দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। ১৯১৯ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানদের আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। কিন্তু এই আত্মসমর্পন নিয়ে জার্মান সমাজ দ্বিধাবিভক্ত ছিলো। এই দ্বিধাবিভক্তির মধ্যে হিটলারের উত্থানের কারণ নিহিত।

তুমিতো জানই, প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ সময়ে জার্মানীর যুদ্ধবাজ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যান। জার্মানীর ভাইমার নগরীতে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। নতুন সংবিধান প্রণীত হয়। ভাইমার রিপাবলিকের গণতান্ত্রিক ও বেসামরিক সরকারই মূলত আত্মসমর্পনের সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু জার্মানীর সামরিকতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা প্রচার করে যে ভাইমার রিপাবলিকের বেসামরিক সরকার জার্মানীকে কলুষিত করেছে। জার্মান সামরিক বাহিনী যুদ্ধজয়ের দ্বারপ্রান্তে ছিলো, ঠিক এমন সময়ে আত্মসমর্পনের সিদ্ধান্ত পিছন থেকে ছুরি মারার সামিল। বেসামরিক সরকারের সব অংশীদারগণই ক্রিমিনাল। যেহেতু নভেম্বর মাসে এই আত্মসমর্পন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তাই এরা নভেম্বর ক্রিমিনাল নামে পরিচিত। এই থিওরী জার্মানীর আপামর জনতা বিশ্বাস করেছিলো। কারণ জার্মানরা ভাবতো যে তাদের সেনাবাহিনী কখনো পরাজিত হতে পারে না। বেসামরিক সরকার শুধু শুধু আত্মসমর্পন করেছে। আত্মঅহংকারী ও গর্বিত জার্মানরা ভাইমারের রিপাবলিকের এই আত্মসমর্পনকে ভালো চোখে দেখেনি।

হিটলার ছিলেন নভেম্বর ক্রিমিনাল থিওরীর অন্যতম সমর্থক। যুদ্ধশেষে ভার্সাই নগরীতে যখন আত্মসমর্পনের চুক্তি হচ্ছিলো, হিটলার তখনও হাসপাতালের বেডে। জার্মান বেসামরিক সরকার যখন মিত্রশক্তির বিভিন্ন অপমানজনক চুক্তিতে সাক্ষর করছিলো, সে সংবাদে তখন পুরো জার্মানীতেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া। হিটলার সেনাবাহিনী থেকে সরে পড়লেন। ১৯২০ সালে জার্মান ওয়ার্কাস পার্টিতে যোগ

দিন। পার্টির একজন প্রচারক হিসেবে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এভাবেই মূলত হিটলার রাজনীতিতে জড়ান। হিটলারের প্রচারণার মূল ফোকাসটা ছিলো জার্মানীর ভাইমার রিপাবলিকের সরকার একটা ক্রিমিনাল, তাদের যোগসাজশে জার্মানীকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করা হয়। তাই এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। আর মিত্রশক্তি জার্মানীর উপর যে অন্যায্য চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলোকে বরবাদ করতে হবে। মিত্রশক্তির উপর চরম প্রতিশোধ নিতে হবে। বলাই বাহুল্য- হিটলারের কথাগুলো সাধারণ জার্মানরা মনেপ্রাণে গ্রহন করতে শুরু করে।

পর্ব-৩০

হিটলারের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের শুরুর কথাঃ

গতপর্বে আমরা বলেছিলাম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হিটলার সেনাবাহিনী থেকে ইস্তফা দেন এবং জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির একজন প্রচারক নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে পার্টির নাম বদলে রাখা হয় 'ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি' বা সংক্ষেপে 'নাৎসী পার্টি'। একটা গুণ হিটলারের ছিলো তা হচ্ছে বাগ্মিতা। হিটলার মুহুর্তেই সমবেত জনতাকে উত্তেজিত করে ফেলতে পারতেন। তিনি জার্মান জাতির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে স্মরণ করে প্যারিস চুক্তির বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে পারতেন। হিটলারের বক্তৃতা দেয়ার গুনাবলীতে মুগ্ধ ছিলো সবাই। নাৎসী পার্টিতে ভাঙ্গন দেখা দিলে হিটলার ১৯২১ সালে একটা অংশের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তারপর থেকেই হিটলারের নাম ডাক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। হিটলারের কর্মকান্ড ছিলো ব্যাভারিয়া প্রদেশের রাজধানী মিউনিক শহরে।

হিন্দুদের স্বস্তিকা প্রতীক ছিনিয়ে নিলেন হিটলারঃ

মামুন জিজ্ঞেস করলো, ''একবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারতের রাজনৈতিক দল বিজেপিকে উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন যে তারা হিটলারের প্রেতাত্মা। নাৎসী পার্টির প্রতীক ব্যবহার করে ভারতের আরএসএস। আসলেই কি তাই?''

জারিফ বললো, ইমরান খান ঠিকই বলেছেন, তবে একটা সংশোধনী আছে। আসলে ভারতের বিজেপি/আরএসএস স্বস্তিকা প্রতীক হিটলার থেকে আনেনি। বরং হিটলার এটা ভারত থেকে আমদানি করেছিলো। স্বস্তিকা হচ্ছে আর্য জাতির প্রতীক। হিটলার মনে করতেন, সকল মানবজাতির মধ্যে আর্যরা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। জার্মানরাই হচ্ছে বিশুদ্ধ আর্য জাতি তাই তারাই বিশ্ব শাসন করবে। হিটলারের রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডার মূল উদ্দেশ্য ছিলো জার্মানদের মধ্যে যারা আর্য নয়, তারা অনুপ্রবেশকারী তথা জার্মান জাতির শত্রু। এই দলের মধ্যে পড়ে প্রথমে ইহুদীরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের পরাজয়ের পর একটা রব উঠে যে ইহুদীরাই হচ্ছে

জার্মানদের এসব পরাজয়ের মূল। ধীরে ধীরে হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষ দানা বাঁধতে থাকে।

১৯২৩ সালঃ-ব্যর্থ রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের কারণে জেলে গেলেন হিটলার

১৯২২ সালে ইতালির ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনী খুব সহজেই ক্ষমতার মসনদে বসলেন। পঞ্চাশ হাজার সদস্য নিয়ে রোম অভিমুখে লংমার্চ করার কারণে ইতালির রাজা মুসোলিনীকে সরকার গঠন করার আহ্বান জানান। হিটলার এ ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেও জার্মানীর রাজধানী বার্লিন অভিমুখে এক লংমার্চ করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ফল হয় অত্যন্ত শোচনীয়।

১৯২৩ সাল ছিলো জার্মানীর জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর একটা সময়। জার্মান অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। ক্ষতিপূরণের টাকা না দিতে পারার কারণে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম মিলে জার্মানীর শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল রুর দখল করে ফেলেছে। মুদ্রাস্ফীতি আকাশ ছুঁয়েছে সেটা আগেই বলেছি। ঠিক সেই সময়ে হিটলার জার্মানীর ক্ষমতা লাভের এক অলীক স্বপ্নে মেতে উঠেছিলেন।

হিটলারের কর্মক্ষেত্র তখন ব্যাভারিয়ান রাজ্যে। হিটলার এই রাজ্যের নেতৃস্থানীয় তিনজনকে কিডন্যাপ করে জোর করে তাদের দলে ভিড়াতে চাইলেন। হিটলারের পরিকল্পনা ছিলো এদেরকে কিডন্যাপ করতে পারলে পুরো ব্যাভারিয়ান রাজ্যই তার দখলে আসবে। তারপর তিনি বার্লিন অভিমুখে লংমার্চ করে ভাইমার রিপাবলিকের সরকারকে উচ্ছেদ করবেন। হিটলারের এই কাজে সমর্থন দিয়েছিলেন জার্মান সেনাপতি লুডেনডর্ফ।

যেই কথা সেই কাজ। ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসের ৮ তারিখ ব্যাভারিয়ান রাজ্যের কমিশনার মিউনিখের বড় একটি বিয়ার হলে একটি আলোচনা সভায় মিলিত হন। ঠিক সেই মুহূর্তে হিটলার তার সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে বিয়ার হলে প্রবেশ করেন। হিটলারের নাজি সমর্থক ও রাজ্য পুলিশের মধ্যে গোলাগোলি চলে। ভীষণ উত্তেজনা। হিটলারের সমর্থক সেনাপ্রধান লুডেনডর্ফ মিউনিখ শহরে চলে এলেন। কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন! রাজ্য পুলিশের ধাওয়া খেয়ে হিটলারের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। ১৬ জন নাজি সমর্থক নিহত হলেন। ঘটনাস্থল থেকে হিটলারও পালিয়ে গেলেন। সাধারণ জনতার চোখে হিটলার ও তার সমর্থকরা কাপুরুষ বলে গণ্য হলেন। সেনাপ্রধান লুডেনডর্ফ হিটলারের এই বোকামি ও অক্ষমতা দেখে নিজেও সড়ে পড়লেন।

হিটলার লুকিয়ে থাকলেন কয়েকদিন। কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন তিনদিন পর। বিশেষ আদালতে হিটলারের বিচার হয়। ৫ বছরের সাজা হয় হিটলারের। কিন্তু ১ বছর পরে হিটলার জেল থেকে বেরিয়ে আসেন।

ব্যর্থ বিপ্লবের ফলাফলঃ

যদিও ১৯২৩ সালের মিউনিখ শহরের বিয়ার হলের বিপ্লব সফল করতে পারেন নি হিটলার, তবুও এই বিপ্লব থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিলেন হিটলার। তিনি জেলে বসে তার রাজনৈতিক ইশতেহার মূলক বই 'মাইন ক্যাম্প' লিখলেন। জার্মানীতে ইতালির মতো বিপ্লব করা সম্ভব নয়। এই বাস্তবতা হিটলার অনুধাবন করলেন। জেলে বসে হিটলার প্রতিজ্ঞা করলেন, ক্ষমতা তিনি একদিন দখল করবেনই এবং সেটা বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই।

পর্ব-৩১

মাইন ক্যাম্পঃ জেলে বসে হিটলার লিখেছিলেন এই বইঃ

মামুন জানতে চাইলো, "জারিফ, তুমি আগেই বলেছিলে হিটলার ছিলো হাইস্কুল ড্রপআউট এবং ব্যর্থ চিত্রশিল্পী। তাহলে এই লোক কিভাবে মাইন ক্যাম্প বইটা লিখলো? এত অল্প জ্ঞান নিয়ে এতো আলোচিত বই লেখা কিভাবে সম্ভব?"

জারিফ বললো, বইটা খুব ভালো তা কে বললো? বইটা আসলেই চরম ফালতু। বইটার পাতায় পাতায় হিটলারের বোকামি ও মূর্খতার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভব হলে নীলক্ষেত থেকে তুমি বাংলা অনুবাদ কিনে পড়তে পারো। আমি ইংরেজিতে কয়েক পৃষ্ঠা পড়েছি, বইটা এককথায় জঘন্য। কেন জঘন্য শোনো তাহলে।

আমাদের উপমহাদেশের গেঁয়ো মানুষদের মতো বারবার বইয়ে বলেছেন, "পৃথিবীতে আর্য জাতির মানুষরাই সর্বশ্রেষ্ঠ। জার্মানরা হচ্ছে পিওর আর্য, তারাই বিশ্ব শাসনের অধিকার রাখে।" ৭৮২ পৃষ্ঠার বইয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা। হিটলার মোটেও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। বইয়ে হিটলার বলেছেন, "গণতন্ত্র অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি।" হিটলার বিশ্বাস করতেন পৃথিবীতে যত খারাপ কাজ হয়েছে সবকিছুর পিছনে ইহুদীরা দায়ী। কম্যুনিস্টদেরও তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। কেন ইহুদী এবং কম্যুনিস্টরা খারাপ এর সপক্ষে কোনো যুক্তি দিতে পারেন নি। হাইস্কুল ড্রপআউট একটা লোক কিভাবে যুক্তি আর জ্ঞান-গরিমার আশ্রয় নিবে? ২৫ পৃষ্ঠা পড়ার পর বইটা পড়ার রুচি হয়নি আমার।

মামুন বললো, "কিন্তু এই বই জার্মানীর আপামর জনগণের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলো কেন?"

প্রিয় হয়নি। জার্মানরাও কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে আর পড়েনি। পাতায় পাতায় ইহুদী আর কম্যুনিস্টদের প্রতি ঘ্রণা। তীব্র জাতিবিদ্বেষ। মনে রাখতে হবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদেরকে যখন সবদিক দিয়ে চেপে রাখা হয়েছিলো তখন জার্মানরা একজন মুক্তিদাতা খুঁজছিলো, যে তাদেরকে এসব শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

তাই জার্মানরা হিটলারের চটকদার কথায় পটে গিয়েছিলো, কিন্তু মাইন ক্যাম্প বইটা এতো উল্টে পাল্টে দেখেনি। বইটা প্রথম প্রথম খুব বেশি বিক্রি হয় নি, আর হিটলার যখন ১৯৩৩ সালে চ্যান্সেলর হন তখন প্রত্যেক নববিবাহিত দম্পতিকে এই বই উপহার দেয়া হতো। বইটি থেকে হিটলার প্রচুর টাকা ইনকাম করেন। ১৯২৪ সালে প্রকাশের পর থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মাইন ক্যাম্প প্রায় ১ কোটি কপি বিক্রি হয়।

স্ট্রেসমানের মৃত্যুঃ-অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দাঃ

বইয়ের মান যাই হোক, হিটলার এই বই দিয়ে তার উগ্র মতবাদ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। বই বিক্রি হতে শুরু করলো হুজুগে। হিটলার জেল থেকে বের হন ১৯২৪ সালের ২০ ডিসেম্বর। ৯ মাস জেল খেটে মুক্তি পান হিটলার। কিন্তু রাজনৈতিক ময়দানে হিটলার সফলতা পাচ্ছিলেন না। এর কারণ হচ্ছে, গুস্তাভ স্ট্রেসম্যানের নেতৃত্বে জার্মানীর অর্থনৈতিক বিপ্লব। আগের পর্বে বলেছি, আমেরিকার সাহায্যে আর স্ট্রেসম্যানের নেতৃত্বে জার্মান অর্থনীতি শক্তিশালী হয়ে উঠে। ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সময়টা জার্মান অর্থনীতির সেরা সময়। অর্থনৈতিকভাবে বলীয়ান হয়ে উঠে জার্মানি। হিটলারের মতো চরমপন্থী ও উগ্র ডানপন্থী রাজনীতিবিদরা কল্কে পাচ্ছিলেন না রাজনীতির ময়দানে। কর্মঠ জার্মান জাতি উগ্রতা ছেড়ে কাজে মনোযোগ দিলো। ১৯২৪ সালে চরমপন্থী রাজনীতিকদের সমর্থন ছিলো ৪০ শতাংশ। ১৯২৮ সালে তা নেমে দাঁড়ালো ২৮ শতাংশে।

কিন্তু ঝামেলা লাগলো যখন ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসের তিন তারিখ স্ট্রেসম্যান আচমকা স্ট্রোক করে মারা যান। জার্মান রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আর কোনো শক্তিশালী নেতা রইলেন না।

স্ট্রেসম্যানের মৃত্যুর ২১ দিন পর পুরো পৃথিবীর জন্য এক ভয়ংকর দিন হয়ে এলো অক্টোবর এর ২৪ তারিখ।

কি সেই ভয়ংকর দিন?

আজকে আমরা করোনা ভাইরাসের খপ্পরে পড়ে অর্থনৈতিক দুরবস্থার হিসাব কষছি, কিন্তু ১৯২৯ সালের অক্টোবর এর ২৪ তারিখ নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে যে বিশ্বমন্দার সূচনা হয়েছিলো তার সাথে করোনাভাইরাসের ক্ষয়ক্ষতি একেবারে শিশু।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারের সাথে জার্মানীর কি সম্পর্ক?"

সম্পর্ক আছে মানে! ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার অর্থনীতি ছিলো পাগলা ঘোড়ার মতো দুরন্ত। এই আট বছরে জাতীয় উৎপাদন দ্বিগুন হয়ে যায়।

পুরো ইউরোপকে টাকা ধার দিয়ে তাকে টেনে তুলছিলো আমেরিকা। আমেরিকা ছিলো বিশ্ব মহাজন। আমেরিকা টাকা ধার দিয়েছিলো ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, হল্যান্ডসহ ইউরোপের অধিকাংশ দেশকে। টাকা ধার দিয়েছিলো জার্মানীকে। আমেরিকার টাকায় ভর করে জার্মান অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠে। জার্মানরা আবার ক্ষতিপূরণের টাকা সহজে দিতে পারতো ব্রিটেন-ফ্রান্সসহ মিত্রশক্তিদের। মিত্রশক্তি সেই টাকা আমেরিকাকেই পরিশোধ করতো। সোজা কথা হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপীয় অর্থনীতির যে দুর্দশা হয়েছিলো আমেরিকার কাঁধে ভর করে তা সোজা হয়ে উঠছিলো।

কিন্তু ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর নিউইয়র্কের শেয়ার বাজার থেকে যে মন্দার সূচনা হয়েছিলো তাতে আমেরিকাই কাহিল হয়ে পড়লো। লাখ লাখ লোক পথে বসে পড়লো দেউলিয়া হয়ে। মানব ইতিহাসে এত বড় অর্থনৈতিক মন্দা আর আসে নি। এই মন্দা নিয়ে অল্পবিস্তর আলাপ করেছি আগের পর্বে। এই মহামন্দা প্রায় ৫ বছর স্থায়ী হয়েছিলো। আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা গ্রাস করে ফেলে পুরো ইউরোপকে।

স্বয়ং মহাজন আমেরিকা বিপদে এবার। দুর্বল ইউরোপকে বাঁচাবে কে? শঙ্কিত ইউরোপে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠলো।

রাজনীতিবিদদের উত্থানের জন্য সমস্যা দরকার। সমস্যা না থাকলে রাজনীতিবিদরা গলাবাজি করবেন কিভাবে? অবশেষে হিটলার গলাবাজি করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। আমেরিকার মহামন্দা যখন জার্মানীসহ পুরো ইউরোপকে গ্রাস করতে লাগলো, হিটলার আবার তার খেলা শুরু করলেন। ততদিনে হিটলারের নাজি পার্টির জনসমর্থন অনেকটা বেড়ে গেছে। হিটলার বলতে লাগলেন ,"জার্মানীর এই দুরবস্থার জন্য প্যারিস শান্তি চুক্তিই দায়ী। কেন মিত্রবাহিনীকে এত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে? কেন জার্মানীর প্রতি এত অবিচার করা হলো?"

হিটলারের রাজনৈতিক সাফল্যঃ

বিপ্লব করতে গিয়ে হিটলার জেলে গিয়েছিলেন ১৯২৩ সালে। হিটলার পণ করছেন যে আর বিপ্লবও করবেন না, জেলেও যাবেন না। এবার তিনি জনগণকে ক্ষেপিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করে নির্বাচনে জিতে তবেই ক্ষমতায় যাবেন। জার্মান জাতিকে উত্তেজিত করার মতো ইস্যুর অভাব নেই। নাজি পার্টি নিষিদ্ধ ছিলো এক বছর। ১৯২৫ সাল থেকেই হিটলার রাজনৈতিক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯৩০ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নেয় হিটলারের নাজি পার্টি। ১৮% ভোট পায় এই দল। পুরো জার্মানীতে মোটামোটি একটা গ্রহনযোগ্যতা পান হিটলার।

কিন্তু কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় চ্যান্সেলর বিহীন, নির্বাচিত সরকার বিহীন ভাবেই জার্মানীর কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। ১৯৩২ সালে জার্মানীতে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন হয়। ভাইমার রিপাবলিকের নিয়ম অনুযায়ী জার্মানীর প্রেসিডেন্টের মেয়াদ ছিলো সাত বছর।

পর্ব-৩২

জার্মানীর একচ্ছত্র নেতা হওয়ার পথে হিটলারঃ

আলোচনা শুরু হলো জারিফ ও মামুনের মধ্যে। মামুন জিজ্ঞেস করলো, "১৯৩২ সালে জার্মানীতে যে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, তার ফলাফল কি হলো? আর হিটলারই বা কিভাবে ১৯৩৩ সাল থেকে চ্যান্সেলর নির্বাচিত হলো?

মামুন, ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং বটে! এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও ।

জার্মানীর সে সময় নির্বাচনী ডামাডোলটা ছিলো প্রেসিডেন্সিয়েল নির্বাচন ও জাতীয় নির্বাচন কেন্দ্রিক। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছিলো ১৯২৫ সালে। ভাইমার রিপাবলিকের নিয়ম অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের মেয়াদ ছিলো সাত বছর। সে অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা ১৯৩২ সালে। তার আগে ১৯৩০ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসলো। আগেই বলেছিলাম, জার্মান সুশাসনের কান্ডারী গুস্তাভ স্ট্রেসম্যান ১৯২৯ সালে মারা যাওয়ায় এবং আমেরিকায় বিশ্ব মন্দা শুরু হওয়ায় জার্মানী তথা ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। হিটলারের মতো উগ্রপন্থী রাজনীতিবদরা আবার আসর গরম করার জন্য মাঠে নামে। ১৯৩০ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে হিটলারের দল ১৮% ভোট পায়। ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হবে বিধায় প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ নিজের হাতেই ক্ষমতা রাখেন। এই ফাঁকা সময়ে হিটলার সারাদেশ ব্যাপী জনসভা করে উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে সমর্থন বাড়ান। হিটলারের জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করে।

হিটলার যখন ১৯৩২ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেটঃ

১৯৩২ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে হিটলার ৩৫% ভোট পান। কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল থাকেন হিন্ডেনবুর্গ। জার্মানীতে ছিলো না কোনো সরকার, ছিলো না কানো মন্ত্রিসভা যারা প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করবে।

যেহেতু হিটলারের দল সংখ্যাগরিষ্ট, সরকার গড়ার মতো কোনো অবস্থানে না থাকলেও প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ হিটলারের দলকে সরকার গড়ার আহবান জানায়। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখ হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ হিটলারের সমর্থক ছিলেন না, বরং ছিলেন হিটলার বিরোধী। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন, যেহেতু হিটলারের দল সবচেয়ে বেশি ভোট

পেয়েছে তাই আপাতত হিটলারকে চ্যান্সেলর পদে বসানো হোক। যাতে পরবর্তীতে আরেকটা নির্বাচনের সময় হিটলার জোটবদ্ধ নির্বাচিত হয়ে আরও স্থিতিশীল সরকার গড়তে পারেন জার্মানীতে।

ছিলো রুমাল - হয়ে গেলো বিড়াল:-হিটলারের মাস্তানি শুরু-

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ছড়াকার সুকুমার রায়ের লেখা সংলাপ ধার করে বলা যায় যে চ্যান্সেলর হবার পর হিটলার বদলে গেলেন। হিটলার ছিলেন রুমাল, হয়ে গেলেন বেড়াল।

প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ হিটলারকে চ্যান্সেলর নিযুক্ত করেছিলেন স্থিতিশীল জার্মানী গড়ার আশায়। কিন্তু হয়ে গেলো হিতে বিপরীত। হিটলারের সমর্থক বাহিনী যারা ব্রাউন শার্ট নামে পরিচিত, রাস্তায় রাস্তায় মারামারি শুরু করলো। ভয়ভীতি দেখিয়ে নাৎসী পার্টি লোকাল নির্বাচনে জয়ী হতে লাগলো। বিরোধীরা খড়কুটোর মতো উড়ে গেলো হিটলারের দলের লোকদের দাপটে। হিটলারের সমর্থন আরো বেড়ে গেলা। এবার সমর্থন বাড়লো ভয়ের চোটে।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, ‘‘ব্যাপারটার সাথে বর্তমানকালের কোনো একটা দেশের যেন মিল পাচ্ছি। লোকজন ভোট দিতে পারছে না ভয়ের কারণে। সমালোচনাও করতে পারে না। আবার পার্লামেন্ট নির্বাচনে ৯৬% এর বেশি ভোটও পায়।’’

জারিফ বললো, আসলে বর্তমানে একটা নয়, বেশ কয়েকটি দেশেই হিটলার জামানার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীরা এটার নাম দিয়েছেন ‘জনতুষ্টিবাদ’। মোটামোটি একটা লেভেলের জনপ্রিয়তা থাকলেই সরকার দেশে যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। স্থানীয় পর্যায়ে দলের সমর্থকরা বিরোধীদের মাঠছাড়া করেন। প্রশাসন হয়ে পড়ে সরকারের হাতের পুতুল। বিরোধীমতকে নির্লজ্জভাবে দমন করা হয়। শুধু একটা দেশ নয় বর্তমানে ব্রাজিল, ভারত, ফিলিপাইন এমনকি আমেরিকা, ব্রিটেনের মতো উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও হিটলারের সময়কার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়।

জার্মানীর পার্লামেন্টে লাগলো আগুন:-হিটলারের সুসময় শুরু-

চ্যান্সেলর নির্বাচিত হবার ঠিক ২৮ দিন পর পুরো জার্মানী উত্তাল হয়ে উঠলো এক বিশেষ ঘটনায়। একজন ডাচ ভবঘুরে, যার নাম মারিয়াস ভ্যান ডার লুবে, জার্মানীর পার্লামেন্ট ভবনে আগুন লাগিয়ে দিলো। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখের ঘটনা সেটা। হিটলার তো রেগেই আগুন। পাকড়াও করা হলো ওই ভবঘুরেকে। আর সারাদেশব্যাপী হিটলারের সমর্থকরা প্রচার শুরু করলো যে ওই ভবঘুরে আসলে বামপন্থী এজেন্ট। এই অজুহাতে সারাদেশে বামপন্থী কমিউনিস্টদের উপর খড়গহস্ত হলেন হিটলার। প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গের

কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হিটলার সংবিধানের ৪৮ ধারা প্রয়োগ করলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা রহিত হয়ে গেলো।

অনেকেই সন্দেহ করেন যে পার্লামেন্ট ভবনে আগুন লাগানো ছিলো হিটলারেরই কাজ। তিনি তার লোকজনদের দিয়েই মানসিক ভারসাম্যহীন ওই ভবঘুরেকে দিয়ে কাজ সারেন। পরবর্তীতে এটা নিয়ে কোনো তদন্ত হয়নি। ওই যুবককে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিলো। কিন্তু এই ঘটনার অজুহাতে হিটলার তার দমনপীড়ন ব্যবস্থা জোরদার করেন।

Night of the long Knives: ঘরের শত্রু বিভীষনদের নির্মুল করেন হিটলারঃ

১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখের পর থেকে হিটলার বিভিন্নভাবে তার শক্তি বাড়িয়ে চলেন। তার সমর্থকরা বিরোধীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে মারপিট করে স্থানীয় পর্যায়েও হিটলারের দলের ভিত্তি মজবুত করেন। হিটলার মার্চে আবার আরেক দফা পার্লামেন্ট নির্বাচনের ডাক দেন। ততদিনে হিটলারের লাখ লাখ নিবেদিত প্রাণ কর্মী দেশের সবপ্রান্তে। মার্চের নির্বাচনে হিটলার ৪৪ % ভোট পেয়ে আবার চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন।

৪৪% ভোট পাওয়া মানে বিরোধীদলকে ভোটকেন্দ্রে না দিতে যাওয়া, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, বিরোধীমতকে দমন এসব করেই হিটলার নির্বাচনে বাজিমাত করেন। যেহেতু হিটলারের হাতে ছিলো ব্যাপক ক্ষমতা তাই তিনি এটা সহজে করতে পারতেন।

শুরু হলো বই পোড়ানো উৎসব। ১৯৩৩ সালের মে মাসে বার্লিনে বই পোড়ানো উৎসব শুরু হয়। যে সমস্ত বইগুলো জার্মান ভাবধারা বিরোধী বলে গন্য হতো, সে সমস্ত বইগুলো লাইব্রেরী থেকে এনে স্তুপ করে পোড়ানো হতো। কি ভয়ংকর ব্যাপার! বিখ্যাত সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জ্যাক লন্ডন এমনকি হেলেন কেলারের মতো মনীষীর বইগুলো পোড়ানো শুরু করলো হিটলারের নাৎসী বাহিনীর সমর্থকরা। সারাদেশ ব্যাপী ৪০ লাখেরও বেশি সক্রিয় কর্মী হিটলারের। বার্লিনের এমন একটা বই পোড়ানো উৎসবের প্রধান অতিথি ছিলেন হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবল্‌স। মানবসভ্যতার অন্যতম ঘৃণ্য কাজ হয় জার্মানিতে। জার্মানির মতো একটা জ্ঞানপিপাসু ও সৃষ্টিশীল জাতির এরকম বর্বর কাজ দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ে পুরো ইউরোপ।

ধীরে ধীরে হিটলার যখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে লাগলেন, তখন হিটলার অন্যরকম এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন। চ্যালেঞ্জটা আসলো তারই সহযোগীদের কাছ থেকে। ব্যাপারটা হলো, হিটলার চ্যান্সেলর হবার পর দেশের অভিজাত সম্প্রদায় ও সামরিক অফিসাররা তাকে সমর্থন দিয়ে আসছিলো। হিটলার সমাজের সবার মন যোগানোর চেষ্টা করছিলো। তাই এ মুহূর্তে রাস্তার

গুণ্ডা তথা তার প্যারামিলিটারী বাহিনীর দরকার আর ছিলো না। এ বাহিনীর প্রধান ছিলেন আর্নস্ট রুহম। রুহম ১৯১৯ সাল থেকেই হিটলারের পাশে থেকে তাকে সফল করে তোলেন। রুহম ছিলেন কিছুটা সমাজতন্ত্রী টাইপের মানুষ। রুহম না থাকলে হিটলার রাজনীতিতে এতদূর আসতে পারতেন না। রুহমের নেতৃত্বাধীন প্যারামিলিটারী বাহিনী সামরিক বাহিনীর সমান্তরাল বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠতে চাইলো। ৪০ লাখ প্যারামিলিটারী বাহিনীর প্রধান রুহম নিজেই গণবাহিনী গড়ে তুলতে চাইলেন। বিপদ দেখলেন প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ ও সামরিক বাহিনী। তারা হিটলারকে হুমকি দিলেন অচিরেই যাতে এসব রাস্তার গুন্ডাদেরকে শায়েস্তা করা হয়। তা না হলে তারা আর হিটলারকে সমর্থন দিবেন না।

১৯৩৪ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখ। রুহম ও তাঁর প্যারামিলিটারী বাহিনীর উপর নেমে আসলো আযরাইলের গযব। হিটলার স্বয়ং উপস্থিত হয়ে গ্রেফতার করলেন রুহমকে। ৪০০ এর অধিক প্যারামিলিটারী বাহিনীর অধিনায়কদের গুলি করে হত্যা করা হয়। নেতাশূন্য হয়ে দিগ্বিদিক পালাতে থাকে প্যারামিলিটারী বাহিনীর সদস্যরা। রুহমকে একটা রুমে বন্দী করা হয়। তার হাতে পিস্তল দিয়ে বলা হয় আত্মহত্যা করতে। রুহম আত্মহত্যা করতে রাজি না হওয়ার কারণে তাকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয় হিটলারের ঘাতক বাহিনী। এভাবেই হিটলার তার দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধাকে হত্যা করে তার পথের কাঁটা দূর করেন। হিটলারের প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে আর কেউ রইলো না।

সরে গেলো পথের শেষ কাঁটাও: প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গের মৃত্যু

রুহমসহ প্যারামিলিটারী গ্রুপের অধিকাংশ নেতাকে হত্যা করার পর এই বাহিনী শেষ হয়ে যায়। সদস্যদেরকে নিয়মিত সামরিক বাহিনীতে নেয়া হয়। হিটলারের সামনে আর মাত্র একটা বাধা ছিলো। সেটা হলো ৮৭ বৎসর বয়স্ক প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ। ১৯২৫ সাল থেকেই তিনি জার্মানীর প্রেসিডেন্ট। তিনি হিটলারের সব কাজে সায় দেন না। প্রতিবাদ করেন সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্য থেকে। বয়োবৃদ্ধ হওয়ায় হিটলার তার বিরুদ্ধে কিছু করতেও পারেন না।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি হিটলারের। ১৯৩৪ সালের আগস্টের ২ তারিখ পরলোক গমন করেন হিন্ডেনবুর্গ। এবার হিটলারকে থামায় কে? দেশের সর্বময় ক্ষমতার মালিক হলেন হিটলার। কিসের গণতন্ত্র, কিসের ভোট, কিসের জোট সরকার? নাৎসী পার্টি ছাড়া সমস্ত দল নিষিদ্ধ হলো। পুরো জার্মানী হিটলারের আয়ত্তে আসলো। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫-এগারোটি বছর হিটলারের অঙ্গুলি হেলনে কাঁপতো পুরো বিশ্ব।

পর্ব-৩৩

হিটলারের রণহুংকার শুরু: লীগ অব নেশনস্ ছেড়ে চলে গেলো জার্মানরা-

১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে হিটলার যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তার আগের বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের সবকটি স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে যোগ দেয়। বিশ্বে যাতে আর কখনো যুদ্ধ না বাধে এজন্য সবাই মিলে অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিযোগিতা কমানোর ব্যাপারে তাগিদ দেয়। মাসের পর মাস সম্মেলন চললো। ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হওয়া সম্মেলনে কোনো মতৈক্যে পৌঁছার উপায় নাই। বেহুদা আলাপ চলতেই থাকলো। জুলাই মাসে জার্মানীর প্রতিনিধিরা সম্মেলন থেকে ওয়াকআউট করলো।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, ''জার্মানীর ওয়াকআউট করার কারণ কি?''

জারিফ বললো, সেই বৈষম্যের ভার্সাই চুক্তি। চিন্তা করো, জার্মানীকে সবদিক দিয়ে পঙ্গু করে ফেলা হয়েছিলো প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এই চুক্তি দিয়ে। ১ লক্ষের বেশি সেনা থাকতে পারবেনা। বিমানবাহিনী থাকতে পারবেনা। অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করতে পারবে না...এসব।

ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে জার্মানরা প্রস্তাব করেছিলো যে তারা তো ইতোমধ্যেই নিরস্ত্রীকরণের সব শর্ত মেনে চলেছে। এখন যদি অন্যান্য দেশগুলোও জার্মানীর মতো অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন কমায়, সেনাসংখ্যা হ্রাস করে তাহলেই কাঙ্খিত নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব।

'এটা তো অবশ্যই ভালো যুক্তি'-মামুনের প্রস্তাব।

কিন্তু জার্মানীর এ প্রস্তাবে ক্ষেপে উঠলো ফ্রান্স। ফ্রান্সের মতে, জার্মানী শয়তানের হাড্ডি । এজন্যই তাদের এ শাস্তি। অন্যান্য দেশগুলো নিরস্ত্রীকরণে যাবে কেন? জার্মানী যখন বুঝলো পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে নয় তখন সম্মেলন থেকে ওয়াকআউট করলো।

১৯৩৩ সালে হিটলার চ্যান্সেলর হবার পর হিটলার আবারও আলোচনার টেবিলে ফিরে এলেন। প্রতিনিধি পাঠালেন আগের প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। হিটলার নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে তার প্রতিনিধিদের ফেরত আসতে বললেন।

রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন হিটলার।

বলতে লাগলেন," জার্মানদেরকে কত অসহায় পেয়েছে আজ ফ্রান্স-ব্রিটেন। ছোট্ট রাষ্ট্র বেলজিয়াম, পোলান্ডও মাস্তানি করে জার্মানির সাথে। জার্মানদেরকে সবদিক

দিয়ে চেপে ধরে তারা নিজেরা অস্ত্রশস্ত্র কমানোর কোনো কথা বলছে না। এর একটা বিহিত করতেই হবে"।

জার্মানরা আর নিরস্ত্রীকরণ মানবে না বলে ঘোষণা দিলেন হিটলার। লীগ অব নেশনস্ থেকে বেরিয়ে যাবে জার্মানরা। কিসের চুক্তি, কিসের নিরস্ত্রীকরণ? লাখ লাখ বেকার জার্মান যুবকদেরকে সেনাবাহিনীতে চাকরি দাও। অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলো। প্রয়োজনে আবার যুদ্ধ হবে। এতসব কথা বলে হিটলার ক্ষেপিয়ে তুললেন পুরো জার্মান জাতিকে।

১৯৩৩ সালের ১৪ অক্টোবর। ১০ মাসও হয়নি হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হয়েছেন। লীগ অব নেশনস্ থেকে বেরিয়ে গেলো জার্মানি।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনও ভেঙ্গে গেলো। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! যে সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিযোগিতা কমানো, ব্যর্থ সম্মেলনের পর নতুন করে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ছড়িয়ে পড়লো পুরো ইউরোপ জুড়ে।

প্রথম শক্তিপরীক্ষায় সফল হিটলারঃ- দখল করলেন রাইনল্যান্ড

মামুন, গাইড বইয়ে একটা প্রশ্ন আছে 'সিগফ্রিড লাইন কি'?

উত্তরে বলা আছে, জার্মান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফ্রান্স কর্তৃক নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা। ব্যাপারটা হলো, এই মুহূর্তে ফ্রান্স-জার্মানির বন্ধুত্ব বিশ্বের সবচেয়ে সেরা বন্ধন। কিন্তু দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দুই প্রতিবেশী ছিলো মহাশত্রু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর হাতে এমন মার খেয়েছিলো ফরাসিরা, যে তারা এই লাইন নির্মান করতে বাধ্য হয়। যদিও আজকের দিনে সিগফ্রিড লাইনের কোনো অস্তিত্বই নেই। শুধু তাই নয় ফ্রান্স সীমান্ত বরাবর জার্মানীর ভূ-খন্ড নিয়ে তৈরী করা হলো আন্তর্জাতিক এলাকা, যেখানে বহুজাতিক বাহিনী থাকবে। জার্মানরা যাতে এই আন্তর্জাতিক এলাকা পার হয়ে ফ্রান্স দখল করতে না পারে সেজন্য ফ্রান্সের এই পদক্ষেপ।

পরাজিত জার্মানী চেয়ে চেয়ে দেখলো যে তার নিজ ভূ-খন্ড নিয়ে ছেলেখেলা খেলছে ফ্রান্স ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা। জার্মানীর জমি নিয়ে গড়া সেই আন্তর্জাতিক ভূ-খন্ডের নাম হলো 'রাইনল্যান্ড'।

১৯৩৬ সাল।

হিটলার চ্যান্সেলর হয়েছেন তিন বছর হলো। দেশের আপামর জনতা হিটলারের জন্য পাগল। লাখ লাখ জার্মান বেকার যুবক সেনাবাহিনীতে চাকরি পেয়েছে। অস্ত্র কারখানায় পুরোদমে অস্ত্র উৎপাদন শুরু। বিমানবাহিনী বাড়াতে লাগলেন হিটলার। নৌ-বাহিনীর কর্মকাণ্ডও থেমে নেই। ভার্সাই চুক্তিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে লীগ অব নেশনস্ থেকে ছিটকে পড়েছেন সেই ১৯৩৩ সালেই। হিটলারকে শাসন করার কেউ নেই।

ঠিক সেই সময়ে ১৯৩৬ সালে সেনাপতিদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন হিটলার। বললেন, "তোমরা কি দেখেছো? আমি এতবড় বাহিনী তৈরী করছি তারপরেও ফ্রান্স-ব্রিটেন আমাকে কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না। কারণ, তারা অন্যায়ভাবে জার্মানীর সাথে অনেক খারাপ আচরণ করেছে। আমি এর প্রতিশোধ তুলবই। শক্তি দিয়ে ফ্রান্সের অধিকার থেকে আমি ছিনিয়ে আনবো রাইনল্যান্ড-"

হিটলারের কথা শুনে শিউরে উঠলেন সেনাপতিরা।

-বলেন কি মহামান্য ফুরার? আরও কত ছোট ছোট দেশ আমাদের ভূ-খন্ড দখল করে বসে আছে। অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং সুইডেনের মতো দেশকে আমাদের ভূ-খন্ড দিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনি তাদেরকে শায়েস্তা না করে সবার আগে ফ্রান্সকে ধরতে চান কেন?"

হিটলার গর্জে উঠলেন, "না, ওসব ছোট দেশকে আমি হাতের মুঠোর মাছি মনে করি। শক্তি যখন দেখাবোই তখন ফ্রান্সের মতো জাত দুশমনদের সাথেই লড়বো আমি। আমার ইচ্ছায় তোমরা বাধা দিও না। কিভাবে কোনদিক দিয়ে আক্রমণ করা যায়, সেই চিন্তা করো। এটাই আমার নির্দেশ।"

হিটলারের অভিসন্ধি কিছুটা বুঝতে পেরে ফ্রান্স ও রাশিয়া সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। এবার হিটলার নাটক শুরু করলেন। বললেন, "ফ্রান্স ও রাশিয়া আবার জার্মানীকে আক্রমন করতে চায়। কেন তারা এ চুক্তিতে মিলিত হলো?" উপায়ান্তর না দেখে রাশিয়া আশ্বাস দিলো-"এ চুক্তি খুবই ফরমাল একটি চুক্তি। প্রয়োজনে জার্মানীর সাথেও আমরা এরকম চুক্তি করবো।"

রাশিয়ার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে ফ্রান্সের প্রতি চরমপত্র দিলেন হিটলার। বললেন, "তোমরা যদি সৎ থাকতে চাও তাহলে রাশিয়ার সাথে এ চুক্তি বাতিল করো, তা না হলে আমি যা ইচ্ছা তা করবো।"

ফ্রান্স জবাব দিলো, "স্বাধীন দেশ হিসেবে ফ্রান্স কার সাথে কি চুক্তি করবে এটার জন্য অন্য কোনো দেশের কাছে জবাবদিহি করতে সে বাধ্য নয়। হিটলার যা খুশি করুক।"

এবার শুরু হলো হিটলারের খেলাঃ

৭ মার্চ, ১৯৩৬।

ফ্রান্সের কাছ থেকে এমন জবাব পেয়ে খুশিই হলেন হিটলার। মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে তিনি আদেশ দিলেন তার বাহিনীকে ঝড়ের বেগে রাইনল্যান্ডে প্রবেশ করতে। বললেন, "জীবিত বন্দী হবে না। পালিয়েও আসতে পারবে না। প্রয়োজন বোধে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু সে মৃত্যু যেনো হয় রাইনল্যান্ডে। ফ্রান্সকে রাইনল্যান্ড থেকে বিতাড়িত করে আমি নিবো চরম প্রতিশোধ"

বিদ্যুৎ বেগে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো জার্মান বাহিনী। হিটলারের হাতেগড়া সেনাবাহিনীর প্রথম যুদ্ধ এটি। হিটলারের জন্য এটি ছিলো অ্যাডভেঞ্চার। হিটলার জানতেন, জার্মানীকে বাধা দেয়ার মতো নৈতিক সাহস ফ্রান্সের নেই। কারণ রাইনল্যান্ড নামে কথিত আন্তর্জাতিক এলাকা আদতে জার্মানীর। ফ্রান্স কিসের বলে এটাকে দখল করে রাখে?

হিটলারের বাহিনী বীরদর্পে রাইনল্যান্ডের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইউরোপের মানুষ আবার শঙ্কিত হয়ে পড়লো। ভাবলো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বুঝি বেধেই গেলো! লীগ অব নেশনস্ জরুরি মিটিংয়ের জন্য তোড় জোড় করতে লাগলো। কিন্তু ফ্রান্স এক্কেবারে নিশ্চুপ। তারা প্রতিবাদ করার সাহসও পায়নি। তাই হাত পা গুটিয়ে থাকলো লীগ অব নেশনস্ ।

মামুন বললো, "ফ্রান্স এরকম চুপ হয়ে যাওয়ার কারণ কি?"

জারিফ উত্তর দিলো, আসলে প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্স বিজয়ী হলেও যুদ্ধের মাসুল তাদের দিতে হয়েছিলো চরমভাবে। একটা যুদ্ধ মানে নাগরিক জীবনে কি দুর্ভোগ তা তারা হাড়ে হাড়ে জানতো। আর জানতো বলেই হিটলারের সাজ সাজ রব শুনে তারা আগেই স্থির করে রেখেছিলো, হিটলার যদি সত্যিই রাইন ল্যান্ডে সৈন্য পাঠায় তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে না। যার ভূ-খন্ড সে নিয়ে যাক। দরকার নেই পরের দেশ দখলে রাখার জন্য নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার। রাইনল্যান্ড ফিরিয়ে নিয়ে হিটলার খুশি হোন, আমরা শান্তিতে থাকি।

হিটলার কিন্তু 'রাইন' অধিকারকে তাঁর জীবনের বিরাট সাফল্য মনে করলেন। প্রথম যুদ্ধে তিনি হলেন সফল। ভাবলেন, তাঁর ভয়ে ফ্রান্স যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। অন্যপথে হয়তো আবার অধিকার করতে চাইবে। বিচার সালিশ বসাবে। তাই তাড়াতাড়ি তিনি অধিকৃত অঞ্চলে গণভোটের ব্যবস্থা করলেন। গণভোটের উদ্দেশ্য-অধিবাসীরা জার্মানীর অধীনেই থাকতে চায়, নাকি ফিরে যেতে চায় ফ্রান্সের তাবেদারে।

গণভোটের শতকারা ৯৮টি ভোট পড়লো জার্মানীর পক্ষে। বিজয়ী হলেন হিটলার। ছিনিয়ে আনলেন রাইনল্যান্ড ফ্রান্সের কাছ থেকে।

সেনাপতিদের নিয়ে ডিনার করলেন হিটলার।

বললেন, "কি! বলেছিলাম না, ফ্রান্স আমাদের বাধা দিতে পারবে না? আমাদের আরও অনেক কাজ বাকী। জার্মানীর সমস্থ ভূ-খন্ড আমরা উদ্ধার করবো শত্রুদের কাছ থেকে। তোমরা কেবল আমার নির্দেশ মেনে চলবে।"

মাথা ঝাঁকালো সেনাপতিরা তাদের মহামান্য ফুরারের কথায়।

পর্ব-৩৪

জন্মভূমি অস্ট্রিয়া দখল করলেন হিটলার :

প্রথম ধাক্কায় 'রাইনল্যান্ড' দখল করলেন হিটলার ১৯৩৬ সালে। ফ্রান্স-ব্রিটেনসহ বৃহৎ শক্তি কেউ বাধা দিলো না। কারণ রাইনল্যান্ড তো আদতে জার্মানিরই অংশ। ফ্রান্স ভাবলো, জার্মানির জমি ফিরিয়ে নিয়ে যদি হিটলার সন্তুষ্ট থাকে, তবে তাই হোক।

কিন্তু হায়! হিটলারের বাড় বেড়ে গেলো। লীগ অব নেশনস্ থেকে সরে পড়ার কারণে ভার্সাই চুক্তিকে এক কানাকড়ি মূল্য দিলেন না হিটলার। ভার্সাই চুক্তিতে বলা ছিলো জার্মানি ১ লাখের বেশি সৈন্য রাখতে পারবে না। কিন্তু ১৯৩৮ সালের শেষে হিটলারের সেনাবাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ালো ১৫ লাখ। জার্মানীর সব স্তরের লোকজন হিটলারকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিলো। কারণ সবাই বুঝতে পেরেছে হিটলারের পক্ষেই সম্ভব জার্মানীর হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা। আশেপাশের সব শত্রুকে সাইজ করার ক্ষমতা একমাত্র হিটলারেরই রয়েছে।

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাকে বলা হয় ইউরোপের প্রবেশদ্বার। শত শত বৎসর যাবত প্রতাপশালী হাপুসবুর্গ সাম্রাজ্যের রাজধানী ভিয়েনা ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বাতিঘর। প্রথম মহাযুদ্ধে হাপুসবুর্গ সাম্রাজ্যের অবসান হয়, অস্ট্রিয়া দেশটি হয়ে পড়ে খুব ছোট।

অস্ট্রিয়ার সমস্ত লোক জার্মান ভাষায় কথা বলে। হিটলারের জন্মভূমিও অস্ট্রিয়াতে। ভিয়েনা নগরীতে ব্যর্থ কিশোরকাল কাটিয়েছিলেন হিটলার চিত্রশিল্পী হবার বাসনায়। হিটলার যখন ১৯৩৬ সালে বিনা বাধায় 'রাইনল্যান্ড' দখল করলেন, তখন লোভে চকচক করলো হিটলারের চোখ। অস্ট্রিয়ার সবাই যেহেতু জার্মান ভাষায় কথা বলে, কি দরকার অস্ট্রিয়া আলাদা থাকার? আবার অস্ট্রিয়ার লোকজনও জার্মানীর গুণ্ডামিকে খুব পছন্দ করে। অস্ট্রিয়ার লোকজন চাইতো জার্মানীর সাথে একত্রে থাকতে পারলে পুরো ইউরোপে তারা জার্মানির সাথে মিলে মাস্তানি করতে পারবে।

ভার্সাই চুক্তির পরিকল্পনাকারীরা অস্ট্রিয়া আর জার্মানির এই দোস্তি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ভার্সাই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিলো, কোনো অবস্থাতেই অস্ট্রিয়া আর জার্মানি এক হতে পারবে না। অস্ট্রিয়া হলো স্বাধীন দেশ। কিন্তু হিটলারের এবার খায়েশ হলো পুরো অস্ট্রিয়া দখল করার।

কিন্তু দখল করতে হলে নাটক করা দরকার। কোনো উছিলা বের করতে হবে। নাটক করতে মহা উস্তাদ হিটলার। কিন্তু কোনো নাটক বানানোর আগেই আরেক

পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন ইতালীর একনায়ক মুসোলিনী। তৈরী হয় হিটলারের অস্ট্রিয়া দখলের মহা সুযোগ।

হিটলার-মুসোলিনী বন্ধুত্বের বলি হলো স্বাধীন অস্ট্রিয়াঃ

হিটলারের অনুকরণে অস্ট্রিয়াতে গড়ে উঠলো নাৎসী পার্টি। হিটলার প্রথমে চাইলেন নাৎসী পার্টি যাতে তার মতো জোর জবরদস্তি করে ক্ষমতা দখল করতে পারে। ১৯৩৪ সালের ২৫ জুলাই নাৎসী পার্টি অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ডলফিউসকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করলো। পুরোপুরি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটালো তারা।

পুরো ইউরোপ জেনে গেলো অস্ট্রিয়ার এই অভ্যুত্থান উগ্র মেজাজী হিটলারেরই কাজ। তাঁর আদেশেই অস্ট্রিয়ার নাৎসী পার্টি এই অরাজকতা সৃষ্টি করলো। কিন্তু গণ্ডগলো বাঁধালেন ইতালির ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনী। অস্ট্রিয়া ইতালির প্রতিবেশী এবং গভীর মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। নাৎসী পার্টিকে শায়েস্তা করার জন্য মুসোলিনী কয়েক ডিভিশন সৈন্য পাঠালেন। তারা অস্ট্রিয় বাহিনীর সাথে একযোগে নাৎসী পার্টির দখল থেকে ছিনিয়ে নিলো অধিকৃত স্থান। উপায়ান্তর না দেখে নাৎসী নেতারা পালিয়ে গেলো জার্মানীতে। শান্তি স্থাপিত হলো অস্ট্রিয়ায়। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো অস্ট্রিয়ার মানুষ।

হিটলার দেখলেন, এতো ভারী বিপদ! মুসোলিনীকে হাত না করলে অস্ট্রিয়া দখল করা যাবে না। হিটলার উগ্র মেজাজী হলে কী হবে? স্বার্থের বেলায় একেবারে ভেজা বিড়াল। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি যেচে মুসোলিনীর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

মুসোলিনী কিন্তু প্রথম থেকেই হিটলারকে পছন্দ করতেন না। সারাক্ষণ হাত পা ছোঁড়াছোড়ি করে আর গরম গরম ভাষণ দেয় লোকটা। মুসোলিনীর চোখে হিটলার ছিলেন সার্কাসের এক জোকার। মুসোলিনীর কাছে পাত্তাই পেলো না হিটলার।

কয়েক বছর যেতে না যেতেই এই মুসোলিনী গায়ে পড়ে বন্ধুত্ব করেছিলেন হিটলারের সাথে। গরজ বড় বালাই। রাজনীতিতে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই। শত্রুতাও টিকে থাকে না যুগ যুগ ধরে। সব কিছুর মূলে স্বার্থ। যখনই স্বার্থ উদ্ধার করার প্রয়োজন পড়ে তখনই সৃষ্টি হয় বন্ধুত্ব। আর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলেই শত্রুতা।

ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনী ১৯৩৫ সালে আফ্রিকার স্বাধীন দেশ আবিসিনিয়া দখল করলেন সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে। পুরো ইউরোপ ছিঃ ছিঃ করতে লাগলো মুসোলিনীর এই ডাকাতির ঘটনায়। ফ্রান্স-ব্রিটেন তীব্র তিরস্কার জানালো মুসোলিনীকে।

মুসোলিনীর এই কাজে সমর্থন দান করলেন হিটলার। মুসোলিনী তো অবাক। হিটলারের কাছ থেকে কোনো সমর্থন তিনি আশা করেন নি। বরং ভেবেছিলেন যে হিটলার হয়তো মুসোলিনীর শত্রুদের সাথে হাত মিলাবে।

অসময়ের বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মুসোলিনী। হিটলার তা বুঝতে পেরে আগেই আমন্ত্রণ জানালেন মুসোলিনীকে।

১৯৩৭ সাল।

আনন্দে গদগদ চিত্তে মুসোলিনী হাজির হলেন জার্মানীর মিউনিখ শহরে। চতুর হিটলার মুসোলিনীকে জানালেন জাঁকজমকপূর্ণ শাহী সংবর্ধনা। সে এক এলাহী কাণ্ডকারখানা। তার সংবর্ধনা মিটিংয়ে হাজির হয়েছিলো দশ লাখের মতো জার্মান নাগরিক। সে যুগে সেটা ছিলো পৃথিবীর বিশালতম জনসমাবেশ। মোহিত হয়ে গেলেন মুসোলিনী। হিটলারকে তখন আর বদ্দ পাগল বলে মনে হলো না তার।

মুসোলিনী চিরদিনের জন্য হিটলারকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করার প্রতিজ্ঞা করার কথা ঘোষণা করলেন। তিনি ভুলে গেলেন অস্ট্রিয়ার স্বার্থের কথা। তিনি ধরা পড়ে গেলেন হিটলারের খপ্পরে।

অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলরকে ডেকে এনে হুমকি দিলেন হিটলার:

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। কার্টভন গুসনিগ তখন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর। হিটলারের আশীর্বাদপুষ্ট নাৎসী নেতাদেরকে দাবড়ানি দিয়ে তিনি ক্ষমতায় আছেন। হিটলার তাকে এক শুভেচ্ছা সফরে আমন্ত্রণ জানালেন জার্মানীতে। বলা নেই কওয়া নেই, হিটলার তাকে নিয়ে গেলেন কনফারেন্স রুমে। সাথে সাথে বন্ধ করে দেওয়া হলো দরজা। আসন গ্রহণপর্ব শেষ হতেই হিটলার ফেটে পড়লেন আগ্নেয়গিরির মতো। চিৎকার করে উঠলেন সিংহের গর্জনে। টেবিলে সজোরে মুষ্ঠঘাত করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি, কতজন সৈন্য রয়েছে তোমার ছাউনিতে? গোলাবারুদের মজুদ কতো? কয়খানা প্লেন রয়েছে তোমার? চড়ুইপাখির মতো ছোট একটা দেশ। তার চ্যান্সেলর হয়ে মনে করেছ স্বর্গ পেয়োছা হাতে। সাহস করেছো বাজপাখির সাথে লড়াই করতে!"

কি বলেছেন মহামান্য ফুরার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কেন যুদ্ধ করতে যাবো আপনার সাথে?-অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর।

যুদ্ধ করতে চাওনা ভালো কথা কিন্তু অস্ট্রিয়ার নাৎসী পার্টির কর্মীদের প্রতি অত্যাচার করছে তোমার সরকার। তাদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করো। কথায় কথায় বন্দী করে জেলে পাঠাও কেন?

অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেরল জবাব দিলেন, ‘‘সেটা তো আমার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমার দেশের শৃঙ্খলা নষ্ট করেছে যারা, সার্বভৌমত্বে আঘাত হানছে যে দল, তাদের কি আমরা কিছুই বলবো না? অপরাধের শাস্তি দিবো না? আপনি হলে কি করতেন?”

হিটলার বলতে লাগলেন-“চুপ করো বেয়াদব, তোমার অনেক ফাজলামো সহ্য করেছি। আজকেই সব শেষ করে দিতে চাই। তুমি মনে করেছে, ইতালি তোমাকে সাহায্য করবে? ছয় কোটি জার্মানীর ফুরার আমি। মুসোলিনীর মাথায় তো গোবর নেই যে আমাকে বাদ দিয়ে তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন? ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স আমাকে অসন্তুষ্ট করে তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না। মাত্র কয়েকটা ঘন্টার প্রয়োজন। অস্ট্রিয়া আমার মাতৃভূমি। আমার প্রিয় অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর সাথে জুড়ে দেয়ার জন্য যা যা করা দরকার আমি করবো।”

অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর বললেন-“ মহামান্য ফুরার, দু বছর আগে আপনি আমাদের সাথে একটা শান্তি চুক্তি করেছিলেন”

“যখন প্রয়োজন ছিলো করেছি। এখন আর ওসব চুক্তি-টুক্তির ধার ধারি না আমি। তুমি নিজের ইচ্ছায় জার্মানীর সাথে যোগ দিবে কিনা বলো” হিটলারের পাল্টা জবাব।

‘‘আমাকে ভুল বুঝবেন না ফুরার। আমি দেশের নির্বাচিত চ্যান্সেলর। দেশবাসী দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে। অপরের কাছে স্বেচ্ছায় দেশটাকে উঠিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার নেই।”

হিটলার বুঝলেন, সোজা লোক নন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর কার্টভন গুসনিগ। তিনি কলিং বেল টিপলেন। পাশের ঘর থেকে জেনারেলের পোশাক পরিহিত, কোমরে তলোয়ার ঝুলানো অবস্থায় প্রবেশ করলেন জেনারেল কাইটেল। হিটলার চোখ গরম করে প্রশ্ন করলেন জেনারেল কাইটেলকে, ‘‘জেনারেল, অস্ট্রিয়া দখল করতে তোমার কতো সময় লাগবে?”

কাইটেল উত্তর দিলেন, “কয়েক ডজন বোমারু বিমান একসাথে বোমা ফেলে নাস্তানাবুদ করে দিয়ে আসবে প্রথমে। তারপর শ্মশানের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পদাতিক বাহিনীর যতটুকু সময় লাগে?”

হিটলারের এমন হুমকিতেও অনড় রইলেন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর। শেষে বাধ্য হয়ে নমনীয় হলেন হিটলার নিজেই। বললেন, “তোমাকে একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। সেটা হলো তোমার দেশে নাৎসী পার্টির উপরে যে নিষেধাজ্ঞা আছে, তা উঠিয়ে দিতে হবে। নাৎসী পার্টির সকল সদস্যকে মুক্তি দিতে হবে। অস্ট্রিয়ার নাৎসী পার্টির নেতা ইনকোয়ার্টকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।”

হিটলারের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে মনে অনেক কষ্ট নিয়ে নিজের দেশে পাড়ি জমালেন ছোট্ট দেশ অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর।

হিটলার কিন্তু দখল করেই ছাড়লেন অস্ট্রিয়াঃ

বাংলা প্রবাদ আছে দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। অস্ট্রিয়া দখল করার সব প্রস্তুতি ভিতরে ভিতরে নিয়েই রাখছেন হিটলার। আগেই বলেছিলাম, অস্ট্রিয়ার লোকজনের একটা অংশ জার্মানীর সাথে মিশে যেতে প্রস্তুত ছিলো। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর শুসনিগ দেশে গণভোটের আয়োজন করতে চাইলেন। অস্ট্রিয়া স্বাধীন থাকতে চায়, নাকি জার্মানীর অধীনে যেতে চায়-এ মর্মে গণভোট।

গণভোটের কথা শুনে হিটলারের মেজাজ বিগড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন যুদ্ধবাজ সেনাপতিদের। অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করে সীমান্তে প্রহরারত সেনাপতিদের আদেশ দিলেন, ''অস্ট্রিয়া আক্রমণ করো, আমি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় তোমাদেরকে নিয়ে মিলনমেলা করবো।"

হিটলারের নির্দেশ পেয়ে অস্ট্রিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো জার্মান ফৌজ। অস্ট্রিয়ার ভেতরের নাৎসী পার্টির কর্মীরা স্বাগত জানালো জার্মান সৈন্যদের। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলরকে আবারও হুমকিবার্তা পাঠালেন হিটলার। বললেন, "চুপ করে বসে থাকো। তোমার সৈন্যবাহিনী যদি আমার সৈন্যবাহিনীকে বাধা দেয় তাহলে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিবো তোমাকে।"

যে কথা সেই কাজ।

অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী নির্দেশ না পেয়ে বসে থাকলো। কয়েক ঘন্টার মধ্যে হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করলেন। নিজে উপস্থিত হলেন রাজধানী ভিয়েনায়। বিশাল জনসমাবেশে হিটলার ভাষণ রাখলেন, "আপনাদের ভয় পাবার কিছু নাই। আমরা আপনাদের শত্রু নই, বন্ধু। অস্ট্রিয়া আর জার্মানি মায়ের পেটের ভাই। আপনারা হয়তো জানেন না, আমি অস্ট্রিয়ারই সন্তান। এই অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ শহরে আমার জন্ম। আমার পিতামাতার কবর রয়েছে সেখানে। একটু পরেই আমি যাত্রা করবো আমার গ্রামের উদ্দেশ্যে। তার আগে বলতে চাই, আমি অস্ট্রিয়াকে অত্যন্ত ভালোবাসি। তাই অস্ট্রিয়াবাসীর ভাগ্য জার্মানীর সাথে মিলিয়ে দিলাম।"

হিটলারের ভাষণ শুনে সমবেত জনতার বিপুল করতালি।

তারপর হিটলার একাকী চলে গেলেন পিতামাতার কবরের কাছে। পাষাণ হৃদয় হিটলার অনাথ শিশুর মতো অঝোরে কাঁদলেন। নিস্তব্ধ গোরস্থানে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন হিটলার।

কয়েকদিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো গণভোট। জার্মানীর অঙ্গরাজ্য হিসেবে থাকার পক্ষে অস্ট্রিয়াবাসী শতকরা ৯৯.৭৫ হারে ভোট দিলো। নির্বাচনে কিভাবে জিততে হয়, সে খেলা হিটলারের জানা আছে। পুরো বিশ্বকে দেখাতে চাইলেন, দেখো, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যম অস্ট্রিয়াবাসী জার্মানীর সাথে থাকতে চায়। ভীত প্রদর্শন বা জোর জবরদস্তি করা হয়নি কাউকে কোথাও।

হিটলারের প্রাণের বন্ধু মুসোলিনী সমর্থন জানালেন হিটলারের অস্ট্রিয়া দখলকে। ব্রিটেন-ফ্রান্স শঙ্কিত হলো, কিন্তু প্রকাশ্যে কোনো তৎপরতাই দেখালো না।

এভাবে একটাও বুলেট খরচ না করে স্বাধীন দেশ অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর অঙ্গরাজ্য বানালেন হিটলার।

যদিও খেলা এখনো শুরুই হয়নি হিটলারের। আরও অনেক কিছু দেখানোর বাকী আছে হিটলারের।

পর্ব-৩৫

এবার চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে নজর দিলেন হিটলারঃ

জারিফের বর্ণনায় মুগ্ধ মামুন প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা, হিটলার ১৯৩৫ সালে রাইনল্যান্ড দখল করলো এবং ১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়া দখল করলো। এরপরও ব্রিটেন-ফ্রান্স কোনো পদক্ষেপ নিলো না কেন?- তারা কি হিটলারকে থামাতে পারতোনা ?

জারিফ বললো, তোমার এই প্রশ্নটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা একাডেমীর ডিকশনারীতে Appease-শব্দের বাংলা অর্থ দেখবে। সেখানে বলা আছে- Appease শব্দের অর্থ হচ্ছে কাউকে শান্ত বা প্রশমিত করা। কিংবা বলা যায়, কারও রাগ কমানো। Appease-শব্দ থেকে এসেছে-Appeasement theory-প্রশমন নীতি। ব্যাপারটা হলো, যেহেতু প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো তাই জার্মান জাতির পক্ষ থেকে ক্ষুব্ধ হিটলার কিছু জমি দখল করলে করুক-এরকম মনোভাবই ছিলো ব্রিটেন-ফ্রান্সের। এরকম কিছু জমি দখল করে যদি হিটলার শান্ত হয় তাহলে তো বেশ হয়। এটাই মনে করেছিলো ব্রিটেন-ফ্রান্স। তথাকথিত প্রশমন নীতিই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সৃষ্টির অন্যতম একটা কারণ-এটা সত্য। প্রথম থেকেই হিটলারকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতো।

সে যাই হোক, চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করার নাটকীয় কাহিনী শুনে হিটলারের শয়তানি বুদ্ধির পরিচয় পাবে তুমি।

মামুন আবার বললো, "বর্তমানে বোধহয় চেকোশ্লোভাকিয়া ভেঙ্গে দুটি দেশ হয়েছে। একটি দেশের নাম চেক প্রজাতন্ত্র যার রাজধানীর নাম-প্রাগ; আরেকটির নাম-শ্লোভাকিয়া যার রাজধানীর নাম বাটিস্লাভা।" ঠিক।

চেকোশ্লোভাকিয়া সমস্যার মূল কাহিনীঃ

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ভেঙে চেকোশ্লোভাকিয়া দেশটির সৃষ্টি হয়। জার্মানীর কাছ থেকে এগারো হাজার বর্গমাইল এলাকা কেটে নিয়ে এ দেশটিকে দেওয়া হয়। জার্মানীকে দুর্বল করার এটাও একটা মিত্রবাহিনীর ষড়যন্ত্র। এগারো হাজার বর্গমাইল এলাকা পরিচিত ছিলো 'সুডেটানল্যান্ড' নামে। এখানে প্রায় ৩০ লক্ষ জার্মান নাগরিক বাস করতো। এখানের অধিবাসীরাও জার্মানীর সাথে মিশে যেতে চাইতো।

রাইনল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া দখল করার পর হিটলারের সাহস আরও বেড়েছে।

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮ সাল-

হিটলার ঘোষণা করলেন, ''প্রতিবেশী যে সকল রাষ্ট্রে জার্মান ভাষাভাষী নাগরিক আছে, তাদের ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব জার্মানীর আছে।" ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে অস্ট্রিয়া দখল করার পর হিটলার সদম্ভে ঘোষণা করেন যে- **"চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে সুডেটানল্যান্ড দখল করবো আমি।** কারন চেকোশ্লোভাকিয়া সুডেটানল্যান্ডের জার্মান ভাষীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আমি আর এসব সহ্য করবো না। দেখি ব্রিটেন-ফ্রান্স আমার কি করে?"

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর নাম নেভিল চেম্বারলিন। ভদ্রলোক বয়স্ক মানুষ, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। হিটলারের এসব হুমকি ধামকি শুনে নিজেই বার্লিনে এলেন মিটিং করতে। হিটলারকে ঠান্ডা করাই তার কাজ।

তিনি হিটলারকে বললেন, ''আমরা কেউই এখনো প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারিনি। দেশগড়ার কাজে নতুন করে কেবল হাত দিয়েছি। এই সময় সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনি কি সব কথাবার্তা আরম্ভ করেছেন।"

''আমি ঠিকই বলেছি। গত যুদ্ধে আপনারা আমাদের মেরুদন্ড দুমড়ে দিয়েছেন, কিন্তু ভাঙতে পারেন নি। সেই দুমড়ানো মেরুদন্ড নিয়ে এখন আমরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমাদের হারানো জমি ও সন্মান আদায় করতে চাই।"

''সেজন্য কি চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো ক্ষুদ্র দেশের উপর অন্যায় আক্রমণ চালাতে হবে?"

হিটলার উত্তর দিলেন, "আপনি আমাদের মেহমান মিঃ চেম্বারলিন! না হলে শিখিয়ে দিতাম কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়? অন্যায়ভাবে জার্মানীর এগারো হাজার বর্গমাইল এলাকা চেকোশ্লোভাকিয়া ভোগ করতেছে, সেটা অন্যায় হয়নি?

চেক সরকার আপনার মতো বন্ধুদের সহায়তায় আমাদের সেই হারানো জমি থেকে লক্ষ লক্ষ নিরীহ জার্মানবাসীকে উচ্ছেদ করেছে, সেটা অন্যায় হয় না? অন্যায় হয় হারানো জমি উদ্ধার করতে চাইলে? এই আপনাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ?"

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন ব্যক্তি ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদও বটে। উগ্র মেজাজী হিটলারের উত্তেজনাময় প্রশ্নাবলীর জবাব তিনি তৎক্ষণাৎ দিলেন না। মার্জিত ভাষা ব্যবহার করে তিনি হিটলারকে পরোক্ষ ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের পরিণতি কি হতে পারে। তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে, রাশিয়া আর ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার্থে ওয়াদাবদ্ধ। তারা বৃহৎশক্তি ও আপনার নিকট প্রতিবেশী।"

হিটলার উত্তর দিলেন, সেটা আমি জানি। এরপরও কি আপনি চেকোশ্লোভাকিয়ায় সৈন্যবাহিনী পাঠাতে চান?"

আবারও হিটলার উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, চাই। আমার দেশের জমি আমি ফিরে পেতে চাই যেকোনে মূল্যে।"

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী আবার বললেন, "ফ্রান্স আর রাশিয়া যদি সে পথে বাঁধা দিতে আসে?"

হিটলার বললেন, "আমি সর্বশক্তি দিয়েই তাদের মোকাবেলা করবো। পারলে যুদ্ধ আরেকবার হবে"

হিটলার যতো উত্তেজিত হন, চেম্বারলিন হন ততো শান্ত। আরেকটা যুদ্ধ এড়িয়ে চলাই তার উদ্দেশ্য। আবার তিনি হিটলারকে প্রশ্ন করলেন, "মানলাম, আপনি যুদ্ধ করতে চান। কিন্তু শক্তি ব্যবহার না করে কি কোনো আপোষ করা যায় না?"

হিটলার বললেন, "আপোষ করা যায় এক শর্তে। এগারো হাজার বর্গমাইল এলাকা জার্মানীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আপনি আপনার বন্ধু চেকোশ্লোভাকিয়ান সরকারকে বলেন যেন সুডেটানল্যান্ড থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়। তাহলেই আমি খুশি।"

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী রাজি হলেন হিটলারের প্রস্তাবে। ফ্রান্স সরকারকে এ ব্যাপারে রাজি করিয়ে তিনি ফিরে গেলেন নিজ দেশে। যুদ্ধোন্মাদ হিটলারকে ঠেকাতে রাজি হলো ফ্রান্সও।

কিন্তু একি! ব্রিটেন-ফ্রান্সের এরকম নমনীয় আচরণের মাঝেও হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়াকে আলটিমেটাম দিলেন এক অজুহাত তুলে। অজুহাতটা হলো, চেক সরকার নাকি সুডেটানল্যাণ্ডে বসবাসরত জার্মান নাগরিকদেরদের উপর অত্যাচার করছে। ১৯৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সুডেটানল্যাণ্ড থেকে সমস্ত

চেক সৈন্য সরিয়ে ফেলতে হবে। হিটলার এ মর্মে হুমকি দিলেন চেকোশ্লোভাকিয়াকে।

হিটলারের এই হুংকার শুনে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো চারদিকে। সবাই ভাবলো, আরেকটা মহাযুদ্ধ বোধহয় লেগেই গেলো! পুরো ইউরোপ জুড়ে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দালাদিয়ের ব্রিটেনকে জানিয়ে দিলেন, "যে পাগলামো শুরু করছে হিটলার, আর বসে থাকা যায় না। যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে জোর করে সুডেটানল্যাণ্ড ছিনিয়ে নেয় হিটলার তাহলে অবশ্যই যুদ্ধ করবে ফ্রান্স। অনেক বাড় বেড়েছে হিটলার। তাঁকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমরা কিছু বলছি না দেখে হিটলার আমাদের দুর্বল মনে করছেন।"

মিউনিখ চুক্তি ১৯৩৮:-চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে সুডেটানল্যান্ড ফিরে পেলেন হিটলার:

এই ফাঁকে আসর গরম করতে মাঠে নামলেন হিটলারের দোস্ত ইতালির একনায়ক মুসোলিনী। মুসোলিনী হিটলারের কাছে দূত পাঠালেন। বার্তা দিলেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমি আরেকবার ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাথে আলোচনার টেবিলে বসতে চাই। আপনি রাজি হলে জার্মানীতে বসেই আলোচনা করবো। আপনার অনুকূলে যাতে পরিস্থিতি যায় সে চেষ্টাই করবো সর্বাত্মক।

মুসোলিনীর উপর হিটলারের অগাধ বিশ্বাস। তিনি মুসোলিনীকে বললেন, "আপনি আলোচনার ব্যবস্থা করুন। আমি রাজি।"

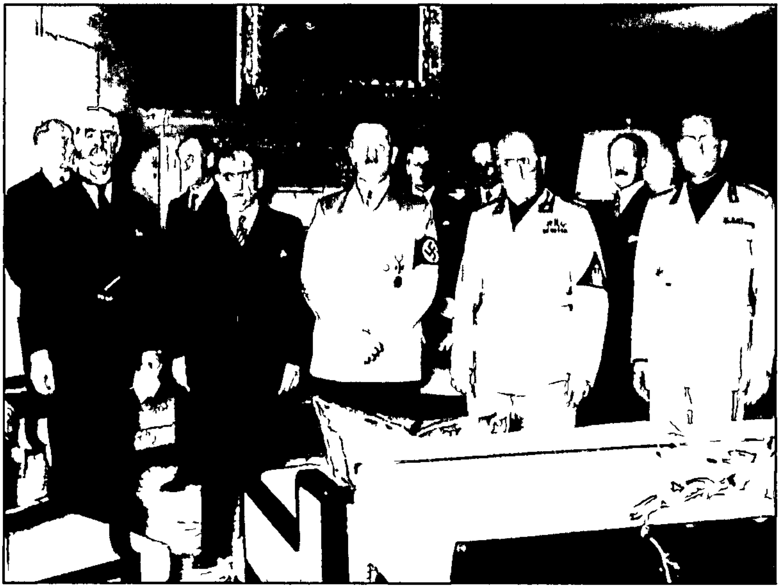
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

জার্মানীর মিউনিখ নগরীতে চার দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিতে একটা সম্মেলন হলো। ইতালির মুসোলিনী, জার্মানীর হিটলার, ব্রিটেনের চেম্বারলিন এবং ফ্রান্সের দালাদিয়ের। চার নেতা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার সুডেটানল্যাণ্ড এলাকা আদতে জার্মানীরই ছিলো। প্রথম মহাযুদ্ধের উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সেটা জার্মানীর কাছ থেকে কেটে নেওয়া হয়। তাই জার্মানীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সুডেটানল্যাণ্ড এলাকা তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তারপর যাতে হিটলার আর কোনো পাগলামি না করে।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "চেকোশ্লোভাকিয়াকে কি এ ব্যাপারে আপত্তি জানায়নি?"

জারিফ বললো, "চেকোশ্লোভাকিয়াকে দাওয়াতই দেয়া হয় নি সম্মেলনে। ছোট দেশ হওয়ায় চেকোশ্লোভাকিয়া কোনো মতামত প্রদান করার সুযোগটুকু পর্যন্ত পায় নি"

যা হোক, মিউনিখ চুক্তি হওয়ার পর হিটলার হলেন বেজায় খুশি। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভাবলো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর হবে না। জমি ফেরত দিয়ে সন্তুষ্ট করা হলো হিটলারকে। মহাযুদ্ধের মরণ খেলা থেকে কৌশলে বিরত রাখা হলো তাকে।



চিত্র ২১ : বাম দিক থেকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন, ফরাসী প্রেসিডেন্ট দালাদিয়ের, জার্মানির একনায়ক হিটলার ও ইতালির শাসক মুসোলিনী। উক্ত চার নেতা একত্রে মিলে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে সুডেটানল্যান্ড জার্মানিকে দিয়ে দেন।

বাংলা সিনেমার রাজীব-হুমায়ুন ফরীদি স্টাইলে পুরো চেকোশ্লোভাকিয়া দখলঃ-

জারিফ বলা শুরু করলো, নব্বই দশকে বাংলা সিনেমার খ্যাতিমান খল অভিনেতাদের অন্যতম ছিলেন রাজীব ও হুমায়ুন ফরীদি। অধিকাংশ সিনেমাতেই দেখা যেতো জোর করে প্রতিপক্ষকে দলিলে সই করিয়ে নিতেন এই খল অভিনেতারা। জায়গা-জমি দখল করতেন এই জোর করে নেওয়া সইয়ের বদৌলতে।

হিটলার ঠিক এমনই এক ঘটনা ঘটালেন চেকোশ্লোভাকিয়াকে কেন্দ্র করে।

যে বাঘ একবার নরমাংসের স্বাদ পেয়েছে তাকে বাগে আনা বড় কঠিন। মিউনিখ অধিবেশনে সমস্ত চাহিদা পূরণ হওয়া সত্ত্বেও বার বার হিটলারের মনে হতে লাগলো তিনি ঠকেছেন। তিনি ভাবলেন, আরে! যুদ্ধ লাগলে তো পুরা

যা হোক, মিউনিখ চুক্তি হওয়ার পর হিটলার হলেন বেজায় খুশি। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভাবলো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর হবে না। জমি ফেরত দিয়ে সন্তুষ্ট করা হলো হিটলারকে। মহাযুদ্ধের মরণ খেলা থেকে কৌশলে বিরত রাখা হলো তাকে।



চিত্র ২১ : বাম দিক থেকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন, ফরাসী প্রেসিডেন্ট দালাদিয়ের, জার্মানির একনায়ক হিটলার ও ইতালির শাসক মুসোলিনী। উক্ত চার নেতা একত্রে মিলে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে সুডেটানল্যান্ড জার্মানিকে দিয়ে দেন।

বাংলা সিনেমার রাজীব-হুমায়ুন ফরীদি স্টাইলে পুরো চেকোশ্লোভাকিয়া দখলঃ-

জারিফ বলা শুরু করলো, নব্বই দশকে বাংলা সিনেমার খ্যাতিমান খল অভিনেতাদের অন্যতম ছিলেন রাজীব ও হুমায়ুন ফরীদি। অধিকাংশ সিনেমাতেই দেখা যেতো জোর করে প্রতিপক্ষকে দলিলে সই করিয়ে নিতেন এই খল অভিনেতারা। জায়গা-জমি দখল করতেন এই জোর করে নেওয়া সইয়ের বদৌলতে।

হিটলার ঠিক এমনই এক ঘটনা ঘটালেন চেকোশ্লোভাকিয়াকে কেন্দ্র করে।

যে বাঘ একবার নরমাংসের স্বাদ পেয়েছে তাকে বাগে আনা বড় কঠিন। মিউনিখ অধিবেশনে সমস্ত চাহিদা পূরণ হওয়া সত্ত্বেও বার বার হিটলারের মনে হতে লাগলো তিনি ঠকেছেন। তিনি ভাবলেন, আরে! যুদ্ধ লাগলে তো পুরা

চেকোশ্লোভাকিয়া তিনি দখল করতে পারতেন। কি দরকার ছিলো চুক্তির নামে এতসব ভদ্রতা করার?

পুরো চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করার লোভে পেয়ে বসলো হিটলারকে। শেষ পর্যন্ত একটা উপায় তিনি বের করলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট মিঃ হাচাকে দাওয়াত দিলেন জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে। সাড়ম্বর সংবর্ধনা দেওয়া হলো তাকে বিমানবন্দরে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট ভাবলেন, "এতোদিন পরে হিটলারের সুমতি হয়েছে। প্রতিবেশী দেশের সাথে মিলেমিশে চলার সিদ্ধান্ত বোধহয় তিনি নিয়েছেন"

রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার পর দুপক্ষের সদস্যরা হাজির হলেন জার্মান চ্যান্সেলারীতে। হালকা রসিকতা, হাসি তামাশা চললো কিছুক্ষণ। এবার হিটলার শুরু করলেন তার আসল খেলা।

টাইপ করা একটা চুক্তিপত্র তিনি দিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট মিঃ হাচাকে। আগ্রহভরে হাত বাড়িয়ে গ্রহন করলেন মিঃ হাচা।

চুক্তিটি পড়া শুরু করতেই মুখের আভা রক্তিম হয়ে গেলো মিঃ হাচার। তাঁর মনে হলো–মালাকুল মওতের সামনে পড়েছেন তিনি। আসলে চুক্তিতে লেখা ছিলো যে জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়া খুশি মনে এক দেশে পরিণত হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানীর সাথে মিশে গেছে।

সংগত কারণেই এ চুক্তি মেনে নিয়ে সই করা সম্ভব নয় চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্টের পক্ষে।

হিটলার জানতেন এ চুক্তিতে সই করবে না মিঃ হাচা। নিজ দেশের সার্বভৌমত্বকে বিক্রি করে দিবে কোন মূর্খ? হিটলার ডাকলেন তার সহকর্মী গোয়েরিংকে।

বললেন, "প্রেসিডেন্ট হাচা এখানে বসা থাকতেই তুমি চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করতে পারবে না"?

গোয়েরিং বললেন, "প্রিয় ফুরার, আপনি বললে আমাদের বোমারু বিমানগুলো দিয়ে পুরো চেকোশ্লোভাকিয়ার আকাশ ঢেকে দিতে পারি। চাঁদ-সুরুজ আটকা পড়ে যাবে আমাদের প্লেনের আড়ালে।"

প্রেসিডেন্ট হাচার দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগলো। মাথাটা ঘুরতে লাগলো তার। হিটলারের নাটক তখনও শেষ হলো না। তিনি এবার জেনারেল কাইটেলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের জন্য তোমার কতো সময়ের প্রয়োজন? কতো ফৌজ তুমি মোতায়েন রেখেছো?"

কাইটেল বললেন, "আমাদের সমগ্র বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে প্রিয় ফুরার। আদেশ পাওয়া মাত্রই আমরা আক্রমণ চালাতে সক্ষম"।

হিটলার প্রেসিডেন্ট হাচাকে দেখিয়ে বললেন, "চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করার পর আমার সামনে যে বলদটা বসে আছে, তখন তার কি হবে?"

কাইটেল বললেন, "মাত্র একটা বুলেট ব্যবহার করে তার মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেওয়া হবে।"

হিটলার হো হো করে হেসে বললেন, "মিঃ প্রেসিডেন্ট! এরপরও কি আপনি দলিলে সই করবেন না?"

সবাই দেখলেন, হিটলারের এসব নাটক দেখে জ্ঞান হারালেন চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট মিঃ হাচা। হিটলারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ মোরেল গেলেন সেখানে। জ্ঞান আনার জন্য দিলেন একটা ইনজেকশন।

কিছুক্ষন পর অসুস্থ প্রেসিডেন্টকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হলো হিটলারের সামনে। আসন গ্রহন করলেন তিনি অতি কষ্টে। কলম উঠিয়ে দেয়া হলো তাঁর হাতে। কম্পিত হস্তে অবশেষে সই করতে বাধ্য হলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট মিঃ হাচা।

পরেরদিন সংবাদপত্রের মারফত সারা বিশ্বের মানুষ জানলো-"গতকাল এক ঐতিহাসিক আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন জার্মানীর হিটলার আর চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট হাচা। বিস্তারিত আলোচনার পর উভয় রাষ্ট্রপধান একমত হয়েছেন। দেশবাসীর ইচ্ছানুযায়ী প্রেসিডেন্ট হাচা তাঁর দেশের কর্তৃত্ব উঠিয়ে দিয়েছেন জার্মানীর হাতে। চেকোশ্লোভাকিয়া এখন থেকে জার্মানীর একটি প্রদেশ।

এইরকম নাটক করে হিটলার দখল করলেন চেকোশ্লোভাকিয়া নামক একটি স্বাধীন দেশকে। ব্রিটেন-ফ্রান্স শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলো। কিছুই করতে পারলোনা তারা। প্রথমে রাইনল্যান্ড, তারপর অস্ট্রিয়া ও এখন চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে হিটলার হয়ে উঠলেন জার্মানীর সুপার হিরো।

পর্ব-৩৬

হিটলারকে থামানোর ব্যর্থ প্রয়াস : মিউনিখ চুক্তি-

জারিফ বললো, গতপর্বে আমরা যে ব্যাপারটাতে ইঙ্গিত করেছি, তা হলো-যুদ্ধ ছাড়া যে কোনো উপায়ে হিটলারকে থামানোর ব্যাপারটিতে জোর দিচ্ছিলো ব্রিটেন-ফ্রান্স। কোনোভাবেই আরেকটা যুদ্ধ হোক, এটা চায়নি এ দুই দেশ। তাই হিটলার পাগলামি করলেও তারা হিটলারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত এ্যাকশনে যায় নি।

কিন্তু ১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ হিটলার যখন নাটক করে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করলেন, তখন শঙ্কিত হলো ব্রিটেন-ফ্রান্স। অথচ ১৯৩৮ সালে মিউনিখ চুক্তি সম্পাদন করে বিজয়ের হাসি হেসেছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন। দেশে ফিরে সমবেত জনতাকে চুক্তির কাগজ দেখিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "আর কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ হবে না। আমরা শান্তির পথে পা বাড়িয়েছি"

রক্ষণশীল জাত ব্রিটেন ও প্রথম মহাযুদ্ধে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত ফ্রান্স ভেবেছিলো মিউনিখ চুক্তির বদৌলতে হিটলারকে তার প্রাপ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন দেশ পুনর্গঠনের সময়। কিন্তু কে জানতো হিটলারের মাস্তানি শুরু হলো কেবল?

হিটলার যাতে পূর্ব ইউরোপের দিকে নজর না দেয়- সেজন্য পোল্যাণ্ডের সাথে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হলো ব্রিটেন। আগে থেকেই ফ্রান্স-পোল্যান্ড মিত্র চুক্তি ছিলো। রাশিয়ার সাথে চুক্তি করতে চাইলো ব্রিটেন-ফ্রান্স। কিন্তু রাশিয়ার লৌহমানব জোসেফ স্ট্যালিন ব্রিটেন-ফ্রান্সের সাথে কোনো সহযোগিতামূলক চুক্তিতে না যেতে টালবাহানা শুরু করলেন।

পোলান্ডকে হুমকি ধামকি-

জারিফ প্রশ্ন করলো, বলো ডানজিগ বন্দর কোন দেশে অবস্থিত?

মামুন বললো, 'পোল্যান্ডে।"

ভালো কথা।

রাইনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করার পর হিটলারের নজর পড়লো এবার পোল্যান্ডের দিকে।

"কেন, পোল্যান্ড কি দোষ করলো আবার?"

ঘটনা হলো, ডানজিগ বন্দর মূলত ছিলো জার্মানীর। ১৮৭১ সালে জার্মানীর জনক বিসমার্ক এই বন্দরকে জার্মানীর আয়ত্তে আনেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হওয়ার পর এই বন্দর পোল্যান্ডকে দিয়ে দেওয়া হয়। জার্মানীকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য সেটাও ছিলো একটা মারাত্মক পদক্ষেপ।

কিন্তু না! এবার হিটলার গর্জে উঠলেন।

২১ মার্চ, ১৯৩৯

হিটলার প্রস্তাব পাঠালেন পোল্যান্ডের সরকারের কাছে। হিটলার বলেন, "ডানজিগ বন্দর জার্মানীকে ফেরত দিতে হবে। দিতে হবে সমুদ্রবন্দর ডানজিগের সঙ্গে জার্মানীর সংযোগ রক্ষার জন্য পোল্যান্ডের মধ্য দিয়ে একটা ট্রেন লাইন । আর দিতে হবে একটা মোটর সড়ক নির্মানের সুযোগ। কারণ ডানজিগ আমাদের বন্দর। আমরা আবার সেটা ফিরে পেতে চাই।"

স্বাভাবিকভাবে পোলিশ সরকার হিটলারের সে প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। হিটলারের দাবিকে অন্যায়, অযৌক্তিক ও ভার্সাই চুক্তির বরখেলাপ বলে আখ্যায়িত করেন।

হিটলারের প্রস্তাবে আপোষ-মীমাংসার কথা বলা হলেও পোল্যান্ডকে হুমকি দেওয়ার ভাষাও ছিলো। হোক না ছোট দেশ পোল্যান্ড, হিটলারের চিঠির ভাষা তাদের আত্মসন্মানে আঘাত লাগলো। তাই পোল্যান্ডের সরকার ২৬ মার্চ হিটলারকে পাল্টা জানিয়ে দিলেন, "পোল্যান্ড জার্মানীর সৎ প্রতিবেশী হিসেবে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়। জার্মানীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলাপের টেবিলে বসতে সবসময়ই রাজি। কিন্তু জার্মানীর প্রস্তাব অনুযায়ী পোলিশ সরকার সমুদ্র বন্দর ডানজিগ হস্তান্তরে রাজি হতে পারে না।

পোল্যান্ডের ভূমির মধ্য দিয়ে রেললাইন ও মোটর সড়ক নির্মান করার সুযোগ দেওয়া কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আলোচনা টেবিলে বসে কোনো লাভ হবে বলে পোল্যান্ড সরকার মনে করছে না।"

আর যায় কোথায়?

পোলিশ সরকারের জবাব পেয়ে হিটলার সিংহের মতো হুংকার দিলেন। বললেন, "শুধু ডানজিগ বন্দর আর রাস্তা তৈরির অধিকার নয়, বছর শেষ হবার আগেই আমি সমগ্র পোল্যান্ড দখল করবো। দেখিয়ে দিবো-জার্মানী কি শক্তি সঞ্চয় করেছে! প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে জার্মানীর দুর্বলচেতা নেতৃবৃন্দ যে হীন চুক্তিতে সই করেছিলেন, আমি শক্তি দিয়েই সে চুক্তি বরবাদ করবো। আজ আর জার্মানী দুর্বল নয়। বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো অস্ত্রবল তাদের আছে।"

হিটলার যে শুধু মুখে বললেন তাই নয়। জাঁদরেল সেনাপতিদের কাছে গোপন সংবাদ পাঠালেন। প্রস্তুতি গ্রহন করতে বললেন।

হিটলারের মনোভাব গোপনে প্রেরিত হলেও শেষ পর্যন্ত গোপন রইলো না। গুপ্তচরের মাধ্যমে জানতে পারলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন। পার্লামেন্ট অধিবেশন আহ্বান করলেন তিনি। নানাবিধ বিচার-বিবেচনার পর বৃটিশ পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহন করলো যে, জার্মানী যদি সত্যি সত্যিই পোল্যান্ড আক্রমণ করে তবে মিত্রদেশ হিসেবে ব্রিটেন পোল্যান্ডকে সামরিক সাহায্য করবে। বৃটিশ পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হলো। খবর কানে গেলো হিটলারের।

ওদিকে ফ্রান্সও পোল্যান্ডের সাথে চুক্তিবদ্ধ বৃহৎ শক্তিশালী মিত্ররাষ্ট্র। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা তাদের সামনেই ঘটেছে। ফলে ব্রিটেনের অনুরুপ অধিবেশন বসলো ফরাসী পার্লামেন্টে। বিস্তর আলাপ-আলোচনা হলো পোল্যান্ড

সমস্যাকে কেন্দ্র করে। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো, হিটলার যদি সত্যিই পোল্যান্ড আক্রমণ করে, তাহলে ফ্রান্স আর নীরব থাকবে না। ফায়সালা যা হবার তা যুদ্ধক্ষেত্রেই হবে।

হিটলার বুঝে গেলেন, পোল্যান্ড আক্রমণ করলে বিপদ আছে। ব্রিটেন-ফ্রান্স নেকড়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে জার্মানীর উপর। ভিন্ন ফর্মুলায় পোল্যান্ড আক্রমণ করার ছক কষতে লাগলেন হিটলার।

এবার রাশিয়ার সাথে সহযোগিতামূলক চুক্তি হিটলারেরঃ

১৯১৭ সালে রাশিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হলো পৃথিবীর প্রথম কমিউনিস্ট সরকার। ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়া হলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পুরো পশ্চিম ইউরোপ সেই থেকে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভয় পেতো। না জানি কখন কোন দেশে বিপ্লব শুরু হয় – এই আতংকে পশ্চিম ইউরোপ তটস্থ থাকতো। রাশিয়াও দেশে দেশে কমিউনিস্ট কর্মীদের সমর্থন দিতো। লেনিন ১৯২৪ সালে মারা যাওয়ার পর দেশের ক্ষমতায় বসেন লৌহমানব জোসেফ স্ট্যালিন। নিষ্ঠুরতায় যিনি আধুনিককালের চেঙ্গিস খান-হালাকু খান টাইপের লোক। হাসতে হাসতে নিজ দেশের মানুষকে খুন করার নির্দেশ দেন তিনি। কঠোর অনুশাসনে বিশাল রাশিয়াকে শাসন করছিলেন স্ট্যালিন। স্ট্যালিনের ভয়ে রাশিয়াতে বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়।

কথা হলো, হিটলার হচ্ছেন চরম কমিউনিস্ট বিরোধী। কমিউনিস্টদের তিনি মানবতার শত্রু আখ্যায়িত করেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি জার্মানীর কমিউনিস্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে চিরুনি অভিযান চালান। সংগত কারণেই জার্মানীর সাথে রাশিয়ার কোনো সম্পর্কই ছিলো না। হিটলার-স্ট্যালিনের মুখ দেখাদেখি ও কথা চালাচালি বন্ধ বহু বছর যাবত।

কিন্তু এবার হিটলার স্ট্যালিনের দিকে হাত বাড়ালেন। আগেই বলেছিলাম, স্বার্থের প্রসঙ্গে হিটলার একেবারে ভেজা বেড়াল। হিটলার হিসাব করে দেখলেন, রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে যদি পোল্যান্ড আক্রমণ করা যায় তাহলে দুই ডাকাত ব্রিটেন-ফ্রান্স কিচ্ছু করতে পারবেনা জার্মানীর। আর পুঁজিবাদী ব্রিটেন-ফ্রান্সের সাথে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সম্পর্ক মোটেও ভালো নয়। হিটলারকে ঠেকাতে রাশিয়ার সাহায্য চেয়ে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ব্রিটেন-ফ্রান্স। তাইতো রাশিয়ার সাথে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করার সেরা সুযোগ আছে জার্মানীর। রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিন এরকম সুযোগই চাচ্ছিলেন। শত শত বৎসর ধরে পূর্ব ইউরোপ ও উত্তর ইউরোপ থেকে বারংবার আক্রমণের শিকার হয়েছিলো রাশিয়া। তাই হিটলারের সাথে মিলে একটা দখলদারিত্ব বজায় রাখলে বেশ ভালোই হয়।

১৯৩৯ সালের ২০ আগস্ট হিটলার স্ট্যালিনের কাছে জরুরি তারবার্তা পাঠালেন। রুশ-জার্মান মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে আশাবাদ জানালেন। ২৭ ঘন্টা পর জবাব দিলেন স্ট্যালিন। খুব সংক্ষিপ্ত ভাষায়। বললেন, "তোমার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপকে মস্কো পাঠাও।"

২৩ আগস্ট, ১৯৩৯-রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিঃ

যেই কথা সেই কাজ। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ মস্কো গেলেন। মিলিত হলেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভের সাথে। অবশেষে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। যেই চুক্তিটা 'মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তি' নামেও প্রসিদ্ধ। ১০ বৎসর মেয়াদী অনাক্রমণ চুক্তি। সিদ্বান্ত হলো, রাশিয়া ও জার্মানি এই দুই দেশ কেউ কাউকে কখনো আক্রমণ করবে না। অন্য দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হলে একযোগে কাজ করবে। বিভিন্ন সামরিক সহযোগিতার আদান-প্রদান হবে এই দুই দেশের মধ্যে।

রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে চুক্তির কথা শুনে ব্রিটেন-ফ্রান্স আতংকে নীল। কথায় আছে, এক রামে রক্ষা নাই, তার উপর সুগ্রীব দোসর। কই রাশিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে হিটলার ঠেকানোর পরিকল্পনা ছিলো ব্রিটেন-ফ্রান্সের, এখন উল্টো রাশিয়া-জার্মানির দোস্তি দেখতে হলো?

এই চুক্তি হিটলারকে আরও বেপরোয়া করে দিলো। কারণ, এখন জার্মানীর বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে রাশিয়ার কথাও মাথায় রাখতে হবে ব্রিটেন-ফ্রান্সের।

হিটলার এবার পোল্যান্ডকে আলটিমেটাম দিলেন যে ৩১ আগস্টের মধ্যে ডানজিগ বন্দর জার্মানীর হাতে তুলে দিতে হবে। তা না হলে, পোল্যান্ড আক্রমণ করবেন তিনি। হিটলারের হুমকি শুনে জার্মানীতে এলেন পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত।

হিটলারকে শান্ত করা যায় কি না-এজন্য আদাজল খেয়ে লাগলেন রাষ্ট্রদূত। কিন্তু হিটলারের এক কথা-ডানজিগ বন্দর জার্মানীর হাতে তুলে না দিলে পোল্যান্ড আক্রমণ তিনি করবেনই।

হিটলারের শেষ কথা শুনে শিউরে উঠলেন পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত। অবনত মস্তকে বেরিয়ে এলেন তিনি জার্মান চ্যান্সেলারী থেকে।

হিটলারের চরম মন্তব্য বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর সব প্রান্তে। পোল্যান্ড হলো শঙ্কিত। ফ্রান্স এবং ব্রিটেন আতঙ্কিত। কারণ পোল্যান্ডের সাথে ফ্রান্স ও ব্রিটেন মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পাড়ি জমালেন লন্ডনে। গোপন আলোচনা করলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সাথে। যুদ্ধ পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিলো উভয় দেশ।

লন্ডন ও প্যারিস হিটলারের ভয়ে কম্পমান। লন্ডনের দশ নাম্বার ডাউনিং স্ট্রিটের সেই ঐতিহ্যবাহী প্রাসাদে এবং প্যারিসের পার্লামেন্ট ভবনে ভয়ানক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। থমথমে ভাব বিরাজমান। হিটলার চোখ-কান খোলা রাখছেন ব্রিটেন-ফ্রান্সের গতিবিধির উপর।

জেনারেলদের ডেকে এনে একদিন তিনি বললেন, "আমি যদি পোল্যান্ড আক্রমণ করেও ফেলি, দেখবে ব্রিটেন-ফ্রান্স কিছুই করবে না আমার। যে ভীতুর ডিম এই দুই জাত-দেখছো না তোমরা? এরা বারবার চিল্লাপাল্লা করে কিন্তু আমাকে ঠেকানোর সাহস নেই!"

জেনারেলরা বললেন, "তবে তাই হোক মহামান্য ফুরার। আপনি নির্দেশ দিলেই আমরা পোল্যান্ডের মতো বেয়াদব দেশকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সাইজ করে দিব।"

হিটলার উত্তর দিলেন, "শুভদিন সন্নিকটে। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর আমরা পোল্যান্ড আক্রমণ করবো। নতুন বন্ধু রাশিয়া নীরবে আমাদের কর্মকাণ্ড দেখবে, কিন্তু কিছুই বলবে না। আর দুই বজ্জাত ব্রিটেন-ফ্রান্স কিছুদিন ঘাঁইঘুঁই করে কাপুরুষের মতো চুপ হয়ে পড়বে। তোমরা তৈরি হও।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যাবতীয় ইতিহাস

পর্ব-৩৭

শুরু হলো স্বরণকালের মহাপ্রলয়: হিটলারের পোলান্ড আক্রমণ-

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "সাধারণ জ্ঞানের বই থেকে এ তথ্যটা আমি পেয়েছি যে- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর। তার মানে- জার্মানী কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণ করার কারণেই যুদ্ধটা শুরু হয়েছিলো?"

এক্সাক্টলি।

হিটলার পোল্যান্ডকে আলটিমেটাম দিলেন যেনো ডানজিগ বন্দর জার্মানীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। হিটলার জানতেন, পোল্যান্ড এ দাবী মানবে না। তাই তিনি জার্মান বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন যাতে যে কোনো মুহূর্তে পোল্যান্ড আক্রমণ করা যায়। আর রাশিয়ার লৌহমানব স্টালিনের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের কারণে রাশিয়ার দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলো জার্মানী।

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯: সকাল সাড়ে নয়টা :

হিটলার তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, "পোল্যান্ড আক্রমণ করো। নাস্তানাবুদ করো শত্রু পক্ষকে। যতো তাড়াতাড়ি পারো অধিকার করে নাও পোল্যান্ড। ফ্রান্স আর ব্রিটেন পোল্যান্ডকে সাহায্য করার আগেই শেষ করে ফেলো যুদ্ধ। সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দাও জার্মানীর শৌর্যবীর্য। ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।"

হিটলারের দুর্ধর্ষ জার্মান ফৌজ পোল্যান্ড সীমান্তের দিকে রওয়ানা হলো। জার্মানী শুরু করলো 'ব্লিৎসক্রিগ পদ্ধতি'র আক্রমণ। 'ব্লিৎসক্রিগ' একটি জার্মান শব্দ যার অর্থ হলো বিদ্যুৎগতিতে কোনো কাজ সমাধা করা। এ পদ্ধতির আওতায় আক্রমণের শুরুতেই বিমান বাহিনী ঝাঁঝরা করে দিতো শত্রুপক্ষের সব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। তারপর পদাতিক বাহিনী অতি সহজেই ভূমির নিয়ন্ত্রণ নিতো। ছোট্ট দেশ পোল্যান্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো হিটলারের অদম্য জার্মানী। শুরু হলো পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের সূচনা।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯: জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো ব্রিটেন-ফ্রান্স -

হিটলারের এই মরণখেলা দেখে হতভম্ব হলো ব্রিটেন-ফ্রান্স। তারাতো যুদ্ধ চায় নি; তাহলে কেন এমন করলো হিটলার? পোল্যান্ড হলো ব্রিটেন-ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠ মিত্র রাষ্ট্র।

পোল্যান্ডকে সহায়তা করা জরুরি। তা না হলে হিটলার অচিরেই পুরো ইউরোপ দখল করবে। যা হবার তা হয়েছে। যুদ্ধ যেহেতু জার্মানরা শুরুই করে দিয়েছে,

এখন তো আর বসে থাকা যায় না। পার্লামেন্টে জরুরি অধিবেশনে বসালো ব্রিটেন সরকার।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন তলব করলেন উইনস্টন চার্চিলকে। চেম্বারলিন যখন হিটলারের একের পর এক মাস্তানি সহ্য করে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন এর মৃদু প্রতিবাদ করেছিলেন চার্চিল। চার্চিল বলেছিলেন, "হিটলারকে শায়েস্তা না করে শান্ত করার সিদ্ধান্তটি একদিন ভুল বলে প্রমাণিত হবে।"

আজ মিলে গেলো চার্চিলের কথা। চেম্বারলিনের আমন্ত্রণে তিনি ওয়ার ক্যাবিনেটে যোগ দিলেন।

৩ সেপ্টেম্বর, বেলা ১১ টা ১৫ মিনিট। নেভিল চেম্বারলিন ৫ মিনিটের বেতার ভাষণ দিলেন। যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ রইলো না ব্রিটেনের সামনে। চেম্বারলিন বললেন, "হিটলার শক্তি প্রয়োগ করে অন্যের জমি দখল করতে চায়। যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে বহু চেষ্টা আমি করেছি। এবার আমরা জার্মানীর সাথে যুদ্ধরত।" অল্পক্ষণ পরে ফ্রান্সও যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

জার্মানীর মোকাবেলায় পোল্যান্ডের বীরোচিত লড়াইঃ কিছুই করতে পারলো না ব্রিটেন-ফ্রান্সঃ

যুদ্ধ ঘোষণা করলে তো হবে না। জার্মানীর মোকাবেলায় সৈন্যবাহিনী তো সাজাতে হবে? ব্রিটেন ঘোষণা দিলো তারা নৌবাহিনী পাঠাবে। ফ্রান্স তো জার্মানীর ভয়ে কাহিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে তারা ব্রিটেনের কাছে অনুরোধ জানালো-বিমান হামলা যাতে জার্মানীর বিরুদ্ধে করা না হয়, তাহলে ফ্রান্সকে আক্রমণ করে বসবে জার্মানী। আর জার্মান আক্রমণ ঠেকানোর সাধ্য ফ্রান্সের নেই। মামুন জিজ্ঞেস করলো-"ফ্রান্সের এতো দুর্বলতার কারণ কি?।"

কারণ হচ্ছে প্রথম মহাযুদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের এতো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো যে তারা আর দাঁড়াতে পারেনি। অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল। লক্ষ লক্ষ তরুণ প্রাণ দিয়েছে। তাই যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা বা সামর্থ্য কোনোটাই নেই ফ্রান্সের। জার্মানীর ভয়ে ব্রিটেনের ছাতায় আশ্রয় নিয়েছে একটু বাঁচার আশায়।"

যা হোক, কোনো সাহায্য ব্রিটেন-ফ্রান্সের কাছ থেকে না পেলেও পোল্যান্ডের সেনাবাহিনী দুর্ধর্ষ জার্মান ফৌজকে ঠেকিয়ে দিচ্ছিলো। ১০ লক্ষ পোলিশ সেনা মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হলো। হিটলার ভেবেছিলেন, পোল্যান্ড দখল করতে ২ দিনের বেশি লাগার কথা নয়। সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখ হিটলার নিজেই পৌঁছে গেলেন সীমান্তে। সীমান্তের সীমানা ফলক দেখিয়ে তিনি বললেন, "এটা উঠিয়ে ফেলো। আজ থেকে পোল্যান্ডের মাটি হলো আমাদের মাটি।"

যুদ্ধরত জার্মান সৈন্যরা জানতে পারলো পেছনে রয়েছে তাদের প্রিয় ফুরার। তারা গাড়ি পাঠিয়ে দিলো হিটলারের জন্য। হিটলার চড়লেন খোলা গাড়িতে। বললেন, "আবহাওয়া ভালো আছে। যুদ্ধরত সৈন্যরা আমাকে দেখতে পেলে উৎসাহিত হবে। মরতেও পরোয়া করবে না। আমি খোলা গাড়িতেই চড়বো।"

হিটলার আনন্দে অভিভূত, আবেগে আপ্লুত। যুদ্ধরত সৈন্যদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন বাক্স বাক্স সিগারেট। উৎসাহিত করেছেন চিৎকার করে। আবার আসছেন পিছিয়ে। আর যাই হোক, হিটলারের গলাটা আছে! চিৎকার চেঁচামেচি করে আসর গরম করার উস্তাদ তিনি।

তবে হিটলার যেমন ভেবেছিলেন ব্যাপারটা তেমন হলো না। পোলিশ বাহিনীর বীরোচিত নৈপুন্যে খুব ধীরে সুস্থে এগোতে লাগলো জার্মানরা। দেরী হতে লাগলো পোল্যান্ড অভিযান। প্রায় ১৫ দিন কেটে গেলো। পুরো পোল্যান্ড এখনও হাতে আসে নি জার্মানীর।

এমন সময়ে বেতারে খবর এলো, বৃটিশ সৈন্যদল ফ্রান্স উপকূল ধরে পোল্যান্ডের দিকে ধেয়ে আসছে। যে কোনো সময় পোল্যান্ড সৈন্যদলের সাথে মিশে জার্মান বাহিনীর উপর হামলা করতে পারে। ঠিক সেই সময় হিটলার খেললেন নতুন খেলা।

হায়রে হায়! ছোট্ট পোল্যান্ডের উপর মস্তবড় বিপদঃ

জারিফ বললো, "বিশ্বের অনেক দেশই নিজের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বড় করতে গিয়ে বলে-আমাদের মতো এতো রক্ত দিয়ে আর কেউ স্বাধীন হয় নি। এগুলো আসলে কথার কথা। রক্ত যদি স্বাধীনতা অর্জনের বিনিময় হয়, তাহলে পোল্যান্ডের মতো এতো রক্ত কোনো জাতি দেয় নি।

কারণ ?

কারণ হচ্ছে- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোল্যান্ড এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো যে, তার মোট ৬০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ৪০ লক্ষই মারা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। জনসংখ্যা অনুপাতে একটা দেশে এত লোক কোনো কালে মরেনি।

যা হোক, আমরা আসল প্রসঙ্গে আসি। হিটলার যখন দেখলেন, পোল্যান্ড দখল করতে দেরী হচ্ছে, আর বৃটিশ সৈন্যরাও চলে আসছে তখন জরুরি তারবার্তা পাঠালেন রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিনকে। স্ট্যালিনকে তিনি বললেন, "আমরা পোল্যান্ডের পশ্চিম প্রান্ত দখল করে ফেলেছি। পূর্বপ্রান্ত আপনি দখল করুন।" রাশিয়া ও জার্মানী মিলেমিশে পোল্যান্ড নামক আস্ত দেশটাকে গিলে খেতে চাইলো।

তাই হলো। কয়েকদিন আগেই তো চুক্তি করে নতুন মিত্রে পরিণত হয়েছিলো দুই দেশ। হিটলারের আহবানে সাড়া দিলেন স্ট্যালিন। রাশিয়ার অপেক্ষমান সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন পোল্যান্ড সীমানা অতিক্রম করতে। দ্রুততম গতিতে পোল্যান্ডের সমৃদ্ধশালী পুর্বাঞ্চল দখল করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলো না রাশিয়া।

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯:

রাশিয়ান সেনাবাহিনী পালন করলো নেতার আদেশ। পশ্চিম প্রান্তে দুর্ধর্ষ জার্মান সেনা আর পূর্বপ্রান্তে মহাশক্তিধর রাশিয়া। এই দুই দেশের সাঁড়াশি আক্রমনের মুখে পোল্যান্ড হলো নাস্তানাবুদ।

পোল্যান্ড আক্রমণে হিটলারের সাথে স্ট্যালিনের একাত্মতায় ব্রিটেন এবং ফ্রান্স একদম বোকা বনে গেলো। পোল্যান্ডকে সহায়তা করার আগেই সব শেষ। ব্রিটেন ফিরিয়ে নিলো সৈন্যদল। ফ্রান্স একেবারে নিশ্চুপ। পোল্যান্ড হলো ধ্বংসস্তুপ। বিপদের সময় বেচারা পোল্যান্ড সাহায্য পেলো না ব্রিটেন-ফ্রান্সের কাছ থেকে। হিটলার মারলেন একঢিলে দুই পাখি। পরের জমি দিয়ে রাশিয়াকে করলেন সন্তুষ্ট। ব্রিটেন-ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়াই দখল করে নিলেন পোল্যান্ড।



চিত্র ২২ : পোল্যান্ডের পশ্চিমদিক দখল করলো জার্মানী(স্বস্তিকা চিহ্ন)-আর পূর্বদিক দখল করলো রাশিয়া(হাতুড়ি-কাস্তে চিহ্ন)। কাজটা তারা করেছিলো মিলেমিশে। ব্রিটেন-ফ্রান্স সহ মিত্রশক্তি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলো।

তাই হলো। কয়েকদিন আগেই তো চুক্তি করে নতুন মিত্রে পরিণত হয়েছিলো দুই দেশ। হিটলারের আহবানে সাড়া দিলেন স্ট্যালিন। রাশিয়ার অপেক্ষমান সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন পোল্যান্ড সীমানা অতিক্রম করতে। দ্রুততম গতিতে পোল্যান্ডের সমৃদ্ধশালী পুর্বাঞ্চল দখল করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলো না রাশিয়া।

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯:

রাশিয়ান সেনাবাহিনী পালন করলো নেতার আদেশ। পশ্চিম প্রান্তে দুর্ধর্ষ জার্মান সেনা আর পূর্বপ্রান্তে মহাশক্তিধর রাশিয়া। এই দুই দেশের সাঁড়াশি আক্রমনের মুখে পোল্যান্ড হলো নাস্তানাবুদ।

পোল্যান্ড আক্রমণে হিটলারের সাথে স্ট্যালিনের একাত্মতায় ব্রিটেন এবং ফ্রান্স একদম বোকা বনে গেলো। পোল্যান্ডকে সহায়তা করার আগেই সব শেষ। ব্রিটেন ফিরিয়ে নিলো সৈন্যদল। ফ্রান্স একেবারে নিশ্চুপ। পোল্যান্ড হলো ধ্বংসস্তুপ। বিপদের সময় বেচারা পোল্যান্ড সাহায্য পেলো না ব্রিটেন-ফ্রান্সের কাছ থেকে। হিটলার মারলেন একঢিলে দুই পাখি। পরের জমি দিয়ে রাশিয়াকে করলেন সন্তুষ্ট। ব্রিটেন-ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়াই দখল করে নিলেন পোল্যান্ড।



চিত্র ২২ : পোল্যান্ডের পশ্চিমদিক দখল করলো জার্মানী(স্বস্তিকা চিহ্ন)-আর পূর্বদিক দখল করলো রাশিয়া(হাতুড়ি-কাস্তে চিহ্ন)। কাজটা তারা করেছিলো মিলেমিশে। ব্রিটেন-ফ্রান্স সহ মিত্রশক্তি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলো।

মামুন এবার বললো, "তার মানে হিটলারের দখলে গেলো রাইনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ড। এরপরেও ব্রিটেন-ফ্রান্স কিছুই করতে পারলো না?"

পারে নি।

কারণ, ব্রিটেন-ফ্রান্স তো যুদ্ধই চায়নি। তারা ভেবেছিলো হিটলার জমি উদ্ধার করে ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন। তাই তারা চুপ ছিলো। চুপ করার পরিণতি হলো আজ এই।

পোল্যান্ড দখল শেষ করার পর জার্মানীতে বিজয় উল্লাস চলতে থাকলো। জার্মানরা ভাবলো, হিটলারের হাতে সত্যিই যাদু আছে। কিভাবে একটার পর একটা দেশ দখল করে উচিৎ শিক্ষা দিচ্ছে শত্রুদের। এমন নেতাই তো দরকার তাদের।

পর্ব-৩৮

মহাট্র্যাজেডির শিকার পোল্যান্ডঃ রাশিয়া-জার্মানীর মিলিত বিভৎসতা-

কয়েকদিন যাবত আমি ঘুমাতে পারছিনা। যেন ঘুমের ঘোরে আমি দেখছি অসহায় গর্ভবতী নারীর আর্তনাদ। ভয়ার্ত নয়নে পেটে হাত রেখে সেই গর্ভবতী নারী দৌড়াচ্ছেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু কোথায় পাবেন তিনি সেই আশ্রয়? প্রসব বেদনায় কাতর কোনো মহিলা সন্তান প্রসব করার মুহূর্তে অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে কেবলই ভাবছেন, অনাগত সন্তানকে নিয়ে কি তিনি একটু সময়ের জন্য হলেও মাটিতে শুতে পারবেন?

আমার চোখে ভাসছে অত্যন্ত মেধাবী সামরিক অফিসারদের মুরগীর বাচ্চার মতো ধরে বেঁধে পাইকারী হারে হত্যা করে মাটিচাপা দিচ্ছে একদল হায়েনা। বাজারে মুরগি জবাই করার পরে একটু পর পর পানি দিয়ে রক্ত মুছে ফেলে মুরগি ব্যবসায়ী; যাতে সারাদিন ধরে মুরগি জবাই করা যায়। আমি ভেবে পাই না, মানুষ কিভাবে মুরগি জবাই করার কায়দায় এভাবে হাজার হাজার মানুষ খুন করতে পারে? কে বলেছে? মানুষ সৃষ্টির সেরা? আমার চোখে ঘুম হচ্ছে না কিছুদিন যাবত।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ জারিফের মুখে এরকম সাহিত্যিক বিলাপ শুনে মামুন জিজ্ঞেস করলো, "আমি তো তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনা? তুমি এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা বলছো, কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে?

জারিফ বললো, "গত পর্বে আমি বলেছিলাম পোল্যাণ্ডের অসহায়ত্বের কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত হওয়ার হার অনুযায়ী পোল্যান্ডের মতো আর কোনো দেশ

এত বেশি রক্ত দেয় নি। পোল্যান্ড সহ্য করেছে রাশিয়া আর জার্মানীর মিলিত নৃশংসতা। পোল্যান্ড দেশটাকে চুরমার করে দিয়েছে এই দুই শক্তিধর দেশ।

মামুন, তোমাকে আমি একটি মুভির কথা বলবো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনী জানতে হলে এ মুভিটি দেখা ফরজ। মুভিটির নাম 'Katyn.' পোল্যান্ডে নির্মিত এই মুভিটি ২০০৭ সালে মুক্তি পায়। এই মুভি দেখার পর আমি রীতিমতো কোমায় ছিলাম বেশ কিছুদিন।

কারণ কি?

প্রথমেই তোমাকে ইতিহাসের জ্ঞান দেওয়া জরুরি। যেটা বলেছিলাম, হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করার ১৭ দিন পরেই রাশিয়াও পোল্যান্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জার্মানরা পোল্যান্ডের বেসামরিক লোকজন ও বিশেষত ইহুদী লোকদের উপর নির্মমতা চালায়। বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, নারী ও শিশুদেরকে প্রথমেই হত্যা করে নিষ্ঠুর নাৎসীরা। জার্মানীর নাৎসী বাহিনীর হাত থেকে কেউই রেহাই পায় নি।

কিন্তু রাশিয়ানরা যেটা করেছে সেটা আরও ভয়ংকর। পোল্যান্ডের লাখ খানেক সৈন্য রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হয়। পোল্যান্ড যাতে কোনোদিন প্রতিরোধ যুদ্ধ না চালাতে পারে সেজন্য চৌকষ সামরিক অফিসারদের একজন একজন করে ধরে হত্যা করা হয় রাশিয়ার স্মোলেনস্ক শহরের কাটিন বনে। এই বন পোলিশ জনগণের কাছে আজও অভিশপ্ত বন নামে পরিচিত। শুধু কি সামরিক অফিসার, শিক্ষক, প্রকৌশলী, ডাক্তারসহ মেধাবী লোকজনদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে রাশিয়ানরা। আমি যে উপরের মুভিটির কথা বললাম, সে মুভিতে এসব ঘটনাবলী নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ কাজটি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিন স্বয়ং।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "আমাদের দেশের বহু নিরীহ বামপন্থীরা এখনও স্ট্যালিনকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। এরা কি এসব ইতিহাস জানে না?"

জারিফ উত্তর দিলো, "আমার মনে হয় এরা এসব ইতিহাস জানার চেষ্টাও করে না। কিংবা জানলেও মনে করে স্ট্যালিন ওলি-আউলিয়া মানুষ। উনার কোনো ভূল হতে পারে না। কিন্তু মনে রেখো স্ট্যালিন ছিলো হিটলারের চেয়েও আরও বড় দানব। হিটলার নিজ দেশের মানুষকে ভালোবাসতো। জনপ্রিয়তা ছিলো স্বদেশবাসীর কাছে। কিন্তু স্ট্যালিন নিজ দেশের লাখ লাখ মানুষকে অনর্থক খুন করেছেন। আর স্ট্যালিন যদি হিটলারের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি না করতেন, পোল্যান্ড ভাগাভাগিতে লিপ্ত না হতেন তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতো কিনা সন্দেহ রয়েছে।"

প্রায় ২২ হাজার পোল্যান্ডের নাগরিককে হত্যা করে রাশিয়ানরা; যার মধ্যে ১৫ হাজার ছিলো সামরিক বাহিনীর লোক। পোল্যান্ডের প্রায় সব সামরিক অফিসারদের হত্যা করেছিলো রাশিয়া। অথচ এ কাজ করার কোনো যুক্তিই ছিলো না। পোল্যান্ডের পতন ঘটেছে। সরকারপ্রধান দেশ থেকে পালিয়েছে। এমতাবস্থায় সামরিক অফিসারদের হত্যা করার কোনো মানে হয়?

নিয়তির নির্মম পরিহাস! হিটলার যখন পরবর্তীকালে রাশিয়া আক্রমন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন পোল্যান্ডের বাকী অংশ জার্মানরা দখল করে কাটিন বনের এই হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে জানতে পারে। প্রচুর গণকবরের সন্ধান পায় জার্মানরা। পোল্যান্ডের নির্বাসিত সরকারকে এবার দরকার পরে রাশিয়ার। পোল্যান্ড যখন রাশিয়ার কাছে বন্দী সামরিক অফিসারদের তালিকা চায় তখন রাশিয়া বলে, এসব অফিসাররা পালিয়ে জাপান চলে গেছে।

চরম প্রতিবাদ করে রাশিয়াকে জিজ্ঞেস করে পোল্যান্ড, "তোমার কাছে বন্দী অফিসাররা জাপান পালিয়ে যাবে কেন?"

পোল্যান্ড যখন এই ঘটনা জানতে পারে যে তাদের বন্দী অফিসারদের হত্যা করেছে রাশিয়ানরা, তখন রাশিয়ার সাথে আলোচনাই করতে চায় নি ঘৃণায়।

কিন্তু কি আর করা! যারা মরে গেছে তারা তো আর ফেরত আসবে না। বহুদিন পর ১৯৯২ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন স্বীকার করে নেন যে পোল্যান্ডের সামরিক অফিসার হত্যা রাশিয়ারই কাজ। স্ট্যালিনের নির্দেশ সংবলিত স্বাক্ষরও পোল্যান্ডের কাছে হস্তান্তর করেন।

যুদ্ধ শুরুর পর আবার কৌশলগত বিরতিঃ রাশিয়া এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো ফিনল্যান্ডের উপরঃ

পোল্যান্ডের বেদনাদায়ক ঘটনার পরে ইউরোপজুড়ে অদ্ভুত নীরবতা গ্রাস করলো। শীত চলে আসাও একটা কারণ। শীতকালে সেনাবাহিনী পরিচালনা করা কষ্টকর বটে। হিটলারের জার্মানী আর কোনো নতুন দেশে যুদ্ধ পরিচালনা করেনি। কিন্তু হিটলার স্টাইলে অন্যরকম এক মাস্তানি শুরু করলো রাশিয়ার একনায়ক স্টালিন। ছোট্ট দেশ ফিনল্যান্ডের উপর প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাশিয়ানরা।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "বর্তমান বিশ্বের অতিশয় সুসভ্য দেশ ফিনল্যান্ড কি দোষ করেছিলো আবার? অত্যন্ত ছোট দেশ ফিনল্যান্ডের সাথে বিশাল দেশ রাশিয়ার আবার কিসের দ্বন্দ?"

জারিফ বললো-"কবিগুরু তো বলেছেনই-
এ জগতে হায় সেই বেশি চায়
আছে যার ভুরি ভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

৫ অক্টোবর, ১৯৩৯ :

বিশাল দেশ রাশিয়া। বিশাল তার আয়তন। রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিন জানতেন আজ না হোক কাল জার্মানির সাথে তার যুদ্ধ লাগবেই। ছোট্ট দেশ ফিনল্যান্ডকে রাশিয়া আমন্ত্রণ জানালো ১৯৩৯ সালের অক্টোবরের ৫ তারিখ।

উদ্দেশ্য খুবই খারাপ। হিটলার যেভাবে চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিমন্ত্রণ করে নাটক করে দেশটাকে দখল করে নিয়েছিলো, রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিলো এরকমই।

রাশিয়া দাবী করলো, ফিনল্যান্ডের কিছু দ্বীপপুঞ্জ ও হাঙ্কো উপদ্বীপের কিছু জমি রাশিয়ার কাছে ইজারা দিতে। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিলো তারা একটি নৌঘাঁটি বানাবে।

মামুন জবাব দিলো, "হিটলারের কাছ থেকে ভালোই শয়তানি বুদ্ধি শিখেছে তাহলে রাশিয়ানরা? একটা দেশ কি পতিত জমি নাকি যে বর্গাদারের কাছে ইজারা রাখতে হবে?"

জারিফ উত্তর দিলো, "সংগত কারণেই ফিনল্যান্ড রাশিয়ানদের কোনো জমি ইজারা দেয়নি। তার দেশের অভ্যন্তরে অন্য দেশের নৌঘাঁটি দিতে রাজি হয়নি ফিনল্যান্ড।"

ফিনল্যান্ডের বেয়াদবিতে(!) রাশিয়া রেগে আগুন। একটার পর একটা আলটিমেটাম দিলো রাশিয়া। কোনো হুমকিকেই পাত্তা দেয়নি ফিনল্যান্ড। শেষে নভেম্বরের ৩০ তারিখ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে ছোট্ট দেশ ফিনল্যান্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাশিয়া।

শুরু হলো পৃথিবীর ইতিহাসের এক অদ্ভুত শীতকালীন যুদ্ধঃ

নভেম্বরের ৩০ তারিখ ইউরোপে প্রবল শীত। তারপর ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস তো আছেই। আর রাশিয়া হলো শীতের মাতৃভূমি। ফিনল্যান্ডেও প্রচুর শীত পড়ে। তুমুল শীতে তীব্র লড়াই চললো রাশিয়া আর ফিনল্যান্ডের মাঝে। মাইনাস ৪০ ডিগ্রী তাপমাত্রার মাধ্যেও লড়াই চালিয়েছে এই দুই দেশ।

আরেকটা প্রশ্ন করি মামুন তোমাকে। সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে পাওয়ার কথা তোমার। বলো রাশিয়া-ফিনল্যান্ডের মাঝে সীমান্তরেখার নাম কি?

মামুন বললো-"এটা তো আসলে মনে নাই। তুমিই বলো।"

জারিফ বললো, "রাশিয়া-ফিনল্যান্ডের সীমারেখার নাম হচ্ছে ম্যানারহেইম লাইন। কার্ল গুস্তাভ ম্যানারহেইম ছিলেন একজন অসাধারণ সমরকুশলী জেনারেল। অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েও তিনি রাশিয়ানদের ঠেকিয়ে দিচ্ছিলেন। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হন। তাঁর নামেই রাশিয়া-ফিনল্যান্ড সীমারেখার নামকরণ করা হয় 'ম্যানারহেইম লাইন'।

রাশিয়ার দুর্ধর্ষ সৈন্যদের বিরুদ্ধে সমানতালে লড়েছে ফিনল্যান্ডের সৈন্যরা। ফিনল্যান্ডের সরকার 'লীগ অব নেশন্স' এর কাছে বিচার চাইলো, কেন রাশিয়া তাদের উপর হামলে পড়লো? মুমূর্ষু লীগ অব নেশন্স আর কি করবে? নিন্দা প্রস্তাব জানিয়ে রাশিয়াকে বহিষ্কার করলো সংগঠন থেকে ১৯৩৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর। লীগ অব নেশন্সকে কি আর পাত্তা দেয় রাশিয়া? চলতেই থাকলো যুদ্ধ।

তিন মাস যুদ্ধ চলার পর অবশেষে ফিনল্যান্ড রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পন করে। নিজের দেশের ১১ শতাংশ ভূমি রাশিয়াকে দিয়ে দেয় ফিনল্যান্ড। কিন্তু অত্যন্ত কষ্টার্জিত জয় ছিলো রাশিয়ার।

৩ লক্ষ সৈন্য হারায় রাশিয়া, বিপরীতে ফিনল্যান্ডের ৬৫ হাজার সৈন্য নিহত হয়। ফিনল্যান্ড-রাশিয়া চুক্তি সাধিত হয় ১৯৪০ সালের ১৯ এপ্রিল।

এ যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির দিকে পাখির চোখ করে রেখেছিলেন হিটলার। রাশিয়ানদের যখন এত কষ্ট করে জিততে হয়েছিলো, তখন হিটলার তার জেনারেলদের বলেছিলেন, "দেখলে তো! ছোট্ট দেশ ফিনল্যান্ডের সাথেই রাশিয়া পারে না, আমাদের সাথে পারবে কি করে যদি যুদ্ধ লাগে? তোমরা প্রস্তুত হও। রাশিয়াও একদিন আমরা দখল করবো-"

আজকের আলোচনার শেষে জারিফ বললো, ১৯৩৯ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর নেই বললেই চলে। হিটলার কর্তৃক পোল্যান্ড দখল আর রাশিয়া কর্তৃক ফিনল্যান্ড দখল এ বছর এই দুটোই ছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা। আমরা আগামী পর্ব থেকে ১৯৪০ সালের ঘটনাবলী আলোচনা করবো। শীত, ক্রিসমাস ও আরও বিবিধ কারণে রনাঙ্গণ ঝিমিয়ে পড়েছিলো।

পর্ব-৩৯

১৯৪০ সালের এপ্রিল-মেঃ সামারের গরম আবহাওয়ায় শুরু হলো যুদ্ধের নতুন ইনিংস-

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে ইউরোপে সামার সিজন শুরু হয়। সামারের গরমে হিটলারের মাথাও গরম হতে শুরু করলো।

৮ এপ্রিল, ১৯৪০ সাল-

জার্মান গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান হেইনরিখ হিমলার ফোনে হিটলারকে বললেন, "মারাত্মক খবর আছে ফুরার"

''মারাত্মক খবর? কিসের?''

''আমার মনে হয় ব্রিটেন যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে।''

''কীভাবে?''

''আজকে ব্রিটেনের নৌ-বাহিনী নরওয়ের সমুদ্র উপকূলে মাইন বসিয়েছে।''

''কী উদ্দেশ্যে?''

''মনে হয় তারা অতর্কিতে নরওয়ে দখল করতে চায়।''

ফোন ছেড়েই হিটলার খবর পাঠালেন জেনারেলদের কাছে। আসতে বললেন চ্যান্সেলারীতে। হিটলার পাগলের মতো অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করতে লাগলেন ম্যাপকক্ষে। লাল-নীল পেনসিলে দাগ কাটতে লাগলেন ম্যাপের উপরে। মুছতে লাগলেন আবার সে দাগ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন ফিল্ডমার্শাল কাইটেল, রুডলফ হেস, মার্টিন বোরম্যান ও প্রচার মন্ত্রী ডঃ গোয়েবলস। আরম্ভ হয়ে গেলো বদ্ধ দরজায় জরুরি আলোচনা।

হিটলার প্রথমে জেনারেলদের খবরটা জানালেন। বললেন, "আমাদেরকে বেকায়দার ফেলার জন্যই ব্রিটেন নরওয়ে দখল করতে চায়। কারণ আমাদের মিল ফ্যাক্টরীতে ব্যবহৃত লোহার বেশির ভাগ আসে সুইডেন থেকে। আর সে ব্যাপারে আমরা ব্যবহার করে থাকি নরওয়ের নাভিক বন্দর। নরওয়ে একবার দখলে গেলে ব্রিটেন সুইডেনও দখল করবে। ফলে বন্ধ হয়ে যাবে সুইডেন থেকে লোহার আমদানি। বন্ধ থাকবে অস্ত্র উৎপাদন। তালা লাগবে মিল ফ্যাক্টরীতে। বেকার হয়ে পড়বে লক্ষ লক্ষ জার্মান শ্রমিক। ভেঙ্গে পড়বে আমাদের অর্থনীতি। এতসব ঘটার আগেই নরওয়ে দখল করবো আমি।"

জেনারেলরা প্রথমে আপত্তি জানান, "বিনা দোষে আমরা একটা নিরপরাধ দেশে আক্রমণ চালাবো? অনর্থক ক্ষয়ক্ষতি করবো?"

হিটলার উত্তর দিলেন, "অনর্থক বলছো কেন তোমরা। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কোনো কাজে হাত দেওয়া কি অনর্থক? বৃটিশ বাহিনী সাগর পাড়ি দেওয়ার আগেই আমরা নরওয়ে দখল করতে চাই। প্রয়োজনবোধে সুইডেন ও ডেনমার্কও দখল করবো। পুরো স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলি আমাদের দখলে

থাকবে। ফিনল্যান্ড যেহেতু রাশিয়া দখল করেই ফেলেছে, সেদিকে পা বাড়াবো না আমরা।"

জার্মানী কর্তৃক ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখলঃ

৯ এপ্রিল, ১৯৪০

হিটলার সৈন্য প্রেরণ করলেন নরওয়ের উদ্দেশ্যে। বলেন, ''সাগরপাড় থেকেই আক্রমন চালাও নরওয়ের মূল ভূমিতে।"

বিনা দোষে আক্রান্ত হলো ছোট্ট দেশ নরওয়ে। হিটলারের আদেশ পেয়েই নৌ, বিমান এবং স্থলবাহিনী একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো নরওয়ের উপর। পর্যুদস্ত করে দিলো নরওয়ের সেনাবাহিনীকে। সুযোগ দিলো না বৃটিশ সৈন্যের সাগর পাড়ি দিয়ে নরওয়ের ত্রিসীমানায় আসার। পাকাপোক্তভাবে অধিকৃত নরওয়ের সমুদ্রসীমা দখল করে থাকলো জার্মান বাহিনী। অবস্থা খারাপ দেখে ফিরে গেলো বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ।

মন খারাপ হলো হিটলারের। কারণ শক্তি পরীক্ষা করার সুযোগ থেকে হলেন তিনি বঞ্চিত। জাতশত্রু বৃটিশ-ফ্রান্স কে সামনাসামনি মোকাবেলা করতে না পারার কারণে বরং তিনি হলেন ম্রিয়মান।

নরওয়ে দখল করার সাথে সাথেই হিটলারের বাহিনী এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের উপর। যুদ্ধ করাতো দূর অস্ত, হিটলারের বাহিনীর নাম শুনেই আত্মসমর্পন করে বসলো ডেনমার্ক।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "তার মানে পোল্যান্ড দখল করার পরে হিটলারের দখলে চলে আসলো নরওয়ে ও ডেনমার্ক?"

ঠিক তাই। কিন্তু যুদ্ধবাজ হিটলারের হাত নিশপিশ করছিলো কখন ফ্রান্সকে শায়েস্তা করা যাবে, এই চিন্তায়।

জেনারেলদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন হিটলার। বললেন, "এই সেই শয়তান ফ্রান্স যারা ভার্সাই চুক্তি দিয়ে জার্মানীকে গোলামির জিঞ্জির পরিয়েছে। ফ্রান্সকে খতম না করতে পারলে আমাদের সব অর্জন বৃথা।"

জার্মানীতে ততদিনে সুপারম্যানে পরিণত হয়ে গেছেন হিটলার। লোকজন দেখলেন, হিটলার যেখানেই হাত দেন সেখানেই সাফল্য। অবলীলায় একটার পর একটা দেশ দখল করছেন তিনি। লাখ লাখ জার্মানীর তরুন সম্প্রদায় হাসিমুখে সেনাবাহিনীতে নাম লেখালো বিশ্বজয়ের অদম্য নেশায়।

১০ মে, ১৯৪০-

আবার হিটলার নেচে উঠলেন মরণ খেলায়। নেমে পড়লেন এক প্রলয়ংকরী যুদ্ধে। উদ্দেশ্য ফ্রান্সকে দখল করা। কিন্তু ফ্রান্স জার্মান সীমান্ত বরাবর তৈরি করেছে দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন। এ লাইন টপকিয়ে সরাসরি ফ্রান্সে হামলা করা কার্যত অসম্ভব। এ লাইন শেষ হলেই আরেক প্রাকৃতিক বাধা হলো আর্দেনেস বন। লম্বা লম্বা গাছগাছড়া আর ঝোঁপঝাড়ে ভর্তি।

তাহলে উপায় কি?

হিটলার নির্দেশ দিলেন, "ছোট্ট দেশ বেলজিয়ামকে দখল করে ফ্রান্স সীমান্ত বরাবর পৌঁছতে হবে। বেলজিয়ামের পড়শি সমুদ্রপারের আরেক দেশ হল্যান্ডও দখল করতে হবে। হল্যান্ড ও বেলজিয়াম দখল করতে পারলেই ফ্রান্স দখল করা আমাদের জন্য ডালভাত।"

যেই কথা সেই কাজ। সর্বশক্তি নিয়ে হিটলারের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের উপর। বেলজিয়ামের রাজা সাহায্য চাইলেন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে। এবার ব্রিটেন-ফ্রান্স হিটলারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরি। লাখ লাখ বৃটিশ ও ফরাসি সৈন্য বেলজিয়াম ও হল্যান্ড রক্ষার মিশনে নামলো। অবশ্য হিটলারের দুর্ধর্ষ বাহিনী তার আগেই দখল করে নিয়েছে আক্রান্ত দুই দেশের অনেক এলাকা।

অসহায় হয়ে পড়লো ফ্রান্সঃ জার্মান ট্যাঙ্ক আর্দেনেস বনের বাধা দূর করলো-

এই ফাঁকে জার্মানি করলো এক মহাচালাকি। চালাকি বলা যাবে না, বলতে হবে জার্মানীর সামরিক সরঞ্জামের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। একটু আগেই বলেছিলাম, ম্যাজিনো লাইন পার হলেই ফ্রান্সের আর্দেনেস বন অবস্থিত। ফ্রান্স ভাবছিলো, এ পথ দিয়ে সে নিরাপদ। ঘন বনের লম্বা গাছের বাধার কারণে জার্মানরা আসতে পারবে না। ব্রিটেন-ফ্রান্স ব্যস্ত হল্যান্ড-বেলজিয়াম রক্ষার মিশনে। কিন্তু জার্মানীর শক্তিশালী ট্যাংক ডিভিশন যে গাছপালা ভেঙে ফ্রান্সের ভিতরে ঢুকবে, সেটা বোধহয় ইবলিশ শয়তানেরও ধারণা ছিলো না।

মামুনের প্রশ্ন, ''এটা পারলো কিভাবে জার্মানী?''

আরে! জার্মানীর ট্যাঙ্ক কি জিঞ্জিরার মাল নাকি, যে সহজে ভেঙে যাবে? জার্মানীর ট্যাঙ্কের সামনে সমস্ত গাছপালা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। ভেঙে পড়া গাছগুলোর উপর দিয়েই রাশি রাশি জার্মান ট্যাঙ্ক ফ্রান্সের সীমানায় ঢুকে পড়তে লাগলো।

ট্যাঙ্ক তো সবাই বানায়, কিন্তু জার্মানীর মতো এতো শক্তিশালী ট্যাঙ্ক ব্রিটেন-ফ্রান্সের নেই। রাতের আঁধারে এই দুঃসাহসিক অপ্রথাগত কাজ করলো জার্মানরা।

সকাল বেলায় ফরাসিরা দেখে তাদের সীমানায় জার্মান বাহিনী। ফ্রান্স পুরোপুরি আতংকিত হয়ে ভাবলো-একি!

ফ্রান্স ব্যস্ত ব্রিটেনের সাথে ডানকার্ক বন্দর এলাকায়। সেখানে জার্মানরা যুদ্ধরত। কিন্তু ঘন বনের লম্বা গাছপালা ও ঝোঁপঝাড় ভেদ করে জার্মানীর আরেক দল সৈন্য ফ্রান্সকে অবরুদ্ধ করে ফেলবে, সেটা কে জানতো?

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী রেঁনো কেঁদেই ফেললেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে জরুরি বার্তা পাঠালেন। ও আরেকটা কথা বলাই হয় নি। ১৯৪০ সালের মে মাসের ১০ তারিখে হিটলার যেদিন হল্যান্ড-বেলজিয়াম আক্রমণ করেন, সেদিনই ব্রিটেনে পতন হয় দুর্বলচিত্ত প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন সরকারের। চেম্বারলিনের শান্তিকামী মনোভাবের কারণেই মূলত জার্মানী এতো আগ্রাসী হয়ে পড়েছে এতদিনে। ব্রিটেনবাসী তাই হিটলারকে ঠেকানোর জন্য চার্চিলকেই এই গুরুদায়িত্ব দিলো।

যেটা বলছিলাম। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী রেঁনো চার্চিলকে পাঠানো বার্তায় বললেন- "we have been defeated. We are beaten. We have lost the battle. The road to paris is open."

মানে-আমরা পরাজিত হয়ে গেছি। আমরা হতোদ্যম। যুদ্ধে হেরে গেছি আমরা। প্যারিসের পথ আজ উন্মুক্ত।

কোটি কোটি ফরাসি নাগরিক পরাজয়ের প্রহর গুনছে। যে জার্মানীর কারণে ১৮৭১ সাল থেকে ফ্রান্সের নাগরিক জীবন থেকে শান্তি হারিয়ে গেছে, সেই জার্মানী আবারো আযরাইল রুপে অবতীর্ণ।

কি লাভ হলো ভার্সাই চুক্তি করে? সেই জার্মানী আবার আসছে হামলাকারী সেজে।

ফ্রান্সের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর তথ্য হলো, এই জার্মানীকে ঠেকানোর কোনো সাধ্য নেই ফ্রান্সের। প্রথম মহাযুদ্ধে তাও লড়েছে ফরাসিরা, এবার আর ফ্রান্সের সেই শক্তি নাই। ২৬ লক্ষ তরুণ জনশক্তি নিহত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু ফরাসিরা।

জনজীবনে গুজব ছড়িয়ে পড়লো। একবার খবর এলো, ফ্রান্স সরকার আত্মসমর্পন করেছে। আরেকবার খবর বের হলো, সেনাপ্রধান গ্যামেলিন আত্মহত্যা করেছেন। যাহোক নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য্য বৃটিশের ভরসায় বসে রইলো নেপোলিয়ানের দেশ ফ্রান্স।

****

পর্ব-৪০

অবশেষে ব্রিটেন-ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সরাসরি মোকাবেলা শুরু হলো জার্মানীর:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রায় ৮ মাস পর ১৯৪০ সালের মে মাস থেকেই প্রকৃতপক্ষে শুরু হলো মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ। একদিকে ফ্রান্স-ব্রিটেন আর বেলজিয়ামের অবশিষ্ট সৈন্য; অন্যদিকে জার্মানীর সমগ্র শক্তি। এতদিন পর জাতশত্রু ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে নাগালে পেয়ে হিটলার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। বললেন, "আর কোনো কথা নয়, বিচার বিবেচনা করারও দরকার নাই। আঘাত হানো, চরম আঘাত। ফরাসী বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দাও। ব্রিটেনকে করো বিতাড়িত। সাগরের পথ খোলা রাখো, যেন সহজে তারা পালাতে পারে। তারপর অগাধ সলিলে তাদের ডুবিয়ে দাও। এখন আমরা জড়িয়ে পড়েছি অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে। আমাদের পরাজয় মানে ইউরোপের মানচিত্র থেকে জার্মানীর অবলুপ্তি। আমাদের বাহিনীর সামনে ইউরোপ মহাদেশে মাথা উঁচ করে দাড়ানোর মতো কোনো দেশ যাতে অবশিষ্ট না থাকে। সবাই থাকবে আমাদের তাঁবেদার। অবনত মস্তকে স্যালুট জানাবে জার্মানীকে।"

হিটলারের এসব ভাষণ বেতার মারফত জেনে গেলো বিশ্ববাসী। ঘনঘন কেবিনেট মিটিং বসলো লন্ডনে আর প্যারিসে। এই দুই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী দেশের রয়েছে শত শত বছর অন্য দেশ শোষণ করার অভিজ্ঞতা। আজ তাদের উঠানে নতুন এক পাগলা ঘোড়ার আবির্ভাব হয়েছে। কি আর করা! মরিয়া হয়ে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করলেন তারাও। এটা যে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

ব্যাটল অব ডানকার্ক: মহাযুদ্ধের অ্যাডভেঞ্চার শুরু-

জারিফ বললো, আমার এখনকার আলোচনা বুঝতে হলে তোমাকে এখন সেনাপতিদের মতো ইউরোপের মানচিত্র নিয়ে বসতে হবে। তাহলেই ডানকার্ক বন্দরের যুদ্ধ সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা লাভ করতে পারবে। তুমি প্রথমেই ফ্রান্সের সীমানার উত্তর দিকে নজর দাও।

উত্তর দিকে ফ্রান্সের পুরো সীমানা বেলজিয়ামের সাথে মিশে গেছে। পশ্চিম দিকে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সীমানা মিলিতভাবে উত্তর সাগরে পড়েছে। ডানকার্ক বন্দরটি ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম কোনে অবস্থিত। ডানকার্কে বিচও রয়েছে, যদিও সেটা অনুকূল নয়। ডানকার্কের কাছাকাছি রয়েছে ডোভার প্রণালী যেখান থেকে ফ্রান্স আর ব্রিটেনের সীমানা দুরত্ব সবচেয়ে কম; মাত্র ১২ মাইল।

ঘটনা হলো ১৯৪০ সালের মে মাসের ১০ তারিখ থেকে জার্মানী বিদ্যুগতিতে একের পর এক দেশ দখলে নামে। জার্মানীর হাতে পতন হয় হল্যান্ড ও

লুক্সেমবার্গের। বেলজিয়ামকেও প্রায় গিলে ফেলেছে জার্মানরা। জার্মানীর তাড়া খেয়ে বেলজিয়ামের বাহিনী ডানকার্ক বন্দরে জড়ো হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ব্রিটেন-ফ্রান্স ৪ লক্ষ সৈন্য নামায় ডানকার্ক বন্দরে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের পরিকল্পনা ছিলো ডানকার্ক বন্দর থেকেই জার্মানীকে বিতাড়িত করার কাজ একত্রে শুরু করবে তিন দেশ।

কিন্তু জার্মানীর মহাশক্তিশালী ট্যাংক ডিভিশন যে আর্দেনেস বনের গাছপালা ভেদ করে ফ্রান্সের ভিতরে ঢুকে পড়বে কে জানতো?

দুর্ধর্ষ জার্মানরা ফ্রান্সের ভিতরে ঢুকে বেলজিয়াম সীমান্ত বরাবর প্রায় পুরো উত্তর ফ্রান্স কব্জা করে ফেলে বিনা বাধায়।

ফলাফল?

ডানকার্কে মোতায়েন বাহিনীর সাথে অবশিষ্ট ফ্রান্সের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো। এখন ফ্রান্স তো বটেই, ডানকার্কে মোতায়েন বৃটিশ ও বেলজিয়াম বাহিনীরও মরণ দশা।

ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে জার্মান গোলন্দাজ বাহিনী এগিয়ে চললো ডানকার্ক বন্দরের দিকে। পথে বেলজিয়ামের সৈন্যের মোকাবেলা করতে হলো তাদের কয়েক স্থানে।

ডানকার্ক দখল করার উদ্দেশ্যে জার্মানী পাঠালো প্রায় নব্বই ডিভিশন সৈন্য। ট্যাঙ্ক প্রেরণ করলো এক হাজারের মতো। হিটলার তার সমগ্র বিমান বাহিনীকে সক্রিয় রাখলেন। ডানকার্কের নীল আকাশ যাতে জার্মান বিমান ঢেকে ফেলতে পারে তার ব্যবস্থাও রাখলেন। যুদ্ধ জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন হিটলার।

দি মিরাকল অব ডানকার্ক: শুরু হলো-'অপারেশন ডায়নামো'

মামুন, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে একটা মুভি দেখার কথা সাজেস্ট করতে পারি। ২০১৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রিস্টোফার নোলান পরিচালিত 'ডানকার্ক' মুভিটি দেখতে পারো। যদিও মুভির কাহিনীর বুনন ভালো নয়, ছবিতে কোনো একক নায়ক নেই; কিন্তু এই মুভিটি দেখলে ডানকার্ক বন্দরে ব্রিটেন-ফ্রান্সের অসহায়ত্ব সম্পর্কে ধারণা হবে তোমার।

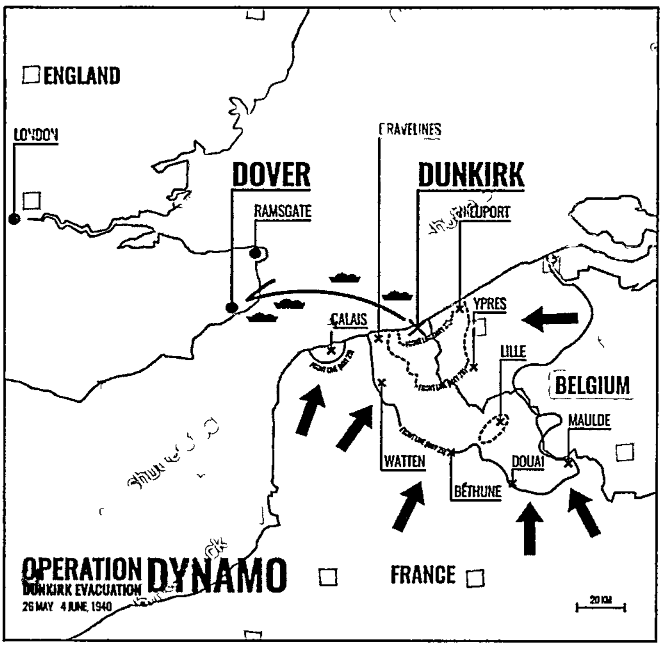
আবার সেই অসহায় অবস্থা থেকে কিভাবে ৪ লক্ষ সৈন্য নিরাপদে তারা সরিয়ে নিলো সেই ঘটনারই দারুণ চিত্রায়ন আছে মুভিটিতে।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "সৈন্য সরিয়ে নিলো মানে? জার্মানীর সাথে যুদ্ধ হয়নি ব্রিটেন-ফ্রান্সের?

জারিফ বললো, সেজন্যই তো ডানকার্কের ঘটনা সামরিক ইতিহাসে মিরাকল নামে পরিচিত। সামান্য ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে ডানকার্ক বন্দর থেকে কিভাবে এত সৈন্যকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে নিলো ব্রিটেন-ফ্রান্স; সেটা মিরাকল ছাড়া আর কিছুই না।

সেই কাহিনীই শোনো এবার-

ব্রিটেন-ফ্রান্স যুদ্ধ করবে কিভাবে? জার্মানী তিনদিক দিয়ে ঘেরাও করে ফেলেছিলো ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সৈন্যদের। প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ সৈন্যের সামনে খোলা আছে কেবল ইংলিশ চ্যানেল। মাথার উপরে অবিরাম বোমা বর্ষন করছে জার্মান বোমারু বিমান। পেছনে সারাক্ষণ কামানের গোলা ছুঁড়ছে জার্মান গোলন্দাজ বাহিনী। ফ্রান্সের সাথে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, কারণ পুরো ফ্রান্স-বেলজিয়াম সীমান্ত বরাবর ওত পেতে আছে জার্মানরা। যুদ্ধ করা দূর অস্ত-এই সাড়ে চার লক্ষ সৈন্য তিনদিক দিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে কীভাবে বেঁচে থাকবে? এটাই হয়ে উঠলো ফ্রান্স-ব্রিটেনের একমাত্র কামনা।

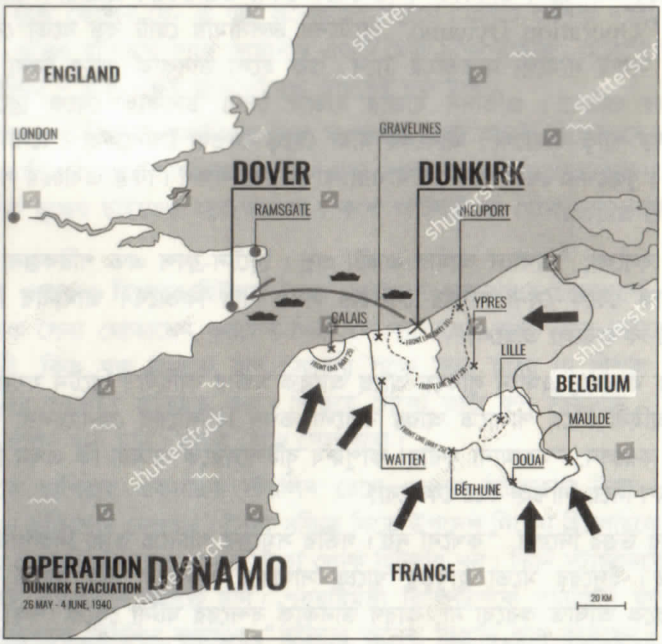


চিত্র ২৩ : ডানকার্ক বন্দরে যখন ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মিলিত বাহিনী জার্মানী কর্তৃক তিন দিক দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ে।

জারিফ বললো, সেজন্যই তো ডানকার্কের ঘটনা সামরিক ইতিহাসে মিরাকল নামে পরিচিত। সামান্য ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে ডানকার্ক বন্দর থেকে কিভাবে এত সৈন্যকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে নিলো ব্রিটেন-ফ্রান্স; সেটা মিরাকল ছাড়া আর কিছুই না।

সেই কাহিনীই শোনো এবার-

ব্রিটেন-ফ্রান্স যুদ্ধ করবে কিভাবে? জার্মানী তিনদিক দিয়ে ঘেরাও করে ফেলেছিলো ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সৈন্যদের। প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ সৈন্যের সামনে খোলা আছে কেবল ইংলিশ চ্যানেল। মাথার উপরে অবিরাম বোমা বর্ষন করছে জার্মান বোমারু বিমান। পেছনে সারাক্ষণ কামানের গোলা ছুঁড়ছে জার্মান গোলন্দাজ বাহিনী। ফ্রান্সের সাথে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, কারণ পুরো ফ্রান্স-বেলজিয়াম সীমান্ত বরাবর ওত পেতে আছে জার্মানরা। যুদ্ধ করা দূর অস্ত-এই সাড়ে চার লক্ষ সৈন্য তিনদিক দিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে কীভাবে বেঁচে থাকবে? এটাই হয়ে উঠলো ফ্রান্স-ব্রিটেনের একমাত্র কামনা।



চিত্র ২৩ : ডানকার্ক বন্দরে যখন ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মিলিত বাহিনী জার্মানী কর্তৃক তিন দিক দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ে।

১৯৪০ সালের ২৬ মে থেকে ৪ জুনঃ-The evacuation of Dunkirk

তাহলে জার্মানীর হাত থেকে বাঁচার উপায় কি?

ব্রিটেনের মসনদে তখন লৌহমানব উইনস্টন চার্চিল। তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করলেন এক অভিনব বুদ্ধি। তিনদিক দিয়ে জার্মানরা ঘেরাও করেছে সেটা সত্য কিন্তু সাগরের দিকের পথ তো খোলা আছে। তাহলে সিদ্ধান্ত পাক্কা। এই চার লক্ষাধিক সৈন্যকে ডানকার্ক বন্দর থেকে সমুদ্রপথে ব্রিটেনের মাটিতে নিয়ে আসতে হবে।

ব্রিটেনের সমরবিশারদরা হতবাক। তারা চার্চিলকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলেন কি? এত সৈন্যকে কিভাবে ডানকার্ক থেকে উদ্ধার করবো?"

চার্চিল বললেন, "যুদ্ধ করলে তো আর একটা সৈন্যকেও জীবিত পাবো না আমরা। তারচেয়ে বরং বন্দর খালি করে লোক নিয়ে আসলে অন্তত ৪০/৫০ হাজার লোককে তো বাঁচাতে পারবো?"

অবশেষে শুরু হলো ডানকার্ক বন্দর থেকে সৈন্য উদ্ধারকরণ প্রক্রিয়া। যার নাম হলো "Operation Dynamo" ব্রিটেনের জলসীমায় ছোট বড় যতো নৌযান আছে, সবাই নামলো মাতৃভূমির টানে। শুরু হলো ডানকার্ক থেকে সৈন্য আনা নেওয়ার প্রক্রিয়া। প্রতিদিন হাজার হাজার সৈন্য ডানকার্ক থেকে ব্রিটেনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালো। জীবনের মায়া ছেড়ে দেওয়া সৈনিকেরা পেলো নতুন জীবন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। কিন্তু এবারের পলায়ন জয়েরও অধিক।

মামুন বললো, "এখানে আমার একটা প্রশ্ন। ব্রিটেন-ফ্রান্স এত পরিকল্পনা করে ডানকার্ক থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার সময় পায় কিভাবে। জার্মানীর বিমান বাহিনী কি করলো তাহলে?"

জারিফ বললো, এখানে লুকিয়ে আছে আরেক মজার কাহিনী। ব্রিটেন যখন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে পালাতে আরম্ভ করলো তখন হিটলারের জেনারেলরা তাকে ফোন করলেন, "মহামান্য ফুরার! কাপুরুষ বৃটিশদেরকে আমরা কি এখন বিমান আক্রমণ দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবো?

হিটলার উত্তর দিলেন, "কখনো নয়। গভীর সমুদ্রের পানিতে তারা নিরুপায় হয়ে ভাসছে। ইঁদুরের মতো হাবুডুবু খাচ্ছে সাগরের পানিতে। এই মুহূর্তে আমি তাদেরকে আঘাত করবো না, কারণ ডানকার্ক বন্দরের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা আমার সাথে শান্তি চুক্তি করতে আসবে। ব্রিটেনের সাথে আমি কখনো যুদ্ধ করতে চাই না। তাদের সাথে শান্তিতে বসবাস করবো। আমার যতো রাগ ওই ফ্রান্সের উপর। এই মুহূর্তে আমি যদি ব্রিটেনকে সমুদ্রের পানিতে চুবিয়ে মারি

তাহলে তো আর শান্তি চুক্তি হবে না নিকট ভবিষ্যতে। ওদেরকে যেতে দাও। নিরাপদে ওরা দেশে ফিরুক। আর সুমতি ফিরুক। আমার সাথে যুদ্ধ করার সাহস যাতে তাদের আর না হয়।

সামরিক বিশারদরা পরবর্তীতে মূল্যায়ন করেছেন, "এটা ছিলো হিটলারের জীবনের অন্যতম সেরা ভুল। হিটলারের ইশারায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো সাড়ে ৪ লক্ষ সৈন্য। মনোবল ভেঙে যেতো বৃটিশদের। তাহলে হয়তো তারা শান্তি চুক্তি করতেও পারতো। এভাবে হাতের মুঠোয় শত্রুকে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া হিটলারের চরিত্রের সাথে যায় না।"

হিটলারের জীবনে এর ফল হয়েছিলো মারাত্মক। হিটলারের সাথে শান্তি চুক্তি করাতো দূরের কথা, ডানকার্ক বন্দর থেকে প্রায় ৪ লক্ষ সৈন্য সরিয়েই গর্জন দিলো বৃটিশ সিংহ। সে কাহিনী আগামী পর্বে।

****

পর্ব-৪১

ডানকার্ক থেকে ফিরেই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের হুঙ্কারঃ

ডানকার্ক বন্দর থেকে প্রায় তিন লক্ষ ৯৮ হাজার সৈন্য ব্রিটেনে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। যার মধ্যে ফরাসি সৈন্য সংখ্যা ছিলো ১ লাখের উপর। অল্প কিছু বেলজিয়াম সৈন্য।

যেখানে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল নিজে অনুমান করেছিলেন হয়তো ৪০/৫০ হাজার সৈন্যকে অক্ষত অবস্থায় ফেরত আনা যাবে। সেই অবস্থায় ৪ লক্ষ সৈন্যকে ফেরত আনা একপ্রকার বিজয়ই বটে।

উচ্ছ্বসিত বৃটিশ গণমাধ্যম ও জনগণ ডানকার্ক থেকে ফিরে আসাকে উদযাপনের উপলক্ষ বানিয়েছিলো। কিন্তু চার্চিল জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, "আরে! সৈন্য ফিরিয়ে এনে কোনো যুদ্ধে জেতা যায় না। আমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।"

স্যার চার্চিল ছিলেন ইস্পাত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জাদুকরী বক্তৃতার মাধ্যমে আহত জাতির মনে আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিটলারের সাথে কোনোরকম আপোষে যেতে রাজি ছিলেন না তিনি। হিটলারের সাথে যে কোনো রকম আলোচনাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

চার্চিল ব্রিটিশ জাতিকে বোঝাতে পেরেছিলেন, "বৃটিশ জাতি বারবার এরকম যুদ্ধ পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলো; কিন্তু বীরত্ব আর মনোবলের কারণে বৃটিশ জাতিকে

কেউ হারাতে পারেনি। নেপোলিয়ানও তো ছিলেন দিগ্বীজয়ী বীর। তাকে শেষমেষ পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মরতে হয়েছিলো বৃটিশদের সাহসিকতার কারণেই।

আরে! পরশুদিনের নব্য ধনী জার্মানীর এই মাস্তানির উদ্ধত আচরণের জবাব ব্রিটিশজাতি দিবেই। শত শত বছর যাবত বিশ্বের বুকে দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে ব্রিটেন। আর তাকে পরাজিত করতে চায় এই হিটলার?

হতেই পারে না! নেপোলিয়ান তো ছিলেন শিক্ষিত, সর্বকালের অন্যতম সেরা সমরকুশলী ও মেধাবী মানুষ। তাঁর মতো ব্যক্তি যেহেতু বৃটিশের কাছে পরাজিত হয়েছে তাহলে হিটলারের মতো একজন বদ্দ পাগল ও অর্ধশিক্ষিত লোককে এতো ভয় কিসের?"

এরকম কথা বলে চার্চিল বৃটিশ জাতির মনোবল চাঙ্গা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ডানকার্ক বন্দর থেকে সৈন্য সরানোর পর চার্চিল জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, আহত জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য সে ছিলো এক মহৌষধ।

আমি এখানে চার্চিলের ভাষণের একটা অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। চার্চিল বলেছিলেন,

"[We] shall not flag or fail. We shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender."

যার বাংলা অনুবাদটা এরকম-"ব্যর্থ অথবা পিছপা হবো না আমরা। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়বো, আমরা ফ্রান্সে যুদ্ধ করবো, আমরা সাগর-মহাসাগরে যুদ্ধ করবো, দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয় ও জাগ্রত শক্তি নিয়ে আমরা আকাশে যুদ্ধ করবো, আমরা আমাদের দ্বীপপুঞ্জ রক্ষা করবো। যতো ত্যাগ তিতিক্ষাই সহ্য করতে হোক না কেন আমরা বিচে যুদ্ধ করবো, আমরা অবতরণ ভূমিতে যুদ্ধ করবো, আমরা পদাতিক বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করবো এবং রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ করবো, আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে যুদ্ধ করবো। আমরা কখনও আত্মসমর্পন করবো না।

চার্চিলের এই ভাষণ শুনে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠলো বৃটিশ জাতি। হিটলারের সাথে তোষামোদী করার কোনো প্রয়োজনই বোধ করলো না বৃটিশরা।

হিটলারের মহাবিজয়: ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়

এদিকে ডানকার্ক বন্দর থেকে সেনা অপসারণের পর থেকেই ফ্রান্সের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়লো। বড় একটা সেনাদল ব্রিটেনের মাটিতে। বাকীরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে ফ্রান্সের ভিতরেই। পুরো উত্তর সীমান্ত

জার্মানরা দখল করে বসে আছে। সময় এখন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস দখল করার। সেনাবাহিনী পরিচালনা করার মনোবল নেই ফ্রান্সের।

১৪ জুন, ১৯৪০-

নাৎসী বাহিনীর স্বস্তিকাশোভিত পতাকা উড়তে থাকে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায়। জার্মানীর অপমানের দলিল-ভার্সাই চুক্তির মূলকপি উদ্ধার করে হিটলারের কাছে পাঠানো হয়। ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ফরাসি সৈন্য সেনানিবাস সমেত বন্দী হয় জার্মানীর কাছে।

ফ্রান্সের মতো এক মহাশত্রুকে পরাজিত করে জার্মানরা শুরু করে বুনো উল্লাস।

কিন্তু আসল খেলা তখনও বাকী। জুন মাসের ১৭ তারিখ নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ফিল্ড মার্শাল পেঁতা। পেঁতা ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের বীর সেনানী। কিন্তু এবার তিনি হিটলারের সাথে সন্ধিস্থাপনে উৎসাহী। তিনি ঘোষণা করেন যে- জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পনের জন্য প্রস্তুত তিনি।

এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় সেনাপতি চার্লস দ্য গলের সাথে। দ্য গল-আমৃত্যু জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করার পক্ষে মত দেন তিনি। পেঁতার কাছে সাহায্য না পেয়ে তিনি লন্ডন চলে যান।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিলেন হিটলার-

সেই ক্যাম্পেগের বন! সেই ট্রেনের বগি!

মাত্র ২২ বছর আগের ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর যে ট্রেনের বগিতে বসে পরাজিত জার্মানীকে আত্মসমর্পনের শর্তগুলো শুনিয়েছিলেন ফ্রান্সের জেনারেল মার্শাল পেঁতা, সেই বগিতে বসেই এবার জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলো ফ্রান্সকে। হিটলারের জন্য এর চেয়ে মধুর প্রতিশোধ আর কি হতে পারে?

সেই বনের সেই ট্রেনের ঠিক সেই বগিতে বসে ১৯৪০ সালের ২১ জুন বিজয়ী হিটলার গাম্ভীর্যের সাথে পরাজিত ফ্রান্সের কর্মকর্তাদের নতুন সন্ধির শর্তগুলো শুনালেন।

স্বয়ং হিটলার উপস্থিত তার সব সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে। সেই ঐতিহাসিক ট্রেনের বগিখানা এতোদিন রক্ষিত ছিলো বিজয়ের প্রতীক হিসেবে ফ্রান্সের জাদুঘরে। হিটলারের আদেশে বগিখানা জাদুঘর থেকে নিয়ে আসা হয়েছিলো সেখানে।

ফ্রান্সের প্রতিনিধি পেঁতা উক্ত ঐতিহাসিক ট্রেনের নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করেই হিটলারকে জানালেন অভিবাদন। হিটলার প্রত্যুত্তর করলেন না সে পর্যন্ত। সন্ধিচুক্তির শর্তগুলো পড়া শেষ হতেই ব্যান্ডের বাজনার সাথে সাথে আরম্ভ হলো জার্মানীর জাতীয় সঙ্গীত। হিটলার নেমে পড়লেন বগি থেকে। ফরাসি কর্মকর্তারাও

অনুসরণ করলেন তাকে। কিন্তু হিটলার পুরোপুরি উপেক্ষা করলেন তাদের। এক নজর তাকালেনও না পেছন ফিরে ফরাসি নেতাদের দিকে। পরাজয়ের বেদনা যে কতো মর্মান্তিক তা মর্মে মর্মে উপলব্দি করলেন ফরাসি প্রতিনিধিরা।

এদিকে ফ্রান্সের এই বেহাল দশায় হিটলারের বন্ধু ইতালির একনায়ক মুসোলিনীও ব্রিটেন-ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যদিও বেশ কয়েকদিন আগের ঘটনা সেটা। ১৯৪০ সালের ১০ জুন হিটলারের সমর্থনে মুসোলিনী যুদ্ধে নামলেন। ফ্রান্সের মহাবিপদ। শেষমেশ হিটলার মুসোলিনীকে ধমক দেন, কেন তিনি ফ্রান্স আক্রমণ করলেন। সব কাজ শেষ করার পর মুসোলিনী কেন বিজয়ের বখরা নিতে আসলেন। সেজন্য মুসোলিনীকে তীব্র ভাষায় গালিগালাজ করলেন হিটলার।

১৯৪০ সালের ২৫ জুন থেকে জার্মানি-ফ্রান্স-ইতালি এই তিন দেশের সমন্বয়ে একটা আপোষমুলক চুক্তি হয়। ফ্রান্সের মাটি আপাতত শান্ত হয়।

কিন্তু শান্ত হলে কি হবে, জার্মানীর কাছে এই পরাজয় ফ্রান্সের জন্য ছিলো খুবই লজ্জাজনক ঘটনা। জার্মানরা ফ্রান্সকে দুই ভাগে ভাগ করে। পাঁচভাগের তিন ভাগ ছিলো জার্মানদের দখলে, আর দুই ভাগ তাঁবেদার পেঁতার সরকারের অধীনে থাকে।

জার্মানরা ইচ্ছা করলেই পুরো ফ্রান্স দখল করতে পারতো। কিন্তু করেনি নিজের স্বার্থে। কারণ, ফ্রান্সের আছে বিরাট কলোনী। অনেক দেশকে লুটেপুটে খাচ্ছিলো বহু বছর ধরে। জার্মানরা ভাবলো, ফ্রান্সের ভিতরেই যেহেতু রাজাকার পাওয়া গেছে, কি দরকার পুরো ফ্রান্স দখল করে কলোনীগুলোকেও শত্রু বানাবার?

তাঁবেদার সরকারের কাজ ছিলো জার্মানদের সহায়তা করা, দেশের প্রশাসন চালানো ও বিশ্বব্যাপী জার্মানরা যে আগ্রাসন চালিয়েছিলো সে ব্যাপারে সহায়তা করা।

সে যাই হোক, ফ্রান্সের এই ঘোর দুর্দিনে লন্ডন থেকে নির্বাসিত সরকার চালাচ্ছিলেন চার্লস দ্য গল। তিনি ব্রিটেনের সাথে মিলে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাকেই একমাত্র ব্রত বলে ধরে নিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'দ্য গল' হয়ে উঠেন ফ্রান্সের মহানায়ক। তাঁবেদার পেঁতার বিচার হয় ট্রাইব্যুনালে।

কিন্তু হিটলার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিলেন না।

ফ্রান্স জয়ের পরেই হিটলার বিজয় অভিযান শেষ করতে পারতেন। তিনি ফ্রান্সের পরাজয়কে মূলধন করে ব্রিটেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে করতে পারতেন একটা আপোষ রফা। ভালো ব্যবহার করতে পারতেন রাজ্যসমূহের সঙ্গে। তাহলে অবশ্যই জার্মানীর অপমানজনক পরাজয় তিনি এড়াতে পারতেন। সত্যিকার

সমৃদ্ধশালী ও মর্যাদাবান দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে পারতেন জার্মানীকে। আজ যে ধিকৃতি তিনি পাচ্ছেন, তার পরিবর্তে পেতেন নব জার্মানীর জনক হিসেবে সন্মান, সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা। কিন্তু যা হবার নয়, তা হয় না। ইতিহাস বার বার ফিরে আসে একইভাবে, নিয়মমাফিক পথে। শিক্ষা দেয় বড় নিষ্ঠুরভাবে। কিন্তু সে শিক্ষা অবিবেচক, আত্মঅহংকারী, ক্ষমতালোভী ও অত্যাচারীদের কার্যক্রম পরিবর্তন করতে পারে না। তাই তাদের জীবনে শেষ পর্যন্ত নেমে আসে করুণ; অথচ স্বাভাবিক পরিণতি। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তারা পৃথিবীর বুক থেকে।

সময় থাকতে শিক্ষা গ্রহন করা ও আখের গুছিয়ে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ। পৃথিবীর আদিকাল থেকে মনীষীরা এই একই কথা বলে আসছেন যুগে যুগে। কিন্তু অতীতে যেমন সে খয়রাতি উপদেশ কর্ণপাত করেনি অহংকারী ডিক্টেটরগণ, হিটলারও করলেন না তেমনি। ক্ষমতার দম্ভে ভুলে গেলেন তিনি ইতিহাসের শিক্ষা ও মনীষীদের উপদেশ। তাইতো হিটলারের এই পরিণতি।

পর্ব-৪২

১৯৪০ সালের ৭ সেপ্টেম্বরঃ

গভীর রাত্রে হিটলার মিলিত হলেন যুদ্ধ বিশারদদের সাথে। ভূমিকা না দিয়েই বলতে আরম্ভ করলেন, ''ফ্রান্সের দিক থেকে আমরা এখন নিরাপদ। কিন্তু আজো বৃটিশ এগিয়ে এলো না শান্তি প্রস্তাব নিয়ে। আমার মনে হচ্ছে বেকায়দায় না পড়লে তারা আসবেও না কোনোদিন। তাই আমি তাদের বেকায়দায় ফেলতে চাই।''

''কেমন করে?'' প্রশ্ন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ

''একটা নতুন মতলব এঁটেছি'' হিটলার বললেন।

''কি মতলব?''

''চরম আঘাতের। অকস্মাৎ প্রচন্ড আঘাতে নাস্তানাবুদ করে, তাদের বাধ্য করতে হবে শর্তহীন প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসতে।''

''কেমন করে?''

হিটলার বললেন, "ভোর থেকেই আমি লন্ডন শহরের উপর নজীরবিহীন বিমান হামলা চালাতে চাই। বিপর্যস্ত করে দিতে চাই তাদের নাগরিক জীবন। সন্মুখীন করতে চাই বিপুল ক্ষয়ক্ষতির।"

হিটলারের ইচ্ছার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিদায় নিলেন পারিষদরা। তাছাড়া উপায় ছিলো না তাঁদের। হিটলার ক্রমান্বয়ে যে মহাযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, পারিষদরা তা বুঝতে পারছেন। কিন্তু সমর্থন না করে করবেন কি?

বৃটিশের পক্ষ থেকে শান্তি প্রস্তাব না আসা পর্যন্ত হিটলারকে নিরস্ত করার কথা কেউ চিন্তা করলেন না। বাধ্য হয়েই সম্মতি জানালেন তার আকাশ কুসুম পরিকল্পনায়। জেনারেলরা মরণ খেলায় নেমে পড়তে বাধ্য হলেন মনের অনিচ্ছায়।

কিন্তু ব্রিটেনের ছিলো উইনস্টন চার্চিল!

জারিফ বললো, "মামুন, তোমাকে মনে রাখতে হবে চার্চিল একখান চিজ বটে!" দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চার্চিলের মতো ইস্পাতদৃঢ় লোক না থাকলে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ তো বটেই; পুরো পৃথিবীই হিটলারের হাতের মুঠোয় চলে যেতো। চার্চিল কোনোমতেই হিটলারের সাথে আপোষে যেতে চাচ্ছিলেন না।

কিন্তু যখন ফ্রান্সের পতন হলো জার্মানির হাতে তখন চার্চিল অবশ্যই ভয় পেয়েছিলেন। কারণ হিটলারের হাতে ততদিনে পতন ঘটেছে অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ ও ফ্রান্সের। আরেক বৃহৎশক্তি রাশিয়ার সাথে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ জার্মানি। ইউরোপের আরেক শক্তিশালী দেশ স্পেন ও তার প্রতিবেশী পর্তুগালের সাথে গভীর সমঝোতার বন্ধনে আবদ্ধ জার্মানি। অন্যদিকে ইতালির ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনী হিটলারের জানি জিগির দোস্ত।

পুরো ইউরোপ মহাদেশে ব্রিটেন ছাড়া হিটলারের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করার সাহস কারো নাই।

ব্রিটেন পুরোপুরি একা হয়ে পড়লো। আমেরিকা তখনও যুদ্ধে জড়ায়নি। নিরপেক্ষ থাকার অঙ্গীকার করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট। এমন অবস্থায় হিটলারের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু চার্চিলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সিংহ সে কাজটিই করেছিলো।

চার্চিল বিখ্যাত হয়ে আছেন একের পর এক উদ্দীমনামূলক বক্তৃতা দেয়ার জন্য। ফ্রান্সের যখন পতন হলো তখন বিষণ্ন মনে চার্চিল বলেছিলেন-

"What General Weygand called the Battle of France is over. I expect that the Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life, and the long continuity of our institutions and our Empire. The whole fury and might of the enemy must very soon be turned on us. Hitler knows that he will have to break us in this Island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be free and the life of the world may move forward into broad, sunlit uplands. But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we

have known and cared for, will sink into the abyss of a new Dark Age made more sinister, and perhaps more protracted, by the lights of perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duties, and so bear ourselves that, if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say, "This was their finest hour."

শুরু হলো ব্যাটল অব ব্রিটেনঃ

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০। রাত গড়িয়ে সকালের সূর্য উঁকি দিবে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে। সবাই জানে সূর্য উঠবে পূর্বদিক থেকে। কিন্তু একি! পুরো ব্রিটেনবাসী দেখলো পশ্চিমাকাশ আলোকিত হয়ে আছে। সূর্য কি আজ পশ্চিমদিকে উঠবে?

পশ্চিমদিকে উঠলেও বোধ হয় ভালো ছিলো, এত যন্ত্রণা হয়তো সহ্য করতে হতো না বৃটিশদের।

একসাথে তেরোশ জার্মান বোমারু বিমান ব্রিটেনের আকাশে গর্জন দিচ্ছে ক্রমাগত। ক্ষিপ্ত গতিতে ছেয়ে ফেললো লন্ডনের চৌহদ্দি। বন্দরে, পোতাশ্রয়ে, জনবসতি এলাকায় এবং বিমান ঘাঁটিতে বেদম বোমা বর্ষণ শুরু করলো জার্মানির খুনী পাইলটরা। প্রতিরোধ তো দূরের কথা, নিরাপদ আশ্রয় গ্রহন করার অবকাশ পেলো না লন্ডন শহরের নিরীহ নাগরিকরা। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সন্মুখীন হলো ব্রিটেন।

ব্রিটেনের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার এটাই ছিলো হিটলারের শেষ অস্ত্র। হিটলার ভাবলেন, তেরোশো বিমানের হামলার চোটে ব্রিটেন আত্মসমর্পন করবেই। তাই তড়িঘড়ি করে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বসে পড়লেন একটা সন্ধিপত্র তৈরির কাজে।

হিটলার ফোনের কাছে অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে রইলেন। এই বুঝি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ফোন করবেন! হিটলারের সাথে দোস্তি করবে ব্রিটেন!

কিন্তু নিরাশ হতে হলো হিটলারকে। বৃটিশ জাতিকে চিনতে তিনি ভুল করেছিলেন। এমন বেপরোয়া আকস্মিক আঘাতেও জনগণের মনোবল ভেঙ্গে পড়লো না। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ''বৃটিশ একটা ঐতিহ্যবাহী পুরাতন জাতি। হঠাৎ গজিয়ে উঠা কোনো তৃতীয় শ্রেণির নেতা যদি মনে করে থাকেন মাস্তানি দেখিয়ে ব্রিটেনকে কাবু করবেন তাহলে তিনি বোকার স্বর্গে বাস করেন। আমরা অনেকদিন যাবত কিছু বলি না দেখে হিটলারের বাড় বেড়েছে। হিটলার জানেন না, যে দাঁত দেখা যায় না তারই ধার বেশি। হাতী তার বড় বড় দাঁত দিয়ে কামড়াতে পারে না। কামড়াতে উস্তাদ হলো বাঘ। আমরা বাঘের জাত। শিকার ধরি বাইরে গিয়ে, কিন্তু ঘর আক্রান্ত হলে ছেড়ে কথা বলি না।"

চার্চিলের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে গর্জে উঠলো বৃটিশ রয়েল এয়ারফোর্স। প্রথমদিনের ধাক্কা খেয়ে এবার বৃটিশ বোমারু বিমান ঝাঁপিয়ে পড়লো জার্মানীর বিমানের উপর।

জারিফ জিজ্ঞেস করলো, "মামুন, ডগ ফাইটা কাকে বলে জানো?"

মামুন বললো, "ডগ ফাইট মানে কি কুকুরে কুকুরে মারামারি নাকি?"

জারিফ উত্তর দিলো, না তোমার ধারণা ভুল। 'ডগ ফাইট' মানে হলো বিমানে বিমানে যুদ্ধ। একটি বিমান আকাশে উড়া অবস্থায় তার বিপক্ষ আরেকটি উড়ন্ত বিমানের সাথে যখন যুদ্ধ করে, তাকেই সামরিক পরিভাষায় 'ডগ ফাইট' বলা হয়।

হিটলারের পাইলটরা ছিলেন সংখ্যায় বেশি। অল্প হলেও ব্রিটিশ বিমানের তেজ বেশি। বৃটিশ পাইলটদের পাল্টা আক্রমণের মুখে বেদম মার খেতে লাগলো হিটলারের দুর্ধর্ষ পাইলটরা।

এ এক জীবন-মরণ খেলা! আমরা বাঙালিরা কবিতা আর গল্পে অ্যাডভেঞ্চার করি। কিন্তু ইউরোপীয়ানরা জীবনকে নিয়ে বাজি ধরে। 'ডগ ফাইট' মানে নিশ্চিত মৃত্যুকে হাতে নিয়ে যুদ্ধ করা। সামান্য এদিক সেদিক হলেই বিমানের আগুনে ঝলসে যাওয়া ছাড়া গতি নাই।

উপরে নীল আকাশ আর নিচে উত্তর সাগরের সীমাহীন জলরাশি। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেন-আর জার্মানীর পাইলটরা মরণ খেলায় নেমে পড়লো।

এভাবে টানা ৫৭ দিন ব্রিটেনের মাটিতে বিমান হামলা চালালো জার্মানী। ফলাফল সম্পূর্ণ ব্যর্থ। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো দুপক্ষের। আর বৃটিশ জাতি জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পন করার বদলে বিজয়ের স্বাদ পেলো।

জার্মানীর ২৫৮৫ জন বিমান সেনা মারা গেলো, অন্যদিকে ব্রিটেন হারালো ৬০০ জন। ২০০০ প্লেন নষ্ট হয় জার্মানীর, ব্রিটেনের ১৮০০ ।

এই প্রথম হিটলার পরাজয়ের স্বাদ পেলেন। ব্রিটেনকে কাবু করতে পারলেন না। হিটলারের এই অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ স্বভাবকে পাত্তাই দিলো না ব্রিটেনবাসী।

প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ব্রিটেনের নিহত পাইলটদের স্বরণে বলেছিলেন-"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few."

(সভ্যতার সংঘাতের ইতিহাসে এত বেশি মানুষ কখনো এত অল্প সংখ্যক মানুষের কাছে এত বেশি ঋণী থাকার ঘটনা ঘটেনি।)

হিটলারও বুঝে গেলেন, আপাতত ব্রিটেনকে ঘাঁটানো আর ঠিক হবে না। এখন অন্য খেলা খেলতে হবে।

পর্ব-৪৩

ব্রিটেনের সাথে না পেরে অন্য পথ ধরলেন হিটলারঃ

ব্রিটেন থেকে মুখ ফেরাতেই হিটলার দেখলেন, তার ঘরের দরজায় আগুন! রাশিয়া দখল করে নিয়েছে রুমানিয়ার দুটো সমৃদ্ধ প্রদেশ। সেখান থেকেই এতদিন আসতো জার্মানীর প্রয়োজনীয় তেলের সিংহ অংশ। কৌশল করে তিনি এতদিন রাশিয়াকে শান্ত রেখেছিলেন বন্ধুর আবরণে। চেয়েছিলেন ব্রিটেনের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেই ধরবেন রাশিয়াকে। অকস্মাৎ আক্রমণ করে দখল করবেন রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সীমানা বাড়াবেন উরাল পর্বত পর্যন্ত। বিশ্বের রুটির ঝুড়ি হিসেবে পরিচিত ইউক্রেন দখল করে সেখানকার সব শস্য নিয়ে আসবেন।

আসলে হিটলারের মূল লক্ষ্য ছিলো বিশাল রাশিয়া দখল করা। তাই তিনি ব্রিটেনের সাথে যে কোনো মূল্যে বন্ধুত্ব বজায় রেখে এ কাজটি করতে চেয়েছিলেন। হিটলার যখন দেখলেন, ব্রিটেন তার সাথে কোনো আপোষ করতে রাজি নয়, এমনকি বিমান হামলা করেও ব্রিটেনকে কাবু করতে পারলেন না তখন তিনি বুঝে ফেলেন যে- এ যুদ্ধ অনেকদিন গড়াবে। এবার রাশিয়া দখল করতে হবে। যদিও রাশিয়ার সাথে জার্মানীর একটা মৈত্রী চুক্তি রয়েছে। আদতে জার্মানী ও রাশিয়া – এ দু পক্ষই জানতো যুদ্ধ অচিরেই শুরু হবে।

হিটলার ধরে নিলেন, রুমানিয়ার তেল সম্পদকে কেন্দ্র করেই বেঁধে যাবে চুক্তিবদ্ধ দেশ রাশিয়ার সাথে সামগ্রিক যুদ্ধ। সে যুদ্ধ পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এমন কি ফ্রান্সের যুদ্ধের চাইতেও হবে ভয়াবহ। ফলে আঁটঘাট না বেধে যুদ্ধে নামা যাবে না।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে হিটলার সৈন্য পাঠালেন রুমানিয়ার তেলকূপে। বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করলেন তিনি সে ব্যাপারে। বাধা দিতে চাইলো রুশ বাহিনী, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক রুশ সৈন্যের পক্ষে সম্ভব হলো না বিশাল জার্মান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা। পিছিয়ে গেলো তারা রুশ সীমানায়। হিটলার খুশি হলেন মনে মনে। সাহস বেড়ে গেল বুকে।

ওদিকে রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিন রেগে গেলেন হিটলারের উপর। হুমকি দিলেন প্রতিশোধ নেওয়ার। সৈন্য সরিয়ে দিতে উপদেশ দিলেন হিটলারকে। কিন্তু এসব খয়রাতি উপদেশ মানার মতো লোক হিটলার নন। তিনি স্ট্যালিনকে সন্তুষ্ট রেখেই কার্যোদ্ধার করতে চান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপকে পাঠালেন মস্কোতে। রিবেনট্রপকে স্ট্যালিন বললেন, "হিটলার অনেক মাস্তানি শুরু করেছেন। আমরা সহ্য করেছি, কিন্তু কিছু বলিনি। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে হিটলার রাশিয়ার দিকে নজর দিতে চাচ্ছেন। রুমানিয়া আমাদের নিজস্ব ভূমি নয়। সেটা নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করবো না ঠিকই, কিন্তু আমাদের গায়ে আঁচড় মারলে রক্ষা নেই।

একটার পর একটা দেশ দখল করে হিটলার অহংকারী হয়ে গেছেন। হিটলার যদি আমাদের স্বার্থে আঘাত করে তাহলে আমরা তার চরম শত্রুতে রুপান্তরিত হবো।"

স্ট্যালিনের মন্তব্য শুনে হিটলার ঘাবড়ালেন না। তিনি বললেন, "আহারে! কত সুন্দর সুন্দর কথা স্ট্যালিন সাহেব বলছেন। আমাকে মাস্তান বলছেন, কিন্তু নিজে দখল করেছিলেন কেন রুমানিয়ার খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চল? স্বার্থে আঘাত লাগলে এরকমই হয়। এ বছরের (১৯৪০) শীতটা যাক, আগামী বছরের গ্রীষ্মে রাশিয়াকে বুঝিয়ে দিবো কত ধানে কত চাল। রাশিয়া দখল করতে প্রস্তুত জার্মান বাহিনী।"

মুসোলিনীর সাহায্যার্থে বলকান অঞ্চলে যুদ্ধে জড়ালেন হিটলার:

হিটলার যখন পুরো ইউরোপকে জ্বালিয়ে মারছেন, তখন তার দোসর ইতালির মুসোলিনীও পিছনে পড়ে থাকবেন কেন? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেই তিনি ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসের (৭-১২) তারিখে মাত্র ৫ দিনের ঝটিকা আক্রমণে আলবেনিয়া দখল করেন। হিটলার যখন ব্রিটেন আর রাশিয়া বাদে পুরো ইউরোপকে দখল করে ফেলেছেন তখন মুসোলিনীর খায়েশ জাগলো তিনি এবার গ্রীস দখল করবেন।

মামুন মন্তব্য করলো, "এই দুইটা (হিটলার ও মুসোলিনী) তো আসলেই শয়তান। খামোখা অন্যের দেশ কেন দখল করার বুদ্ধি করে তারা? আমি তো সারাজীবন জানতাম-সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর ও পররাজ্য দখলকারী দেশ হচ্ছে ব্রিটেন ও ফ্রান্স। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ব্রিটেনকে শ্রদ্ধা করতে হবে। কারণ তা না হলে বর্বর হিটলার আর তার দোসর মুসোলিনী পৃথিবী থেকে মানবিকতাই তুলে দিতো। ব্রিটেন যদি হিটলারের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াতো, তাহলে সত্যিই পৃথিবীতে অন্ধকার যুগ নেমে আসতো।"

জারিফ বললো, ১০০% সত্যি। হিটলার যেভাবে অন্যের দেশ দখল করতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন সেটা ছিলো মধ্যযুগের ধ্যান-ধারণা। আধুনিককালে একটা দেশকে শুধুমাত্র হামলা চালিয়ে দখল করা যায় না।

পুরো আলবেনিয়ায় ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে ইতালীয় বাহিনী। বলকান অঞ্চলের হাঙ্গেরী ও রুমানিয়া জার্মানীর মিত্রদেশ। বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া নিরপেক্ষ হলেও জার্মানীর প্রতি বন্ধুত্ব রয়েছে। মুসোলিনীর নজর এবার সুপ্রাচীন সভ্যতা গ্রীসের প্রতি। গ্রীস তিনি দখল করবেনই। এদিকে গ্রীসের সাথে ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ ব্রিটেন।

কিন্তু হিটলার এই মুহূর্তে রাশিয়া আক্রমণ ছাড়া অন্য কিছু ভাবছিলেন না। কবে রাশিয়া দখল করবেন সেজন্য হাত নিশপিশ করছিলো তার।

হিটলার-মুসোলিনী বাহিনীর বিরুদ্ধে গ্রীক রূপকথা!

কিন্তু হিটলারের সে পরিকল্পনার সর্বনাশ করলো মুসোলিনী।

২৮ অক্টোবর, ১৯৪০

মুসোলিনীর বাহিনী ঢুকে পড়লো গ্রীসের ভূ-খন্ডে। খবরটা শোনার সাথে সাথে হিটলারের মুখ রাগে লাল হয়ে পড়লো। ছুটলেন তিনি ইতালির ফ্লোরেন্সে। মিলিত হলেন মুসোলিনীর সাথে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করলেন তাকে। অবস্থা বুঝে মুসোলিনী একটা কথাও বললেন না। কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না। নির্বিবাদে হজম করেছিলেন বন্ধু হিটলারের আশ্রাব্য গালি গালাজ। কারণ তখন তার সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন। তিনি মনে করেছিলেন গ্রীস আক্রমণ করে দু এক দিনের মধ্যে পুরো দেশ দখল করবেন।

মুসোলিনীর সে স্বপ্নসাধ পূরণ হয় নি। প্রবল বাধা দিয়েছিলো গ্রীক বাহিনী। বিপুল ক্ষতি হয়েছিলো ইতালির। যুদ্ধ হয়েছিলো বিলম্বিত। রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা বন্ধ রেখে হিটলার তার নিজের সৈন্যবাহিনী পাঠালেন বন্ধুকে উদ্ধার করার জন্য। আবার গ্রীসকে সাহায্য করার জন্য বিমান বাহিনী পাঠায় ব্রিটেন। তুমুল যুদ্ধ হলো গ্রীসে। ৫ মাস পর গ্রীস দখল করে জার্মানী আর ইতালির মিলিত অক্ষশক্তি। কিন্তু প্রচুর শক্তিক্ষয় করতে হয় তাদেরকে।

যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো আফ্রিকা মহাদেশেঃ

শুধু গ্রীস নয় ইতালির একনায়ক মুসোলিনী যুদ্ধ বাধালেন উত্তর আফ্রিকায়। মুসোলিনীর চোখে তখন রোমান সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন। আফ্রিকা মহাদেশ পুরোটাই দখল করতে চান তিনি। ইতোমধ্যে ইতালীর দখলে আছে ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া ও লিবিয়া। উত্তর আফ্রিকার অন্যতম প্রভাবশালী দেশ মিসর তখন ব্রিটেনের অধীনে। ভারতের সাথে সহজ যোগাযোগের রাস্তা সুয়েজ খাল তখন ব্রিটেনের কাছে অক্সিজেন সমতুল্য। লিবিয়াতে তখন আড়াই লক্ষ সৈন্য মোতায়েন ছিল ইতালির। বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমানও মজুদ। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেন যখন জার্মানীর বিমান হামলা সামলাচ্ছে নিজের মাটিতে, এই ফাঁকে মিসর দখল করার ফন্দি আঁটলো ইতালি। ইতালিকে কাউন্টার এ্যাটাক করার মতো সামর্থ্য নাই ব্রিটেনের। পরের মাসেই যখন জার্মানীর বিমান হামলার ক্ষমতাকে ধ্বংস করলো ব্রিটেন, তখন ইতালিকে শায়েস্তা করার পালা।

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখে উত্তর আফ্রিকায় চরম পরাজয়ের মুখোমুখি হয় মুসোলিনী। দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী হয় ব্রিটেনের হাতে, যুদ্ধ সরঞ্জামের ক্ষয়ক্ষতি তো ছিলোই।

আবারও হিটলারের কাছে কেঁদে কেটে সাহায্য চাইলেন মুসোলিনী। বললেন, "উত্তর আফ্রিকা পুনরুদ্ধার করতে হবে ব্রিটেনের কাছ থেকে। আমি আর পারবো না। আপনার দুর্ধর্ষ বাহিনী পাঠান আমার সাহায্যের জন্য। না হলে আমি শেষ।"

হিটলারের সমস্ত উপদেষ্টারা হিটলারকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আপনি আফ্রিকার যুদ্ধে জড়াবেন না। কারণ, মুসোলিনী একটা চাপাবাজ ছাড়া আর কিছু না। একটা তৃতীয় পর্যায়ের সামরিক শক্তি হলো ইতালি। ইতালিকে সাহায্য করা মানে নিজের উপর বিপদ ডেকে আনা। যেহেতু সামনে রাশিয়া অভিযান আছে, তাই এই মুহূর্তে একজন জার্মান সৈন্যকেও আফ্রিকা পাঠানো যাবে না। মুসোলিনী মরলে মরুক।"

কিন্তু হিটলার তার সামরিক উপদেষ্টাদের কথা শুনলেন না। গ্রীসে যেরকম জার্মান বাহিনীকে হিটলার পাঠিয়েছিলেন মুসোলিনীকে সাহায্য করার জন্য, ঠিক তেমনি আফ্রিকার রণাঙ্গনেও তিনি মুসোলিনীকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন সামরিক অফিসারদের সমস্ত পরামর্শকে উপেক্ষা করে।

হিটলার সিদ্ধান্ত নিলেন, আফ্রিকা রনাঙ্গনে তিনি পাঠাবেন তার সবচেয়ে প্রিয় জেনারেল এরউইন রোমেলকে। এই সেই রোমেল যার অকুতোভয় ও সাহসী ভূমিকার জন্য পুরো পশ্চিম ইউরোপ আজ হিটলারের দখলে। স্থলযুদ্ধে রোমেলের মতো বীরযোদ্ধা পুরো পৃথিবীতে নেই। রোমেলকে দিয়েই পুরো উত্তর আফ্রিকা দখল করবেন তিনি। সুয়েজ খাল কেড়ে নিতে পারলেই বুঝবে এবার মজা ব্রিটেন।

১৯৪১ ও ১৯৪২ পর্যন্ত টানা দুটি বছর উত্তর আফ্রিকার তপ্ত মরুভূমি হয়ে উঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মল্লভূমি।

পর্ব-৪৪

রাশিয়া দখলের জন্য হিটলার শুরু করলেন 'অপারেশন বারবারোসা' নামক মানব ইতিহাসের বৃহত্তম সেনা অভিযান-

১৯৪০ সালের শীত মৌসুম শেষে শুরু হলো গ্রীষ্মকাল।

২২ জুন-১৯৪১

সমগ্র বিশ্বকে অবাক করে ভোর চারটায় হিটলার জার্মান বাহিনীকে আদেশ দিলেন, "রাশিয়ার ভিতরে ঢুকে পড়ো। এগিয়ে যাও বীরদর্পে। তাড়িয়ে দাও রুশ বাহিনীকে। দখল করো রাশিয়ার শস্যভান্ডার।"

আসলে রাশিয়া জয়ের বাসনা তার প্রথম থেকেই ছিলো। কমিউনিস্টদের প্রতি ছিলো তাঁর চরম বিতৃষ্ণা। রাশিয়ার আবাদী জমির উপর ছিলো তার লোলুপ দৃষ্টি। অপেক্ষা করেছিলেন শুধু ভালো করে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য।

মামুন বললো, "তাহলে ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট রাশিয়া আর জার্মানীর মধ্যে যে মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তি হয়েছিলো, তার মানে কি? দুটো দেশ না বন্ধু ছিলো?"

জারিফ উত্তর দিলো, চুক্তি দিয়ে হিটলার রাশিয়াকে ইউরোপীয়ান সংঘাত থেকে দূরে রেখেছিলেন। এজন্যই তো হিটলার যখন ফ্রান্স সমেত পুরো পশ্চিম ইউরোপ দখল করলো তখন রাশিয়া নীরব ছিলো। ভিতরে ভিতরে রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা হিটলারের বহুদিনের পুরনো। আর রাশিয়ানরাও জানতো জার্মানির সাথে চুক্তিটা নেহায়েত অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

যা হোক, হিটলার সেনাপতিদের আদেশ দিতে থাকেন, "এগিয়ে যাও ক্ষিপ্রগতিতে। আক্রমন চালাও প্রচন্ডভাবে। অধিকার করো ইউক্রেন। গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ যেন রাশিয়ানরা না পায়। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের উৎসব আমি পালন করবো রাশিয়ায়।"

হিটলারের এই উচ্চাভিলাষ কিন্তু কেবল কথার কথা ছিলো না। দ্বাদশ শতাব্দীর জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসার নামে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহত্তম অভিযান সূচনা করেছিলেন।

তুমি টাসকি খেয়ে যাবে হিটলারের এই অভিযানের আয়োজন শুনে। প্রাথমিক সৈন্যসংখ্যা ছিলো ৩০ লক্ষ। তিন হাজার ট্যাঙ্ক,৭ হাজার আর্টিলারি ও ২৫০০ যুদ্ধবিমানের সমন্বয়ে এই অভিযান শুরু হয়।

হিটলারের দম আছে বলতে হবে!

হিটলার ও তার জেনারেলরা ধরে নিয়েছিলেন, অক্টোবর মাসের মধ্যে পুরো রাশিয়া তিনি দখল করবেন। তারপর তিনি হয়ে যাবেন ইউরোপের একচ্ছত্র অধিপতি। ব্রিটেন তখন তার পায়ে ধরে সন্ধি করবে!

মামুন জিজ্ঞেস করেছিলো, "আমি তো '**গল্পে গল্পে বিশ্বভ্রমণ**' বই পড়ে জানতে পারলাম যে- ১৮১২ সালে ফ্রান্সের দিগ্বীজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করতে গিয়ে চরম পরাজয়ের মুখোমুখি হন। রাশিয়া আক্রমণ করতে গিয়ে নেপোলিয়ান তার নিজের পতন ডেকে আনেন। হিটলার কি নেপোলিয়ানের ব্যর্থতার কথা স্বরণ করেন নি?"

অবশ্যই নেপোলিয়ানের কথা স্বরণ করেছিলেন হিটলার। নেপোলিয়ান কেন রাশিয়া অভিযানে ব্যর্থ হয়েছিলেন সে ব্যাপারে বারবার স্টাডি করেছেন হিটলার ও তার জেনারেলরা। নিজেরা যাতে এরকম কোনো ভুল না করে সেজন্য সতর্ক ছিলো জার্মানী।

প্রথম সতর্কতা ছিলো নেপোলিয়ান সরাসরি মস্কো দখল করতে চেয়েছিলেন। ৫ লক্ষ সৈন্যের বাহিনী ছিলো নেপোলিয়ানের। মস্কো দখল করতে গিয়ে পথে পথে বাধার সন্মুখীন হয়েছিলেন নেপোলিয়ন। তারপর শীত চলে আসে। রাশিয়ানরা মস্কো ছেড়ে পালিয়ে যায়। পোশাক আর খাবারের অভাবে ফরাসিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তাই হিটলার ভাবলেন, শুধু মস্কো আক্রমণ করলেই হবে না। তাঁর সমগ্র বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করে রাশিয়াকে দখল করার পরিকল্পনা করলেন।

একটা বাহিনীকে পাঠালেন উত্তরদিকে লেনিনগ্রাদ শহর অবরোধ করার জন্য। আরেকটা বাহিনীকে পাঠালেন ইউক্রেনের কিয়েভ নগরী অভিমুখে। আরেকটা বাহিনীকে মস্কোর জন্য তৈরি করলেন। নেপোলিয়ান যেমন পথে পথে মার খেয়েছিলেন রাশিয়ানদের হাতে, হিটলার সেরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চান নি। তাই তিনি তার বিশাল বাহিনীকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন।

লেনিনগ্রাদ অবরোধঃ হিটলারের সীমাহীন নিষ্ঠুরতাঃ

জারিফ বললো, দেখো এখনও কেউ কেউ হিটলারের এসব এ্যাডভেঞ্চারিজমকে মনে মনে পছন্দ করে। হয়তো কল্পনা করে হিটলার যদি জিতে যেতো তাহলে বোধহয় ভালোই হতো। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, জার্মান জনগণ ব্যতীত হিটলারের আর কারো প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা ছিলো না। বেসামরিক জনগণের উপর এতো অত্যাচার করা হয়েছে যে সেজন্য হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখা যাবে। হিটলারের বাহিনীর নির্মমতার জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে লেনিনগ্রাদ শহর অবরোধ।

গুনে গুনে ৮৭২ দিন!

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখ থেকে ১৯৪৪ সালের ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত নাৎসী বাহিনী লেনিনগ্রাদ শহর অবরুদ্ধ করে রাখে। শহরবাসী খাবারের কষ্টে তিলে তিলে মরতে থাকে।

আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিতৃভূমি বলা হয় রাশিয়াকে। প্রায় ৫ কোটি লোক মারা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। তার মধ্যে রাশিয়ারই ছিলো প্রায় তিন কোটির কাছাকাছি।

লেনিনগ্রাদ শহরের পুর্ব নাম ছিলো সেন্ট পিটার্সবার্গ। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ভ্লাদিমির লেনিনের নামে এ শহরের নামকরণ করা হয় লেনিনগ্রাদ।

জার্মানরা যখন এ শহরটাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফিলে তখন এ শহরের বাসিন্দাদের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের কোনো সীমা ছিলো না। শীতকালে ছিলো আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি। কাপড় নেই, খাবার নেই, জার্মানদের অবিরাম গোলাবর্ষণ চলছেই।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "জার্মানরা এরকম একটা বড় শহর অবরোধ করে রাখলো, রাশিয়ানরা কি কিছুই করতে পারলো না?"

জারিফ বললো, করবে কিভাবে? জার্মানদের বাহিনী তো ছিলো তিনটি। একভাগ লেনিনগ্রাদসহ বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী অনেক এলাকা দখল করে রেখেছে, আরেকভাগ ইউক্রেনের বিস্তীর্ন অঞ্চল দখল করেছে। মস্কোর দিকেও এগিয়ে যাচ্ছে নাৎসীদের আরও একটি দল। সবার আগে মস্কো শহর বাঁচাতে হবে; তারপর না হয় অন্য দিকে নজর দিবে রাশিয়ানরা।

৩০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত লেনিনগ্রাদে শহরের ১০ লক্ষ অধিবাসী এ অবরোধে মারা যায়। কতো শিশু খাবারের অভাবে হাহাকার করতে করতে মারা গেছে সে খবর কে রাখে?

যুদ্ধের পর লেনিনগ্রাদ শহর বীরোচিত শহরের খেতাব অর্জন করে। লেনিনগ্রাদের আত্মত্যাগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলোর একটি।

ব্যাটল অব মস্কোঃ জার্মানদের বিপুল পরাজয়ঃ

সুখময় ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর জার্মানীর একনায়ক হিটলার। বন্ধু মুসোলিনী এক ডিভিশন সৈন্য পাঠিয়েছে রাশিয়া অভিযানে। জুন মাসের ২২ তারিখ রাশিয়া দখলের যে অভিযান শুরু করেছিলেন হিটলার, তিনি আশা করেছিলেন ২৫ ডিসেম্বর ক্রিসমাস উৎসব তিনি পালন করবেন রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে। সেদিন বেশি দূরে নয় পুরো রাশিয়ার বিরাট ভূ-খন্ডের মালিক হবে জার্মানরা। সর্বকালের সেরা সমরকুশলী নেপোলিয়ানের মতো ভূল তিনি করেন নি। নেপোলিয়ান পথে পথে যুদ্ধ করতে করতে অনেক লোকবল হারিয়ে মস্কো এসে দেখেন জনশুন্য নগরী। খাদ্য আর বস্ত্রের অভাবে এবং রাশিয়ার ভয়ংকর শীতের কবলে পড়ে নেপোলিয়ানের বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

হিটলার তো এরকম কিছু করেন নি! রাশিয়ানরা জার্মানদের বাধা দিবে দূরের কথা, জার্মানদের ভয়ে পঙ্গপালের মতো পালিয়ে গেছে রাশিয়ানরা। হিটলারের সব পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত সফল। বিশাল রাশিয়াকে তিনদিক ধরে আক্রমণ চালিয়ে অনেক এলাকা দখল করে ফেলেছেন। কোনো বাধার সম্মুখীন হননি তিনি। সময় এবার রাশিয়ার রাজধানী মস্কো দখল করার।

২ অক্টোবর, ১৯৪১!

জার্মান বাহিনী মস্কো থেকে মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরে। রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিনের মাথা নষ্ট। এই বুঝি জার্মানরা চলে আসলো মস্কো। রুশ সেনাপতি জুকভ তখন লেনিনগ্রাদ অবরোধের বিরুদ্ধে একটার পর একটা ব্যর্থ কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছিলেন। স্ট্যালিন জুকভকে তলব করলেন মস্কো নগরী রক্ষার জন্য।

ফিল্ড মার্শাল জুকভ দায়িত্ব পেয়েই রাশিয়ান সেনাবাহিনীর সাইবেরিয়ান ইউনিটকে মস্কো রক্ষার দায়িত্ব দিলেন।

সাইবেরিয়া হলো শীতের মাতৃভূমি, যত শীতই পড়ুক সাইবেরিয়ান ইউনিট কখনো ঘায়েল হবে না, এটা ভেবেই জুকভ তার রণপরিকল্পনা সাজালেন।

নামলো ভয়ংকর শীতঃ

রাশিয়ানদেরও কপাল ভালো, এ বছর শীত একটু আগেভাগেই নামলো। অক্টোবর এর ৭ তারিখ বছরের প্রথম তুষারপাত শুরু হলো মস্কোতে। খোদার মাইর শুরু হলো জার্মান বাহিনীর উপর। প্রকৃতির অভিশাপ। ঠান্ডায় আড়ষ্ট হলো জার্মান সৈনিকদের দেহ। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো তারা। সাথে তাদের নেই গরম পোশাক। হিটলার ভেবেছিলেন, শীতের মৌসুম আসার আগেই মস্কো দখল করবেন তিনি। তখন আর শীতের পোশাকের অভাব হবে না। কিন্তু অসময়ের শীতে হাজার হাজার জার্মান সৈন্য মরতে লাগলো প্রতিদিন। বাধ্য হয়ে হিটলার দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানালেন যার কাছে যতো শীতের পোশাক আছে তাই সরকারি তহবিলে দিয়ে দিতে। হিটলারের ঘোষণায় কাজও হলো। যুদ্ধক্ষেত্রে গরম পোষাক সরবরাহ করা হলো।

কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হলো নতুনভাবে। তেল ও পেট্রোল প্রচন্ড শীতে গেলো জমে। যুদ্ধ সরঞ্জাম জমে হলো বরফ। যানবাহনের গতি হলো বন্ধ। ট্রেন অচল হলো কয়লার অভাবে।

এই অবস্থার সুযোগ গ্রহন করলো রাশিয়ান সেনাবাহিনীর সাইবেরিয়ান ইউনিট। শীত তাদের কাছে ডাল-ভাত। দুর্বার বেগে এগিয়ে গেলো তারা। প্রচন্ড আক্রমণে ধরাশয়ী করলো জার্মানদের।

৫ ডিসেম্বর, ১৯৪১:

১৫ লক্ষ রাশিয়ান লাল ফৌজ ঝাঁপিয়ে পড়লো হিটলারের বাহিনীর উপর। এতদিন পর মহা গজব শুরু হলো জার্মান বাহিনীর উপর। ২ বছর যাবত জার্মানরা শুধু অন্য দেশের সৈনিকদের মেরেছে। এবার জার্মানদের মার খাওয়ার পালা। শীতে অনভিজ্ঞ জার্মান সৈন্য শুধু যে পশ্চাদপসরণ করলো তা নয়, মরলো লাখ লাখ। জানুয়ারির ৭ তারিখের মধ্যে জার্মানরা পিছু হটতে হটতে মস্কো থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান নিলো। আগেই বলেছি, যুদ্ধ শুরুর আগে জার্মানরা মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরে ছিলো।

প্রায় ৪ লক্ষ সৈন্য হারালো জার্মানরা। যুদ্ধ সরঞ্জাম তো ছিলোই। রাগে, অপমানে, ব্যর্থতায় ফেটে পড়লেন হিটলার। বেতারেই গালি গালাজ শুরু করলেন জেনারেলদের।

যদিও মস্কো দখল করা আপাতত সম্ভব হয় নি জার্মানীর, তখনও জার্মানীর সমস্ত সৈন্য রাশিয়ার ভিতরেই মোতায়েন ছিলো। রুশ-জার্মান যুদ্ধ মাত্র শুরু হলো কেবল।

পর্ব-৪৫

যুদ্ধে জড়ালো আমেরিকা ও জাপানঃ

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর আর জানুয়ারি মাসের তীব্র শীতে যখন হিটলারের জার্মান বাহিনী রাশিয়ানদের হাতে বেদম মার খাচ্ছে তখন দূর প্রাচ্যে ঘটে গেলো আরেক ভয়াবহ ঘটনা।

মামুন বললো, " দূর প্রাচ্য বলতে কোন কোন দেশগুলিতে বোঝানো হয়েছে?"

জারিফ উত্তর দিলো-"দূর প্রাচ্য মূলত চীন-জাপান ও কোরিয়া উপদ্বীপকে বোঝায়। কেউ কেউ আবার আসিয়ানভুক্ত দেশ ও মঙ্গোলিয়াকেও দূর প্রাচ্যের অন্তর্গত বলে মনে করেন। যা হোক, আমরা চীন-জাপান ও কোরিয়া উপদ্বীপের ঘটনাবলী নিয়েই আলোচনা করবো।"

৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১:

প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবার আমেরিকার নৌ-ঘাঁটিতে সকালের আলো ফুটে উঠবে-ঠিক এরকম একটা মুহূর্ত। পার্ল হারবারের স্থানীয় ক্যালেন্ডারে তখন ৮ ডিসেম্বর সকাল বেলা।

আমেরিকান সৈন্যদের অনেকেই তখনও ঘুমাচ্ছেন। কেউ কেউ উঠেছেন ঘুম থেকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই আত্মঘাতী জাপানী পাইলটদের নারকীয় হামলা। জাপানীরা সবাই মরতে এসেছে। নিজেরা মরে আমেরিকানদেরকে মারবে। আর কেউ যদি নিজের প্রাণটা বিলিয়ে দিতে চায় তাহলে তার চেয়ে বড় শক্তিমান পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

হামলায় অংশ নেয় প্রায় ৩৫৩ জন জাপানি সেনা। যার মধ্যে পাইলট, বোমা নিক্ষেপকারী ও ক্রু রয়েছেন। আমেরিকানরা কিছুই করতে পারেনি। ২৪০০ আমেরিকান সৈন্য নিহত হয়। আটটি যুদ্ধজাহাজ সমূলে ধ্বংস করে জাপানিরা।

মামুন জিজ্ঞেস করে, "কেন জাপান আমেরিকার এই নৌ-ঘাঁটি ধ্বংস করতে উদ্যত হয়? যেখানে এই দুই দেশের মধ্যে সরাসরি কোনো যুদ্ধ চলছিলো না।"

জারিফ উত্তর দিলো, এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে অনেক লম্বা ইতিহাস হয়ে যাবে। অন্য কোনো আলোচনায় সেটা করবো। তবে শুধু এটুকু জেনে রাখো, প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন তথা এশিয়া মহাদেশের প্রথম শিল্পায়িত দেশ জাপান পুরো এশিয়া মহাদেশেই তার আধিপত্য বিস্তার করতে চাইলো। জাপান দেখলো, তার

প্রতিবেশী বিশাল দেশ চীন অত্যন্ত দুর্বল। কমিউনিস্ট আর চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী বাহিনী সারাক্ষণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত।

ইন্দোনেশিয়া দখল করে রেখেছে ডাচরা। ইন্দোচীনের তিন দেশ লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম দখল করে রেখেছে ফ্রান্স। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, মিয়ানমারসহ ভারতবর্ষ বৃটিশের দখলে। জাপান আওয়াজ তুললো, Asia for the Asian. জাপান সিদ্ধান্ত নিলো, এশিয়া থেকে সব ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে হটিয়ে সে নিজেই এশিয়া মহাদেশের মাতব্বর হবে। আসলে জাপানের যে শক্তি ছিলো, এরকম কিছু কল্পনা করা তার জন্য অসম্ভব কিছু ছিলো না।

আবার জাপান ছিলো আয়তনে ছোট দেশ। তার প্রাকৃতিক সম্পদও খুব বেশি নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের জন্য চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন দখল করা জাপানের দরকার।

জাপানের এ কাজে বাগড়া দিলো আমেরিকা। আসলে আমেরিকা দেশটা তো ইউরোপীয়রাই নির্মান করেছে। তাই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষেই ছিলো আমেরিকার অবস্থান। কিন্তু জাপানও একটার পর একটা জঘন্য কাজ করেছিলো চীনকে কেন্দ্র করে। ১৯৩১ সালে চীনের মাঞ্চুরিয়া দখল করে সেখানে তাঁবেদার সরকার বসায়। ১৯৩৭ সালে আবার চীনের সাথে যুদ্ধ বাধায় জাপান। চীনের বেসামরিক লোকজনের উপর নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাপানের নীতি ছিলো- 'Kill all, burn all, destroy all' রোহিঙ্গাদের উপর মিয়ানমার বাহিনী যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো সেভাবে।

আমেরিকা জাপানকে আহ্বান জানায় এসব মাস্তানি বন্ধ করতে। জাপান কর্ণপাত করেনি। আমেরিকা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা জারী করে জাপানের উপর। জাপান আমেরিকার কাছ থেকে জ্বালানি তেল কিনে আসছিলো। এই নিষেধাজ্ঞার কারণে জাপান মহাবিপদে পড়লো। এশিয়ার তেলক্ষেত্র ইন্দোনেশিয়া দখল করার দিকে নজর দিলো জাপান। অন্য দেশ দখল করার জন্য জাপান হন্যে হয়ে উঠলো।

যেহেতু আমেরিকার একটা শক্তিশালী নৌঘাঁটি পার্ল হারবারে মোতায়েন আছে; তাই আমেরিকা হয়তো সেখান থেকেই জাপানের এসব পররাজ্য দখলের পরিকল্পনায় বাধা দিতে পারে। তাই জাপান ভাবলো, পার্ল হারবার নৌঘাটি পুরোপুরি ধ্বংস করে দিলে আমেরিকা যদি যুদ্ধও ঘোষণা করে, তাহলে নতুন করে সবকিছু সাজাতে অন্তত বছর খানেক লাগবে। এই ফাঁকে জাপান সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নির্বিঘ্নে দখল করে ফেলবে। তারপর আমেরিকার সাধ্য নেই জাপানকে ঠেকানোর। আমেরিকাকে আপাতত যুদ্ধ থেকে দূরে রাখার জন্যই জাপান এই কাজটা করলো।

পার্ল-হারবারে হামলা হলোঃ চার্চিলের শান্তিতে ঘুম হলো-

মামুন বললো, "বলছো কি তুমি? পার্ল হারবারে আগ্রাসী জাপান আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে আমেরিকার এতো বড় ক্ষতি করলো; আর এ খবর শুনে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের শান্তিতে ঘুম হলো? এটা কেমন কথা!"

জারিফ উত্তর দিলো, ঘটনা হচ্ছে দুইটি বছর পার হয়ে গেছে ব্রিটেন একা একা হিটলারের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিলো। জার্মানীর হাতে ফ্রান্সের পতন হওয়ার পর ব্রিটেন একেবারেই নিঃসঙ্গ। হিটলারের হাত থেকে বাঁচার যেন কোনো রাস্তাই নেই। চার্চিল চেয়েছিলেন, আমেরিকা যদি ব্রিটেনের পক্ষ হয়ে সৈন্য পাঠাতো, যুদ্ধে নামতো, তাহলে কতোই না ভলো হতো!

কিন্তু হায়! আমেরিকার অভ্যন্তরীন রাজনীতির কারণে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ব্রিটেনকে মনমতো সহায়তা করতে পারছিলেন না। বারবার দূতিয়ালি করেও আমেরিকার মন গলাতে পারছিলেন না চার্চিল।

কিন্তু এবার আর মন গলাতে হবে না চার্চিলের। আজ যে আমেরিকা নিজেই আক্রান্ত! জাপানের হাতে আমেরিকার নৌসেনাদের এই অসহায় মৃত্যুতে গর্জে উঠলেন রুজভেল্ট। নিরপেক্ষতার নীতি আপাতত মূলতবি।

পরের দিনই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো আমেরিকা। যা বলেছিলাম, পার্ল হারবারের ঘটনার পর চার্চিল আরাম করে ঘুমাতে পারলেন। চার্চিল নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলেন যে-আর আমরা একা নই। হিটলারকে ধ্বংস করার জন্য এবার আমেরিকা পুরোপুরি সাথে আছে। আবার রাশিয়া আক্রমণের কারণে হিটলার ততদিনে রাশিয়ারও চরম শত্রু। যে মুহুর্তের জন্য চার্চিল ছাতক পাখির মতো অপেক্ষা করছিলেন দুইটি বছর; সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অবশেষে আসলো।

আমেরিকা-রাশিয়া-ব্রিটেন তৎকালীন বিশ্বের তিন পরাশক্তি এক কাতারে সামিল হওয়ার পরিস্থিতি তৈরী হলো। চার্চিল ভাবলেন, এবার হিটলারকে শায়েস্তা করা যাবে।

ব্রিটেনের যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস' ধ্বংস করলো জাপানঃ

পার্ল হারবারে নৌ-ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে আমেরিকার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে জাপান আরও বেপরোয়া হয়ে উঠলো। জাপানকে ঠেকাতে দুটি শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ পাঠালেন চার্চিল। সিঙ্গাপুরের নৌঘাঁটি থেকে এই দুই জাহাজ জাপানকে মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট হবে এই ভেবে চার্চিল যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস' ও 'রিপাল্স' পাঠালেন।

কিন্তু জাপানীজ নৌসেনাপতি এডমিরাল ইয়ামামুতু এই দুই জাহাজকে ডুবিয়ে মারার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়ে এই দুই প্রতাপশালী যুদ্ধজাহাজকে ধরাশায়ী করে ফেললো জাপানীরা।

১৯৪১ সালের ১০ ডিসেম্বর চার্চিলের কাছে যখন এই খবর গেলা তখন তিনি স্তম্ভিত। বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। চার্চিল পরবর্তীতে তার বইয়ে স্বীকার করেছেন যে- আচমকা ভেঙে পড়া বলতে যা বোঝায় ঠিক সেরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলেন তিনি।

অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, পুরো ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রবাহিনীর কোনো প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রইলো না। অসমসাহসী ও নিষ্ঠুর জাপানী বাহিনীকে এখন রুখবে কে?

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন উল্লসিত হিটলারঃ

জাপান যত কিছুই করুক না কেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসল খেলোয়াড় তো হচ্ছেন হিটলার। হিটলার যখন দেখলেন, জাপান আমেরিকাকে যুদ্ধে টেনে এনেছে তখন কালবিলম্ব না করে পার্ল হারবারের ঘটনার ঠিক ৪ দিন পরে ১১ ডিসেম্বর হিটলার আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। জাপান আর ইতালির সাথে মিলে ১৯৪০ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর জার্মানি একটা ত্রিপক্ষীয় চুক্তি করে, যার বদৌলতে জন্ম নেয় অক্ষশক্তির।

যদিও রাশিয়ার প্রান্তরে ব্যাপক মার খাচ্ছে জার্মান বাহিনী; তবু হিটলার হিসাব কষে দেখলেন, জাপানের পক্ষ অবলম্বরন করার এই তো সুযোগ। দুর্বার জাপান পুরো এশিয়া মহাদেশ দখল করে ফেলবে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এবার পালাবার পথ পাবে না। আর আমেরিকা এতো দূর থেকে সাহায্য করতে পারবে না।

হিটলার ভাবলেন যে জাপান এশিয়া দখল করতে চায় করুক, এশিয়া দখল করা শেষ হলে যদি রাশিয়ার ভূ-খণ্ডে জাপানকে দিয়ে হামলা করানো যায়, তাহলেই হিটলারের মহাবিজয় হবে। আয়ত্তে আসবে রাশিয়া। তাই, এখন জাপানের পক্ষে যেতেই হবে হিটলারকে।

যুদ্ধ এবার প্রকৃতপক্ষেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। পুরো ইউরোপ হিটলারের করতলগত। আফ্রিকাতে যুদ্ধ হচ্ছে বৃটিশের সাথে জার্মানী-ইতালির মিলিত বাহিনীর। এবার পুরো এশিয়ায় তান্ডব চালাবে জাপান। আটলান্টিকের অপর পাড়ের দেশ আমেরিকাও নামলো। রাশিয়া-জার্মানীর বৃহৎ যুদ্ধ চলছেই। পুরো মানবজাতির বুঝি আর রক্ষা নেই!

পর্ব-৪৬

দুর্বার জাপানের যত সব কান্ডকীর্তি:

জারিফ বললো, "আজকের পৃথিবীর সভ্য দেশ জাপান কোন মন্ত্র বলে এত হিংস্র হায়েনার মতো দূর প্রাচ্যের সব দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো তা ভাবতে অবাক লাগে।"

জাপানের প্রধান সমস্যা ছিলো প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা। দেশের আয়তন ছিলো ছোট, কিন্তু সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত বলীয়ান হয়ে পড়েছিলো জাপান। জাপানের চেয়ে ২৫ গুন বেশি আয়তনের চীন ছিলো খন্ড-বিখন্ড ও দুর্বল। ১৯৩১ সালে চীনের মাঞ্চুরিয়া দখল দিয়েই জাপানের সাম্রাজ্যবাদী তাণ্ডব শুরু। তারপর মঙ্গোলিয়ার বিরাট অংশ দখল করলো জাপান।

মামুন প্রশ্ন করলো, "রাশিয়ার সাথে নাকি জাপানের একটা যুদ্ধ হয়েছিলো সে সম্পর্কে কিছু বলো।"

জারিফ উত্তর দিলো, ১৯০৪-০৫ সালে ব্যাটল অব পোর্ট আর্থার যুদ্ধে জাপান রাশিয়াকে পরাস্ত করে। তবে, জাপানের প্রথম নজর ছিলো চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ-সমৃদ্ধ অঞ্চল ও রাশিয়ার সাইবেরিয়া এলাকা। এসব এলাকায় প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ বিদ্যমান ছিলো। মাঞ্চুরিয়া দখলের পর জাপানের সাথে রাশিয়ার সীমানা স্পর্শ করলো।

১৯৩৭ সালে প্রথমে চীনের সাথে যুদ্ধ শুরু করলো জাপান। পিকিং (বর্তমানে বেইজিং) থেকে অদূরে মার্কো পোলো ব্রিজে প্রথম সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। জাপানকে ঠেকাতে মাও সে তুং এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি ও চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী দল এক হয়। একটার পর একটা চাইনিজ প্রদেশ দখল করে জাপান। সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ছিলো নানকিং গণহত্যা।

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নানকিং এর পতন ঘটে। প্রায় ৩ লক্ষ সামরিক-বেসামরিক লোকজন জাপানী বাহিনীর বর্বরতার শিকার হয়। গণহারে নারীদেরকে ধর্ষণ করে জাপানিজরা।

জাপান রাশিয়ার সাথে ১৯৩৯ সালে একটা যুদ্ধ বাঁধিয়েছিলো; যদিও সেটা হয়েছিলো স্বল্পস্থায়ী। জাপান মঙ্গোলিয়ার একটা অংশ দখল করার পর রাশিয়ার সাথে তার সীমান্ত সমস্যা শুরু হয়। রাশিয়ার একনায়ক জোসেফ স্ট্যালিন শক্তহাতে জাপানকে দমন করেন। জাপানের হাতে রাশিয়ার লজ্জাজনক পরাজয় হয়েছিলো ১৯০৪-০৫ সালে। সে কথা মনে রেখে স্ট্যালিন কুশলী সেনাপতি জুকভকে পাঠিয়েছিলেন জাপানকে শায়েস্তা করতে।

১৯৩৯ সালের ১১ মে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে কালকিন গোল এর যুদ্ধ শুরু হয়। যদিও শেষমেষ জাপানের পরাজয় হয়। বাধ্য হয়ে জাপান রাশিয়ার সাথে সন্ধি করে। আর এই পরাজয়ের পরই মূলত জাপান রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে ইস্তফা দেয়। জাপান চিন্তা করলো, রাশিয়ার সাথে ঝামেলা বাধিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে চীনসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিরাট ভূ-খণ্ড পড়ে আছে, সেগুলো দখল করাই সুবিধাজনক।

শুধু রাশিয়ার সাথে সন্ধিই করেনি জাপান, হিটলার যখন ১৯৪১ সালের ২২ জুন রাশিয়া আক্রমণ করেন, তার মাত্র দুই মাস আগে জাপান রাশিয়ার সাথে নিরপেক্ষ থাকার চুক্তি করে।

এই চুক্তিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ জাপান হিটলারের ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়া সত্ত্বেও আর কোনোদিন রাশিয়া আক্রমণ করেনি। এমনকি হিটলারের বারংবার অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেছে জাপান। জাপান চায়নি আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুই দেশের বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ করতে।

হিটলারের হাতে ফ্রান্সের পতন: কপাল খুললো জাপানের

মামুন, তুমি আগে থেকেই জানো-ইন্দোচীন অঞ্চলের তিনটি দেশ লাওস, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া ছিলো ফ্রান্সের উপনিবেশ। ১৯৪০ সালে ২১ জুন যখন ফ্রান্স জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পন করলো, তখন ফ্রান্সের ললাটে মহা অপমান আর লাঞ্চনা জুটলো। ঠিক তখনই জাপানিজরা ইন্দোচীন দখলে হানা দিলো। ইন্দোচীনের অন্তর্গত চায়না-ভিয়েতনাম রেলওয়ে ব্যবহার করে চীন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আমদানি করতো। সেসব সরঞ্জাম জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো চীনারা। তাই চীনকে ঠেকাতে গেলে উক্ত অঞ্চল জাপানের হাতে থাকা দরকার।

দুর্বল ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব হয় নি ইন্দোচীন রক্ষা করা। অবধারিতভাবে উক্ত অঞ্চল দখল করে জাপান। পার্ল হারবারে বোমা হামলার প্রায় ১ বছর আগের ঘটনা সেটি।

পার্ল হারবার ঘটনার পরের ৬ মাস: চললো জাপানের বিজয়াভিযান-

পার্ল হারবারে বোমা হামলার ঠিক পরের দিন ব্রিটিশ কলোনী মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো জাপান। জাপানের পরিকল্পনাই ছিলো এরকম। আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করলে করুক। সৈন্য পাঠাতেও তো ৬ মাস লাগবে। এই ফাঁকে জাপান পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দখল করে ফেলবে। যেই কথা সেই কাজ।

মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর দখলঃ

ব্রিটিশ কলোনী মালয়েশিয়া ছিলো অত্যন্ত লোভনীয় অঞ্চল। তৎকালী বিশ্বের ৪০ শতাংশ রাবার ও ৬০ শতাংশ টিনের যোগানদাতা ছিলো মালয়েশিয়া। গভীর বনে আচ্ছাদিত মালয়েশিয়ার জঙ্গলগুলো ছিলো এক দুর্ভেদ্য এলাকা। এরকম গভীর জঙ্গল কোনোদিন কেউ আক্রমণ করতে আসবে তা ছিলো বৃটিশদের চিন্তার বাইরে। তাই সিঙ্গাপুরে নৌঘাঁটি মোতায়েন করে সেখান থেকেই মালয় উপদ্বীপ নিয়ন্ত্রণ করতো বৃটিশরা।

কিন্তু এবার নজর পড়লো জাপানের। পার্ল হারবার আক্রমণের পরের দিনই জাপানিজরা সিঙ্গাপুরে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ শুরু করলো। পালে পালে জাপানি সৈন্যরা মালয়েশিয়াতে অবতরণ করলো। সাইকেল র‍্যালী করে ব্রিটিশ নির্মিত পথ ধরে মালয়েশিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো জাপানি জেনারেল ইয়ামাশিতো'র সৈন্যরা।

যে ভরসায় ব্রিটেন মালয়েশিয়া আর সিঙ্গাপুর নিজেদের দখলে রাখার চিন্তা করেছিলো; সেই দুই যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস' আর 'রিপাল্‌স' ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জাপানীদের সামনে আর কোনো বাধা রইলো না।

ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৯৪২

ব্রিটিশ সিঙ্গাপুর আত্মসমর্পন করলো জাপানের কাছে। ১ লক্ষ ৩০ হাজার ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়ান ও ভারতীয় সৈন্যকে বন্দী করা হলো। সিঙ্গাপুরের পতনের কথা শুনে চার্চিল মন্তব্য করেছিলেন, "The worst disaster and largest capitulation in British history."

থাইল্যান্ড হয়ে বার্মা (মিয়ানমার) আক্রমণঃ জাপানিদের কব্জায় ইন্দোনেশিয়াও :

পার্ল হারবারে বোমা হামলার পর ডিসেম্বর মাসে জাপানীদের আরেকটি দল থাইল্যান্ডের দিকে নজর দিলো। আসলে জাপানিজরা যেভাবে বিদ্যুৎগতিতে সাঁড়াশি আক্রমণ চালাচ্ছিলো, সে আক্রমণকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারো ছিলো না। থাইল্যান্ডের সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলে জাপান বৃটিশদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কলোনী বার্মা আক্রমণের ফন্দি আঁটলো। থাইল্যান্ড হয়ে উঠলো অক্ষশক্তির গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। ঘন বনের ভিতর দিয়ে বার্মা যাওয়ার পথে বনের বাঘ, ভাল্লুক, হাতি ছাড়া জাপানিজদের বাধা দেওয়ার কেউ নাই।

৭ মার্চ-১৯৪২

বৃটিশ বাহিনী বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন (বর্তমান ইয়াঙ্গুন) থেকে সরে পড়লো। প্রায় বিনা বাধায় রেঙ্গুন প্রবেশ করলো জাপানিজরা।

১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ তেলসমৃদ্ধ ইন্দোনেশিয়া আক্রমণের দিকে এগিয়ে চললো জাপানিজরা। বড় দেশ ইন্দোনেশিয়া শাসন করতো

ইউরোপের ছোট্ট দেশ নেদারল্যান্ড। নেদারল্যান্ড নিজেই তখন হিটলারের দখলে, তাই জাপানিজদের বাধা দেওয়ার সামর্থ্য নেই তাদের। মার্চ মাসের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা আত্মসমর্পন করে বসলো। ইন্দোনেশিয়ায় বলতে গেলে কোনো যুদ্ধই হয়নি। সহজেই জাপানের দখলে এলো এই দেশ। ৬৫ হাজার ডাচ ও ইন্দোনেশিয়ার সৈন্যকে গ্রেফতার করে জাপানিজরা বিভিন্ন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠালো। তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন নির্মানশিল্পের কাজ করানো হলো।

হংকং দখলঃ অস্ট্রেলিয়া আক্রমণ ও ভারতবর্ষে জাপানিজ আক্রমণের শঙ্কাঃ

জাপানের হাতে হংকং এর পতন ছিলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন ঘটনা। চীনের বিরুদ্ধে আফিম যুদ্ধে জিতে হংকং এর হর্তাকর্তা হয় বৃটিশরা। পার্ল হারবারে বোমা নিক্ষেপের পরের দিনই জাপানিরা হংকং আক্রমণ করে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে আত্মসমর্পন করার আহবান জানায় জাপান। ব্রিটেন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে এ প্রস্তাব। জাপানীদের নৃশংসতা শুরু হলো এবার। জাপানের সৈন্যদের আদেশ দেওয়া হয়েছিলো, কাউকে বন্দী করা যাবে না, যাকে পাবে তাকেই হত্যা করবে। বন্দুকের গুলি শেষ হয়ে গেলে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "এতক্ষণ জানতাম জার্মানরা খারাপ, এখন দেখছি জাপানও কম যায় না।

জারিফ বললো, "কম যায় না মানে? জাপান ছিলো আরও ভয়ানক হিংস্র প্রকৃতির। হংকং আক্রমণের সময় বৃটিশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের মেধাবী ডাক্তারদের বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে জাপানীরা। এসব ডাক্তাররা বিন্দুমাত্র যুদ্ধ করেনি।"

১৯৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর ক্রিসমাস ডেতে বৃটিশরা হংকং জাপানের হাতে ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পন করে বসে।

এভাবেই বর্তমান আসিয়ানের সব সদস্যদেশগুলিকে জাপান মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে দখল করে বসে। জাপানীদের দুরন্ত যুদ্ধকৌশল ছিলো জার্মানীর চেয়েও বেশি ক্ষুরধার।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারির ১৯ তারিখ জাপান অস্ট্রেলিয়ায় বোমাবর্ষণ শুরু করলো। কুইন্সল্যান্ড ও ডারউইনে বেশ কয়েকদফা বোমাবর্ষণ করেছে জাপানিজরা।

হায়রে হায়! জাপানের বেপরোয় আচরণে মনে হচ্ছিলো এশিয়াজোড়া বৃটিশ সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো উড়ে যাবে। কলকাতা নগরীতে জাপানীরা বোমা মারতে পারে-এ আশংকা ঘিরে ধরলো।

জাপানের এই উন্মত্ততার সুযোগ নিতে চাইলো পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিবিদরা। ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী শুরু করলেন 'ভারত ছাড় আন্দোলন'। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের সহায়তায় সশস্ত্র পথে ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ তাড়াতে চাইলেন।

(আগামীতে প্রকাশিতব্য -**ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন**-বইতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত থাকবে)।

তবে জাপানিজ আক্রমনে বাংলায় একটা হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে যায়। বাংলা প্রদেশে চাল আসতো মূলত বার্মা থেকে। বার্মা বৃটিশের হাতছাড়া হওয়ায় বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। না খেতে পেরে মারা যায় বাংলার লাখ লাখ জনগোষ্ঠী। শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদীন মর্মস্পর্শী এসব চিত্র এঁকেছেন এ ব্যাপারে।

আর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ভারতবর্ষের লোকজনদের একদম পছন্দ করতেন না। মহাত্ম গান্ধীকে বলতেন নেংটি ইঁদুর। চার্চিল প্রশাসনের উদাসীনতা বাংলার এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী।

পর্ব-৪৭

প্রশান্ত মহাসাগরের যতসব নৌযুদ্ধঃ

গত পর্বে আমরা জাপানের দুর্বার আক্রমণের কথা বলেছিলাম। আমরা আলাপ করেছিলাম, জাপান কিভাবে একটার পর একটা দেশ দখল করেছিলো। জার্মানীর চেয়ে বেশি হিংস্রতায় জাপানিজরা কুপোকাত করেছিলো বৃটিশদের।

কিন্তু জাপানের একটা হিসাবে ভুল হয়েছিলো।

কি সেই ভুল?

জাপান ভেবেছিলো, পার্ল হারবার আক্রমণ করার পর আমেরিকা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নিতে ৬ মাস/এক বছর লাগবে। আবার এতদূর থেকে আমেরিকা যুদ্ধে কিভাবে অংশ নেয়, সেটাও অনিশ্চয়তার ব্যাপার।

কিন্তু আমেরিকা যে সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধে নামবে সেটা ছিলো জাপানের চিন্তার বাইরে। সেখানেই জাপানের পরাজয়ের বীজ নিহিত।

ব্যাটল অব কোরাল সাগর :

জাপান সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দখল করার পর ওশেনিয়া মহাদেশ দখল করতে চেয়েছিলো। তারা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বোমাবর্ষণও শুরু করলো ফেব্রুয়ারি মাসেই। প্রশান্ত মহাসাগরের নিউ গায়ানা দ্বীপপুঞ্জে জাপান অবস্থান নিতে শুরু করলো।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান বাহিনীকে সাথে নিয়ে আমেরিকা যে এত তাড়াতাড়ি রণসজ্জা সাজিয়ে রেখেছে তা ছিলো জাপানের চিন্তার বাইরে।

৪ মে থেকে ৮ মে ১৯৪২ :

সে এক যুদ্ধ বটে! জাপানি যুদ্ধজাহাজে মোতায়েন যুদ্ধবিমানের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করলো আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ান বাহিনী। মানব ইতিহাসের প্রথম সাগরে ও আকাশে একসাথে যুদ্ধ। পানিতে মোতায়েন যুদ্ধজাহাজকে ঘাঁটি করে আকাশে বিমান যুদ্ধ শুরু হলো জাপানের সাথে আমেরিকার। ফলাফল?

দুপক্ষেরই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হলো। অগ্রসরমান জাপানিজরা এই প্রথম পিছু হটলো আমেরিকান আক্রমণে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আক্রমণ করার আশা ত্যাগ করতে হলো জাপানকে।

৩ জুন থেকে ৬ জুন ১৯৪২ : ব্যাটল অব মিডওয়ে :

আবারও যুদ্ধ শুরু হলো আকাশে-সাগরে। জাপানী নৌবাহিনীর প্রধান এডমিরাল ইয়ামামুতু মিডওয়ে দ্বীপপুঞ্জে অবস্থানরত মার্কিন বাহিনীকে ধ্বংস করতে তৎপর হলেন। চতুর্দিক দিয়ে আক্রমণ করা শুরু করলো জাপান। কিন্তু এই ফাঁকে আমেরিকান গুপ্তচরেরা জাপানিদের গোপন তৎপরতা ও বিস্তারিত সামরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে গেলেন। তাই মার্কিনিরা আগে থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। এতেই জাপান কুপোকাত হলো। তিন দিন স্থায়ী এ যুদ্ধে জাপানিজরা ৩০০০ নৌসেনা হারালো, যার মধ্যে ছিলো ২০০ সুদক্ষ পাইলট। ৩০০ এয়ারক্রাফট, ১টি ক্রুজার ও চারটি ক্রজার ক্যারিয়ার হারালো জাপান। বিপরীতে আমেরিকার ৩৬৪ জন সৈন্য নিহত হলো।

মিডওয়ের যুদ্ধে জাপানের এই পরাজয় আমেরিকাকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুললো। জাপান আর প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে দাবড়ানোর সাহস পায় নি। ডিফেন্সিভ মুডে চলে গেলো জাপানের নৌবাহিনী। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম টার্নিং পয়েন্টও বটে।

ব্যাটল অব গুয়াডাল ক্যানাল : আমেরিকার জন্য প্রতিশোধ মিশনও বটে! :

পরপর দুটি যুদ্ধে জাপানকে পরাস্ত করে সাহস বেড়ে গেলো আমেরিকার। আমেরিকার সাথে পুরোপুরি যোগ দিলো অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। বর্তমান ওশেনিয়া মহাদেশের সলোমন দ্বীপপুঞ্জে ঘাঁটি ছিলো জাপানের। আগের দুটি যুদ্ধে হেরে জাপানিজরা ১৯৪২ সালের ৮ জুন সলোমন দ্বীপপুঞ্জে ঘাঁটি গড়ে তুলে।

দুই মাস পরে আগস্ট মাসে আমেরিকানরা পার্ল হারবার বোমা হামলার প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয়। এবার আমেরিকানরা জাপানের উপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সন্মুখীন হয় জাপান। কয়েকমাস প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার

করলেও জাপানিজরা ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গুয়াডাল ক্যানাল এলাকা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

পার্ল হারবার বোমা হামলার পরবর্তী এক বছর জাপানের ৩০ হাজার নৌসেনার মধ্যে ২০ হাজারকে ততদিনে খতম করে ফেলেছে আমেরিকা। আর আমেরিকা অত্র অঞ্চলে ৬০ হাজার নৌসেনা মোতায়েন করেছে বিভিন্ন সময়ে। নিহত হয়েছে মাত্র ২ হাজার সৈন্য।

আমেরিকান নৌবাহিনী যদি জাপানকে এভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে রুখে না দিতো তাহলে জাপান আরও বেশি হিংস্র হয়ে পড়তো। হয়তো জাপানের দখলে চলে যেতো ভারতবর্ষ ও অস্ট্রেলিয়াসহ গোটা এশিয়া।

ব্যাটল অব স্ট্যালিনগ্রাদ :

প্রশান্ত মহাসাগরে হিটলারের মিত্র রাষ্ট্র জাপান যখন আমেরিকার হাতে নাকানি চুবানি খাচ্ছে তখন হিটলারেরও কাহিল দশা। রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিনের নামাঙ্কিত শহর স্ট্যালিনগ্রাদে তখন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণঘাতী যুদ্ধ হচ্ছিলো। এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর ক্ষয়ক্ষতি হয়নি কোনোদিন।

১৯৪১ সালের ২২ জুন রাশিয়া আক্রমণ করার সময় হিটলার ভেবেছিলেন, আগামী শীত শেষ হওয়ার আগেই ক্রিসমাস ডে তিনি পালন করবেন মস্কোয়। সেটা তো হলোই না, যুদ্ধ গড়ালো ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মেও। হিটলার মস্কো দখল করতে না পেরে এবার যুদ্ধের ফ্রন্ট অন্যদিকে ঘুরালেন।

স্ট্যালিনসহ রাশিয়ান জেনারেলরা ধরে নিয়েছিলেন ১৯৪১ সালের শীতে জার্মানরা রাশিয়ানদের হাতে যে মার খেয়েছে মস্কো দখল করতে গিয়ে, হয়তো গ্রীষ্মকালে জার্মানরা আবারও মস্কো দখল করতে আসবে।

কিন্তু জার্মানদের যুদ্ধ সরঞ্জাম দরকার। দরকার বিপুল পরিমাণ তেল। ককেশাস অঞ্চলের দেশ আজারবাইজানের বাকুতে আছে তেলের খনি। জার্মানরা চিন্তা করলো, মস্কো দখল আপাতত বাদ। ককেশাস অঞ্চলের তেলের খনি দখল করলে রাশিয়ারও ক্ষতি হবে আবার জার্মানদেরও শক্তি বাড়বে। তাই ককেশাস অঞ্চলের দিকে পা বাড়ালো জার্মানরা। আর এ কাজ করতে গিয়ে ভলগা নদীর তীরে অবস্থিত স্ট্যালিনগ্রাদ শহর দখল করতেই হবে। তাই জার্মান শিবিরে রব উঠলো, "চলো চলো, স্ট্যালিনগ্রাদ চলো"

২৩ আগস্ট-১৯৪২!

স্ট্যালিনগ্রাদ শহরে বোমা বর্ষণ শুরু করে জার্মানরা। কিন্তু রাশিয়ানদের ইস্পাত কঠিন মনোবল ছিলো সর্বজয়ী। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে প্রতিরোধ গড়ে তুলে রাশিয়ানরা। স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের রেলস্টেশন ৬ ঘন্টায় ১৪ বার হাতবদল হয়।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধকে সবাই মানব ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করে-এর কারণ কি?"

জারিফ উত্তর দিলো, আসলেই স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ মানব ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, কারণ ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চলে। দুপক্ষে প্রায় ২০ লাখ লোক নিহত হয়। গড়ে প্রতিদিন ১০ লাখ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়।

রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিনের নির্দেশ ছিলো, কোনো অবস্থাতেই পিছু হটা যাবে না। ভলগা নদীর দুপাড় জুড়ে ছিলো স্ট্যালিনগ্রাদের অবস্থান। হিটলারও তার বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কোনো রকম আত্মসমর্পন না করার। হয় বিজয়, নয়তো মৃত্যু। সৈনিকদের প্রতি এরকম নির্দেশ ছিলো জার্মান সেনাপতিদের।

আবারও রাশিয়ার উদ্ধারকর্তা হয়ে মাঠে ভয়ংকর শীত। স্তব্ধ হয়ে গেলো জার্মান যুদ্ধাস্ত্র। আড়ষ্ট হয়ে গেলো অগনিত সৈনিক। খাদ্যাভাবে এবং মহামারীতে মারা গেলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জার্মান সেনা। সুযোগ গ্রহন করলো সোভিয়েত বাহিনী। প্রচণ্ড বিক্রমে বিপুল সৈন্যদল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা জার্মানদের উপর।

হিটলার বুঝতে চাইছেন না জার্মান সৈন্যদের বাস্তব অসুবিধা। হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি সেনাপতিদের উপর। বললেন, "আমি চাই না কোনো কৈফিয়ত, চাই অগ্রগতি। চাই বিজয়"।

সকল তর্জন-গর্জন বিফলে গেলো। দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুললো রুশ বাহিনী। রুশ বাহিনী মরিয়া আক্রমণ চালায় জার্মানদের উপর। রাশিয়ান সৈন্যদেরও বিপদ। স্ট্যালিন বলে রেখেছেন, "কোনো সৈন্য যদি আত্মসমর্পনের কথা চিন্তাও করে, তাহলে তাদেরকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হবে, নয়তো ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে হত্যা করা হবে।"

স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জিততে হিটলার একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন জাপানকে দিয়ে। যেহেতু জাপানের সাথে জার্মানীর বন্ধুত্ব বিদ্যমান, তাই ভাবলেন জাপানকে একটু তোষামোদ করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়া যায় কিনা।

জাপানী রাষ্ট্রদূত ওশিমাকে ডেকে নরম নরম কথা বললেন। জাপান জবাব দিলো, এ মুহূর্তে রাশিয়া আক্রমণের কোনো পরিকল্পনা জাপানের নেই। বরং উল্টো হিটলারকে উপদেশ দিলো, রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। জাপানের যুক্তি ছিলো, রাশিয়ার সাথে কেন আমি অনর্থক যুদ্ধ করবো? যেখানে আমেরিকা আর ব্রিটেনকে পুরো এশিয়া মহাদেশ আর প্রশান্ত মহাসাগরে দাবড়ানি দিচ্ছে জাপান, সেখানে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই।

কোনো অবস্থাতেই জাপান সরকার রাজি হয়নি। রুশ যুদ্ধে জার্মানীকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করেনি জাপান। অবধারিতভাবেই হিটলারের কপালে পরাজয়ের কলঙ্ক তিলক জুটে।

স্ট্যালিনগ্রাদের পরাজয় হিটলারের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়। বিশ্বজয় দূর অস্ত, নিজের অস্তিত্ব নিয়ে শংকায় পড়ে যান হিটলার। স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ের আভাস পেয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 'শেষের শুরু' হয়ে গেলো। আমরা বিজয়ের গন্ধ পাচ্ছি। ১৯৪২ সালের ক্রিসমাসটা বৃটিশ জাতি অত্যন্ত উৎসবের সাথে পালন করতে পেরেছিলো।

পর্ব-৪৮

মরুভূমির প্রান্তরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ :

১৯৪২ সালের ক্রিসমাসে মিত্রপক্ষে উৎসব, আর অক্ষশক্তি শিবিরে বিষণ্নতা। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের একটার পর একটা পরাজয় আর রাশিয়ার স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে হিটলারের সব আশা শেষ হওয়ার পাশাপাশি অক্ষশক্তির জন্য আরেকটা মহা দুঃসংবাদ ছিলো।

হিটলারের মিত্র ইতালির একনায়ক মুসোলিনীর খুব খায়েশ ছিলো উত্তর আফ্রিকা দখল করার। তিনি আবার রোমান সম্রাট হতে চেয়েছিলেন। বলকান অঞ্চলের আলবেনিয়া ও গ্রীস দখল করার পর তিনি আফ্রিকা অভিযানে নেমেছিলেন। গ্রীস দখলের সময় হিটলার তাকে সহযোগিতাও করেছিলেন।

কিন্তু মুসোলিনীর ছিলো খাই খাই স্বভাব। উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া আগেই ইতালির দখলে ছিলো। লিবিয়াকে কেন্দ্র করে তিনি দখল করতে চান মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মিসর। হিটলারকে তিনি উপহার দিতে চান সুয়েজ খাল। যে সুয়েজ খাল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অক্সিজেন। এই সুয়েজ খাল দিয়ে ইউরোপ থেকে ভারতে আসা যায় অতি সহজে। বৃটিশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ আসার জলপথ দখল করতে চান মুসোলিনী।

চাপাবাজ মুসোলিনীর খপ্পরে পড়লেন হিটলার, আর ডেকে আনলেন নিজের চরম সর্বনাশ। মামুন প্রশ্ন করলো, "মুসোলিনী চাপাবাজ কেন?"

জারিফ উত্তর দিলো, মুসোলিনী এজন্য চাপাবাজ যে- তার নিজের বাহিনী ছিলো অত্যন্ত অদক্ষ। জার্মানী-জাপান কিংবা আমেরিকান-বৃটিশ সৈন্যদের ধারেকাছেও ছিলো না ইতালির সৈন্যরা। তাছাড়া ইতালি ছিলো অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। এমন অবস্থা নিয়ে কি আর যুদ্ধ বাধানো যায়?

কিন্তু মুসোলিনী তাই করলেন, হিটলারকে আফ্রিকা রনাঙ্গণ খুলতে অনুরোধ করলেন । নিজেও মরলেন, হিটলারকেও মারলেন।

এবার শোনো সেই সব কাহিনী।

দি "ডেজার্ট ফক্স"-জার্মান সেনাপতি রোমেলের কিচ্ছা :

জেনারেল এরউইন রোমেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র জার্মান সেনাপতি যাকে জার্মানরা আজও শ্রদ্ধা করে। রোমেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন স্বয়ং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। স্থলযুদ্ধে রোমেলের মতো মেধাবী সেনাপতি বিংশ শতাব্দীতে বোধহয় আর একজনও আসেনি।

দু:খজনক ভাবে হিটলারের মতো একজন জাত পাগলের খপ্পরে পড়ে এই মেধাবী সেনাপতির জীবনে ট্রাজেডি নেমে আসে। জীবনের শেষ মুহূর্তে বিষপান করে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হন।

কে এই রোমেল?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রোমেল ছিলেন একজন সেকেন্ড লেফট্যানেন্ট। পদাতিক যুদ্ধের কলাকৌশল নিয়ে তিনি একটি বইও লিখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে রোমেলের বুদ্ধির জোরে অতি সহজে ফ্রান্সকে পরাজিত করে জার্মানরা। রোমেল বিরোধী সেনাদের হতবুদ্ধি করে ফেলতে পারতেন। আচমকা শত্রু পক্ষের সামনে হাজির হয়ে যেতেন রোমেলের পদাতিক বাহিনী। হঠাৎ আক্রমণে ঘায়েল হয়ে যেতো বিরোধী সৈন্যরা। বিরোধী পক্ষ রোমেলের এই আচমকা আক্রমণকে নাম দিয়েছিলো 'Ghost division' নামে। পোল্যান্ড অভিযানে জেনারেল রোমেল রেখেছিলেন উল্লেখযোগ্য অবদান। সে যুদ্ধের প্ল্যান প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য হিটলার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়েছিলেন জেনারেল রোমেলের নিকট থেকে। হিটলারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন রোমেল। হিটলার প্রায়ই বলতেন, "আমার যোগ্য উত্তরসূরী হচ্ছেন রোমেল।"

হিটলার যখন ১৯৪১ সালে পুরো বিশ্বে যুদ্ধটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন, তখন হিটলারের মিত্র মুসোলিনী আফ্রিকা মহাদেশে যুদ্ধ শুরুর পরিকল্পনা করেন। উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া ছিলো ইতালির উপনিবেশ। লিবিয়ার বামপাশে ছিলো ফ্রান্স নিয়ন্ত্রিত আলজেরিয়া, মরক্কো আর তিউনিসিয়া। ডানপাশে ছিলো বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশ মিসর।

আগেই বলেছি, মুসোলিনী চাপাবাজ। ইতালির সৈন্যদের কোনো যোগ্যতা নেই উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীর সাথে পাল্লা দেওয়ার।

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখে উত্তর আফ্রিকায় চরম পরাজয়ের মুখোমুখি হয় মুসোলিনী। দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী হয় ব্রিটেনের হাতে, যুদ্ধ সরঞ্জামের ক্ষয়ক্ষতি তো ছিলোই।

আবারও হিটলারের কাছে কেঁদে কেটে সাহায্য চাইলেন মুসোলিনী। বললেন, "উত্তর আফ্রিকা পুনরুদ্ধার করতে হবে ব্রিটেনের কাছ থেকে। আমি আর পারবো না। আপনার দুর্ধর্ষ বাহিনী পাঠান আমার সাহায্যের জন্য। না হলে আমি শেষ।"

হিটলার তার সব সামরিক উপদেষ্টাদের কথা অগ্রাহ্য করে তার সবচেয়ে প্রিয় সেনাপতি রোমেলকে লেফট্যানন্ট জেনারেল উপাধি দিয়ে পাঠান আফ্রিকা অভিযানে।

১২ ফেব্রুয়ারি-১৯৪১!

জার্মানীর সবচেয়ে চৌকষ সেনাপতি রোমেল তাশরীফ আনয়ন করলেন লিবিয়ার ত্রিপলিতে। রোমেলের চোখ দিয়ে হিটলার আর মুসোলিনীর স্বপ্ন ছিলো সমগ্র উত্তর আফ্রিকা থেকে বৃটিশ আর ফ্রান্সকে বিতাড়িত করে তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অক্সিজেন সুয়েজ খাল দখল করবেন। রোমেলের মতো সুদক্ষ অধিনায়ক পেয়ে দুর্বল ইতালিয়ান বাহিনীও চাঙ্গা হয়ে উঠে।

রোমেল দখল করলেন লিবিয়ার তব্রুক শহর। বৃটিশ বাহিনীকে ঠেঙ্গিয়ে মিসরের মূল ভূখন্ডে নিয়ে গেলেন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে- আফ্রিকায় বৃটিশের সাধের উপনিবেশ মিসর বুঝি এবার জার্মানীর পেটে যায়।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে রোমেলের প্রশংসা করলেন। চার্চিল বললেন, 'We have a very daring and skilled opponent against us.'

কিন্তু বছর শেষে উত্তর আফ্রিকার ফ্রন্টে আমেরিকাও জড়িয়ে পড়ে। ব্রিটেনকে ব্যাপক সহায়তা করে আমেরিকা। আর ব্রিটেনের মেধাবী অফিসার জেনারেল মন্টোগোমারী রোমেলকে হারানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে যান।

আহলান! সাহলান!

স্বাগতম! জার্মান!! জার্মান!!!

হিটলার নাকি বাহিনী পাঠিয়েছেন বৃটিশকে ঠেঙ্গানোর জন্য?

মিসরজুড়ে এ খবর রাষ্ট্র হয়ে যায়। ২৫০০ বছর যাবত পরাধীনতার গ্লানি টানছে মিসর। সেই গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের সময় থেকে শুরু। তারপর পারসিক, বাইজেন্টাইন, মুসলিমদের হাত ধরে কত রাজবংশ আর সৈনিকেরা যে মিসরকে শাসন করেছে তার ইয়ত্তা নেই। সর্বশেষ সব ডাকাতের বড় ডাকাত বৃটিশরা ১৮৮২ সাল থেকে মিসরে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। বৃটিশদের প্রতি নিদারুণ ঘৃণা ছিলো মিসরবাসীর। সেই বৃটিশ যখন হিটলারের হাতে নাকানি চুবানি খাচ্ছিলো, তখন মিসরবাসীর খুশি দেখে কে?

শুধু তাই নয়, বৃটিশদেরকে উৎখাত করে জার্মানরা শাসন করুক মিসর-এতে আপাতত কোনো আপত্তি নাই মিসরবাসীর। জার্মান সৈনিকদের বরণ করা শুরু করলো মিসরবাসী। জার্মানীর বিজয় কামনায় মসজিদে মসজিদে দোয়া শুরু হলো। মিসরবাসীর খুশি দেখে মনে হলো জার্মান সেনাপতি রোমেল তাদের মুক্তিদূত।

কিন্তু মিসরবাসীর স্বপ্নপূরণ হলো না!

ব্যাটল অব এল-আলামিন: আফ্রিকা থেকে জার্মানীর বিদায়

রোমেল তার মেধা দিয়ে কি করবেন, যেখানে সৈন্যদের জন্য গোলাবারুদ, রসদ, ট্যাঙ্ক ইত্যাদির তীব্র অভাব?

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসের ২৩ তারিখ শুরু হওয়া এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ফায়সালা হয়ে যায় যে- অক্ষশক্তিকে আফ্রিকা ছাড়তে হবে। মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে ১৫০ মাইল দূরে এল আলামিন প্রান্তরে মুখোমুখি হয় অক্ষশক্তি আর মিত্রশক্তি। ১১ নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার জার্মান সৈন্য বন্দী হয় মিত্রবাহিনীর হাতে। জার্মান সেনাপতি রোমেল ততদিনে অসুস্থ হয়ে জার্মানীতে চলে এসেছেন।

আফ্রিকা ফ্রন্টে হিটলার-মুসোলিনী বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়-

১৯৪৩ সালের মে মাসের মধ্যে সম্মিলিত মিত্র বাহিনী পুরো উত্তর আফ্রিকাকে অক্ষশক্তির হাত থেকে মুক্ত করে। বৃটিশের অষ্টম বাহিনী ও আমেরিকান নৌবাহিনী একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মানদের উপর। মরক্কো এবং আলজেরিয়ার উপকূলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হলো তাদেরকে। পিছিয়ে গেলো জার্মান বাহিনী তিউনিসিয়া বরাবর। এই সময় তারা বিপুল অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রায় আড়াই লাখ জার্মান সৈন্যকে বন্দী করতে সক্ষম হলো।

ওদিকে রাশিয়ার কাছেও তখন চরম মার খাচ্ছে জার্মান বাহিনী। ঘন্টায় ঘন্টায় দু:সংবাদ আসছে বিভিন্ন সেক্টর থেকে। মানচিত্রের দিকে তাকাতে পারেন না হিটলার। বুকে চিনচিন ব্যাথা করে হিটলারের। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ আর প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস হিটলারকে উপদেশ দিলেন, রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিনের সাথে একটা সন্ধি করে ফেলুন। অনেক যুদ্ধ হয়েছে, আর কতো?

রোমেলও বুদ্ধি দিয়েছিলেন, "মহামান্য ফুরার! দুনিয়াব্যাপী যদি একটা দেশকে যুদ্ধ করতে হয়, তবে পরাজয় না হয়ে যাবে কোথায়? আপনার উচিত হয়নি একই সময়ে রাশিয়ায় ও আফ্রিকায় সৈন্য পাঠানো। এখন সন্মানের সাথে সন্ধি করে ফেলুন।"

সন্ধিপ্রস্তাবের কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন হিটলার। কিসের সন্ধি? যুদ্ধ চলবেই। আমি আবার সৈন্য তৈয়ার করবো। জার্মানীকে কেউ হারাতে পারবেনা। সবাই বুঝলেন যে, হিটলারকে সুবুদ্ধি দেওয়া বৃথা। সারাক্ষণ যুদ্ধ নিয়ে চিন্তা করতে করতে মানসিক রোগী হয়ে গেছেন হিটলার।

পর্ব-৪৯

১৯৪৩ সাল:-পরাজয় ছাড়া আর কোনো খবর নেই জার্মান বাহিনীর-

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে রাশিয়ার প্রান্তর থেকে পিছু হটা শুরু করে জার্মান বাহিনী। এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। নবশক্তিতে বলীয়ান রাশিয়ানদের হাতে চরম মার খেতে থাকে জার্মানরা।

ঠিক একই সময়ে আফ্রিকা থেকে গুটিয়ে চলে আসে হিটলার ও মুসোলিনীর সম্মিলিত বাহিনী। অক্ষশক্তির অপর সদস্য জাপান ডিফেন্সিভ খেলা শুরু করে।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে তো যুদ্ধ ১৯৪৩ সালেই শেষ হওয়ার কথা ছিলো? হলো না কেন?"

জারিফ উত্তর দিলো, ঘটনা হচ্ছে-তখনও ইউরোপের বিশাল অংশ জার্মানদের দখলে ছিল। হিটলার যখন কোনো ধরণের আত্মসমর্পনের পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিলেন, তখন যুদ্ধ শেষ করতে গেলে সময় তো লাগবেই। কারণ যুদ্ধ শেষ করার পূর্বশর্ত ছিলো জার্মানদের মাটিতে আক্রমণ। কিন্তু জার্মানদের মাটিতে আক্রমণ করতে গেলে আগে তাদের দখল থেকে অন্য দেশগুলিতে উদ্ধার করতে হবে। ফ্রান্সসহ বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, পোল্যান্ড এসব দেশগুলিতে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে জার্মানরা। জার্মানদের দুঃশাসনের কারণে এসব দেশে খাদ্যভাব ও সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। জনগণ কষ্ট করে ফসল ফলাতো, আর এসব ফসল নিয়ে যেতো জার্মানরা।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সবসময় একই কথা Germany first নীতি। আমেরিকা যতোই জাপানকে ঘায়েল করুক, আর উত্তর আফ্রিকাতে অক্ষশক্তি যতোই পরাজিত হোক না কেন, ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকাতে জার্মানরা যেভাবে বছরের পর বছর ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে, সেখান থেকে জার্মানদেরকে বিতাড়িত করতে না পারলে যুদ্ধ কখনোই শেষ হবে না। চার্চিলের এরকম পরিকল্পনা শুরুতে কেউ সমর্থন না করলেও ধীরে ধীরে এটা নিয়ে আলোচনা হতে থাকে মিত্রশক্তির মাঝে।

ইতালির আত্মসমর্পন: দিশেহারা হিটলার-

চার্চিলের এরকম পরিকল্পনার প্রথম বাস্তবায়ন ঘটে ইতালিতে। ইতালিয়ানরা যখন দেখলো, এই যুদ্ধ তাদেরকে কিছুই দিতে পারেনি, বরং যুদ্ধ নিয়ে এসেছে

অবর্ণনীয় কষ্ট আর লাঞ্ছনা। ইতালির একনায়ক মুসোলিনীর মন্ত্রিসভার সদস্যরাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠলেন। হিটলারের পাশে থেকে কিছুই মেলে নি ইতালির।

ইতালির এরকম গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই মিত্রবাহিনী ইতালিকে বশে আনতে শুরু করেন 'Operation husky'

১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে চার্চিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে অনুরোধ করেন ইতালিতে সৈন্য নামানোর। চার্চিল যুক্তি দেখান, যেহেতু ইতালির অবস্থা নড়বড়ে আর উত্তর আফ্রিকায় আমরা বিজয় অর্জন করতে চলেছি তাই এ মুহূর্তে ইতালিকে সহজে ঘায়েল করা যাবে। ইতালিকে যদি আমরা কব্জায় আনতে পারি তাহলে পরবর্তীতে ইউরোপকে নাৎসীদের কবল থেকে মুক্ত করা সহজ হবে।

যদিও আমেরিকা অনিচ্ছুক ছিলো এ ব্যাপারে তবুও পরবর্তীতে ব্রিটেনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলো।

৯ জুলাই, ১৯৪৩

ইতালির সিসিলি দ্বীপপুঞ্জে মিত্রশক্তি অবতরণ করলো। ২৭০০ এর বেশি জাহাজ নিয়ে ভূমধ্যসাগরের দিকে ছুটে চললো অ্যাংলো-আমেরিকান বাহিনী। তাদেরকে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত ছিলো দেড় লক্ষ সৈন্য ও ৪ হাজার যুদ্ধবিমান। মিত্রবাহিনীর এরকম আচমকা আক্রমেণ মোটেও প্রস্তুত ছিলো না ইতালিয়ানরা। অল্প সংখ্যক জার্মান সৈন্য কুলিয়ে উঠতে পারছিলোনা সিসিলি অভিযানে।

মিত্রবাহিনী ইতালি আক্রমণ করলে এক আজব ঘটনা ঘটে ইতালিতে। ইতালির লোকজন মিত্রবাহিনীকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে স্বাগত জানায়। কারণ, ইতালির সাধারণ জনগন আর যুদ্ধ করতে চাইছিলো না। ইতালিয়ানরা চাইতো, মুসোোলিনীকে উৎখাত করে দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসুক।

মিত্রবাহিনী কর্তৃক হামলার মাত্র ১৩ দিন পর ২৪ জুলাই মুসোলিনী ক্ষমতাচ্যুত হয়। মুসোলিনীকে গৃহবন্দী করা হয়; ক্ষমতা নিয়ে নেয় পিয়েত্রো বাদগ্লিয়ো।

কিন্তু হিটলার দমবার পাত্র নন। জানি জিগির দোস্ত মুসোলিনীকে বাঁচাতে অচিরেই কয়েক ডিভিশন সৈন্য পাঠান রণাঙ্গণে।

শুরু হলো তুমুল লড়াই। মিত্রবাহিনী ইতালি অভিযানকে যতটুকু সহজ মনে করেছিলো, তেমন আর হয়নি। ইতালিয়ান বাহিনীর একটা বড় অংশ মিত্রবাহিনীর সাথে যোগ দেয়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো নবগঠিত জার্মান সৈন্যদের সাথে ইতালিয়ানদের যুদ্ধও হয়। আসলেই বিপদে পড়ে যায় জার্মানরা। বেশ কয়েক মাস পর এরকম অবস্থার পর ইতালির সরকার আত্মসমর্পনের সিদ্ধান্ত নেয়।

৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ :

মার্কিন সেনাপতি জেনারেল আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করেন, ইতালি আত্মসমর্পন করবে। ইতালিয়ান বাহিনীর সাথে কথা বলেই আইসেনহাওয়ার এই ঘোষণা দেন। কিন্তু আবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন হিটলার। ইতালিকে নিজের দখলে রাখতে চান।

ইতালির অবস্থা দাঁড়ালো এমন যে যুদ্ধ শেষ হয়েও হলো না শেষ। নিজেরা আত্মসমর্পন করলে কি হবে, জার্মানরা বিভিন্নভাবে জ্বালিয়ে মারলো ইতালিয়ানদের। কেন ইতালিয়ানরা মিত্রবাহিনীর সাথে যোগ দিলো- এ অজুহাতে ইতালি থেকে জার্মান বাহিনী সরে নি। ইতালি হয়ে পড়লো চরম নৈরাজ্য আর দেউলিয়াপনার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মুসোলিনী আপাতত গৃহবন্দী রইলেন।

তেহরান সম্মেলনঃ হিটলারের কবল থেকে ইউরোপকে মুক্তির পরিকল্পনা-

২৮ নভেম্বর, ১৯৪৩

ইরানের রাজধানী তেহরানে তিন নেতার মহামিলন হলো। বিশ্ব দেখলো-পরস্পর বিরোধী দুই মতবাদের ধারক ও বাহক পুঁজিবাদী আমেরিকা ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া হিটলারকে ঠেকানোর জন্য এক মঞ্চে উপস্থিত। আর অবশ্যই উপস্থিত ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল একসাথে বসে ছবি তুলেন; যেটা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম আইকনিক এক ছবি।

স্ট্যালিন প্রথমেই রুজভেল্টের কাছে অভিযোগ করেন চার্চিলের ব্যাপারে। বলেন, "দেখুন, রাশিয়ানরা একা হিটলারকে সামলাচ্ছে। কি ভীষণ মুসিবতে পড়েছি আমরা এই পাগলা কুকুরকে সামলাতে। অথচ মিঃ চার্চিল আমাকে বারবার আশ্বাস দিয়েছেন-এই করবেন, সেই করবেন বলে। আমাকে কোনোরকম সহায়তা করেনি ব্রিটেন। রাশিয়ানরা কারো কাছ থেকে সহায়তা না পেয়ে কত কষ্ট করছে; সেই খবর কি আপনার নিয়েছেন?"

রুজভেল্ট স্ট্যালিনকে আশ্বাস দিলেন, "ব্রিটেন আর আমেরিকা আপনাকে এখন পর্যন্ত সহায়তা করেনি সেটা সত্য; কিন্তু আমরা তো আরও বড় পাগল জাপানকে সামলাচ্ছি। এত ছোট একটা দেশ জাপান; সে যে কতবড় হিংস্র হয়ে গেছে সেটা কে জানতো?"



চিত্র-২৪: মতাদর্শকে পাশে ঠেলে পুঁজিবাদী আমেরিকা ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া হিটলারকে ঠেকানোর জন্য একসাথে মিলিত হয়েছিলো। তেহরান সম্মেলনে প্রথমবারের মতো একত্রে বৈঠক করলেন তিন নেতা। বামদিক থেকে চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন।

রুজভেল্ট যুক্তি দিলেন যে, ব্রিটেন আর আমেরিকা জাপানকে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত; তার উপর উত্তর আফ্রিকায় হিটলার ও মুসোলিনীর সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে কি ধকলটাই না গেছে আমাদের! তাই রাশিয়ানদেরকে সহায়তা করতে পারিনি আমরা। এখন সময় অনুকূলে। তাই আপনাদের সহায়তার জন্য আমরা যা করার করবো।

চার্চিল দেখলেন, পুঁজিবাদী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার একনায়কের ভালোই খাতির জমছে! অথচ স্ট্যালিনের সাথে শুরুতে বসতেই রাজি ছিলেন না রুজভেল্ট। চার্চিলের দূতিয়ালিতেই আজ তা সম্ভবপর হয়েছে।

চার্চিলের এক কথা। আগামী গ্রীষ্মে (১৯৪৪ সালের মে-জুন) ফ্রান্সে সৈন্য নামাতে হবে। তারপর দুর্বার গতিতে ফ্রান্সকে মুক্ত করে জার্মানীর সীমানা অব্দি পৌঁছে যেতে হবে। জার্মানীর কাছ থেকে সব দেশকে মুক্ত করে ১৯৪৫ সালের দিকেই



চিত্র-২৪: মতাদর্শকে পাশে ঠেলে পুঁজিবাদী আমেরিকা ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া হিটলারকে ঠেকানোর জন্য একসাথে মিলিত হয়েছিলো। তেহরান সম্মেলনে প্রথমবারের মতো একত্রে বৈঠক করলেন তিন নেতা। বামদিক থেকে চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন।

রুজভেল্ট যুক্তি দিলেন যে, ব্রিটেন আর আমেরিকা জাপানকে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত; তার উপর উত্তর আফ্রিকায় হিটলার ও মুসোলিনীর সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে কি ধকলটাই না গেছে আমাদের! তাই রাশিয়ানদেরকে সহায়তা করতে পারিনি আমরা। এখন সময় অনুকূলে। তাই আপনাদের সহায়তার জন্য আমরা যা করার করবো।

চার্চিল দেখলেন, পুঁজিবাদী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার একনায়কের ভালোই খাতির জমছে! অথচ স্ট্যালিনের সাথে শুরুতে বসতেই রাজি ছিলেন না রুজভেল্ট। চার্চিলের দূতিয়ালিতেই আজ তা সম্ভবপর হয়েছে।

চার্চিলের এক কথা। আগামী গ্রীষ্মে (১৯৪৪ সালের মে-জুন) ফ্রান্সে সৈন্য নামাতে হবে। তারপর দুর্বার গতিতে ফ্রান্সকে মুক্ত করে জার্মানীর সীমানা অব্দি পৌঁছে যেতে হবে। জার্মানীর কাছ থেকে সব দেশকে মুক্ত করে ১৯৪৫ সালের দিকেই

হিটলারকে নরকে পাঠাতে হবে। চার্চিলের কথায় সায় দিলেন স্ট্যালিন ও রুজভেল্ট।

অনেক রাজনৈতিক আলোচনাও হয় এ বৈঠকে। যুদ্ধোত্তর বিশ্ব কেমন হবে এ ব্যাপারেও আলোচনা হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করেন। তিনি চার্চিলের মুখের উপর বলে দিলেন এ যুদ্ধের পর সব কলোনী থেকে আপনাদের সরে আসতে হবে। অন্যের দেশ দখল রাখার দিন শেষ। এ ব্যাপারে আমেরিকানদের সাথে রাশিয়ার মিল আছে। কারণ, রাশিয়ানদেরও কোনো কলোনী নাই। ফ্রান্স ও ব্রিটেন জগৎজোড়া যে কলোনী চালাচ্ছে তার অবসান হওয়া দরকার- এ মর্মে আমেরিকা ও রাশিয়ার মতামত এক।

রাশিয়া অবশ্য কিছু দেশের উপর দখলদারিত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিলো। যেমন- পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডের দখলকৃত জমি রাশিয়া ছাড়তে চায়নি। যদিও পরে রাশিয়ানরা পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডের জমি ফিরিয়ে দেয়। সেটা যুদ্ধের পরের ঘটনা।

পর্ব-৫০

D-Day : রক্তগঙ্গা বইলো ওমাহা বিচে-

অনেক হয়েছে মিঃ হিটলার! এবার আর তোমার রক্ষা নেই। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে যে তাণ্ডব তুমি শুরু করেছো এবার এর পরিণতির জন্য তুমি প্রস্তুত হও। তুমি পুরো ইউরোপে ধ্বংসের প্রলয়নৃত্য করেছো। কোটি কোটি মানবসন্তানকে মৃত্যুর দিকে তুমি ঠেলে দিয়েছ অনর্থক। পুরো পৃথিবীর একটি পরিবারও রেহাই পায়নি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব থেকে। তুমি চেয়েছিলে যে পৃথিবীতে রাজত্ব করবে শুধু জার্মানরা আর বাকী সবাই হবে তোমার গোলাম। তুমি পৃথিবীতে অন্ধকার যুগ কায়েম করতে চেয়েছিলে।

উপরের কথাগুলো বলেছিলেন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। জার্মানীর প্রতি ভয়ানক ক্ষ্যাপা চার্চিল বলেছিলেন, "If Hitler invaded hell I would make at least a favourable reference to the Devil in the house of commons."

অর্থাৎ-হিটলার যদি যদি নরকেও আক্রমণ করে, তাহলে তিনি হাউজ অব কমন্সে শয়তানের পক্ষ নিয়ে বক্তব্য দিতেন। [যেহেতু নরকের বাসিন্দা শয়তান।]

চার্চিলের বক্তব্য ছিলো, দুনিয়ার যে প্রান্তেই যুদ্ধ লাগুক না কেন হিটলারকে শায়েস্তা করার জন্য সরাসরি জার্মানীর মাটিতে গিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। হিটলার তখন বুঝবে অন্যের মাটি দখল করে যুদ্ধ করার মজা।

কিন্তু জার্মানীর মাটিতে গিয়ে যুদ্ধ করা চাট্টিখানি কথা নয়। ফ্রান্স থেকে নরওয়ে, বেলজিয়াম থেকে পোল্যান্ড প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ হিটলারের দখলে। এখন যেহেতু পূর্ব ইউরোপের মাটি থেকে দখলদার জার্মানরা পরাজয় বরণ করছে দিন দিন; তাই পশ্চিম ইউরোপে মিত্র বাহিনীকে নামানোর উৎকৃষ্ট ক্ষণ চলে এসেছে। ১৯৪৩ সালে তেহরান সম্মেলনে এ ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। মিত্র শক্তির তিন শীর্ষ নেতা-ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিনের উপস্থিতিতে একটা রুপরেখা প্রণয়ন করা হয়। সে রুপরেখার উদ্দেশ্যে ছিলো-১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে (মে-জুন-জুলাই) ফ্রান্সের নরম্যান্ডি উপকুলে সৈন্য নামাতে হবে। নরম্যান্ডি উপকূলে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি বিচ আছে। এসব বিচগুলোতে খুব গোপনীয়তা বজায় রেখে সৈন্য নামাতে হবে। করতে হবে গোপন আঘাত। ফ্রান্সে মোতায়েন দখলদার জার্মান সৈন্যদেরকে মুহুর্মুহু আক্রমণে চুরমার করে দিতে হবে। জার্মানরা কোনোকিছু বুঝে উঠার আগেই করতে হবে এসব। এরপর ফ্রান্সকে মুক্ত করে জার্মানীর সীমানায় চলে যেতে হবে। আশা করা যায় যে ১৯৪৪ সালের মধ্যে হিটলারের খেল খতম হবে।

৬ জুন, ১৯৪৪:- ইউরোপকে মুক্ত করার জন্য 'Operation overlord' শুরু-

ফ্রান্সের নরম্যান্ডি উপকূলের ওমাহা বিচ। উদ্দাম জীবনের হাতছানি এসব বিচগুলোতে আজকাল অগুনতি পর্যটকের আনাগোনা। কিন্তু ১৯৪৪ সালের জুন মাসের ৬ তারিখ মহাপ্রলয় শুরু হয়েছিলো ওমাহা বিচে। মানব ইতিহাসের অন্যতম সেরা যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো সেদিন। ১ লক্ষ ৫৬ হাজার বৃটিশ-আমেরিকান ও কানাডিয়ান সৈন্য অবতরণ করেছিলো নরম্যান্ডি উপকুলে। ইতিহাসে দিনটি 'ডি-ডে' নামেও পরিচিত। ডি-ডে স্বরণীয় হয়ে আছে স্থল, জল ও আকাশপথের মিলিত আক্রমণের এক মেধাবী সেনা অভিযানের জন্য।

আমেরিকান সেনাপতি জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে এ অভিযানের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। প্রথম কথা ছিলো জুনের ৫ তারিখ সেনা নামানো হবে। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য একদিন পিছিয়ে দেয়া হয়। ৫ জুন সকালবেলা আবহাওয়াবিদ সেনাপতি আইসেনহাওয়ারকে জানান যে পরের দিন রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকবে। তাই জুনের ৬ তারিখ সেনা নামানো যায় নরম্যান্ডি উপকূলে।

আইসেনহাওয়ার তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, "You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you."

বহু মাস যাবত নিরন্তর পরিশ্রম করে আমরা যে গ্রেট ক্রসেডের দামামা বাজাচ্ছি, তার অংশ হতে যাচ্ছো তোমরা। বিশ্বের দৃষ্টি এখন তোমাদের দিকে।

জুন মাসের ৬ তারিখ খুব ভোরে মিত্র বাহিনীর সৈন্যদল নরম্যান্ডি বিচে নামতে শুরু করলো। সামান্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যদল। ৫ হাজার যানবাহন সমেত ১ লক্ষ ৫৬ হাজার সৈন্য একদিনেই অবতরণ করলো নরম্যান্ডির মাটিতে। সে এক মহাকাব্যিক সৈন্য অবতরণ!

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "একদিনে এত সৈন্য নামালো মিত্রবাহিনী, তাহলে জার্মানরা করলো টা কি? তারা তো ফ্রান্সের মাটিতেই ঘাঁটি করে রেখেছিলো, নাকি?"

জারিফ বললো, জার্মানরা প্রথমে ভেবেছিলো হয়তো কিছু সৈন্য নামবে জার্মানদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। জার্মানরা নিজ থেকে আক্রমণ চালালে তারপর হয়তো পাল্টা জবাব দিবে মিত্রবাহিনী। জার্মানরা স্বল্প সংখ্যক সৈন্যকে মুহূর্তের জন্য খতম করে ফেলবে।

কিন্তু মিত্রবাহিনী যে হিটলারকে চিরদিনের জন্য খতম করার জন্য নেমেছে তা ছিলো জার্মানদের চিন্তার বাইরে। ৬ জুন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিলো ওমাহা বিচে। ২ হাজার আমেরিকান সৈন্য একদিনে মারা যায়। কিন্তু দিনের শেষে যখন এতগুলো সৈন্য নরম্যান্ডিতে নেমে পড়লো তখন সাহস বেড়ে গেলো মিত্রবাহিনীর। অবশ্য সারাদিনে ৪ হাজার সেনা প্রাণ হারায় মিত্রবাহিনীর। সংঘর্ষ চলতেই থাকলো। এক সপ্তাহের ব্যবধানে জুনের ১১ তারিখ মোট ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার মিত্রবাহিনীর সৈন্য নরম্যান্ডির উপকূলে অবতরণ করে। আরও বিস্ময়কর তথ্য হলো যে জুন মাসের ৩০ তারিখের মধ্যেই মোট ৮ লক্ষ ৫০ হাজার সেনা এই নরম্যান্ডি উপকূল দিয়ে ফ্রান্সের মাটিতে প্রবেশ করে।

কিন্তু জার্মান সৈন্যরা প্রতিরোধ করবে কিভাবে?

শুরু হলো আসল লড়াই। জার্মান বাহিনী দিশেহারা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে শুরু করলো জার্মান বাহিনী। এতদিন ফ্রান্সের মাটিতে বসে ফ্রান্সের কৃষকদের উৎপাদিত ফসল খেয়েছে জার্মান সৈন্যরা। শুধু কি ফ্রান্স? জার্মান অধিকৃত প্রত্যেকটি ইউরোপীয় দেশে অনাহারে মরতে লাগলো বেশুমার লোকজন। হানাদার জার্মানদের কারণে কত শিশু ক্ষুধায় চিৎকার করতে করতে মরেছে তার হিসাব কে রাখে?

মিত্রবাহিনীর এত সৈন্য সামলানোর কোনো উপায় নাই জার্মানদের। ফ্রান্স হচ্ছে জার্মানীর পশ্চিম দিকে; কথা হচ্ছে মিত্রবাহিনীকে সামলানোর জন্য জার্মানী যদি পশ্চিম দিকে আরও সৈন্য পাঠায় তাহলে তো পূর্বদিক দিয়ে মহাবিপদ। রাশিয়ান লাল ফৌজ চেপে ধরেছে পূর্বপ্রান্ত থেকে। যে লেনিনগ্রাদ শহর অবরোধ করে রেখেছিলো জার্মানরা, সেখান থেকে জার্মানরা পিছু হটে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে। বর্তমান রাশিয়ার মূল ভূ-খন্ড থেকে ততদিনে সরে পড়েছে জার্মানরা।

মিত্রবাহিনী যখন নরম্যান্ডি উপকূলে লাখ লাখ সৈন্য নামিয়ে পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে জার্মানীকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে, ঠিক সে সময় পূর্ব দিক দিয়ে রাশিয়ানদের বিজয় অভিযান চলছেই। জুন মাসেই জার্মানদের কাছ থেকে পূর্ব ইউরোপের এস্তানিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া ছিনিয়ে নিলো রাশিয়ানরা। সেক্টরের পর সেক্টর জয়লাভ করলো রাশিয়ান লাল ফৌজ। পরিস্থিতি বুঝে রোমানিয়া ও হাঙ্গেরী হিটলারের পক্ষ ত্যাগ করে আত্মসমর্পন করে রাশিয়ানদের দলে ভিড়ে গেলো। বুলগেরিয়া নিজেকে নিরপেক্ষ থাকার কথা ঘোষণা করলো। আলবেনিয়া ও যুগোশ্লাভিয়াকে জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত করা সম্ভব হলো। একে একে সকল মিত্র ও আশ্রিত রাষ্ট্রের পতন হওয়ায় জার্মানদের মনোবল একদম ভেঙ্গে গেলো। এমন অবস্থায় নরম্যান্ডি উপকূলে মিত্রবাহিনীকে ঠেকানো দূরের কথা, নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে মহাসংকটে পড়ে গেলো জার্মানী।

১৯৪০ সালের গ্রীষ্মে যখন জার্মানদের চরম সুসময় সেই সময়কার চৌকষ সেনাপতি রোমেল তখন আহত হয়ে ছুটিতে। উপযুক্ত সেনাপতি নেই, সৈন্যরাও মনোবলহীন।

২৫ আগস্ট, ১৯৪৪ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস এখন মুক্তঃ

নরম্যান্ডিতে অবতরণকারী সৈনিকেরা ফ্রান্সের ভিতরে ঢুকতে লাগলো প্রায় বিনা বাধায়। জার্মানদের প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত। পরাজয় অত্যাসন্ন দেখে হিটলার তার সেনাপতি চুলটিট্জকে হুকুম দেন পুরো প্যারিস নগরীকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য। জার্মান সেনাপতি এবার হিটলারের আদেশকে পায়ে ঠেলে আত্মসমর্পন করার প্রস্তুতি নেন।

আত্মসমর্পন করা ছড়া অন্য কোনো উপায় ছিলো না জার্মানদের। ফ্রান্সের অবিসংবাদিত মুক্তির নায়ক 'চার্লস দ্য গল' তার বাহিনী নিয়ে প্যারিসকে ঘিরে ফেলেন। আমেরিকান সেনাপতি আইসেনহাওয়ার এত তাড়াতাড়ি প্যারিস দখল করতে চান নি। কিন্তু দ্য গল নাছোড়বান্দা। তিনি আইসেনহাওয়ারকে বিনয়ের সাথে জবাব দেন, তিনি যদি প্যারিস মুক্ত করার কোনো উদ্যোগ না নেন তাহলে দ্য গল নিজেই প্যারিস মুক্ত করার সংগ্রামে নামবেন।

অবশেষে রাজি হয় আমেরিকাও। ২৬ আগস্ট বিজয় মিছিলে নেতৃত্ব 'দেন দ্য গল' ও তার অনুগামী সেনাপতি 'লে ক্লার্ক'।

চারটি বছর জার্মানীর কাছে পরাধীন ছিলো ফ্রান্স। হাজার বছরের ফ্রান্সের ইতিহাসে এরকম লজ্জাজনক পরিস্থিতি আর হয় নি। ফ্রান্সকে জার্মানীর কবল থেকে মুক্ত করার পর হিটলারের শেষদিন কতো তাড়াতাড়ি আসবে তার জন্য অপেক্ষায় ছিলো পুরো পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ।

পর্ব-৫১

জানুয়ারি ১৯৪৫, রাশিয়ানদের কবলে এবার পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশঃ-

জারিফ বলা শুরু করলো, আমি আগেই বলেছিলাম, পোল্যান্ডের প্রতি যে চরম অবিচার করেছিলো জার্মান ও রাশিয়ানরা মিলে, তা পুরো ৬টি বছর যাবত বলবৎ থাকে। পোল্যান্ডকে আক্রমণ করার মধ্য দিয়েই মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, সেটা আমরা সবাই জানি।

পোল্যান্ডের জন্য চরম উপহাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো রাশিয়া যখন তাদের সহায়ত চাইলো জার্মানদের হটানোর জন্য। জার্মানীর সাথে মিলে পোল্যান্ড দখল করলো, পোল্যান্ডের সামরিক বাহিনীর ২২ হাজার সদস্যদের হত্যা করলো রাশিয়া। কিন্তু জার্মানী যখন ১৯৪১ সালের ২২ জুন রাশিয়া আক্রমণ করলো, তখন জার্মানী-রাশিয়া চিরশত্রু।

পোল্যান্ডে নির্বাসিত সরকার রাশিয়ার সাথে কাজ করতে চাইলো না। রাশিয়া আবার পোল্যান্ডের অভ্যন্তরে তাদের কিছু অনুগত লোক তৈরী করে জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে গেলো বছরের পর বছর।

কিন্তু জার্মানরা যখন দুর্বল হয়ে রাশিয়া থেকে পিছু হটা শুরু করলো, তখন সমগ্র পোল্যান্ডের উপর আবারও লোলুপ দৃষ্টি দিলেন স্ট্যালিন। বিপ্লবের পূর্বে জারের আমলে পোল্যাণ্ড ছিলো রাশিয়ারই অংশ। লাল ঝান্ডাধারী স্ট্যালিন জার্মানদের হটিয়ে পোল্যান্ড দখল করতে চাইলেন। কিন্তু দেশপ্রেমিক পোলিশরাই ছিলো মূলত যোদ্ধা। রাশিয়ার এত খারাপ মনোভাব ছিলো যে, শেষমুহূর্তে জার্মানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পোল্যান্ডের যোদ্ধাদের সাহায্যে কিছুই করেনি তারা। চেয়ে চেয়ে দেখেছে শুধু।

যখন পোলিশরা জার্মানদের ধরাশয়ী করে ফেলেছে, তখনি শকুন মামার মতো রাশিয়ানরা জার্মানদের বিরুদ্ধে নামকাওয়াস্তে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

১৯৪৫ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখে সোভিয়েত বাহিনী পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশে প্রবেশ করে। যুদ্ধ শেষ হলেও সোভিয়েত বাহিনী পোল্যান্ড ছেড়ে যায়নি। পোল্যান্ড হয়ে পড়ে সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী এক দেশ। ১৯৮৯ সালে পোল্যান্ড সোভিয়েত প্রভাবমুক্ত হয়।

'Battle of bulge' মিত্রবাহিনীর প্রতি জার্মানদের শেষ আঘাত-

কিন্তু হিটলার দমে যাওয়ার পাত্র নন। পূর্ব-পশ্চিম সবদিক থেকে সব হারিয়ে যুদ্ধ চলে এলো জার্মানীর মাটিতে। তবুও শেষবারের মতো আরেকটা প্রচেষ্টা চালানোর উদ্যোগ নিলেন হিটলার। জার্মান-ফ্রান্স সীমান্তের আর্ডেনেসের ঘন বন ভেদ করে আবার দখল করবেন তিনি ফ্রান্স। আবার জাগবে জার্মানী।

হিটলারের জেনারেলরা জানতেন এটা বৃথা চেষ্টা। কিন্তু হিটলারের নির্দেশ অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৪।

৩০ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে হিটলার আর্ডেনেস সেক্টরে যুদ্ধ চালানোর নির্দেশ দিলেন। ফ্রান্স সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে আমেরিকান সৈন্য। হিটলার ভাবলেন ক্লান্ত আমেরিকান সৈন্য ডিসেম্বরের তীব্র শীতে জার্মানদের সামনে টিকতে পারবে না।

আবার হিটলারের ভয় পেয়ে বসলো ফ্রান্স আর বেলজিয়ামকে। না জানি হিটলার আবার তাদের দেশ দখল করে কিনা। কিন্তু আমেরিকান সেনাপতি আইসেনহাওয়ার অন্য ধাতুতে গড়া। জার্মান আক্রমণের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে তিনি ২ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্যকে কাজে লাগালেন।

জার্মানরা বিভিন্ন ফন্দির আশ্রয় নিলো। আমেরিকান সৈন্যদের পোশাক পড়ে তারা বিভ্রান্ত করে ফেললো। জার্মানদের এই টেকনিকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিলো আমেরিকানদের।

ক্রিসমাসের পর থেকে আবহাওয়া ভালো হতে শুরু করলো। বিমান হামলা শুরু হলো পুরোদমে। পিছু হটতে লাগলো জার্মানরা।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে সব জার্মান সৈন্য আর্ডেনেস সেক্টর ত্যাগ করে জার্মানীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো।

আর্ডেনেস প্রান্তরের এই যুদ্ধকে চার্চিল "The greatest American battle of the war" নামে অভিহিত করেন।

ব্যাটল অব বার্লিনঃ- ঘনিয়ে আসছে হিটলারের শেষ দিনঃ

হিটলারের গোপন বাহিনী গেস্টাপো খবর দিলো যে সামরিক অফিসাররা মনোবল হারিয়ে ফেলেছেন। যুদ্ধ জয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। নিজের পথ দেখেছেন অনেকেই। জার্মানীর পতন হচ্ছে দ্রুততর।

খবরটা দেখে হিটলার রাগে গরগর করতে লাগলেন। আদেশ দিলেন, "পলাতক অফিসারদের পাকড়াও করে গুলী করো। বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড।"

কিন্তু হিটলারের আদেশ মানার মতো খুব বেশি অফিসার নেই। হিটলার তখনো বাঙ্কারের মধ্যে বসে আশা করছেন প্রতিরোধ শক্তি জোরদার করার।

১৬ এপ্রিল-১৯৪৫-

হিটলারের প্রিয় নগরী বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় সোভিয়েত লাল ফৌজ। বাঙ্কারে হিটলারের পাশাপাশি বসে আছেন বেশ কয়েকজন সিনিয়র জেনারেল। কেউ টু শব্দটিও করছে না।

হিটলার প্রশ্ন করলেন, ''গোলার শব্দ আসছে কোত্থেকে? খুব ভারী গোলা মনে হচ্ছে?'

''জ্বী ফুরার, ভারী গোলাই নিক্ষেপ করছে রাশিয়ানরা।'' জবাব দিলো জেনারেলরা।

''ওরা এত কাছে এসে গেছে? তোমরা করছ কি তাহলে?'' প্রশ্ন করলেন হিটলার।

উত্তর পাবার আগেই দড়াম করে বন্ধ করলেন দরজা। জেনারেলগণ বসে রইলেন পাংশু মুখে, আশাহত বুকে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে হিটলারের দ্বিতীয় সাড়া না পেয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন তারা।

আসলে হিটলারকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে সোভিয়েত লাল ফৌজ সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করলো। কোনো সৈন্যদল নাই যারা সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। বার্লিন নগরীর সাধারণ নাগরিকরাই রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে তাদের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এই পরিস্থিতিতে স্ট্যালিনের লাল বাহিনী কমপক্ষে ১৪ লক্ষ জার্মান নারীর উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। এক হিটলারের পাপের কারণে অসহায় জার্মান নারীদের আর্তনাদ এখন কে শুনবে?

বার্লিন নগরীকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ফেলছে রাশিয়ানরা। যে কোনো মুহূর্তে হিটলারের বাঙ্কারে হামলা চালাতে পারে তারা। প্রেমিকা ইভা ব্রাউনসহ আরও কয়েকজন উপদেষ্টাকে নিয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন হিটলার।

হিটলারের এককথা, রাশিয়ানদের হাতে কোনোমতেই ধরা দেওয়া যাবে না। এর চেয়ে মৃত্যু ভালো। আত্মহত্যার জন্য মনস্থির করে ফেললেন হিটলার।

কিন্তু মরার আগে হিটলার ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তার রোমান্টিক সত্তার জন্য।

পর্ব-৫২

হিটলারের আত্মহত্যা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি

হিটলারের প্রেমিকা ইভা ব্রাউনের কাহিনীঃ-

২৫ এপ্রিলের ভয়াবহ রজনী-

হিটলার বাঙ্কার থেকেই রাশিয়ানদের মুহুর্মুহু গুলির শব্দ শোনতে পাচ্ছেন। হিটলার বাঙ্কারবাসীকে বললেন, "তোমরা পালাও।"

হিটলারের সেনাপতি মার্টিন বোরম্যান বললেন যে প্রিয় ফুরার, বিমান তৈরি হয়েই আছে। আপনি আমাদের সাথে চলুন। নিয়ে যাবো বিপদ সীমানার বাইরে।

এবারো অসম্মতি জানালেন হিটলার। বললেন, "তোমরা যাই বলো না কেন, বার্লিন ছেড়ে আমি যাবো না। আমাকে বিরক্ত করো না।"

২৭ এপ্রিল

হিটলার তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হেইন লিনজকে ডাকলেন কাছে। অনুরোধের ভঙ্গিতে বললেন, "ইভাকে একটু বাইরে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসো। বাঙ্কারের এই বদ্ধ জীবনে সে হাঁপিয়ে উঠেছে।"

হিটলারের অনুরোধ রক্ষা করলেন লিনজ। ফাঁক বুঝে নিয়ে গেলেন হিটলারের প্রেমিকা ইভা ব্রাউনকে। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে আনলেন নিরাপদ অঞ্চল থেকে।

ইভা ব্রাউন প্রকাশ করলেন মনের ইচ্ছাঃ

হিটলারের সর্বাপেক্ষা নিকট সহচর লিনজকে হিটলারের প্রেমিকা ইভা বললেন, "যদিও আপনার চাইতে আমি ফুরারের বেশি কাছে থাকি, তবু একটা কথা তাকে বলতে সাহস পাই না। দয়া করে আপনি যদি তাকে বলতেন?"

"কি কথা?" – বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করলেন মেজর লিনজ।

হিটলারের প্রেমিকা ইভা ব্রাউন বললেন, "আপনি সবকিছুই জানেন। দীর্ঘ সাতটা বছর চলছে আমাদের প্রেমপর্ব। একটা মিনিটের জন্য তাতে ভাটা পড়ে নি। ফুরার আমাকে যেমন আদর করেন, তেমন আদর খুব কম নারীর ভাগ্যে জুটে। সেদিক থেকে আমি সর্বাপেক্ষা সুখী। কিন্তু একটা বেদনা, একটা অন্তর্জালা আমি অহরহ অনুভব করি, কিন্তু প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছি না।"

"কি সে অসহ্য বেদনা?" – জানতে চাইলেন লিনজ বেশ সহানুভূতির সঙ্গে।

"কষ্টে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন মিস ইভা ব্রাউন। রুমালে চোখ মুছে তিনি বললেন, ফুরারের সব কিছু পাওয়া সত্ত্বেও আমি পাইনি তার আইন সম্মত স্ত্রী হবার অধিকার। সে সৌভাগ্য থেকে রয়েছি বঞ্চিত। দেশের যে অবস্থা তাতে অলৌকিক

কিছু না ঘটলে আমাদের রক্ষার কোনো উপায় নেই। তাই আমার ইচ্ছা, মরার সময় আমি যেন আমার প্রিয় ফুরারের সহধর্মিনী হয়ে মরতে পারি।"

২৮ এপ্রিল :

হিটলার কাছে ডাকলেন মেজর লিনজকে। সে ডাক জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী হিটলার হিসেবে নয়, একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে। দীর্ঘ কর্মজীবনে ছায়ার মতো হিটলারের পাশে ঘুরলেও সামনে বসার সুযোগ পাননি তিনি কখনো। কিছুতেই জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। হিটলার যেন বুঝতে পারলেন।

মোলায়েম স্বরে প্রশ্ন করলেন, "ইভা বলেছিলো, তুমি নাকি কি বলতে চাও আমাকে?"

ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো লিনজের কাছে। ভয় কেটে গেলো তার। ইভা ব্রাউনের মনের শেষ ইচ্ছার কথা বললেন হিটলারের কাছে। প্রস্তাব শুনে হিটলার প্রশান্ত মনে তার দেহরক্ষী লিনজকে বললেন, "তুমি শুনে খুশী হবে। ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করবো আমি। তুমি সকল ব্যবস্থা করো"

অবশেষে বসলো হিটলারের বিয়ের আসর-

২৯ এপ্রিলঃ-

আজ হিটলারের বিয়ে। লিনজ প্রশ্ন করলেন, "কখন বসবে বিয়ের মজলিশ? কাকে কাকে দাওয়াত দিতে হবে? কাবিন তৈরী করবেন কে?"

হিটলার জবাব দিলেন, "মজলিশ করার লোক পাচ্ছ কোথায়? বাঙ্কারে যাকেই পাওয়া যাবে তাকেই বলো। কাবিন লেখার জন্য ওয়াল্টার ওয়েগনাকে আসতে বলেছি। ফ্রাউ এবং গোয়েবলস এর বিয়ে তিনিই পড়িয়েছিলেন। বেশ সুখের হয়েছে তাদের দাম্পত্য জীবন।"

গোয়েবলসও শুনলেন হিটলারের শেষ বাসনা। তিনি বললেন, "দশটা বছর আগে যদি ফুরার এই সিদ্ধান্ত নিতেন তবে জার্মানীতে বয়ে যেতো আনন্দের বন্যা। একমাস ধরে চলতো আনন্দ উৎসব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়তো বাধতোই না। পারিবারিক জীবনে অভ্যস্ত না হলে কোনো মানুষ বাস্তববাদী হতে পারে না। স্ত্রী-পুত্রের মায়া বড় সাংঘাতিক জিনিস। মহাপুরুষেরা তাই বিয়ে করে সংসারী হতে বলেছেন। সংসারধর্মহীন জীবন অবাস্তবের আখড়া।"

বিয়ের আসর শেষ পর্যন্ত সত্যিই বসলো। মধ্যরাতে সম্পন্ন হলো সে ঐতিহাসিক বিবাহ অনুষ্ঠান। গোলাগুলি ও বোমা নিক্ষেপ বন্ধ ছিলো সে সময়টা। ঘন্টা তিনেক ধরে চললো আনন্দ-ফুর্তি।

ছোট্ট অনাড়ম্বর পরিবেশে হিটলার আর ইভা ব্রাউন পরস্পরে দাম্পত্য জীবনের অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হলো পুরোপুরিভাবে। বিয়ে হলো সিভিল আইনে। বোরম্যান আর গোয়েবলস হলেন সাক্ষী। কাবিন রেজিস্টারে নাম সই করার সময় অভ্যাসবশত ইভা লিখলেন, 'ইভা ব্রাউন'। পর মুহূর্তে ব্রাউন অংশটা কেটে লিখলেন হিটলার। হলেন ইভা হিটলার। উপস্থিতরা খোশ আমদেদ জানালেন নব দম্পতিকে। অতিথিদেরকে যৎসামান্য আপ্যায়নও করা হলো।



চিত্র ২৫ : প্রেমিকা ইভা ব্রাউনকে মৃত্যুর আগের দিন বিয়ে করে তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দেন হিটলার।

মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য হলেও হিটলারের ম্যাপ কক্ষটি হাসি তামাশা আর আনন্দ ফুর্তিতে মশগুল হয়ে রইলো। বাইরে যে তখন যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছেন রাশিয়ান লাল ফৌজ সে কথা আপাতত ভুলে গেলেন সবাই। হিটলারের বাসর রাতই হয়ে গেলো তার জীবনের শেষ রাত

ছোট্ট অনাড়ম্বর পরিবেশে হিটলার আর ইভা ব্রাউন পরস্পরে দাম্পত্য জীবনের অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হলো পুরোপুরিভাবে। বিয়ে হলো সিভিল আইনে। বোরম্যান আর গোয়েবলস হলেন সাক্ষী। কাবিন রেজিস্টারে নাম সই করার সময় অভ্যাসবশত ইভা লিখলেন, 'ইভা ব্রাউন'। পর মুহূর্তে ব্রাউন অংশটা কেটে লিখলেন হিটলার। হলেন ইভা হিটলার। উপস্থিতরা খোশ আমদেদ জানালেন নব দম্পতিকে। অতিথিদেরকে যৎসামান্য আপ্যায়নও করা হলো।



চিত্র ২৫ : প্রেমিকা ইভা ব্রাউনকে মৃত্যুর আগের দিন বিয়ে করে তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দেন হিটলার।

মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য হলেও হিটলারের ম্যাপ কক্ষটি হাসি তামাশা আর আনন্দ ফুর্তিতে মশগুল হয়ে রইলো। বাইরে যে তখন যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছেন রাশিয়ান লাল ফৌজ সে কথা আপাতত ভুলে গেলেন সবাই। হিটলারের বাসর রাতই হয়ে গেলো তার জীবনের শেষ রাত

১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল

সেই ঐতিহাসিক দিন। অন্যান্য দিনের মতো এদিন হিটলার সকাল সাড়ে নয়টায় দরজা খুললেন না। দাম্পত্য জীবনের প্রথম রজনীতে হয়তো ঘুমিয়েছিলেন বেশি রাত্রে। চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম হলো সেদিন। প্রায় এগারোটার দিকে ঘুম থেকে উঠলেন হিটলার।

শান্ত কণ্ঠে ব্যক্তিগত সহকারীকে বললেন-"লিনজকে নাস্তা দিতে বলো।" লিনজ এই প্রথম এক টেবিলে খেলেন হিটলারের সাথে।

মুখ খুললেন হিটলার, রাশিয়ানরা যদি আমাকে ধরতে পারে তবে নিয়ে যাবে তাদের দেশে। চিড়িয়াখানার বাঘের মতো আমাকে পরিণত করবে দর্শনীয় বস্তুতে। মোমের মডেলের মতো অবস্থা হবে তখন আমার। না-না-না আমি তেমন হতে দেবো না। কিছুতেই না। কখ্খোনা না।

বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো কথাগুলো বললেন হিটলার। উত্তেজনায় তাঁর সারা দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগলো। অস্থিরভাবে পায়াচারি করতে লাগলেন হিটলার।

চলা বন্ধ করে হিটলার তাকালেন লিনজ এর দিকে। আবেগহীন কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন, ''ইভা ব্রাউনের সাথে আমার একটা আপোষরফা হয়ে গেছে। সেও মরতে রাজি হয়েছে। তোমার প্রতি আমার শেষ অনুরোধ। কিছুক্ষণের মধ্যে কিছুটা পেট্রোল যোগাড় করবে। মৃত্যুর পর আমাদের দেহ দুটোকে জড়াবে একটা কম্বলে। নিয়ে যাবে বাইরে। পেট্রোলে ভিজিয়ে নেবে খুব ভালো করে। তারপর জ্বালিয়ে দেবে আগুন।"

লিনজ এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হিটলার তার সেক্রেটারীকে ডেকে একটা ব্যক্তিগত উইলের ডিকটেশন দিলেন। সে উইলের কথাগুলো ছিলো "ক্ষমতাচ্যুত অথবা আত্মসমর্পনের লজ্জাকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাবার জন্য আমি এবং আমার স্ত্রী স্বেচ্ছামরণ করে নিলাম। আমার প্রিয় জার্মানবাসীদের সেবা করার জন্য দীর্ঘ বারোটা বছরের বেশির ভাগ সময় আমি যেখানে বসে কাজ করেছি সেখানেই আমাদের দেহ পুড়িয়ে ফেলা হোক-এই আমার আন্তরিক বাসনা।"

এবার দরজা বন্ধ করলেন হিটলার। রুমের ভিতর শুধুমাত্র তার স্ত্রী ইভা ব্রাউন। ভিতরে কি হলো কেউ জানে না। আধাঘন্টা পর গুলির শব্দ শুনে মেজন লিনজ ও অন্যরা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। দেখলেন, মিসেস ব্রাউনের প্রাণহীন দেহ এলিয়ে রয়েছে সোফার উপরে। পাশের সোফায় রক্তাক্ত স্পন্দনহীন হিটলার। নিজ মুখে গুলি করেছেন তিনি। মিসেস ইভা পান করেছেন মরণ বিষ।

বাইরে তখন চলছে বিমানের মরণ হামলা, মেশিনগানের গগন বিদারী আওয়াজ এবং বোমা বর্ষণের অশুভ গর্জন। বাঙ্কারে অবস্থানরত শেষ কৃত্যে নিয়োজিত

সদস্যরা শঙ্কিত। তবু তারা হিটলার এবং তার সহধর্মিনীর লাশ কম্বলে জড়িয়ে বাইরে নিয়ে পেট্রোলের আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। মেজন লিনজ এর কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে গেলো। মার্টিন বোরম্যান হিটলারের শেষ আদেশ অনুযায়ী অতঃপর কঙ্কাল দুটো নিয়ে গেলেন এক গোপন স্থানে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে পুঁতে ফেললেন মাটির নিচে।

বেলা তখন পাঁচটা। ভেতরের পরিবেশ থমথমে স্পন্দনহীন। বাইরে বার্লিনের আসমান ধূসরবর্ণ। জমিন বোমাবর্ষণে ক্ষুব্দ। এভাবে যবনিকাপাত হলো জার্মানীর একটা অশান্ত যুগের।

V-E (Victory of Europe) day-

হিটলারের আত্মহত্যার এক সপ্তাহ পর মে মাসের ৮ তারিখ জার্মানরা নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করলো। লাখ লাখ জার্মান সৈন্য বন্দী হলো মিত্রবাহিনীর হাতে। রাশিয়ানদের হাতেই বন্দী হলো প্রায় ২০ লাখের মতো সৈন্য।

আনন্দ উল্লাস করতে লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। রটারডাম থেকে লন্ডন, প্যারিস থেকে অসলো-সমস্ত শহরগুলোর মানুষজন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলো।

৮ মে উদযাপিত হলো ইউরোপ মুক্ত দিবস। ইউরোপের কোথাও আর যুদ্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি নাই। যদিও প্রশান্ত মহাসাগরে তখন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলো নাছোড়বান্দা জাপান।

জাতিসংঘ-ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের জন্ম

পর্ব-৫৩

জারিফ বললো, এখন পর্যন্ত আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে একটু বেশিই আলোচনা করে ফেলেছি। কিন্তু আলোচনা না করে উপায় ছিলো না আমাদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এসব খবর না জানলে আসলে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফর জন্ম এসব সম্পর্কে কোনো আলোচনাই করা যাবে না। তাই চলো আমরা প্রথমে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা ও এর বিস্তারিত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি।

<u>জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার যতসব কাহিনীঃ</u>

বয়ান শুরু করলো জারিফ।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কাহিনীঃ-

১৯৪১ সালের ঘটনা। পুরো ইউরোপ মহাদেশ হিটলারের ভয়াল থাবায় ক্ষতবিক্ষত। কেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা না করলে জাতিসংঘ নিয়ে কোনো কথা যাবে না, তা তোমার মাথায় ঢুকবে এবার। মনোযোগ দিয়ে শুনো।

মিঃ মামুন! তুমি ইতোমধ্যে জেনে গিয়েছে, হিটলার প্রথমে দখল করলো পোল্যান্ড। তারপর বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, সুইডেন ও নরওয়ে। ১৯৪০ সালের জুন মাসে পতন ঘটে শক্তিধর ফ্রান্সের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেই হিটলার দখল করেছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়া।

এবার বুঝো ঠেলা!

হিটলারের দাবড়ানি খেয়ে উপরে বর্ণিত পরাজিত দেশগুলোর সরকারপ্রধানেরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। সেখান থেকেই জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মূল কাহিনী শুরু।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "এসব দেশের সরকারের লোকজন কোথায় পালিয়ে গেলো?"

"কোথায় আবার পালাবে? ব্রিটেন ছাড়া কি আর জায়গা আছে?"-উত্তর দিলো জারিফ

ইংলিশ চ্যানেল দ্বারা পুরো ব্রিটেন ইউরোপ মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। ব্রিটেন মূলত দ্বীপপুঞ্জ। ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনে বসেই এসব দেশের প্রবাসী সরকারগুলো কাজকর্ম করছে। আর তাদের দেশ দখল করে বসে আছে জার্মান হানাদার বাহিনী। এসব নির্বাসিত সরকারগুলোর প্রথম মিটিংকে আমরা ধরতে পারি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ।

১২ জুন, ১৯৪১-

(লন্ডনের সেন্ট জেমস্ প্রাসাদের ঘোষণা)

সুমহান সভ্যতার অধিকারী ফ্রান্স সে মুহূর্তে হিটলারের দখলে। এর চেয়ে বড় লজ্জা ফ্রান্সের হাজার বছরের ইতিহাসে আর আসেনি। মরার উপর খাঁড়ার ঘা হলো প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের বীর সেনাপতি মার্শাল পেঁতার নেতৃত্বে তাঁবেদার সরকার হিটলারের কথামতো গোলামি করছে। ফ্রান্সের স্বাধীনচেতা সেনাপতি 'চার্লস দ্যা গল' লন্ডনে নির্বাসিত অবস্থায় একটি প্রবাসী সরকার চালাচ্ছেন। লন্ডনের সেন্ট জেমস প্যালেসের সেদিনের মিটিংয়ে দ্যা গলও উপস্থিত। হিটলারের দখলে যাওয়া দেশগুলির প্রতিনিধিরাও আছেন। ফ্রান্স ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলো – নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, নরওয়ে, গ্রীস, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, এবং বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা। বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলো মধ্যে – দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলো।

উক্ত দেশের প্রতিনিধিরা এই মর্মে ঘোষণাপত্র দেন যে বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত জার্মানী ও ইতালির বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই দেশের কবল থেকে দখলীকৃত ভূমি ও জনগণকে মুক্ত না করা পর্যন্ত কোনো শান্তি আসতে পারে না।

যদিও জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সাথে এই মিটিংয়ের যোগসূত্র নেই বললেই চলে, তবুও এ মিটিংটার তাৎপর্য হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এটা ছিলো কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠক। সবাই এ বাস্তবতা অনুধাবন করেছিলো যে সম্মিলিতভাবে একটা কিছু করতে হবে। হিটলারের কবল থেকে ইউরোপকে মুক্ত করার শপথ নেয়া ছাড়া আর কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়নি এ সম্মেলনে।

১৪ আগস্ট,১৯৪১

(আটলান্টিক চার্টার)

সারা দুনিয়ায় দখলদারিত্ব চালানো সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের তখন ঘোর দুর্দিন। ১৯৪০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে হিটলারের বিমান হামলা যদিও ঠেকিয়ে দিয়েছে বৃটিশরা, তবুও দুর্দান্ত জার্মানীর শক্তি ক্ষয়ের কোনো চিহ্নই নেই। ১৯৪১ সালের শুরুতে জার্মানরা ইতালীকে সাথে নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালালো। ঘনিষ্ট মিত্র গ্রীসকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করেছিলো বৃটিশ, কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। অজেয় জার্মানীকে রুখবে কে?

১৯৪১ সালের ২২ জুন যখন জার্মানরা বিশাল দেশ রাশিয়া আক্রমণ শুরু করে দিলো ২৯ লক্ষ সৈন্য নিয়ে, তখন সবাই ভেবেছিলো মাস দুয়েকের মধ্যে

রাশিয়ারও পতন হবে জার্মানির হাতে। চার্চিলসহ বৃটিশরা আতংকে দিন গুনছিলেন। এই বুঝি হিটলারের তাণ্ডবে পৃথিবীতে নতুন অন্ধকার যুগ নেমে এলো।

হিটলারের হাত থেকে তাহলে বাঁচার উপায় কি? উপায় একটা আছে, ভাবলেন চার্চিল। আটলান্টিকের অপর পাড়ের দেশ আমেরিকাই পারে ব্রিটেনকে বাঁচাতে। যদিও সাধারণ আমেরিকান জনগণ ইউরোপীয় কোনো সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে একেবারেই অনিচ্ছুক। এই চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়েই চার্চিল ছুটলেন আমেরিকায়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে নিয়ে আটলান্টিকের উপর জাহাজ নিয়ে ভাসতে লাগলেন। উদ্দেশ্য একটাই, আমেরিকা যাতে ব্রিটেনের পাশে থেকে যুদ্ধে যোগ দেয়।

দেশের জনমতের কথা মাথায় রেখে আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেয়নি বটে, কিন্তু চার্চিলকে দিয়ে বেশকিছু ভালো অঙ্গীকার করালেন রুজভেল্ট। চার্চিল একজন আজন্ম শ্বেতকায় সাম্রাজ্যবাদী, বৃটিশ উপনিবেশগুলোকে কিছুতেই স্বাধীন করে দেওয়ার মতো লোক তিনি নন। কিন্তু বিপদে পড়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে সাথে নিয়ে তিনি একটা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করলেন। ইতিহাসে এটি 'আটলান্টিক চার্টার' নামে পরিচিত।

যুদ্ধ শেষ হলে নতুন পৃথিবীর রূপরেখা কেমন হবে তা নিয়েই দুই নেতা আলোচনা করলেন। কয়েকটি ধারা খুব চমৎকার; যেগুলোর কারণে যুদ্ধোত্তর বিশ্বে উপনিবেশবাদের অবসান হয়।

যেমন-

১. যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র কেউ নতুন কোনো ভূ-খন্ড দখল করবে না।

২. জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী ভৌগোলিক সীমারেখার বিন্যাস করতে হবে।

৩. সকল জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকতে হবে।

৪. দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক বাধা দূর করতে হবে।

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যান নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়াও সমুদ্রে অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা, নিরস্ত্রীকরণ এসব ব্যাপারে কাজ করার কথা বলা হয়েছিলো।

আটলান্টিক চার্টারের গুরুত্ব অপরিসীম। এই চার্টারের বদৌলতে বৃটিশ জাতি তার অধীনস্ত সকল উপনিবেশগুলোকে স্বাধীন করে দেওয়ার ব্যাপারে সর্বপ্রথম সম্মতি জানায়। তাছাড়া বাণিজ্যিক চুক্তির ইতিহাসেও আটলান্টিক চার্টারের গৌরবোজ্জ্বল

ভূমিকা আছে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ মুক্ত বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হচ্ছে এই আটলান্টিক চার্টার।

স্মরণ রাখতে হবে, বিপদে পড়ে এত ভালো ভালো অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। এত কিছু করেও তিনি আমেরিকাকে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে রাজি করাতে পারলেন না। এ নিয়ে চার্চিল ছিলেন বেজায় ক্ষুব্দ।

পর্ব-৫৪

১ জানুয়ারি, ১৯৪২ (ওয়াশিংটন ঘোষণা)-

এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। আমেরিকা আর নিরপেক্ষ নয়। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপানী নৌ-বাহিনী পার্ল হারবারে আমেরিকান নৌঘাঁটিতে বিমান হামলা চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধন করেন। ২ হাজারের অধিক নৌ-সেনা নিহত হয় আমেরিকার। যুদ্ধে নামলো আমেরিকা। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল হলেন উৎফুল্ল। কারণ, আমেরিকাকে যুদ্ধে নামানো গেছে অবশেষে। আটলান্টিক চার্টারকে মনে রেখেই ওয়াশিংটন ঘোষণার খসড়া তৈরি হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সর্বপ্রথম জাতিসংঘের নামকরণ করেন-United nations.বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল রুজভেল্টের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। চার্চিল বলেন-United nations-শব্দটি বৃটিশ কবি লর্ড বায়রন-Childe harold's pilgrimage-কবিতায় উল্লেখ করেন।

২৬টি দেশের সরকারপ্রধান ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন ওয়াশিংটনে। নববর্ষের প্রথম দিন একান্তে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন-মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট,বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, সোভিয়েত প্রতিনিধি ম্যাকসিস লিটভিনভ এবং চীনের প্রতিনিধি টি.ভি শুঙ। পরের দিন জানুয়রির ২ তারিখ আরো ২২টি দেশ এ দলিলে স্বাক্ষর করেন। ২৬টি দেশের সমন্বয়ে ওয়াশিংটন ঘোষণা জাতিসংঘ ঘোষণা নামেও পরিচিত।

১৪ থেকে ২৪ জানুয়ারি ১৯৪৩

মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন-

১৯৪১ সালের ক্রিসমাসের আনন্দটা ছিলো অক্ষশক্তির। জাপান-জার্মানী আর ইতালির মিলিত অক্ষশক্তি পুরো পৃথিবীব্যাপী বিজয়পতাকা উড়াচ্ছিলো। কিন্তু ১৯৪২ সালের পুরোটা সময় আমেরিকা-রাশিয়া আর ব্রিটেন মরণপণ লড়াই চালিয়ে পরিস্থিতি নিজেদের আয়ত্তে আনে। ১৯৪২ সালের ক্রিসমাসের আনন্দ উপভোগ করে মিত্রশক্তি। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মন্তব্য করেছিলেন, 'It is the begining of the end.' ফ্রান্সের দখলে থাকা মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কা নগরীর

আনফা হোটেলে এবার মিলিত হন চার্চিল ও রুজভেল্ট। দুই ফরাসী সেনাপতি জিরুদ ও দ্য গলও যোগ দিয়েছিলেন মিটিংয়ে। এ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিনকেও। কিন্তু জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই চলার কারণে রাশিয়ার একনায়ক সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নি। কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন ছিলো মূলত রণকৌশল ঠিক করার লড়াই। উত্তর আফ্রিকা থেকে জার্মান-ইতালি বাহিনীকে সমূলে বিনাশ করা ও ইতালির মাটিতে সরাসরি সৈন্য নামানোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয় এ সম্মেলনে।

২৮ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর-১৯৪৩

(তেহরান সম্মেলন)

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটা ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। বহু বছর যাবত ইরানে নিজস্ব বলয় গড়ে তুলেছিলো ব্রিটেন ও রাশিয়া। ইরানে তেলক্ষেত্র আবিষ্কার হওয়ার পর ইরান হয়ে উঠে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ। ইরান যাতে কোনোমতেই হিটলারের দখলে যেতে না পারে সেজন্য প্রথম থেকেই নজর রাখছিলো রাশিয়া ও ব্রিটেন।

কূটনৈতিক পরিভাষায় যোগ হলো একটি শব্দ বিগ থ্রি। রাশিয়ার একনায়ক জোসেফ স্ট্যালিন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট প্রথমবারের মতো মিলিত হন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা মত বিনিময় করেন।

তেহরান সম্মেলনে যে যে বিষয়গুলোর ফায়সালা হয় সেগুলি হলো:

১. জার্মানীকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করা হবে। এ ব্যাপারে লড়াই চলবেই।

২. জার্মানীকে আক্রমণ করে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলতে হবে। (কিন্তু কার দখলে কতটুকু এলাকা থাকবে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি)

৩. এমন একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে বিশ্বের সব দেশের সমস্যা নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করা যায়। (জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় এটা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত)

৪. রাশিয়া অনেক আগে থেকেই জোর দিচ্ছিলো পশ্চিম প্রান্ত (ফ্রান্স সীমানা দিয়ে) দিয়ে জার্মানীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। তাহলে জার্মানী রাশিয়া থেকে হয়তো বাহিনী সরিয়ে নিবে। আর তখন রাশিয়া তাড়াতাড়ি জার্মানদেরকে তাদের ভূ-খন্ড থেকে বিতাড়িত করতে পারবে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসেই ফ্রান্স সীমান্ত দিয়ে জার্মানীকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

৫. পোল্যান্ড যাতে তার আগের সীমানা ফিরে পায়-এ ব্যাপারে কথা হয়। কিন্তু রাশিয়া প্রথমে বেঁকে বসে। রাশিয়ানরা পোল্যান্ডকে স্বাধীনতা দিতে চায়নি। পোল্যান্ড পরে অবশ্য স্বাধীনতা ফিরে পায়।

৬. রাশিয়াকে অনুরোধ জানানো হয়, জাপানকে যেনো আক্রমণ করা হয়। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপান তখনও তুমুল লড়াই চালাচ্ছে আমেরিকার সাথে। স্ট্যালিন এ প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দেন। যদিও তিনি বলে দিয়েছিলেন যে ইউরোপের লড়াই শেষ না হলে জাপানকে তিনি আক্রমণ করতে পারবেন না।

সর্বশেষ ইরানকে নিয়ে আরেকটা সমঝোতা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইরানকেও স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হবে।

একটা কথা বলতেই হবে ১৯৪৩ সালের তেহরান সম্মেলন বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার একটি।

হিটলারকে ঠেকাতে পুঁজিবাদী আমেরিকা ও তার সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শের ধ্বজাধারী সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া একযোগে কাজ করতে সম্মত হয়। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বুঝে গিয়েছিলেন যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্রিটেন আর আগের মতো প্রভাবশালী থাকবে না। আমেরিকা আর রাশিয়াই হবে সবকিছুর হর্তাকর্তা। সামরিক দিক দিয়ে মিত্র শক্তি এক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক তেমনি জাতিসংঘ গঠনের ব্যাপারেও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়।

পর্ব-৫৫

৭ অক্টোবর, ১৯৪৪

(ডাম্বারটন ওকস সম্মেলন)

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় এই সম্মেলনটাও গুরুত্বের দাবীদার। ১৯৪৪ সালের ২১ আগস্ট থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস ভবনে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ও চীনের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে যোগ দেন। শীর্ষ নেতারা এ বৈঠকে উপস্থিত না হলেও জাতিসংঘের রূপরেখা প্রণয়ন হয় এ সম্মেলনে। নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও ৫টি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র নির্ধারণ করা হয়।

৪-১১ ফেব্রুয়ারি-১৯৪৫

(ইয়াল্টা সম্মেলন)

চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের শেষ মিটিং ছিলো এ সম্মেলন। ইউক্রেনের ইয়াল্টায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে আবারও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতির দিকে ফিরে যেতে হবে। হিটলারের জার্মানী চতুর্দিক থেকে বিপর্যস্ত। রাশিয়ার দাবড়ানি খেয়ে পুরো পূর্ব ইউরোপ

থেকে পিছু হটছে জার্মানরা। বার্লিন নগরী থেকে মাত্র ১৪ মাইল দূরে রাশিয়ান লাল ফৌজ। ধেয়ে আসছে জার্মানীর রাজধানীর দিকে। তাদেরকে ঠেকানোর কেউ নেই। পশ্চিম ইউরোপ থেকে জার্মানরা পিছু হটতে হটতে একেবারে নিজের দেশে ফিরে এসেছে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ মুক্ত হলো হিটলারের কবল থেকে। ইউরোপের যুদ্ধ এখন কেবল জার্মানির মাটিতে।

রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিন খুব খোশমেজাজে আছেন। রাশিয়ার মূল ভূ-খন্ড তো বটেই; পোল্যান্ড, রোমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়াসহ সব দেশ তার করায়ত্ত । রাশিয়ার এই সীমাহীন অগ্রযাত্রার কারণে স্ট্যালিনকে সমীহ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিলো না চার্চিল-রুজভেল্টের।

এ সম্মেলনেই স্ট্যালিনের সাথে মতপার্থক্য দেখা দেয় আমেরিকা-ব্রিটেনের। বিশ্লেষকদের মতে, স্নায়ুযুদ্ধের শুরুটা বোধহয় এ সম্মেলন থেকেই।

কি নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছিলো স্ট্যালিনের সাথে আমেরিকা-রাশিয়ার?

চলুন, বিস্তারিত জানা যাক!

তার আগে জেনে নেই ইয়াল্টা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো-

১. রাশিয়া নীতিগতভাবে রাজি হয় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে। যেহেতু ইউরোপে যুদ্ধ শেষের দিকে তাই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে আপত্তি নেই রাশিয়ার।

২. জাতিসংঘের প্রথম অধিবেশন যাতে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরই হতে পারে, এ ব্যাপারে সব পক্ষই একমত পোষণ করে।

৩. জার্মানীকে চারটি ভাগে ভাগ করতে হবে। নাৎসী জার্মানির কবল থেকে মুক্ত জার্মানীর পূর্বপ্রান্তে থাকবে রাশিয়া। পশ্চিম দিকে তিন প্রান্তে থাকবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা।

৪. জার্মানীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে। তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও আদায় করতে হবে।

৫. জার্মানীর সকল যুদ্ধাপরাধীকে চিহ্নিত করে তাদেরকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৬. স্ট্যালিনের মাধ্যমে এই স্বীকারোক্তি আদায় করে নেওয়া হলো যে, পূর্ব ইউরোপে রাশিয়া সরাসরি কোনো দখলদারিত্ব চালাবে না। স্ট্যালিন রাজি হয়েছিলেন, পূর্ব ইউরোপে পক্ষপাতহীন ভাবে নির্বাচন হবে যাতে করে সেখানকার অধিবাসীরা নিজেরাই নিজেদের নেতৃত্ব নির্বাচন করতে পারে।

সবচেয়ে বড় মতদ্বৈততা গড়ে উঠেছিলো পোল্যান্ডের ভবিষ্যত নিয়ে। পোল্যান্ডের ইতিহাস আসলেই বড় বেদনার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুই হয়েছিলো হিটলার কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণকে কেন্দ্র করে। ঠিক সে সময়ে রাশিয়া ছিলো হিটলারের মিত্র। রাশিয়ার সাথে মিলে হিটলার পোল্যান্ডের উপর নির্মমতা চালিয়েছিলেন। পোল্যান্ডের পশ্চিম দিক দখল করেছিলেন হিটলার আর পূর্ব দিক দখল করেছিলেন স্ট্যালিন। এ কাজটা তারা করেছিলেন মিলে মিশে।

এখন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যখন প্রস্তাব দিলেন, পোল্যান্ডকে তার আগের সীমানা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তখন দৃশ্যত বেঁকে বসলেন রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিন।

স্ট্যালিন বললেন, ''রাশিয়া পোল্যান্ডের যে অংশটুকু দখল করেছে সেটুকু আর ফেরত দিবে না। তবে পোল্যান্ডের আয়তন ঠিক রাখার জন্য জার্মানীর কাছ থেকে জমি নিতে হবে। এ প্রস্তাবে বেজায় অখুশী হলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট স্ট্যালিনকে রাগাতে চাইলেন না। তিনি স্ট্যালিনের প্রস্তাব মেনে নিলেন।

কারণ, জাপানকে পরাজিত করতে হলে রাশিয়ার সমর্থন প্রয়োজন আমেরিকার। রুজভেল্ট চেয়েছিলেন স্ট্যালিনকে খুশি রাখতে। বাস্তবে সেটাই হয়েছিলো। স্ট্যালিন তার মনমতো সবকিছুই পেয়ে গেলেন।

নতুন এ প্রস্তাবে পোল্যান্ড পূর্বদিকে রাশিয়ার কাছে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূ-খন্ড হারায়, বিনিময়ে পশ্চিমদিকে জার্মানীর কাছ থেকে ১ লক্ষ ১ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূমি পায়।

ইয়াল্টা সম্মেলন ছিলো জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরেক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ সম্মেলনে ৫টি স্থায়ী সদস্যকে ভেটো ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং এপ্রিল ১৯৪৫ সালে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো আরেকবার বৈঠকে মিলিত হবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন-১৯৪৫
(সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন)

দফায় দফায় বৈঠক চলতেই লাগলো আগত দেশগুলোর মধ্যে। দীর্ঘ আলোচনা শেষে জাতিসংঘ সনদ গৃহীত হয় এবং ২৬ জুন ১৯৪৫ সালে উপস্থিত ৫০টি দেশ/জাতির সনদ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়। উপস্থিত না থেকেও পোল্যান্ডকে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বলে ধরে নেওয়া হয়। তাই জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা দেশের সংখ্যা হচ্ছে ৫১টি।

বড়ই দুঃখের বিষয়, জাতিসংঘের স্বপ্নদ্রষ্টা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ততদিনে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। লিখে গিয়েছিলেন নিচের বক্তৃতাটা।

"The work, my friends, is peace; more than an end of this war-an end to the beginning of all wars; ... as we go forward toward the greatest contribution that any generation of human beings can make in this world-the contribution of lasting peace-I ask you to keep up your faith...."

২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ সাল জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। ১১টি ধারা এবং ১৯টি অধ্যায় এর সমন্বয়ে জাতিসংঘ সনদ তৈরি করা হয়েছে। জাতিসংঘ সনদের রচয়িতা হলেন মার্কিন কবি ও কথাসাহিত্যক Archibald Macleish.

পর্ব-৫৬

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের জন্মঃ

বিশেষজ্ঞ জারিফ বললো, ''মামুন, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর ইতিহাস জানতে হলেও আমাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে টান দিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এর জন্মপ্রক্রিয়া জড়িত।

স্বরণ করো আটলান্টিক চার্টারের কথা-যেটা আমি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণণার সময় বলেছিলাম।”

১৪ আগস্ট, ১৯৪১

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কানাডার প্রদেশ নিউফাউন্ডল্যান্ডের প্লাসেন্টা বে তে এক ব্যক্তিগত বৈঠকে বসলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যুদ্ধজাহাজ ‘এইচএমএস প্রিন্স অব ওয়েলসে’ সওয়ার হয়ে এই দূরবর্তী জায়গা বেছে নিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ‘ইউএসএস অগাস্টায়’ চেপে ততক্ষণে চলে এসেছেন।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, “আটলান্টিক চার্টারের কথা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক স্বরণীয় অধ্যায় । তাহলে দুই নেতার এই বৈঠককে ব্যক্তিগত বৈঠক বলছো কেন?”

জারিফ উত্তর দিলো, মিটিংয়ের সময়কালে এই দুই নেতার বৈঠক সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতই ছিলো। কাকপক্ষীও জানতো না চার্চিল আর রুজভেল্টের এই গোপন বৈঠকের কথা। বৈঠকটি গোপনে অনুষ্ঠিত হওয়ার পিছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে। বিশেষত, আটলান্টিক মহাসাগরে মাস্তানি করে বেড়াচ্ছে জার্মান সাবমেরিন ও আরো অন্যান্য জলযানসমূহ; যারা মুহূর্তের মধ্যে বৃটিশ কিংবা আমেরিকান নৌযান

ধ্বংস করে দিতে পারে। আরেকটা কারণ হচ্ছে, আমেরিকান লোকজন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে একদম অনিচ্ছুক। আমেরিকার সাধারণ জনগণের মনোভাব ছিলো, ইউরোপীয়রা মরলে মরুক এতে আমেরিকানদের কিচ্ছু আসে যায় না।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। হিটলারকে ঠেকানোর জন্য বারবার আমেরিকার সাহায্য চেয়েছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। কিন্তু রুজভেল্ট প্রতিবারই তার নিজের দেশের জনগণের মনোভাবের দোহাই দিয়ে চার্চিলের প্রস্তাবে সাড়া দেননি। মরিয়া চার্চিল তবুও রুজভেল্টের সাথে দেখা করতে চাইলেন। সবার অলক্ষ্যে দুই নেতা বসলেন মিটিংয়ে। মিটিংয়ের সময়কাল ছিলো ৯ আগস্ট থেকে ১২ আগস্ট।

তারও দুইদিন পরে ১৪ আগস্ট সারা দুনিয়া জানলো দুই নেতার মিটিংয়ের কথা। পরবর্তীতে যেটার নামকরণ করা হয় আটলান্টিক চার্টারের।

বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের জন্মের সাথে এই মিটিং যেভাবে জড়িত

চার্চিলের মহাবিপদ। তিনি রুজভেল্টের পায়ে পড়ছেন সাহায্যের জন্য। রুজভেল্ট বললেন, "দেখো চার্চিল, তোমাদের এসব পরের দেশ দখল করাকে আমি খুব ঘৃণা করি। শত শত বছর যাবত অন্যের দেশ দখল করে তোমার নিজেদের শহর-বন্দর সাজাচ্ছো, মানুষের কষ্টার্জিত সম্পত্তি লুট করে তোমরা আবার মানবতার কথা শোনাও। দাস ব্যবসা থেকে শুরু করে মানুষ খুন, কোন পাপাকাজটা তোমরা করো নাই শত শত বছর যাবত। এজন্যই আজকে হিটলারের মতো দানবকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরুপ। আমরা আমেরিকানরা এজন্যই ইউরোপীয়দেরকে ঘৃণা করি। এজন্যই তো আমাদের দেশের জনগণ তোমাদেরকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে রাজি নয়।"

চার্চিল উত্তর দিলেন, "বন্ধু, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে পাপ করেছে তার জন্য আমার আর কি বলার আছে? এখন হিটলারকে ধ্বংস করার জন্য আমাকে কি কি করতে হবে, আমাকে বলে দাও। আমি সব করবো। কিন্তু তোমাদের সহায়তা ছাড়া আমি কিচ্ছু করতে পারবো না।

মামুন বললো, "ব্যাপক মজা পাইলাম ইতিহাসটা শুনে। এই চার্চিল ছিলেন বদের হাড্ডি। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনি একদমই সহ্য করতে পারতেন না। মহাত্মা গান্ধীকে ব্যাঙ্গ করে চার্চিল ডাকতেন, 'নেংটি ইঁদুর' নামে। বলতেন, ভারতীয়রা ঠিকঠাকমতো কাপড়ই পড়তে পারে না, এরা আবার দেশ চালাবে?"

জারিফ বললো, "ফান্দে পড়িয়া বগা ঠিকই কান্দে। বড় ভাই আমেরিকার পায়ে ঠিকই ধরেছিলো চার্চিল বৃটিশ জাতিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে।"

যা হোক, রুজভেল্ট চার্চিলকে বললেন, "তুমি যদি সত্যিই আমেরিকার সাহায্য চাও তাহলে আমার সাথে কিছু অঙ্গীকার করতে হবে। বলো, তুমি কি রাজি?" চার্চিল বললো, "আমি রাজি বন্ধু, তুমি যা বলবে আমি তাতেই রাজি।"

রুজভেল্ট বললো, "তুমি আমাকে অঙ্গীকার করো যে বৃটিশ জাতি আর কোনোদিন অন্যের জমি দখল করে লুটপাট চালাবে না। তুমি বলো, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো শাসকগোষ্ঠী তোমরা তৈরি করবে না। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের জনগণ যাতে নিজের ইচ্ছেমতো চলতে পারে, সে ব্যবস্থা তুমি করবে। কোনো জবরদস্তি করবে না।"

চার্চিল উত্তর দিলো, "আমি সব প্রস্তাবেই রাজি। আজ বৃটিশ জাতিই তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত, আমরা বুঝতে পারছি অন্যের জমি দখল করার পাপ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমরা এ যাত্রায় রক্ষা পেলে আমাদের সব কলোনীগুলোকে স্বাধীনতা দিয়ে দিব। শুধু হিটলারের হাত থেকে বাঁচার জন্য তুমি আমার পাশে থাকো।"

রুজভেল্ট বললো, "অতিশয় উত্তম কথা। আমেরিকা কোনোদিন সাম্রাজ্যবাদকে প্রশ্রয় দেয় না, তারা কোনোদিন অন্যের জমি দখল করতেও চায় না। তুমি তোমার সব কলোনীগুলোকে স্বাধীনতা দিয়ে দিবে সেটা শুনে ভালো লাগলো। তোমাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায়, এ ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিব।"

কিন্তু চার্চিলের মনে একটি প্রশ্ন-

চার্চিল রুজভেল্টকে বললো, "তোমার সব রাজনৈতিক প্রস্তাব আমি মেনে নিলাম কিন্তু আমার মনে একটা অর্থনৈতিক প্রশ্ন আছে। রুজভেল্ট বললো, "কি সেই প্রশ্ন তোমার মনে?।"

চার্চিল বললো, "মানলাম, অন্যের জমি দখল করা পাপ। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এ পাপ কাজ করেছে বলেই তো আজ আমাদেরকে ঈশ্বর হিটলারকে পাঠিয়ে শাস্তি দিচ্ছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, সব কলোনীগুলোকে যদি আমরা স্বাধীনতা দিয়ে দেই তাহলে বৃটিশ জাতি বাঁচবে কিভাবে? কলোনীগুলো থেকে সস্তায় কাঁচামাল এনে আমরা পণ্য বানিয়ে সেগুলো আবার কলোনীগুলোতে বিক্রি করি। কলোনীগুলো যদি আমাদের হাতে না থাকে তাহলে আমরা কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করবো? ভালো কাজ করতে গিয়ে যদি না খেয়ে মরতে হয়, তা হলে এই ভালো কাজের কি মূল্য আছে?"

''সেটা আমার মাথায় আছে চার্চিল'' উত্তর দিলেন রুজভেল্ট।

তোমার মনে নেই ১৯৩০ এর দশকে আমরা মহামন্দায় পড়েছিলাম। তখন তোমাদেরই অর্থনীতিবিদ জন মেইনার্ড কেইনস্ বলেছিলেন, "পৃথিবীতে দখলদারিত্বের যুগ শেষ হওয়া দরকার। মুক্ত বাণিজ্য হওয়া দরকার দেশে দেশে।"

বিভিন্ন প্রকার শুল্ক উঠে যাবে। এক দেশের পণ্য অবাধে অন্য দেশে ঢুকবে। কোনো দেশকে দখল করে আর লুটপাঠ চালানো চলবে না। আমরা আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুলবো এসব দেখভালের জন্য।

চার্চিল আবার উত্তর দিলেন, "আমাদের কলোনীগুলোর লোকজন যদি আমাদের পণ্য না কিনে? আমরা এগুলো বিক্রি করবো কোথায়?

রুজভেল্ট উত্তর দিলেন, "এসব গরীব দেশগুলোর কি আর ভালো গুণাগুণসম্পন্ন পন্য উৎপাদন করার যোগ্যতা আছে? বাজারকে করে তুলতে হবে পূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন। অযোগ্যদের পন্য বাজারে একদমই চলবে না।"

''তাহলে কি করা যায়?'' চার্চিলের প্রশ্ন।

রুজভেল্ট বললেন, "আমাদেরও একজন অর্থনীতিবিদ আছে; যার নাম হ্যারী ডেক্সটার হোয়াইট। আমি এখান থেকে গিয়ে আজকেই তাকে ডেকে পাঠাবো। যুদ্ধোত্তর নতুন পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন হয়, সে ব্যাপারে গবেষণা শুরু করে দিতে। তুমি তো জানই চার্চিল-আমাদের হাতে টাকা পয়সার কোনো সমস্যা নাই। আমরা বহু কষ্টে ত্রিশের দশকের মন্দা পার করেছি। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েছি। টাকা হাতে থাকলেই শুধু ভোগবিলাস নয়, এমন জায়গায় নিরাপদ বিনিয়োগ করবো, যেখান থেকে টাকা উঠে আসে। আমি চাই যুদ্ধোত্তর বিশ্বে তোমরা সমস্ত কলোনীগুলোকে স্বাধীন করে দাও। এসব দেশের দরকার অর্থ, তোমাদের ইউরোপীয়দের দরকার অর্থ। সমস্ত অর্থের যোগান আমরা দেব। আমরা এসব দেশের অবকাঠামো গড়ে তুলবো। আমরাই এসব দেশে পণ্য বিক্রি করবো। তোমাদের দেশেও ভালো ভালো কোম্পানী গড়ে উঠবে। আমরা মিলেমিশে ব্যবসা করবো। সারাবিশ্বে আমাদের পণ্যের বাজার তৈরি করবো। রাজনৈতিক দখলদারিত্বের দিন শেষ। অর্থনীত দিয়ে এখন দেশ কব্জা করতে হবে।"

চার্চিল বললেন, "আমি তোমার কথায় শতভাগ সহমত পোষণ করলাম। তুমি এসব দেখভাল করার জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলো। আমি তোমার পাশে আছি।

পর্ব-৫৭

ব্রেটন উডস সম্মেলন শুরু-

১-২২ জুন, ১৯৪৪

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রেটন উডসের মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেল। ৪৪টি দেশের ৭৩০ জন প্রতিনিধি বৈঠকে বসেছেন-নতুন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য। এই মিটিং সম্পর্কে কিছু বলার আগে প্রথমেই নাম নিতে হবে তিনজনের কথা।

প্রথমজন হচ্ছেন যুগশ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেইনার্ড কেইন্‌সের কথা। তিনি সেই ১৯৩০ সালের মহামন্দার সময়ই বলে আসছিলেন-পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে যতোই স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া হোক না কেন, তার উপর সরকারি কর্তৃত্ব দরকার। দরকার সমন্বিত কিছু সংগঠন যারা অভিভাবকের ন্যায় কাজ করবে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি কোনো কারণে দিশা হারায় সেজন্য সরকার মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করে ঠিকঠাক করবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিশা হারিয়েছিলো বলেই ইউরোপে উত্থান ঘটেছিলো হিটলার ও মুসোলিনীর মতো চরম একনায়কদের। মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তারা বড় বড় কথা বলে জনপ্রিয় হতে পেরেছিলো। এরকম পরিস্থিতি যাতে কোনোভাবেই আর না ঘটে সেজন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুসমন্বিত করতে হবে।

দ্বিতীয়জন হচ্ছেন আমেরিকার ট্রেজারি সেক্রেটারি হেনরী মরগেনথাউ। সম্মেলনের আগে নিউ জার্সির ক্লারিজেস হোটেলে আমেরিকার বাঘা বাঘা অর্থনীতিবিদদের তিনি জড়ো করেছিলেন। কিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে জ্ঞানী-গুণীদের পরামর্শ নিয়েছিলেন তিনি। হেনরী মরগেনথাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ সম্মেলনের প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তিটি হচ্ছেন, মার্কিন সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্ট হেনরী ডেক্সটার হোয়াইট। তাই ব্রেটন উডস সম্মেলনকে এই ত্রয়ীর মিলিত প্রচেষ্টাও বলা চলে। সম্মেলনের অধিকাংশ প্রস্তাব হোয়াইট কর্তৃক উদ্ভাবিত।

অর্থনৈতিক সম্মেলনেও রাজনীতি!

যে ৪৪টি দেশ অংশ নিয়েছিলো, তারা সবাই ছিলো মার্কিন মিত্র। সম্মেলনে আসেনি সোভিয়েত রাশিয়া। পুঁজিবাদী অর্থনীতির কোনো নীতির সাথেই সমাজবাদী রাশিয়ার মিল নেই। তাই আমেরিকার নেতৃত্বাধীন এই সম্মেলনে রাশিয়ার যোগদানের প্রশ্নই আসে না।

বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের জন্ম:

এই সম্মেলনের মূল সফলতা হচ্ছে, 'বিশ্বব্যাংক' ও 'আইএমএফ' প্রতিষ্ঠা। এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে "ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউট" নামে অভিহিত করা হয়। যদিও পুরো বিশ্বের বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য বিশ্ব 'বাণিজ্য সংস্থা' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা উদ্দেশ্যে ছিলো। পরে দেখা গেলো, 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা' গঠন করা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা দরকার। তাই-বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন স্থগিত রেখে GATT প্রতিষ্ঠা করা হয়। General agreement on tariff and trade-নাম দিয়ে একটা আপৎকালীন ব্যবস্থা চালু করা হয়, যাতে বিশ্ব বাণিজ্যের সমস্ত বাধাগুলো অপসারণ করে কার্যকর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন করা যায়। দীর্ঘ আলোচনা ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমলে নিয়ে অবশেষে ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠিত হয়।

আমেরিকার অর্থনীতিবিদরা সরকারকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যুদ্ধোত্তর ইউরোপের প্রচুর টাকা দরকার। আমেরিকা যেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়। শুধু ইউরোপ নয়, বিশ্বের যেকোন প্রান্তে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণদানের জন্য আইএমএফ (International monetary fund) প্রতিষ্ঠিত হয়। আর দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশ্বব্যাংককে।

বহুমুখী কাজের দায়িত্ব থাকার কারণে বিশ্বব্যাংকের চারটি অঙ্গসংগঠন আছে। এসবগুলোকে একত্রে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ বলা হয়। অঙ্গসংগঠনগুলো হচ্ছে-

a. The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD);

b. The International Development Association (IDA);

c. The International Finance Corporation (IFC); and

d. The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

ব্রেটন উডস সম্মেলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিনিময় হার নির্ধারণ। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিশ্বের মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছিলো তখন। তৎকালীন বিশ্বের মোট স্বর্ণের দুই-তৃতীয়াংশ আমেরিকার হাতে থাকায় সিদ্ধান্ত হয় ডলারই হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একচ্ছত্র মুদ্রা। সব মুদ্রার মান স্বর্ণমান দ্বারা নির্ধারিত হলেও, স্বর্ণমান নির্ধারিত হবে ডলারের বিনিময় হার অনুযায়ী। তাই অঘোষিতভাবে ডলারই হয়ে পড়ে সব মুদ্রার রাজা। আমেরিকার অর্থনৈতিক আধিপত্যের উপর কার্যত সীলমোহর পড়ে যায় **ব্রেটন উডস সম্মেলনে।**

ব্রেটন উডস সম্মেলনের সফলতা-

যদিও কেউ কেউ ব্রেটন উডস সম্মেলনকে আমেরিকার দাদাগিরি দেখানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দোষারোপ করেন, এই সম্মেলনের সফলতা অনস্বীকার্য। আজকে বাংলাদেশের মতো দেশ তার অবকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সফলতার জন্য বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কাছে ঋনী। এই সংস্থাগুলি যতোই আমেরিকার আজ্ঞাবহ হোক না কেন, এত স্বল্প সুদে বিপুল পরিমাণ টাকার ঋণ কোথায় পেতো বাংলাদেশ? শুধু বাংলাদেশ নয়, প্রত্যেকটি স্বল্পোন্নত দেশ এই দুটি সংস্থা থেকে ঋণ পেয়েছে। আজ হয়তো বাংলাদেশ নিজের টাকায় পদ্মা সেতু করার সাহস পায়, কিন্তু সত্তর ও আশির দশকে যখন বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে তলাবিহীন ঝুড়ি নামে পরিচিত ছিলো তখন এই দুই সংস্থাই বাংলাদেশকে সহজ শর্তে ঋণ দিয়েছে।

এই দুই সংস্থার ঋনদানের কারণে সমগ্র বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের জীবনমান উন্নত হয়েছে।

লৌহ যবনিকা ও স্নায়ুযুদ্ধ, মার্শাল প্ল্যান ও ন্যাটো

পর্ব-৫৮

গল্পে যাওয়ার আগেঃ

১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্বে ইরানের ক্ষমতায় ছিলেন রেজা শাহ্ পাহ্লবী। তিনি একবার কৌতুক করে বলেছিলেন, ''বিশ্বে স্বাধীন দেশ আসলে ২টি। একটি আমেরিকা ও অন্যটি হচ্ছে রাশিয়া।''

তাজ্জব কথা বটে!

বিশ্বে স্বাধীন দেশ দুটি হয় কিভাবে? কেন রেজা শাহ্ পাহ্লবী এ কথা বলেছিলেন?

ঘটনা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন নতুন পরাশক্তি হিসেবে উত্থান হয় আমেরিকা ও রাশিয়ার তখন পুরো পৃথিবীতেই এই দেশের শত্রু/মিত্র হিসেবে যাবতীয় কর্মকাণ্ড চালাতে হতো বাকি বিশ্বকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে কোন ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হতো এই দুই দেশের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এর একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ-

আমরা সবাই জানি-আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করেছে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণকে মাথায় রেখে?

কি সেই সমীকরণ?

সমীকরণটি হলো, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের প্রতীদ্বন্দ্বী ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করে। ভারতে তখন ক্ষমতাসীন ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী।

ইন্দিরা গান্ধীর পিতা জওহরলাল নেহেরু জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের একজন উদ্যোক্তা হলেও সোভিয়েত রাশিয়া ঘেঁষা লোক ছিলেন। মার্কিন প্রশাসনের অপছন্দের লোক ছিলেন নেহেরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধী।

ভারত যখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি হয়ে উঠে, তখন রাশিয়া অনিবার্যভাবেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন কারী দেশ হয় উঠে।

কিন্তু গণ্ডগোলটা অন্য জায়গায়

পাকিস্তানের সাথে চীনের হলো জন্মের দোস্তি। আবার ভারতের সাথে চীনের সম্পর্কও ছিলো তখন তলানিতে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতকে আচ্ছামতো ধোলাই দেয় চীন। যদিও পরে দখলীকৃত ভূ-খন্ড ছেড়ে চলে আসে চীন। পাকিস্তানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে এবং ভারতের সাথে বিরোধিতা থাকায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধে চীন যে আমাদের পাশে থাকবে না-এটা অবধারিত ছিল।

বরং চীন আমাদের পক্ষে থাকলেই হতো আশ্চর্যের ঘটনা।

আমেরিকা কেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করেছে সেটাও স্নায়ুযুদ্ধ সম্পর্কিত কারণে।

পুঁজিবাদের তীর্থভূমি রাশিয়ার সাথে চীনের ছিলো গলায় গলায় পিরীতি বহু বছর যাবত। চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিনকে বড় ভাই ও গুরু বলে মানতেন।

স্ট্যালিন মারা যাওয়ার পর যখন রাশিয়ার সাথে চীনের শত্রুতা শুরু হলো তখন আমেরিকা চীনকে কাছে পেতে চাইলো। চীনও আমেরিকার ঘনিষ্ঠ হতে চাইলো।

পুঁজিবাদী আমেরিকার সাথে সমাজতান্ত্রিক চীনকে মিলিয়ে দেওয়ার ঘটক সাজলো পাকিস্তান।

এই ঘটকালিতে পাকিস্তান শতভাগ সফল। আমেরিকার সাথে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু হলো। দুই পরস্পরবিরোধী দেশ হয়ে গেলো ঘনিষ্ঠ মিত্র।

পাকিস্তান-আমেরিকা-চীন মিলে গেলো একবিন্দুতে।

ভারত-রাশিয়া অন্যবিন্দুতে।

তাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তিহলো ভারত-রাশিয়া, আর বিপক্ষ শক্তি হলো আমেরিকা-চীন।

এটা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলা। এই খেলা নির্ধারিত হয়েছিলো স্নায়ুযুদ্ধের দ্বারা।

১৯১৭ সাল, স্নায়ুযুদ্ধের শুরু কি সে বছরই?

১৯১৭ সালে ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানোভের নেতৃত্বে বিশ্বের বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়া তথা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হয়। রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে সবার সমান অধিকার, এই ধারণা নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার যাত্রা শুরু হয়।

ঠিক ১৯১৭ সালেই আটলান্টিকের ওপারের দেশ আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শরীক হয়।

একটা তাজ্জব ব্যাপার হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে উদ্ভুত হওয়া দুই পরাশক্তি আমেরিকা ও রাশিয়ার দুটি পথ ১৯১৭ সালেই বেঁকে গিয়েছিলো।

কিভাবে বেঁকে গিয়েছিলো?

আমেরিকা ও রাশিয়া দুটি দেশই ছিলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্র শক্তি ব্রিটেন-ফ্রান্সের মিত্র।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণ ছিলো সবদিক দিয়ে লাভজনক। ইউরোপের পরাশক্তিরা আমেরিকার কাছ থেকে অর্থসাহায্য নিয়েছিলো। আমেরিকার ভূ-খন্ডে যুদ্ধ হয়নি। ধীরে ধীরে ইউরোপীয়রা আমেরিকাকে বড় ভাই মানতে শুরু করেছিলো।

কিন্তু রাশিয়ার জন্য প্রথম মহাযুদ্ধ ছিলো অত্যন্ত অপমানজনক। রাশিয়া নিজেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, সামরিক শক্তিতে সে সবার চেয়ে পিছিয়ে। দেশে খাদ্যাভাব, জারের অপশাসনের বিরুদ্ধে মিছিলে নামলো লাখো জনতা।

তাই, ১৯১৭ সালে আমেরিকা যেখানে জার্মানীর সাবমেরিন আক্রমণের শিকার হয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে যুদ্ধ শুরু করে, সেখানে রাশিয়ার জনগণ যুদ্ধবিরোধী হয়ে উঠে। জার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চেয়েছিলো বটে, কিন্তু ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে জার উৎখাত হয়। অন্তর্বর্তী সরকারও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে।

ঠিক সেরকম পরিস্থিতিতে রাশিয়া মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশ হয়েও জার্মানীর সাথে হাত মিলায়। জার্মানী লেনিনকে সহায়তা করে বিপ্লব সফল করতে। জার্মানী যদিও ছিলো সমাজতন্ত্রের বিরোধী, তবুও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে রাশিয়াকে দূরে সরানোর জন্য লেনিনকে কাজে লাগায়।

তার মানে ১৯১৭ সালে ফলাফলটা এই দাঁড়ালো মিত্রশক্তির সাথে গাদ্দারি করে রাশিয়া জার্মানীর সাথে মিলে গেলো; এবং যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালো। অথচ জার্মানী ছিলো মিত্রশক্তির প্রত্যেকটি দেশের চরম দুশমন।

তাই স্নায়ুযুদ্ধের প্রাথমিক পটভূমি ১৯১৭ সালেই রচিত হয়েছিলো, একথা বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী স্নায়ুযুদ্ধ তৈরি হওয়ার পটভূমি

হিটলার আত্মহত্যা করেন ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল। তার এক সপ্তাহ পর মে মাসের ৮ তারিখ জার্মানী নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করে। হিটলারের আরেক মিত্র ইতালির খেলা শেষ হয় আরও আগেই। বাকী ছিলো অক্ষশক্তির আরেক মিত্র দুর্ধর্ষ জাপান। জাপানকে শায়েস্তা করতে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দুইটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে আমেরিকা। জাপান অবশেষে বাধ্য হয় নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অফিসিয়ালি শেষ হয় ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মিত্র শক্তির প্রধান অঙ্গীকার ছিলো, যার যার সেনাবাহিনীর হাতে যতো ভূ-খন্ড দখলে আসুক না কেন, সবাইকে বিনাশর্তে স্বাধীনতা দিতে হবে। চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের প্রথম সাক্ষাতে ১৯৪৩ সালে তেহরান সম্মেলনেই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা হয়।

কিন্তু দিন যত যেতে থাকে-এ অঙ্গীকার থেকে রাশিয়া ততই সরে যেতে থাকে। স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হওয়ার এ ছিলো প্রথম ও একমাত্র কারণ।

উত্তরের নরওয়ে থেকে শুরু করে পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স ও ইতালি পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভূখন্ডই মিত্র শক্তির দখলে আসে। আমেরিকান ও বৃটিশ বাহিনী এসব দেশগুলোর সৈনিকদের সাথে নিয়ে হিটলারের নাৎসী বাহিনীকে বিতাড়িত করেছে। বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, ইতালি এসব দেশ মিত্রশক্তির দখলে আসলেও যুদ্ধের পরপরই পুরোপুরি স্বাধীন হয় সব দেশ। বরং মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো, গণতন্ত্র কায়েম করে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশ শাসন করবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান খেলোয়াড় জার্মানীকে নিয়েই প্রধান ঝামেলা শুরু হলো। বার্লিন নগরীর পূর্বপ্রান্ত বরাবর রাশিয়ান লাল ফৌজ যখন হিটলারকে পাকড়াও করার মিশনে মত্ত, নগরীর পশ্চিম দিক দিয়ে অবস্থান নিয়েছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন মিত্র বাহিনী। তাই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই বোঝা গিয়েছিলো, দ্বিখন্ডিত জার্মানীর ভবিষ্যত নিয়ে রাশিয়া আর মিত্রশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগবেই। কারণ কেউ জার্মানীর মাটি থেকে সরে যাবে না।

আবার জার্মান বাহিনীকে ঠেঙ্গিয়ে যখন রাশিয়ান বাহিনী জার্মানীর মাটিতে ঢুকে পড়লো তখন রাশিয়ান বাহিনীর দখলে সমগ্র পূর্ব ইউরোপ।

জার্মানী থেকে ঘাঁটি সরানোর কোনো লক্ষণ নেই, তার উপর পূর্ব ইউরোপকে কলোনী বানানোর চিন্তায় মগ্ন রাশিয়া। হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতেও তাই কপালে ভাঁজ পড়তে লাগলো ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের। তবে

স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে আরও আলোচনা করার আগে আমরা যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের করুণ কাহিনীর দিকে একটু নজর দেই।

কিন্তু এ কোন ইউরোপ?

ইউরোপকে আমরা মোটাদাগে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি-যথা-পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম ইউরোপ।

পুরো ইউরোপের মধ্যে স্পেন ও পর্তুগাল হিটলারের সাথে সুসম্পর্ক রেখে ও মিত্রশক্তির সাথে কোনো বিবাদে না জড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পায়। নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে সুইজারল্যান্ডকে কেউ আক্রমণ করেনি। এর বাইরে পুরো ইউরোপ লন্ডভন্ড।

রেনেঁসার পথ ধরে ১৫০০ সাল থেকেই ইউরোপ হয়ে উঠেছিলো পুরো পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্তা। সারা দুনিয়া তছনছ করেছে ইউরোপীয়রা। ইউরোপের মাটিতেও প্রচুর যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সব সমীকরণ উল্টে দিলো। চাকচিক্যময় ইউরোপের সাধারণ জনগন পথে বসে গেলো। অনাহারে মরে যেতে লাগলো সাধারণ জনগণ।

মামুন বললো, "ইউরোপীয়রা ক্ষুধার কষ্ট করেছে এরকম ইতিহাস তো শুনিনি আগে। তুমি পরিসংখ্যান আর উদাহরণ দিয়ে বলো।"

জারিফ বললো, উত্তরের নরওয়ে থেকে দক্ষিণের বলকান উপদ্বীপের প্রত্যেকটি দেশ কার্যত ধ্বংসস্তুপ হয়ে গেলো। বুদাপেস্ট, মিনস্ক, কিয়েভ, ওয়ারশ, বুখারেস্ট, লেনিনগ্রাদ এসব শহরগুলো হয়ে পড়েছিলো বসবাসের অযোগ্য। পূর্ব ইউরোপের প্রায় ১৭০০ শহর ধ্বংস হয়ে গেলো।

পশ্চিম ইউরোপ এদিক দিয়ে একটু ভালো অবস্থানে ছিলো। কারণ, হিটলার যুদ্ধের শুরুতেই ব্রিটেন বাদে পুরো পশ্চিম ইউরোপ কব্জা করে ফেলেছিলেন। তাই প্যারিস, আমস্টারডাম, রটারডাম, ব্রাসেলস, কোপেনহেগেন, অসলো এসব শহর জার্মানীর দখলে গেলেও ধ্বংসস্তুপ হয়নি। একমাত্র জার্মানীর শহরগুলো ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিলো।

নেদারল্যান্ডের মতো অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশে ১৯৪৫ সালের শীতে ২২ হাজার লোক মারা গেলো শুধু না খেয়ে। ফ্রান্সের লোকজন অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলো। কারণ জার্মানদের কারণে দেশের শিল্প-বাণিজ্য, কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন সহ সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়েছিলো। দখলীকৃত দেশে জার্মানরা কোনো প্রশাসনিক কাজকর্ম করেনি। শুধু শুয়ে বসে কাটিয়েছে।

এরই ফল হলো সর্বব্যাপী ক্ষুধার জালা। বাঁচার কোনো আশা নেই। কি হবে কাজ করে, কি হবে বেঁচে থেকে, এভাবে যদি মানুষ অহেতুক যুদ্ধক্ষেত্রেই মরে পড়ে থাকে?

পর্ব-৫৯

কিন্তু রাজনীতির খেলা বড় জটিল?

আগেই বলেছিলাম, এই বিপর্যস্ত ইউরোপে আদি পরাশক্তিগুলো একেবারে নির্জীব হয়ে পড়লো। ব্রিটেন-ফ্রান্স নিজেই চলতে পারবে না, দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্য চালাবে কিভাবে?

নবনির্বাচিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ঘোষণা দিলেন, ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হবে। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হলো। ভারতীয় উপমহাদেশ তো বটেই, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া ও মিয়ানমার থেকেও ব্রিটিশরা পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।

আগে তো নিজে বাঁচি-তারপর না হয় অন্য দেশ দখল?

মামুন প্রশ্ন করলো-ইউরোপের সব দেশ দুর্বল হয়ে পড়লো-কিন্তু রাশিয়া কিভাবে নতুন পরাশক্তি হলো? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সবচেয়ে বেশি ভুগেছে-তাহলে রাশিয়া তো আরও কাহিল হয়ে পড়ার কথা।

জারিফ বললো, "লোকবল হারিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয়ে রাশিয়া যথেষ্ট কাহিলই ছিলো। কিন্তু রাশিয়ার দখলে পড়েছিলো প্রায় সমগ্র পূর্ব ইউরোপ।"



চিত্র-২৬: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ার দখলে থাকা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি।

এরই ফল হলো সর্বব্যাপী ক্ষুধার জালা। বাঁচার কোনো আশা নেই। কি হবে কাজ করে, কি হবে বেঁচে থেকে, এভাবে যদি মানুষ অহেতুক যুদ্ধক্ষেত্রেই মরে পড়ে থাকে?

পর্ব-৫৭

কিন্তু রাজনীতির খেলা বড় জটিল?

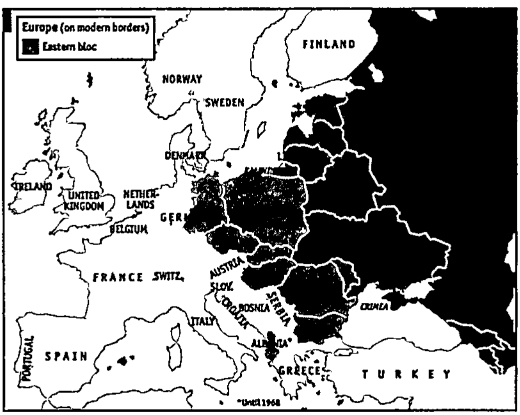
আগেই বলেছিলাম, এই বিপর্যস্ত ইউরোপে আদি পরাশক্তিগুলো একেবারে নির্জীব হয়ে পড়লো। ব্রিটেন-ফ্রান্স নিজেই চলতে পারবে না, দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্য চালাবে কিভাবে?

নবনির্বাচিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ঘোষণা দিলেন, ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হবে। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হলো। ভারতীয় উপমহাদেশ তো বটেই, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া ও মিয়ানমার থেকেও ব্রিটিশরা পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।

আগে তো নিজে বাঁচি-তারপর না হয় অন্য দেশ দখল?

মামুন প্রশ্ন করলো-ইউরোপের সব দেশ দুর্বল হয়ে পড়লো-কিন্তু রাশিয়া কিভাবে নতুন পরাশক্তি হলো? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সবচেয়ে বেশি ভুগেছে-তাহলে রাশিয়া তো আরও কাহিল হয়ে পড়ার কথা।

জারিফ বললো, "লোকবল হারিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয়ে রাশিয়া যথেষ্ট কাহিলই ছিলো। কিন্তু রাশিয়ার দখলে পড়েছিলো প্রায় সমগ্র পূর্ব ইউরোপ।"



চিত্র-২৬: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ার দখলে থাকা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি।

রাশিয়ার দখলে পূর্ব ইউরোপের ভূখন্ড যাওয়ার পিছনে জার্মানীর ভূমিকা রয়েছে। কারণ জার্মানী ১৯৪১ সালের ২২ জুন রাশিয়া আক্রমণ করতে যাওয়ার মুখে এসব পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো দখল করে। রাশিয়ানরা জার্মানদেরকে তাড়া করতে করতে এসব দেশে অবলীলায় ঢুকে পড়ে।

ইউক্রেন, বেলারুশ, লিথুয়ানিয়া ছিলো বিশাল সোভিয়েত রাশিয়ার অংশ। কিন্তু স্বাধীন দেশ বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, আলবেনিয়া, পোল্যান্ড এমনকি জার্মানীর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত দখল করে ফেলে রাশিয়ান লাল ফৌজ।

এই পরাক্রমশালী রাশিয়াকে ঠেকাবে কে?

ব্রিটেন-ফ্রান্স মুমূর্ষু; জার্মানী তছনছ। নতুন দানব রাশিয়াকে নিয়ে চিন্তার ভাঁজ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মনে। হিটলারের বিরুদ্ধে অর্জিত এত সাধের জয় কি শেষমেষ ছিনতাই হয়ে যাবে রাশিয়ার কাছে?

রাশিয়াই কি হতে যাচ্ছে নতুন জার্মানী? স্ট্যালিনের মাঝেই কি লুকায়িত আছে হিটলারের প্রেতাত্মা?

যত চিন্তাই চার্চিল করুন না কেন, তিনি এটাই ভাবলেন যে রাশিয়াকে ঠেকানোর জন্য আমেরিকার উপর ভরসা করা ছাড়া আর কোনো গতি নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে ইউরোপের মাটিতে। জাপান এখনও যুদ্ধ চালাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। আত্মসমর্পনের কোনো লক্ষ্মণ নাই জাপানের।

এ এক অদ্ভুত জাতি! মরে সাফ হয়ে যাচ্ছে তবুও আত্মসমর্পন করতে আসছেনা মান সন্মানের ভয়ে।

সেই উত্তাল দিনে মারা গেলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টঃ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যু চার্চিলের চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিলো। যাকে নিয়ে এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্দ সাগর পাড়ি দিচ্ছিলেন, সেই সহযাত্রীর মৃত্যু হওয়ায় অসহায় হয়ে পড়েন চার্চিল। রুজভেল্টের সাথে চার্চিলের ছিলো ব্যক্তিগত রসায়ন। গভীর বন্ধুত্ব।

তবে রুজভেল্টের মৃত্যুটা ছিলো একদম প্রত্যাশিত। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়াল্টা সম্মেলনেই দেখা গেলো একদম বিধ্বস্ত চেহারার রুজভেল্টকে। কথা বলতে পারছেন না ঠিকমতো, হাঁটতে পারছেন না, মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসেই ডাক্তার রুজভেল্টের রক্তচাপ দেখে বলেছিলেন, "প্রেসিডেন্ট আরও কয়েকটা দিন বাঁচতে পারেন যদি সবধরনের টেনশন এড়িয়ে চলেন।"

কিন্তু সেই উত্তাল পরিস্থিতিতে টেনশন এড়িয়ে চলা অসম্ভব ছিলো রুজভেল্টের উপর। **১৯৪৫ সালের ১২ এপ্রিল মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে সফল প্রেসিডেন্টদের একজন ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট মারা গেলেন।**

বিশ্বমন্দা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাখা আমেরিকার সেই টালমাটাল পরিস্থিতিতে রুজভেল্ট জাতির জন্য যা করে গিয়েছেন, আমেরিকান ইতিহাসে সেটা চির অম্লান হয়ে হয়ে থাকবে।

হিটলারের প্রচার মন্ত্রী গোয়েবলস হিটলারের মন শীতল করার জন্য ইতিহাসের পাতার পৃষ্ঠা উল্টালেন। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের সময় (১৭৫৬-১৭৬৩) রাশিয়ান বাহিনী যখন বার্লিনের গেটের কাছে চলে এসেছিলো, ঠিক তখনই মারা যান রাশিয়ান জার ফ্রেডরিক দ্যা গ্রেট। পরবর্তী জার জার্মানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই সে যাত্রায় বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায় জার্মানরা।

গোয়েবলস হিটলারকে বলতে লাগলেন-" দেখবেন ফুরার! রুজভেল্ট যেহেতু মারা গেছে, দম ফুরিয়ে যাবে মিত্রবাহিনীর। আমরা অচিরেই মুক্ত হবো। আবার আঘাত হানবো সবাইকে।"

সে আশায় গোরেবালি! রুজভেল্টের চেয়ারে বসলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। অভিজ্ঞতায় রুজভেল্টের ধারে কাছেও ছিলেন না তিনি। তবে আমেরিকান স্বার্থরক্ষায় তিনি আরও বেশি কট্টর। রুজভেল্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাশিয়ানদের ছাড় দিচ্ছিলেন প্রতিনিয়ত। কিন্তু ট্রুমানের হাব ভাব দেখে মনে হলো, তিনি কমিউনিস্ট রাশিয়াকে এত সমঝে চলার লোক নন।

ক্ষমতায় আরোহন করেই দুটি কাজের দিকে ট্রুমানকে মনোযোগ দিতে হলো। প্রথম কাজটা হচ্ছে, হিটলার পরবর্তী জার্মানীর ভাগ্য নির্ধারণ ও দূরপ্রাচ্যের দেশ জাপানকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করা। ১৯৪৫ সালের ৮ মে তারিখে ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হলেও নাছোড়বান্দা জাপান তখনও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। জাপানের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ট্রুমান জার্মান নগরী পটস্ডামে চললেন শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

ব্রিটেন-রাশিয়া-আমেরিকার তিন শীর্ষ নেতৃত্বের সেটাই ছিলো শেষ বৈঠক।

পর্ব-৬০

পটসডাম সম্মেলনঃ বিধ্বস্ত জার্মানীকে ঘিরেই আবর্তিত হলো স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম অঙ্কঃ

জার্মানী পরাজিত। হিটলার আত্মসমর্পন করেছেন। এখন কথা হলো, জার্মানীর ভবিষ্যৎ কি? যদিও ইয়াল্টা সম্মেলনে জার্মানীকে চার ভাগ করার কথা বলা হয়েছিলো, এবং সে অনুযায়ী চার ভাগই আছে। মোট ভূমির ২৮ শতাংশ দখল

করে পূর্ব জার্মানীতে ঘাঁটি গেড়েছে রাশিয়া। পশ্চিমপ্রান্তে জার্মানীর দখল করেছে ব্রিটেন-ফ্রান্স আর আমেরিকা।

এই জার্মানীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য পটসডামে আবারও তিন জাতির শীর্ষ নেতৃত্ব সম্মেলনে বসবেন । জার্মানীর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে এবার।

১৭ জুলাই ১৯৪৫ থেকে ২ আগস্ট ১৯৪৫

বার্লিন থেকে অল্প দূরত্বের পটসডাম নগরীতে রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারী ট্রুমান আর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাশরীফ আনয়ন করলেন।

অল্প কয়েকদিন আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মারা যাওয়ায় ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রুমান ক্ষমতায় বসেন। জুলাই মাসের ১৫ তারিখ ট্রুমান বার্লিন নগরীতে পা রাখলেন। চলে আসলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলও।

কিন্তু এখনও দেখা নেই রাশিয়ান একনায়ক স্ট্যালিনের। জানা গেলো স্ট্যালিন বিমানে আসবেন না। তিনি আসবেন ট্রেনে। অতিথিদের অপেক্ষা করিয়ে রাখা ছিলো স্ট্যালিনের চিরাচরিত অভ্যাস।

স্ট্যালিনের মনে কি অহংকার ঢুকে পড়েছিলো?

অবশ্যই! হিটলারের বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন প্রায় একা। ব্রিটেন-আমেরিকা হিটলারের বিরুদ্ধে সৈন্য নামিয়েছে পরে। পূর্ব ইউরোপের সব দেশ দখল করে তিনি জার্মানীর মাটিতে পা রাখছেন বীরদর্পে। বার্লিন নগরীর রেলস্টেশন রাশিয়ান সৈন্যদের দখলে। মস্কো থেকে সরাসরি তিনি চলে আসবেন বার্লিনে। প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ১২-১৪ জন প্রহরায় ছিলো স্ট্যালিনের নিরাপত্তার জন্য। মোট ১৫ হাজার সেনাসদস্য দায়িত্বরত ছিলো স্ট্যালিনের আগমণ উপলক্ষে। সে এক এলাহী কারবার বটে!

আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে, ফরাসী সেনাপতি চার্লস দ্য গলকে সম্মেলনে আমন্ত্রণই জানানো হয় নি। এটা দৃষ্টিকটু লেগেছিলো এজন্য যে দ্য গল ছিলেন মিত্রবাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা।

সম্মেলনের ফলাফল:

সম্মেলনের প্রথম দিনই আমেরিকা আণবিক বোমার সফল বিস্ফোরণ ঘটায়। নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে পরীক্ষা চালিয়ে বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত রবার্ট ওপেনহাইমারের নেতৃত্বে গবেষক দল। ট্রুমান নিজে থেকে সে কথা স্ট্যালিনকে জানান। কিন্তু স্ট্যালিনও দমবার পাত্র নন। কারণ আমেরিকার পারমাণবিক প্রকল্পের কথা গোয়েন্দা মারফত স্ট্যালিন আগেই জানতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাশিয়াও এরকম পারমাণবিক বোমা বানানোর

গবেষণায় লিপ্ত ছিলো। সুতরাং এরকম বোমা যে অচিরেই রাশিয়ার হাতে চলে আসবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন স্ট্যালিন। তাই ট্রুমানকে পাত্তা দেন নি স্ট্যালিন।

জার্মানীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে চান স্ট্যালিন। এতে আপত্তি জানায় আমেরিকা। আমেরিকার বক্তব্য ছিলো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এরকম ক্ষতিপূরণ আদায় করার চুক্তি করার কারণেই হিটলারের উত্থান হয়েছিলো।

ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি দুই পরাশক্তি। যদিও কয়েক বছর পর আমেরিকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। রাশিয়া প্রথমে ঘাঁইঘুই করলেও পরে আর শব্দ করেনি।

জাপানের প্রতি ট্রুমানের চরমপত্রঃ

জাপানে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের জন্য আমেরিকার প্রতি ঘৃণা কাজ করে অনেকের। কিন্তু জানো কি, এ বোমা নিক্ষেপের জন্য জাপানও কম দায়ী নয়। জাপানকে পটস্‌ডাম সম্মেলনে বার্তা দেওয়া হয়, অতি তাড়াতাড়ি জাপান যানো আত্মসমর্পন করে। তা না হলে জাপানকে চরম ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে।

কিন্তু কিসের কি? বেকুবের মতো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলো জাপানীরা। উপায়ান্তর না দেখে আমেরিকা ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা নগরীতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। তিনদিন পরে নাগাসাকি শহরে আরেকটি বোমা নিক্ষেপ করে আমেরিকা।

আত্মগর্বে বলীয়ান জাপান বুঝতে পারলো, এখনও যদি আমরা আত্মসমর্পন না করি তাহলে বিশ্বে জাতি হিসেবে জাপানের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়।

পর্ব-৬১

যুদ্ধ পরবর্তী অচেনা ইউরোপ, ক্ষুধার জ্বালায় কাতর অগনিত অনাহারী আদম সন্তান :

আমরা যারা এ উপমহাদেশের বাসিন্দা তাদের কাছে দুর্ভিক্ষ মানে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের কালজয়ী সেই সব চিত্রকর্ম, যেখানে দেখা যাচ্ছে মানুষের

মাংস ছিড়ে খাচ্ছে কাক। বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে একটি কথা আছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর বলতে বোঝায়, বাংলা ১৩৫০ সাল/ইংরেজি ১৯৪২-৪৩ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিলো তখন এ উপমহাদেশে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিলো। সে সময় ক্ষুধার জ্বালায় লাখো লাখো লোক অনাহারে মারা যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তর এতই হৃদয় বিদারক ছিলো যে তার বর্ণনা দিলে এখনও যে কারো চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠবে মুহূর্তেই।

যাক সে কথা, সে আলোচনা অন্যত্র হবে। কিন্তু প্রাচুর্যময় ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেভাবে খাদ্যের অভাবে মানুষ মারা গিয়েছিলো তা পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে কোনো অংশে কম নয়।

যা হোক, এরকম দুর্ভিক্ষ পীড়িত ইউরোপের লোকজন বাঁচার আশা একরকম ছেড়ে দিলো।

জারিফ বললো, কম্যুনিজমটা ইউরোপে টিকলো না কেন জান?

এসব অসহায় ভূখা-নাঙ্গা মানুষদের নিয়েও রাজনীতি করেছিলো রাশিয়ানরা। স্ট্যালিন ভেবেছিলেন, মানুষ যত গরীব থাকবে, না খেয়ে থাকবে ততই নাকি উনার সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে। তাই পশ্চিম ইউরোপের মানুষ যখন না খেয়ে মরছিলো, পিশাচের মতো হাসছিলো স্ট্যালিন। মনে মনে স্ট্যালিন বলছিলেন, "পুঁজিবাদের মজা বুঝো তোমরা এবার!"

ট্রুমানের-Policy of containment-

তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া দেশটা এমনিতেই ছিলো অনেক বড় দেশ। তার উপর পূর্ব ইউরোপের বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ইত্যাদি দেশ দখল করে বসে আছে রাশিয়া। আমেরিকান নীতি নির্ধারকদের মাথায় হাত! না জানি রাশিয়া আর কোন দেশে তার সমাজতন্ত্র কায়েম করে ফেলে!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান যখন রাশিয়াকে নিয়ে এসব দুশ্চিন্তার কথা সারাক্ষণ চিন্তা করতে লাগলেন তখনই পূর্ব ইউরোপের দেশ গ্রীস ও কামাল আতাতুর্কের দেশ তুরস্ককে নিয়ে নতুন বিপদ দেখা দিলো।

গ্রীস ও তুরস্ক দুটো দেশই ছিলো পূর্ব ইউরোপ সংলগ্ন। পূর্ব ইউরোপ ইতোমধ্যেই সমাজতন্ত্রের ছায়াতলে চলে এসেছে। গ্রীস ও তুরস্ককে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো ব্রিটেন। এই বুঝি স্ট্যালিনের অশুভ তৎপরতার বলি হয় এই দুই দেশ!

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্রিটেনের দাপট ফুরিয়েছে। নিজের নাই অর্থনৈতিক শক্তি। উদ্বিগ্ন ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জরুরি তারবার্তা পাঠালো যেনো গ্রীস ও তুরস্ককে সমাজতন্ত্রের কবলে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করা হয়।

নড়েচড়ে বসলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান। তিনি সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন; ইতিহাসে যেটা ট্রুমান ডকট্রিন নামে পরিচিত।

গ্রীসের কমিউনিস্টরা বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে রাজকীয় বাহিনীকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিলো। আর তুরস্কের কাছ থেকে দার্দানেল্‌স প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিতে উঠেপড়ে লেগেছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন।

১২ মার্চ-১৯৪৭-

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। গ্রীস ও তুরস্কের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো উপায়ে সমাজতন্ত্রকে প্রতিহত করা যাতে গ্রীস ও তুরস্ক আমেরিকার মিত্র হয়ে থাকে। **'ট্রুমান ডকট্রিনের' মূল কথা ছিলো-**

"A promise that the United States would do whatever was necessary both economically and militarily to contain the spread of communism around the world."

এর মানে হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের বিস্তার ঠেকানোর জন্য অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে যা যা করা দরকার সবকিছু করবে।

'ট্রুমান ডকট্রিনের' বদৌলতে আমেরিকা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভুত্ব করার জন্য এক মোক্ষম চাল ফেলে। সোভিয়েত রাশিয়া পড়ে থাকলো তার নীতি আর আদর্শের গাল ভরা বুলি নিয়ে। মানুষের জীবন মান উন্নয়নের কোনো চেষ্টাই করেনি তারা।

ট্রুমান ডকট্রিনের হাত ধরাধরি করে চলে আরেকটা থিওরী; সেটা হচ্ছে ডমিনো থিওরী। **ডমিনো থিওরীর মূল কথা ছিলো-**

If one country in a region came under the influence of communism, the surrounding countries would follow, falling like dominos.

যদি একটা অঞ্চলের কোনো দেশ সমাজতন্ত্রের প্রভাবের আওতায় চলে আসে, তাহলে তার চারপাশের দেশগুলোতেও সে হাওয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ডমিনো থিওরীকে আমেরিকান থিংক ট্যাংক ১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মনেপ্রাণে লালন পালন করেছে।

শুধুমাত্র ঠেকিয়ে দেওয়ার নাম করে আমেরিকানরা দেশে দেশে কুখ্যাত সামরিক শাসকদেরকে সমর্থন দিয়েছে, আগ্রাসন চালিয়েছে এবং শাসক পরিবর্তন করিয়েছে।

ট্রুমান ডকট্রিন-ডমিনো থিওরীর সাথে আরেকটা যাদুকরী নীতি ছিলো আমেরিকার; যে নীতির বদৌলতে আমেরিকা পশ্চিম ইউরোপকে অর্থনৈতিকভাবে বলীয়ান করে তুলে। সোভিয়েত রাশিয়া শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে কিন্তু এ পরিকল্পনার সাথে থাকতে পারেনি।

আর শুরু হয়ে গেলো স্নায়ুযুদ্ধ। ১৯৫০ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়টুকুতে পুরো পৃথিবী বিভক্ত ছিলো দুই শিবিরে বিভক্ত।

জেনে রাখা ভালো, আমেরিকান সিনেটর বার্নার্ড বারুচ সর্বপ্রথম ১৯৪৭ সালের ১৬ এপ্রিল স্নায়ুযুদ্ধের কথা প্রথম ঘোষণা করেন। তারপর আমেরিকান কলামিস্ট ওয়ালটার লিপম্যান স্নায়ুযুদ্ধের উপর প্রথম আর্টিকেল লিখেন।

মার্শাল প্ল্যান, লাগে টাকা দেবে গৌরিসেন (পড়ুন আমেরিকা!)

১৩ বিলিয়ন ডলার!

৫ জুন, ১৯৪৮

দিনতারিখ আর টাকার পরিমানটা মনে রাখা দরকার খুব ভালো করে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে আরেকটা বাঁক বদলের ঘটনা।

জারিফ আলোচনা করলো, ইউরোপীয় জাতিগুলো সারাজীবনেও আমেরিকার ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবেনা। অর্থনৈতিকভাবে হয়তো আমেরিকার ঋণ ইউরোপীয় জাতিগুলো অনেক আগেই শোধ করে ফেলেছে কিন্তু মানসিকভাবে আমেরিকা তাদেরকে যে শান্তিটুকু দিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা পরিবারের মধ্যে হয়তো সম্ভব কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তা কোনামতেই সম্ভব নয়। সেই অচিন্ত্যনীয় মহানুভব কাজ করেছে আমেরিকা ইউরোপের জন্য।

মামুন বললো, "বলো কি? আমেরিকা এত মহান কাজ করেছে অথচ আমি কোনো বইতে আজ পর্যন্ত পড়িনি। তোমার কাছে তো সব নতুন ইতিহাস শুনবো মনে হচ্ছে।

জারিফ বললো, "হয়তো তুমি বাংলা বইয়ে আমেরিকার এসব মহৎকাজগুলোর বিবরণ পাবে না, কিন্তু আমি প্রচুর ইংরেজি বই পড়েছি, সেখানে আমেরিকানদের এসব কাজের কথা কৃতজ্ঞতাভরে স্বীকার করে নিয়েছে ইতিহাসবিদেরা।

চলো আজকে সেসব কাহিনীর কথা শুনি-

আগেই বলেছিলাম, ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিকে নিয়ে মজা করছিলো রাশিয়া। তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। অবশ্য রাশিয়ার সামর্থ্যও খুব বেশি ছিলো না।

কিন্তু আসল কাজটা করলো আমেরিকা। জর্জ সি মার্শাল ছিলেন একজন ডাকসাইটে সামরিক অফিসার। কিন্তু ১৯৪৭ সালে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব।

১৯৪৭ সালের ৫ জুন তারিখে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সেখানে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আমেরিকা যদি প্রকৃত অর্থেই বিশ্ব রাজনীতির মোড়ল হতে চায়, তাহলে ভূখা-নাঙ্গা অসহায় ইউরোপকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে অর্থসাহায্য দিয়ে। ঐশ্বর্যশালী ইউরোপকে কোনোদিন রাশিয়া এসব গালভরা বুলি দিয়ে তাদের দলে নিতে পারবে না।

তাছাড়া আমেরিকা যে অর্থবিত্ত গড়ে তুলেছে, তার কোম্পানীগুলোর জন্য বিরাট বাজার দরকার। ইউরোপের মার্কেটে একচ্ছত্র রাজত্ব করতে পারবে আমেরিকান কোম্পানীগুলো।

যেই কথা সেই কাজ। ইউরোপ পুনর্গঠনের কাজ শুরু হলো পুরোদমে। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের ৫ তারিখে মার্শাল প্ল্যান পাশ হলো। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ ১৩ বিলিয়ন ডলার ইউরোপের ১৬টি দেশকে দিয়ে দিলো আমেরিকা। দেশগুলো হলো-অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রীস, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, ব্রিটেন এবং পশ্চিম জার্মানী।

রাশিয়াকেও এই মার্শাল প্ল্যানের আওতায় এনে সাহায্য দিতে চেয়েছিলো আমেরিকা। সংগত কারণেই রাশিয়া তার চিরশত্রু আমেরিকার এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

মামুন বললো, "খুব ভালো লাগলো এই তথ্যটা জেনে। আসলেই আমেরিকানদের এই কাজটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

জার্মানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে মহাচিন্তায় মিত্রশক্তি:

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের পটস্ডাম সম্মেলনে রাশিয়াকে একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিলো-মিত্রবাহিনীর দখলে থাকা পশ্চিম জার্মানী থেকে কিছু ক্ষতিপূরণ তারা পাবে। কিন্তু ১৯৪৬ সালের মে মাসে আমেরিকার সামরিক গভর্নর ডি, ক্লে রাশিয়াকে দেওয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ ছাড় দিতে অস্বীকার করেন। ব্রিটেনও আমেরিকার পথ অনুসরণ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। রাশিয়ারতো মাথা খারাপ! কারণ রাশিয়া জার্মানী থেকে ক্ষতিপূরণ নিতে চায়, তার দেশ পুনর্গঠনের জন্য।

কিন্তু আমেরিকান নেতৃত্বাধীন মিত্র শক্তি বললো, "জার্মানরা এমনিতেই খেতে পায় না। তারা ক্ষতিপূরণের অর্থ কোত্থেকে দিবে?"

জার্মানীর ভবিষ্যৎ কি হবে এটা নিয়ে মিত্রদেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে দফায় দফায় চললো বৈঠক। কিন্তু কোনো সুরাহা হয় নি।

রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিন চেয়েছিলেন, জার্মানীর পুরোটাই যাতে রাশিয়ার প্রভাবে থাকে। কারণ তার গুরু লেনিন বলে গিয়েছিলেন, জার্মানীর হওয়া উচিত সমাজতন্ত্রের উর্বর ভূমি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর জার্মানী হয়ে গেলো উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধী রাষ্ট্র। হিটলার দুই চোখে দেখতে পারতেন না কমিউনিস্টদের।

এখন যেহেতু হিটলারের পতন হয়েছে, পুরো জার্মানীতে সমাজতন্ত্র ছড়িয়ে দেওয়ার এই তো সময়। কিন্তু মিত্র শক্তির কাছে রাশিয়ার এই ইচ্ছা ছিলো মামাবাড়ির আবদারের মতো। রাশিয়ানরা দখল করেছিলো জার্মানীর ২৮ শতাংশ। বাকি ৭২ শতাংশের হর্তাকর্তা তখনও ব্রিটেন-ফ্রান্স-আমেরিকান নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনী।

জার্মানীতে নিজ নিজ প্রভাব বাড়ানোর লড়াইয়ে কেউ কাউকে একচুল ছাড় দিতে রাজি নয়।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ বলেছিলেন,

"What happenes to Berlin happens to Germany.

What happenes to Germany happens to Europe."

কিন্তু ফ্রান্স নাখোশ-

ফ্রান্স আমেরিকাকে বুদ্ধি দিলো, কি লাভ জার্মানদের মতো দুষ্টজাতের লোকদেরকে এত খাতির করার? জার্মান দেশটাকেই টুকরো টুকরো করে ফেলা হোক। জার্মান জাতির অস্তিত্ব মুছে দেওয়া হোক বিশ্বের মানচিত্র থেকে। আসলে জার্মানরাই মূলত দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী। ফ্রান্সের কোমর ভেঙ্গে গেছে এই দুটি বিশ্বযুদ্ধের কারণে। তাই জার্মানদের প্রতি তুলনারহিত রাগ আছে জার্মানদের।

বুদ্ধিমানের মতো কাজ করলেন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেভিন। তিনি বললেন, "ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে থেকে জার্মানীকে বস্তি করে রাখা চলবে না। জার্মানীকে সুযোগ দিতে হবে। তারা যাতে নিজেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ইউরোপ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় জার্মানীকে সবদিক দিয়ে সাহায্য করতে হবে আমাদের। আর জার্মানীর উচিত হবে এই সাহায্যকে কাজে লাগিয়ে নিজের অর্থনীতিকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া। তাই জার্মানীও আসলো মার্শাল প্ল্যানের আওতায়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে মার্শাল প্ল্যানের সহযোগিতার আওতায় থাকা দেশগুলোর উৎপাদনশীলতা ৫৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছিলো। জার্মানরা বরং

দশবছরের মধ্যে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো পুরো বিশ্বকে। ইউরোপ তথা বিশ্ব অর্থনীতির পাওয়ার হাউজে পরিণত হয় জার্মানী।

মার্শাল প্ল্যানের বিরুদ্ধেও ছিলো কেউ কেউ। ইউরোপের মুক্ত গণমাধ্যমে কেউ কেউ মার্শাল প্ল্যানের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে আসছিলো। তাদের মতে, **"ইউরোপের মতো অভিজাত একটি সমাজে নব্য ধনী আমেরিকা যেভাবে টাকা দিয়ে সাহায্য করছে তা অনেকটা ভিক্ষার শামিল। ইউরোপের লোকজন এই সাহায্যের কারণে আমেরিকার সেবাদাসে পরিণত হবে।"**

বলাই বাহুল্য, প্রয়োজনের তাগিদের সুবাদে এরকম আঁতেলবাজি আলাপ পাত্তাই পায়নি।

পর্ব-৬২

ন্যাটো প্রতিষ্ঠার মূল কাহিনী:

আজকের আলোচনার শুরুতেই একটা জিনিস জানিয়ে রাখি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমেরিকার অবদান যে কতখানি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকেই এই কথা শুনে তেড়ে ফুঁড়ে আসবেন। আমেরিকানরা শান্তি দিয়েছে বিশ্বকে-এমন কথা তো শুনি নি? কি বলছেন এসব?

তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমেরিকানরা যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত ইউরোপের হাল না ধরতো তাহলে পুরো পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়তো।

এ কথা সবাই জানে যে হিটলারকে ঠেকাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আমেরিকা তার বিপরীত মতাদর্শের অধিকারী সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে সাথে নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিলো। ১৯৪৫ সালের মে মাসের মধ্যে যখন ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হয়েছিলো তার আগেই বেশ কয়েকটি সম্মেলন করেছিলো আমেরিকা ও রাশিয়া। সেসব সম্মেলনে এ কথা বলা হয়েছিলো যে নাৎসীদের কবল থেকে ইউরোপ মুক্ত হবার পরে সবকটি দেশকে স্বাধীন করে দিতে হবে। আমেরিকার নেতৃত্বে মিত্র শক্তির দখলে আসে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো। কথামতো আমেরিকা ও তার পুঁজিবাদী দেশের মিত্ররা ছোটবড় প্রত্যেকটি দেশকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়।

কিন্তু বেঁকে বসলেন সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ার একনায়ক জোসেফ স্ট্যালিন। একথা সবাই জানে যে রাশিয়া হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিতৃভূমি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে ৫ কোটি লোক নিহত হয় তার মধ্যে অন্তত তিন কোটি রাশিয়ান। হিটলারের অদম্য জার্মান বাহিনীকে রুখতে যেয়ে রাশিয়ানরা যে ত্যাগ দিয়েছে, মানব ইতিহাসে তা নজীরবিহীন। জার্মানীকে দাবড়ানি দিয়ে রাশিয়ানরা জার্মানদের কবল থেকে দখল করে সমগ্র পূর্ব ইউরোপ। রাশিয়ানদের দখলে চলে যায়

বাল্টিক রাষ্ট্র এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া থেকে শুরু করে পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, রোমানিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া। আজকের স্বাধীন রাষ্ট্র ইউক্রেন ও বেলারুশ তো রয়েছেই। সোজা কথা হচ্ছে সমগ্র পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ান সেনারা বিদ্যমান। হিটলার মুসোলিনীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর তাঁবেদার সরকার গড়েছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে।

ঘটনা হলো, আমেরিকান নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনী তাদের দখলীকৃত দেশগুলোর স্বাধীনতা দিয়ে দিলেও রাশিয়ানরা তাদের দখলীকৃত দেশগুলো ছাড়তে রাজি নয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মূলত স্নায়ুযুদ্ধ জোরদার হয় এবং ন্যাটো প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট শুরু হয়। শুধু তাই নয়, জার্মানির বার্লিন নগরীর পূর্বপ্রান্ত রাশিয়ার দখলে ছিলো। পূর্ব জার্মানীকে কেন্দ্র করে রাশিয়ানরা তাদের উপস্থিতি মজবুত করে। পশ্চিম জার্মানীতে ছিলো আমেরিকান নেতৃত্বাধীন মিত্র বাহিনী।

তছনছ হলো জার্মানী, দুর্বল হলো ব্রিটেন-ফ্রান্স, উত্থান ঘটলো নব্য পরাশক্তি রাশিয়ার-

রাশিয়া যে এমন কিছু করতে পারে, সে ব্যাপারে আগেই সতর্ক করেছিলেন ব্রিটেনের সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল।

৫ মে, ১৯৪৬ সাল-

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের সাধারণ নির্বাচনে হেরে উইনস্টন চার্চিল ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন। অনেকটা নিভৃতেই সময় কাটাচ্ছিলেন তিনি। চার্চিলের সহযোদ্ধা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৪৫ সালের এপ্রিলের ১২ তারিখ মারা যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কার্যত শেষ হওয়ার আগেই মিত্রশক্তির দুই কাণ্ডারী দৃশ্যপটে নেই।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হলেন ক্লিমেন্ট এটলী, আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন হ্যারি এস ট্রুমান।

একজন অভিজ্ঞ ও ঝানু রাজনীতিবিদ হিসেবে চার্চিল সব মহলেই সম্মান পেতেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান চার্চিলকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। আমেরিকার মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন ট্রুমান। ট্রুমান চার্চিলকে আমন্ত্রণ জানান সে রাজ্যের ওয়েস্ট মিনিস্টার কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য।

নিমন্ত্রণপত্রে ট্রুমান লিখেন, “This is a wonderful school in my home state. If you come, I will introduce you. Hope you can do it.”

চার্চিল আমন্ত্রণ রক্ষা করলেন।

১৯৪৬ সালের ৫ মে তারিখে চার্চিল জন্ম দিলেন আরও এক ঐতিহাসিক ভাষণের। ঐতিহাসিক বললেও কম বলা হবে, চার্চিলের সেই ভাষণ স্নায়ুযুদ্ধের

প্রতীক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। ইতিহাসে সে ভাষণ Iron curtain নামেও পরিচিত।

সে ভাষণে চার্চিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। চার্চিল বলেছিলেন, "এক লৌহ যবনিকা গ্রাস করতে শুরু করেছে পুরো ইউরোপ জুড়ে।" চার্চিলের পাশে উপস্থিত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হেনরী ট্রুমান স্বয়ং।

চলো, এবার সেই বক্তৃতাটা শুনে নেই, "From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an 'iron curtain' has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia; all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and all are subject, in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and in some cases increasing measure of control from Moscow."

যার বাংলা অর্থ হচ্ছে, বাল্টিক সাগরের স্টেট্টিন থেকে শুরু করে আড্রিয়াটিকের ট্রিয়েস্টি পর্যন্ত মহাদেশ জুড়ে এক লৌহ পর্দার আবির্ভাব ঘটেছে। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের প্রাচীন দেশগুলোর রাজধানীসমূহ এই প্রভাববলয়ের মধ্যে পড়েছে। ওয়ারশ্, বার্লিন, প্রাগ, ভিয়েনা, বুদাপেস্ট, বেলগ্রেড, বুখারেস্ট এবং সোফিয়া- এসব বিখ্যাত শহরগুলো এবং তার জনগণ সোভিয়েত বলয়ের মধ্যে পড়েছে। এবং তারা কোনো না কোনোভাবে কেবল সোভিয়েত দ্বারা প্রভাবিতই নয়, বরং মস্কোর ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণের শিকার। "

ব্রাসেলস Treaty-মার্চ ১৯৪৮:

দিন যত যাচ্ছিলো চার্চিলের কথাগুলো ততই সত্যি হচ্ছিলো। সমগ্র পূর্ব ইউরোপ জুড়ে রাশিয়া দখলদারিত্ব বজায় রেখে চলেছে। এসব দেশে রাশিয়া কর্তৃক নিয়োজিত তাবেদার কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে পড়েছে। পশ্চিম ইউরোপের লোকজন দেখলো-রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি তাদের নাই। সম্মিলিতভাবে কিছু একটা করা দরকার। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্নেস্ট বেভিন প্রথমে এ ব্যাপারে মুখ খোলেন। তিনি বলেন- "The western power have to organise themselves to defend against joseph stalin's expansionist ambitions and soviet military power."

১৭ মার্চ, ১৯৪৮-

দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু দুই ঐতিহ্যবাহী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্স তিনটি ছোট রাষ্ট্র- যেমন : বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গকে নিয়ে বেলজিয়ামের

রাজধানী ব্রাসেলসে একটি চুক্তি করে। এই ব্রাসেলস চুক্তি ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। যদিও চুক্তি স্বাক্ষরটা ঘটেছিলো রাশিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ভয়কে কেন্দ্র করে কিন্তু এ চুক্তি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ঐক্যের জন্ম দেয়। পশ্চিম ইউরোপ চিন্তা করতে শুরু করে তারা একসাথে না থাকলে রাশিয়া তাদেরকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করবে না। পুরো ইউরোপে যা খুশি তা করে বেড়াবে।

জার্মানী চারভাগে বিভক্ত ছিলো তখন। পূর্ব জার্মানী ছিলো সোভিয়েতের দখলে। আর পশ্চিম জার্মানীর মালিকানা ছিলো ব্রিটেন-ফ্রান্স ও আমেরিকার। পশ্চিম জার্মানীতে আমেরিকার সাহায্য পেয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিলো। কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

পশ্চিম জার্মানীর কর্মমুখর পরিবেশে পূর্ব জার্মানি থেকে দলে দলে লোকজন আসতে শুরু করলো। রাশিয়ানরা দেখলো, পশ্চিম জার্মানীমুখী এই জনস্রোত সামলানো দরকার। বার্লিন নগরীর পশ্চিম প্রান্তকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। যাতে করে পূর্ব জার্মানীর লোকজন না আসতে পারে।

অবরুদ্ধ বার্লিন থেকে মুক্ত বার্লিন, রাশিয়ার পরাজয়:

এবার পশ্চিম জার্মানীকে ভাতে মারার সিদ্ধান্ত নিলেন স্ট্যালিন। বার্লিন নগরীকে চারদিক দিয়ে অবরুদ্ধ করে দিলেন। ট্রেন, বাস, নৌপথ সবদিক দিয়ে অবরুদ্ধ করলেন বার্লিনের ১৫ লক্ষ বাসিন্দাকে। ১৯৪৮ সালের ২৪ জুন থেকে এই অবরোধ শুরু। স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম সংঘাতও বলা চলে একে। স্ট্যালিন পশ্চিম জার্মানীকে দেখিয়ে দিতে চাইলেন, তোমরা আমেরিকার টাকায় মুদ্রানীতি ঘোষণা করে পূর্ব জার্মানীর লোকজনকে প্রলুব্দ করতে চাইছো, এবার না খেয়ে মরতে থাক তোমাদের মুদ্রানীতি নিয়ে।

কিন্তু আমেরিকার নেতৃত্বাধীন মিত্র বাহিনী শুরু করলো এক পাগলা খেলা। রাশিয়া সব পথ বন্ধ করেছে বার্লিনে ঢোকার জন্য, কিন্তু আকাশপথ তো আর বন্ধ করেনি! শুরু হয়ে গেলো মানব ইতিহাসের এক অন্যরকম বাঁক সৃষ্টিকারী ঘটনা। প্রতিদিন ১৫০০ বিমানের ফ্লাইট বার্লিনে ঢুকতে লাগলো খাবার নিয়ে। ২৫ লক্ষ জনগোষ্ঠীকে বিমান দিয়ে প্রতিদিন খাবারের যোগান দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। সে অসাধ্য কাজটাই করেছিলো আমেরিকা। কয়েক মাস যেতেই রাশিয়া বুঝতে পারলো, এই অবরোধ একেবারেই নিরর্থক। উল্টো পূর্ব জার্মানির ক্ষতি হচ্ছে। শেষমেষ ১৯৪৯ সালের ১২ মে তারিখে রাশিয়ানরা বার্লিন নগরীর অবরোধ প্রত্যাহার করে।

গড়ে উঠলো দুই দেশ, পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানিঃ

কিন্তু আসল সমস্যাটা তখনও জার্মানীকে ঘিরে। জার্মানীকে দখল করে রেখেছে চারটি দেশ। পূর্ব জার্মানী পুরোটাই রাশিয়ার দখলে; যার পরিমাণ ২৮ ভাগ। পশ্চিম ইউরোপে উপস্থিত ব্রিটেন-ফ্রান্স ও আমেরিকা। আসলে যে পাপ করেছে জার্মানী তাতে ১০০ টুকরো হয়নি সেটাই তার ভাগ্য।

স্ট্যালিনের গুরু লেনিন ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন, জার্মানীতে যাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর ভাগ্য নির্ধারণ নিয়ে যখন একের পর এক ব্যর্থ বৈঠক হচ্ছে, তখন স্ট্যালিন জার্মানীর প্রশ্নে কোনো আপোষে যেতে চান নি। দখলীকৃত জার্মান ভূমি থেকে তিনি পিছু হটতে নারাজ। আমেরিকা যখন দেখলো, রাশিয়া কিছুতেই পূর্ব জার্মানির দখল ছাড়বে না তখনই রাশিয়াকে বাদ দিয়ে ১৯৪৮ সালে লন্ডন সম্মেলন ডাকা হলো। পশ্চিম জার্মানিকে আলাদাভাবে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করেই রাশিয়াকে মোকাবেলা করার ফন্দি আঁটলো আমেরিকা।

পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বার্লিন, পূর্ব জার্মানির রাজধানী বন। বিভক্ত বার্লিন নগরী। কিন্তু আমেরিকানরা খেললো এক সূচতুর অর্থনৈতিক খেলা। পশ্চিম জার্মানিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করলো। অর্থনৈতিক জোয়ার শুরু হলো পশ্চিম জার্মানিতে। রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন পূর্ব জার্মানিতেও নতুন মুদ্রা ঢুকতে লাগলো অবাধে। স্ট্যালিন কিংকর্তব্যবিমূঢ়! কী করবেন তিনি আমেরিকার টাকা পয়সার দাপটের সামনে? তিনি করলেন এক পাগলামি কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাভবান হয় আমেরিকাই।

১৯৪৯ সালের ২৩ মে পশ্চিম জার্মানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কনরাড আদেনুয়ার পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন।

কয়েক মাস পর সোভিয়েত ইউনিয়নের (রাশিয়ার) তত্ত্বাবধানে পূর্ব জার্মানীও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ৭ অক্টোবর পশ্চিম জার্মানীর পাশাপাশি পূর্ব জার্মানীর জন্ম হয়। পশ্চিম জার্মানী পুঁজিবাদের আজ্ঞাবহ আর পূর্ব জার্মানী সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার অধীনে।

....এবং ন্যাটোর জন্ম!

বার্লিন নগরীর অবরোধের সময়ই আমেরিকান নেতৃত্বাধীন মিত্র বাহিনী বুঝতে পেরেছিলো যে এই রাশিয়া তাদেরকে আগামী দিনগুলোতে ভোগাবে। যেহেতু ইউরোপ দুর্বল, তাই আমেরিকার কাঁধে বন্দুক রেখেই করতে হবে পাখি শিকার। আর আমেরিকাও ভাবলো, একটি ঐক্যবদ্ধ এবং সমৃদ্ধশালী পশ্চিম ইউরোপই পারে রাশিয়াকে ঠেকাতে। যদিও আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রনায়কগণ বহু বছর

আগেই সতর্ক করেছিলেন, আমেরিকা যেনো কোনোদিনই ইউরোপের সাথে কোনো ধরণের বন্ধুত্বে না জড়ায়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অনড়। শুধু বার্লিন বাসীর পাশেই নয়, আমেরিকা দেখিয়ে দিতে চাইলো যে পুরো পশ্চিম ইউরোপের পাশেই সে আছে। এমন একটি সামরিক জোট করতে হবে যাতে রাশিয়ার কখনো পশ্চিম ইউরোপের কোনো দেশে আক্রমণ চালানোর সাহস না হয়।

৪ এপ্রিল, ১৯৪৯।

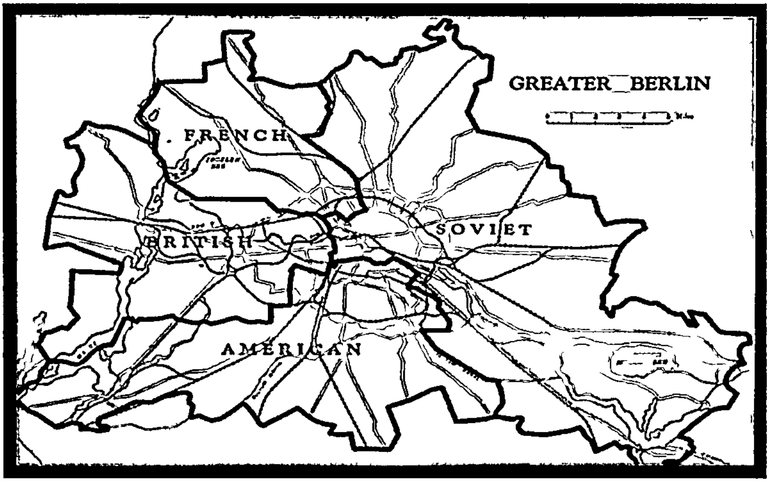
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ১২টি দেশের অংশগ্রহণে একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যার নাম 'North Atlantic Treaty Organization (NATO).' আটলান্টিক মহাসাগরের দুই পাড়ের ১২টি দেশ। পশ্চিম পাড় থেকে শুধু আমেরিকা ও কানাডা। ইউরোপের ঐতিহ্যবাহী দুই দেশ ব্রিটেন-ফ্রান্সতো রয়েছেই, আরও আছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোও। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো নিরপেক্ষ হিসেবে পরিচিত, কিন্তু হিটলার যে তান্ডব দেখিয়েছে এসব দেশগুলোতে তাই তাদের নিরপেক্ষ থাকার স্বাদ চিরতরে মিটে গেছে। স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চল থেকে যোগ দিলো নরওয়ে, ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ড। উপরের ৭টি দেশ বাদে বাকী ৫টি দেশও ইউরোপের, যাদের মধ্যে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ-হিটলারের নির্মমতার শিকার। বাকী দুইটি দেশ হলো ইতালি ও পর্তুগাল।

বলাই বাহুল্য, ন্যাটোর জন্মই হয়েছিলো রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবেলা করার চিন্তা মাথায় রেখে। যদিও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরে ন্যাটোর কর্মকান্ড আরও বিস্তৃত হয়। ন্যাটো চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিলো 'An attack against one, would be an attack against all.'

ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ এবং স্নায়ুযুদ্ধের সময় যতো সব সমস্যা

পর্ব-৬৩

বিগত পর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপে একদিকে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো উঠে দাঁড়াচ্ছে,অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার বলয়ে থেকে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় কিছু একটা করার চেষ্টা করছে।



চিত্র-২৭ : পশ্চিম পাশে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকা আর পূর্ব পাশে রাশিয়ার দখলে ছিল জার্মানী।

সোজা কথা-স্নায়ুযুদ্ধ তখন পুরোপুরি শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার নেতৃত্বে ইউরোপ বিভক্ত।

১৯৫০-১৯৬১ সাল পর্যায়:-

পশ্চিম ইউরোপের বন্ধুত্বপূর্ণ যাত্রা শুরু:

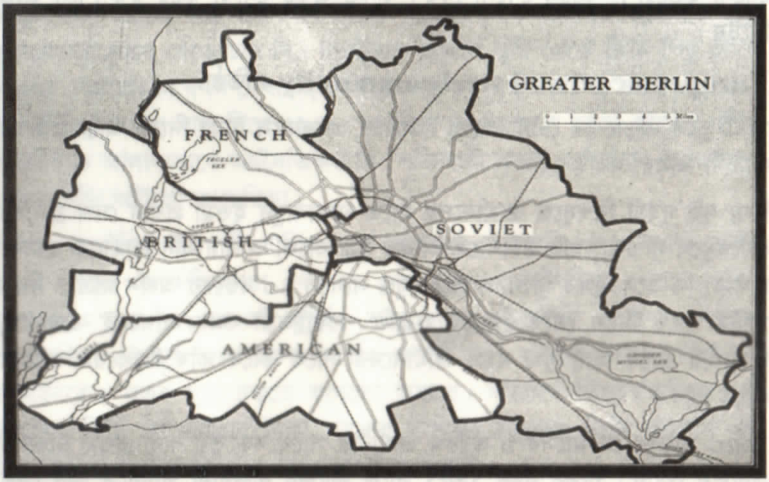
পূর্বে আমরা যে আলোচনা করেছিলাম, তার সারমর্ম ছিলো – আমেরিকার কাঁধে ভর করে পশ্চিম ইউরোপ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখছিলো।

পূর্ব ইউরোপের দরকার ছিলো একজন বড়ভাই; যে তার পিঠ চাপড়ে দিবে; চলার পথে সাহস যোগাবে। আমেরিকার মাঝে পশ্চিম ইউরোপ খুঁজে পেলো সেই বড় ভাইয়ের ছায়া।

ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ এবং স্নায়ুযুদ্ধের সময় যতো সব সমস্যা

পর্ব-৬৩

বিগত পর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপে একদিকে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো উঠে দাঁড়াচ্ছে,অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার বলয়ে থেকে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় কিছু একটা করার চেষ্টা করছে।



চিত্র-২৭ : পশ্চিম পাশে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকা আর পূর্ব পাশে রাশিয়ার দখলে ছিল জার্মানী।

সোজা কথা-স্নায়ুযুদ্ধ তখন পুরোপুরি শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার নেতৃত্বে ইউরোপ বিভক্ত।

১৯৫০-১৯৬১ সাল পর্যায়:-

পশ্চিম ইউরোপের বন্ধুত্বপূর্ণ যাত্রা শুরু:

পূর্বে আমরা যে আলোচনা করেছিলাম, তার সারমর্ম ছিলো – আমেরিকার কাঁধে ভর করে পশ্চিম ইউরোপ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখছিলো।

পূর্ব ইউরোপের দরকার ছিলো একজন বড়ভাই; যে তার পিঠ চাপড়ে দিবে; চলার পথে সাহস যোগাবে। আমেরিকার মাঝে পশ্চিম ইউরোপ খুঁজে পেলো সেই বড় ভাইয়ের ছায়া।

বাদবাকী কাজ গুছিয়ে নিলো ইউরোপ। বিশেষভাবে বলতে হয়, ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট শুমান এর কথা। শুমান চিন্তা করলেন ১৮৭১ সালে জার্মানী যখন থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়, তার আগ থেকেই ফ্রান্সের সাথে চরম শত্রুতা ছিলো জার্মানীর। জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যকার শত্রুতার মাশুল দিতে হয়েছে পুরো ইউরোপকে। পুরো বিশ্বকেও উলটপালট করে দিয়েছে এই দুই রাষ্ট্রের শত্রুতা। তাই, ইউরোপের মিলনকাজ শুরু করতে হবে ফ্রান্স-জার্মানীর বন্ধুত্ব দিয়ে। হলোও তাই। প্রচুর রক্ত আর ধ্বংসের পর এবার হাত মিলালো ফ্রান্স ও জার্মানী। বদলে গেলো ইউরোপ, বদলে গেলো বিশ্ব। যদিও একটু গোস্বা করে রক্ষণশীল জাত ব্রিটেন।

European coal and steel community-প্রতিষ্ঠা:

মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ইউরোপ, দেদারসে টাকা দিচ্ছে আমেরিকা এ কাহিনী আমরা সবাই জানি।

কিন্তু দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের হাতে নাস্তানাবুদ হওয়া প্রধান দেশ ফ্রান্সের চোখেমুখে দুশ্চিন্তা, যদি ভবিষ্যতে আবার যুদ্ধ বাধে! আবার যদি জার্মানরা হামলা চালায়! কি হবে এসব পুনর্গঠন করে! যুদ্ধ লাগলে ৪০ বছরের অর্জন মাত্র ৪ দিনে মাটির সাথে মিশে যেতে পারে। ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুমান প্রথমেই ভাবলেন, জার্মানীর সাথে আর যুদ্ধ নয়। জার্মানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।

১৯৫০ সালের মে মাসের ৯ তারিখ জার্মানীর সাথে বন্ধুত্বের কথা প্রথম উচ্চারণ করলেন শুমান। **পরের বছর ১৯৫১ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ৬টি দেশ বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়।** দেশগুলো হচ্ছেঃ ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ। সেই চুক্তির বলেই গঠিত হয়- **European coal and steel community**

মামুনের প্রশ্নঃ- ব্রিটেন নেই কেন?

জারিফ উত্তর দিলো, একটু আগেই বলেছিলাম যে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী মিলে যাচ্ছে অতীতের সব তিক্ততা ভুলে যা মানতে পারেনি ব্রিটেন। ব্রিটেন দুঃখ পেলো এই ভেবে যে, তারা দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের মোকাবেলায় সর্বাত্মকভাবে ফ্রান্সের পাশে দাঁড়িয়েছিলো। আর আজ সেই ফ্রান্স জার্মানদের সাথে দোস্তি করে?

আবার জাত হিসেবে বৃটিশরা খুব রক্ষণশীল। নতুন কোনো কিছুকে সহজে স্বাগত জানাতে বরাবরই অনীহা বৃটিশদের। এজন্যই তারা প্রথমে ইউরোপীয়দের সাথে একাত্ম হতে চায়নি।

সে যাই হোক। ছয়টি দেশ মিলে গেলো এক ছাতার নিচে। যুদ্ধের কথা যাতে কোনোদিন চিন্তাও না করে, তাই আমেরিকার দেওয়া টাকার সদ্ব্যবহার করতে চাইলো তারা। শিল্প গড়ে তোলার জন্য দরকার কয়লা ও ইস্পাত। এক দেশ আরেক দেশকে কয়লা, ইস্পাত দিবে ও নিবে। এক দেশের শিল্প পণ্য আর ভোগ্য পণ্য সহজে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

এমন এক দিন আসবে সীমান্ত বলে কোনোকিছু থাকবে না। হাজার হাজার বছর যাবত যুদ্ধতো হলো, এবার না হয় শান্তিই হোক।

শুধু কয়লা, ইস্পাত আর কমন মার্কেট নিয়েই পড়ে থাকলো না এই ছয় দেশ। তারা বিভিন্ন কমিটি গড়ে তুললো যাতে করে ইউরোপের মানুষজন আর জনপ্রতিনিধিরা কাছাকাছি আসতে পারে। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপীয়ান 'কোর্ট অব জাস্টিস' এরকম প্রতিষ্ঠান তৈরি হলো অখন্ড ইউরোপের কথা ভেবে।

রোম চুক্তি, ১৯৫৭:

১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া **'European coal and steel community'** সংগঠনটির সফলতা আশাব্যাঞ্জক। প্রত্যেকটি দেশ ১০ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি অর্জন করলো। যুদ্ধের সব সম্ভাবনা দূর করে ভ্রাতৃত্বের জয়গান ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। ছয়টি দেশ ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ ইতালির রাজধানী রোমে বসলো তাদের মধ্যকার সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরও বেগবান করার প্রয়াসে। প্রতিষ্ঠিত হলো 'European Economic community.'

এবার নড়েচড়ে বসলো রক্ষণশীল দেশ ব্রিটেন। আরে! এরাতো দেখি আমাদেরকে রেখেই তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬১ সালে ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ের সাথে ব্রিটেনও 'European Economic community'র সদস্যপদ পেতে চাইলো। বেশ ক'বছর যাবত ঝুলে রইলো এসব দেশের সদস্যপদ।

বৃটিশদের সদস্যপদ লাভের ব্যাপারে অত্যন্ত খড়গহস্ত ছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট 'চার্লস দ্য গল'। দ্য গল ব্রিটেনকে ট্রোজান হর্স নামে আখ্যায়িত করে তীব্র ভাষায় ব্রিটেনের সদস্যপদ লাভের ব্যাপারে বিরোধিতা করেন। দ্য গল বলেন, "বৃটিশরা আমেরিকার পা চাটা গোলাম হয়ে ইউরোপীয়দের স্বাধীনভাবে চলার পথকে রুদ্ধ করবে।"

ব্রিটেনের কারণেই বাকি তিনটি দেশকেও আর নেওয়া যায়নি। অবশ্য দ্য গল ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর ব্রিটেনের ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কম্যুনিটিতে যোগদানের পথ সহজ হয়। ১৯৬৯ সালে দ্য গলের ভেটো প্রস্তাব তুলে নেওয়া

হয়। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ থেকে ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ড ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গঠিত সেই জোটে ঢুকে পড়ে।

আর নরওয়ের জনগণ নিজেরাই গণভোটের মাধ্যমে আপাতত দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।

ম্যাসট্রিখট চুক্তি, ১৯৯৩:

মনে রাখতে হবে, আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্বসূরী হলো ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত **'European coal and steel community.'** এবং ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'European Economic community'.

১৯৮১ সালে গ্রীস, ১৯৮৬ সালে স্পেন ও পর্তুগাল ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ে যোগ দেয়।

আবারও মাঠে নামলো ফ্রান্স ও জার্মানী। সময়কাল ১৯৯৩ সাল। ১৯৯০ সালে দুই জার্মানীর একত্রীকরণের পর জার্মানী তখন আরও শক্তিশালী। জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট কোহল আর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়া মিতেরা।

১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে শুরু হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের যাত্রা।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিস্তারিত কর্মকাণ্ড পরে অন্যত্র কোনো বইয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

পূর্ব ইউরোপের ঐক্যবদ্ধ পথচলা:

পশ্চিম ইউরোপের এসব শান্তিময় পথ চলা দেখে নিশ্চয়ই হিংসা হচ্ছিলো সোভিয়েত রাশিয়ার। নিজেরা মানুষের অসহায়ত্ব দেখে ফায়দা তুলতে চাচ্ছিলো কিন্তু টাকার বস্তা নিয়ে আমেরিকা মাঠে নামায় কোনো কিছুই তাদের মনমতো হচ্ছিলো না। মার্শাল প্ল্যানের আওতায় যাতে কোনো পূর্ব ইউরোপীয় দেশ না আসে, সেজন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন স্ট্যালিন। কিন্তু হুশিয়ারী দিয়েতো আর পেট ভরে না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে সংগটিত করা এবং তাদের পাশে থাকা জরুরী হয়ে পড়েছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়ার।

Cominform (Communist information bureau) গঠন:

১৯৪৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কমিনফর্ম গঠিত হয়। রাশিয়া নিজে ছিলো এর সদস্য। পাশাপাশি পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া কমিনফর্মের অংশ হয়। ফ্রান্স ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদেরকেও সন্মানসূচক পদ দেওয়া হয়।

কমিউনিস্ট দেশগুলো যাতে একসাথে চলতে পারে সেজন্য এটা ছিলো একটা কার্যকর পদক্ষেপ।

কিন্তু শুরুতেই গণ্ডগোল!

যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনচেতা শাসক জোসেফ টিটোর সাথে সাপে-নেউলে সম্পর্ক শুরু হলো স্ট্যালিনের। টিটো চেয়েছিলেন তার মনমতো সমাজতান্ত্রিক শাসন কায়েম করতে। টিটোর আবদার ছিলো কমিনফর্মের সদর দপ্তর হবে যুগোশ্লাভিয়ার বেলগ্রেডে। স্ট্যালিনের মহাশত্রুতে পরিণত হন তিনি। স্ট্যালিন একবার যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করারও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। যুগোশ্লাভিয়াকে অচিরেই কমিনফর্ম থেকে বহিষ্কার করা হয়।

কিন্তু রাশিয়ার মাতব্বরিতে কমিনফর্ম কার্যকরী হতে পারলো কই? আমেরিকান নেতৃত্বাধীন পশ্চিম ইউরোপ যেখানে মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছিলো, নাগরিকদের চলাচলের উপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ না করে জীবনের উল্লাস দেখছিলো, সেখানে পূর্ব ইউরোপে হাজারো বিধিনিষেধ। এই করা যাবে না, সেই করা যাবে না-এরকম হাজারো শর্তের বেড়াজালে বন্দী ছিলো পূর্ব ইউরোপের জনগণের জীবন।

আরও অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, এসব বিধিনিষেধ আসতো রাশিয়া থেকে। রুমানিয়ার জনগণ কি খাবে, হাঙ্গেরীর লোকজন কিভাবে সরকার চালাবে, পোল্যান্ডের শ্রমিকদের বেতন কত হবে, এসব হাজারো সমস্যার তাবিজ আসতো রাশিয়া থেকে।

মামুন বললো, "সমাজতন্ত্রের প্রতি আমার একধরনের শ্রদ্ধা ছিলো, এখন তো বুঝতে পারলাম সমাজতন্ত্র নিকৃষ্টমানের স্বৈরতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জঘন্য স্বৈরতন্ত্র যে ৪০টি বছর টিকে ছিলো সেটাই তো ছিলো বিস্ময়ের "

জারিফ উত্তর দিলো, সমাজতন্ত্র অবশ্যই নিকৃষ্টমানের স্বৈরতন্ত্র। স্বৈরতন্ত্র মাঝে মাঝে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে নজর দেয়। জনগনের কল্যানের জন্য কাজ করে কিন্তু সমাজতন্ত্র সব সময় কান পেতে রাখে তার বিরুদ্ধে কে কি বললো, এসব কাজে সময় নষ্ট করতে।

কমিনফর্মকে স্ট্যালিন ট্রুমান ডকট্রিনের বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। নন-কম্যুনিস্ট দেশগুলোর সাথে কোনোরকম সম্পর্কে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলো রাশিয়া।

Comecon (Council of mutual economic assistance) গঠনঃ-

শুধু শুধু জোট করলেই হবে না, পয়সাপাতিরও দরকার আছে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর।

১৯৪৯ সালের ২৫ জানুয়ারি মাসে কমিকন গঠিত হয় পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা দেওয়ার জন্য। কমিকনে যুগোশ্লাভিয়া বাদে পূর্ব ইউরোপের সব দেশই ছিলো। বলকান অঞ্চলের দেশ আলবেনিয়াকে এর সদস্যপদ দেওয়া হয়।

প্রত্যেকটা দেশকে সোভিয়েত স্টাইলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতা গ্রহন করতে বলা হলো। সমস্ত কল-কারখানাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলো। কৃষিজমির ব্যক্তিগত অধিকার বাদ দিয়ে সমবায়ের ভিত্তিতে যৌথ খামার গড়ে তোলা হলো রাষ্ট্রের জন্য।

পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য করা চলবে না। সব ব্যবসা হবে রাশিয়ার সাথে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতির একটা থিওরী কিন্তু কাজে লাগলো রাশিয়ার জন্য। বড় অর্থনীতির দেশ হওয়ার রাশিয়ার লাভ হলো, কিন্তু পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি দিন দিন পিছিয়ে পড়তে লাগলো।

WARSHAW-গঠন:

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুটি জোট করার পরে এখন সামরিকভাবে পূর্ব ইউরোপের একতাবদ্ধ হওয়া জরুরী। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি আমেরিকার সাথে মিলে ন্যাটো গঠন করে ফেলেছে। আমেরিকার কাঁধে বন্দুক রেখে আরামসে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সংগঠন ন্যাটোর বিকল্প কিছু একটা করা অত্যন্ত জরুরী।

এই নিয়ে যখন চিন্তাভাবনা চলছে তখনই সোভিয়েত শিবিরে ভূমিকম্প শুরু হলো এক চাঞ্চল্যকর সংবাদে।

কি সেই সংবাদ? পশ্চিম জার্মানী নাকি যোগ দিয়েছে ন্যাটোতে। হায়রে! ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইতালিকে না হয় মানা গেলো; তারাতো আমেরিকার টাকা খেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হয়েছে।

টাকা তো পশ্চিম জার্মানী আরও বেশি খেয়েছে, তাই বলে যে জার্মানীকে নিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা, সেই জার্মানীর পশ্চিম অংশ ন্যাটোতে যোগদান করবে? এটাকে কী আর মানা যায়?

১৯৫৫ সালের মে মাসের ৯ তারিখ জার্মানীর পশ্চিম অংশ যখন ন্যাটোতে যোগ দিলো ঠিক তার ৫ দিন পরেই পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ্তে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এক বৈঠকে মিলিত হলো।

সোভিয়েত রাশিয়া ও তার ৭টি মিত্র দেশ নিয়ে ওয়ারশ সামরিক জোটের যাত্রা শুরু হলো। দেশগুলো পূর্ব ইউরোপের। দেশগুলো হচ্ছে: পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী,

রোমানিয়া, আলবেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী এবং সোভিয়েত রাশিয়া।

কিন্তু ন্যাটো জোটের মতো এই সামরিক জোট কখনোই কার্যকরী ছিলো না। রাশিয়াই ছিলো সবকিছুর হর্তাকর্তা।

অন্যান্য সদস্য দেশগুলো মনমতো কিছুই করতে পারতো না। ১৯৬৮ সালে আলবেনিয়া এই জোট থেকে চলে যায়। সমাজতন্ত্রই যেখানে ধীরে ধীরে পতনের দিকে ধাবিত হয়, সেখানে এই জোটের অর্জন নিয়ে বলার মতো কিছুই নাই।

১৯৯১ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে ওয়ারশ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

স্ট্যালিনের মৃত্যু, পরবর্তী হাঙ্গেরিয়ান সমস্যাঃ

সোভিয়েত একনায়ক স্ট্যালিন ১৯৫৩ সালে মারা যান। ১৯৫১ সালে ডাক্তাররা স্ট্যালিনকে বলেছিলেন, সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কাজের পরিমাণ কমিয়ে দিতে। কিন্তু স্ট্যালিন সেসব শোনেন নি।

স্ট্রোক করে মারা যান স্ট্যালিন। নতুন শাসক নির্বাচিত হন নিকিতা ক্রুশেভ। ক্রুশেভ স্ট্যালিনের প্রতি খড়গহস্ত হয়ে উঠেন। স্ট্যালিনের নাম নিশানা মুছে যেতে শুরু করে সোভিয়েত রাশিয়ার বুক থেকে।

যদিও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে স্ট্যালিন একজন নরদানব হিসেবে চিহ্নিত থাকবে চিরকাল।

স্ট্যালিনের মৃত্যু পরবর্তী সময়কালে ইউরোপের দিকে নজর দিলে প্রথমেই বলতে হবে হাঙ্গেরীর সমস্যা। সেটি নিয়েই আলোচনা করবো।

১৯৫৬ সাল, হাঙ্গেরীয়ান সমস্যার চূড়ান্ত রূপঃ

জারিফ আলোচনা শুরু করলো পূর্ব ইউরোপের এক ছোট্ট দেশ হাঙ্গেরির ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে। বললো, জাতি হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়া যে কি জঘন্য প্রকৃতির ছিলো, তা ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীয়ান সমস্যার দিকে আলোকপাত করলে বোঝা যাবে। আমার প্রিয়তম লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ বইতে এ ব্যাপারে ভালো আলোচনা আছে। সে বই থেকে আমি অল্প কিছু অংশ হুবহু তুলে দিচ্ছি। আশা করি পরপারে থেকে সুনীল বাবু আমাকে অভিশাপ দিবেন না কারণ উনার বই থেকে আমি চুরি করছি না, সরাসরি তুলে দিচ্ছি এবং সেটা পাঠককুলের সামনে স্বীকার করে নিচ্ছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাঙ্গেরি এক দারুন দোটানার মধ্যে পড়েছিলো। যুদ্ধ যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন হাঙ্গেরি কোন পক্ষ নেবে তা ঠিক করতে পারেনি। হাঙ্গেরির সৈন্য এবং অস্ত্র ছিল যৎসামান্য, অস্ত্রশস্ত্র অধিকাংশই জার্মানি থেকে আসে।

হিটলারের জার্মানির মত প্রবল প্রতিবেশীকে চটাবার সাধ্য হাঙ্গেরির নেই। তা ছাড়া এখানেও নাৎসী চিন্তাধারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে একটা শ্রেণীর মধ্যে, তারা রাশিয়ার বলশেভিকদের পছন্দ করে না। স্বদেশের ইহুদীদের প্রতিও বিদ্বেষী, সুতরাং এই শ্রেণী জার্মানদের সমর্থক। আবার বামপন্থী ও মধ্যপন্থীরা হিটলারের নীতি ঘৃণা করে, উল্লেখযোগ্য ইহুদী জনসাধারণও হিটলার বিরোধী। আরও একটি শ্রেণীর সমর্থন পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি।

কিন্তু হাঙ্গেরীর শাসকশ্রেণী ও সেনাপতিদের ধারণা হয়েছিলো যে, এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না এবং জার্মানিরই জয় হবে। সেজন্য তারা জার্মানিকে মৌখিক সমর্থন জানিয়ে ভেতরে ভেতরে পশ্চিমা দেশগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চললো। যুদ্ধ শুরু হবার পর হাঙ্গেরী গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করেছিলো কিছুদিন। কিন্তু এই সুবিধাবাদ অচিরেই বুঝে গিয়েছিলো হিটলার। বার বার সে হাঙ্গেরিকে যুদ্ধে টানতে লাগল। যুগোশ্লাভিয়া আক্রমন করার পর নাৎসী হাঙ্গেরীকে সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ জানালো। এদিকে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে হাঙ্গেরি চির বন্ধুত্ব চুক্তি করে বসে আছে। একদিকে চুক্তি পালন, অন্যদিকে হিটলারের চোখ রাঙানি এর মধ্যে মনঃস্থির করতে না পেরে হাঙ্গেরির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টেলোকি আত্মহত্যা করেন।

হিটলার যখন সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে তখন হাঙ্গেরি ভেবেছিলো প্রবল জার্মান বাহিনীর কাছে স্ট্যালিনের লাল ফৌজ দু'দশ দিনেই বশ্যতা স্বীকার করবে। হাঙ্গেরী অল্প কিছু সৈন্য পাঠিয়ে হিটলারকে খুশী করতে গেলো, কিন্তু যুদ্ধ চলতে লাগলো দীর্ঘকাল। জার্মানি এবার হাঙ্গেরিকে বাধ্য করাল তার সমস্ত যুদ্ধ উপকরণ এবং সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের সোভিয়েত ফ্রন্টে লড়াই করতে। অর্থাৎ হাঙ্গেরি এখন পুরোপুরি হিটলার এবং মুসোলিনীর তল্পিবাহক।

জার্মান-হাঙ্গেরিয়ান বাহিনীর সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ চলতে লাগলো কয়েক বছর। অবশেষে জার্মানদের পরাজয়ের পালা আসলো। জার্মান-হাঙ্গেরিয়ান যৌথ ফৌজ পিছু হটতে লাগলো। তারপর সোভিয়েত ট্যাঙ্ক বাহিনীর সামনে হাঙ্গেরিয়ানদের ফেলে রেখে এক সময় জার্মানরা পালালো।

হাঙ্গেরীর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক পায়ে নয়, দু'পায়ে খাড়া হয়ে রইলো সোভিয়েত রাশিয়া। চাপিয়ে দেওয়া হলো অনেক অপমানজনক শর্ত। দেশের কিছুটা অংশ কেটে দিয়ে দেওয়া হলো চেকোশ্লোভাকিয়াকে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য তাদের অর্থদণ্ড দেওয়া হলো তিরিশ কোটি ডলার। ইচ্ছেমতো সেনাবাহিনী গড়ার আর অধিকার রইলো না। এই সব শর্ত ঠিক মতো পালিত হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব মিত্রশক্তির চুক্তি অনুযায়ী বর্তালো দখলদার বিরাট সোভিয়েত বাহিনীর উপর।

বছরের পর বছর সোভিয়েত বাহিনী যে দেশের বুকে চেপে বসে আছে, সেখানে যে কমিউনিস্ট পার্টিই শাসন ক্ষমতা পেয়ে যাবে, তা খুবই স্বাভাবিক। হাঙ্গেরিয়ানরা সোভিয়েত বাহিনীকে বিদেশী সৈন্য বলেই মনে করতো এবং কেউই নিজের দেশে বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতি সম্মানজনক মনে করে না। ঘাড়ের উপর এরকম একটা শক্তি থাকার কারণে হাঙ্গেরীর সরকার ছিলো তার ক্রীড়নক। মস্কোর নির্দেশে হাঙ্গেরির নেতাদের উত্থান পতন ঘটত।

কিন্তু ১৯৫৬ সালে কোনো এক যাদুমন্ত্রের মতো পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। ১৯৫৩ সালে জানোয়ার স্ট্যালিনের মৃত্যু হয়েছে। নিকিতা ক্রুশ্চেভ কিছুটা উদারপন্থী। এদিকে এগারো বছর সোভিয়েত সেনাবাহিনী হাঙ্গেরির ভূমিতে দখলদারীত্ব বজায় রাখে।

স্ট্যালিনের মৃত্যু পরবর্তী খোলামেলা হাওয়া বইতে শুরু করলো হাঙ্গেরীতে:

হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেস্টে একদল ছাত্র তাদের দাবিদাওয়া জানাবার জন্য সমবেত হলো একটা মিছিলে। পথ চলতি মানুষ স্বত:স্ফুর্তভাবে যোগ দিলো সেই মিছিলে। মানুষ সরকারের বদল চায়নি, চেয়েছিলো শাসনব্যবস্থার কিছু সংস্কার। কিন্তু সোভিয়েতের তাবেদার শাসক জেরো জনতার দাবিদাওয়া শোনার বদলে ধমক দিলেন; তারপর হুকুম দিলেন গুলি চালাতে।

ক্রমশ শান্তিপূর্ণ মিছিল হিংস্র হয় উঠলো, সেনাবাহিনী এনেও তাদের দমন করা গেলো না। বরং হাঙ্গেরিয়ান সৈন্যরা যোগ দিলো বিদ্রোহীদের সঙ্গে। বিভিন্ন দলের সংমিশ্রণে এক সম্মিলিত সরকার গঠিত হলো। সেই দলের প্রধান হলেন ইমরে নেগি।

ইমরে নেগি তার সংস্কার ব্যবস্থাগুলি পুনঃপ্রবর্তন করতে চাইলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানালেন পুরো সেনাবাহিনী হাঙ্গেরী থেকে সরিয়ে নিতে।

বলে কি হাঙ্গেরী? ছোট্ট দেশের এত বড় সাহস? সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নিতে বলে?

মস্কো থেকে কয়েকজন কমিউনিস্ট বাহাদুর এলেন ইমরে নেগিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে। ওয়ারশ্ চুক্তি থেকে হাঙ্গেরী নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলো। জাতিসংঘের কাছে হাঙ্গেরীকে একটি নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে গণ্য করার দাবি জানানো হলো। হাঙ্গেরীর এত বড় বাড়াবাড়ি আর বরদাস্ত করতে রাজি নয় সোভিয়েত রাশিয়া।

২৩ অক্টোবর, ১৯৫৬:

হাজার হাজার ছাত্র বুডাপেস্টে স্ট্যালিনের প্রতিকৃতি ভেঙে ফেলে। রাশিয়ার দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে স্বত:স্ফুর্ত বিপ্লব শুরু হয়। মনে হচ্ছিলো বিপ্লব করেই

ফেলবে হাঙ্গেরীর ছাত্র-জনতা। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া ট্যাঙ্ক মোতায়েন করলো। ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর শব্দে কেঁপে উঠলো বুডাপেস্ট। সোভিয়েত ফৌজের নিকট ছাত্র জনতার বিপ্লব কিছুই না।

গুজব উঠেছিলো ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি হাঙ্গেরীর সাহায্যে এগিয়ে আসবে সোভিয়েত বাহিনীকে মোকাবেলা করতে। সে রকম কিছুই ঘটলো না । বিদ্রোহ ক্রমশ প্রশমিত হয়ে গেলো, বহু শিক্ষিত ব্যক্তি দেশ ছেড়ে পালালেন।

ইমরে নেগি আশ্রয় নিয়েছিলেন বুডাপেস্ট এর যুগোশ্লাভ দূতাবাসে। সেখান থেকে চলে গেলেন রুমানিয়ায়। কিছুদিনের মধ্যেই তাকে গ্রেফতার করে একটা গুপ্ত বিচার অনুষ্ঠিত হলো এবং অবিলম্বে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হলো। ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে তাকে চিহ্নিত করে তাঁর নাম মুছে ফেলা হলো হাঙ্গেরীর ইতিহাস থেকে।

নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! এই বস্তাপঁচা সাম্যবাদের বুলি আওড়ানো সমাজতন্ত্রের পতনের পর ইমরে নেগির নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে কোটি কোটি মানুষ। তিনি যে সব সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাই পরবর্তীতে গ্রহণ করা হয়েছে।

কী নির্মম, হৃদয়হীন এই সব ভুল।

পর্ব-৬৪

১৯৬১-১৯৬৮, বার্লিন দেওয়াল নির্মান :

অবিভক্ত বার্লিন শহরের প্রতীক ব্রান্ডেনবুর্গ গেট। বিশ্ব ইতিহাসের পানিপথ যেন এটি। বার্লিন দেওয়াল হয়ে উঠেছিলো স্নায়ুযুদ্ধের প্রতীক। অথচ এই ঘটনার কোনো দরকারই ছিলো না।

কীভাবে এই দেওয়াল নির্মান হয়, চলুন আমরা এখন সেইসব কাহিনী শুনি।

আমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছি যে, দুই জার্মানীকে ঘিরে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো ১৯৪৯ সালের ২৩ মে পশ্চিম জার্মানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কনরাড আদেনুয়ার পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন।

কয়েক মাস পর সোভিয়েত রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে পূর্ব জার্মানীও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ৭ অক্টোবর পশ্চিম জার্মানীর পাশাপাশি পূর্ব জার্মানীর জন্ম হয়।

এক জাতি দুভাগ হয়ে গেলো দুটি আলাদা রাষ্ট্রে। হিটলারের পাপে জার্মানি তখন অপরাধবোধে নতশির। তাদের কিছুই বলার নেই।

পশ্চিম জার্মানী হল পশ্চিমী শক্তির তল্পিবাহক, পূর্ব জার্মানি গ্রহণ করলো সমাজতন্ত্র। একদিকে উদগ্র পুঁজিবাদ, আর অন্যদিকে সমতার কথামালা।

পূর্ব জার্মানির সমাজতন্ত্রের কথাবার্তা ও আদর্শ খুব মজার; কিন্তু বাস্তবে ফাঁকা বুলি। পশ্চিম জার্মানী আমেরিকার কাছ থেকে অঢেল সাহায্য পেয়েছে। দেশ গড়ার জন্য পেয়েছে চার বিলিয়ন ডলার। আর পূর্ব জার্মানি তাদের প্রভু সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়েছে উল্টো দশ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকার সামনে রাশিয়া কেন টিকেনি, তার হাজারটা কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ।

তবে কয়েক বছর পর অবশ্য সোভিয়েত রাশিয়া এ ঋণ মওকুফ করে দিয়েছিলো। কিন্তু আমেরিকান সমর্থন নিয়ে অর্থনৈতিক পরাশক্তি হয়ে উঠলো পশ্চিম জার্মানী। সে তুলনায় পূর্ব জার্মানী পিছিয়ে পড়লো। এ যেন দুই ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই হঠাৎ ধনী হয়ে গেলো, অন্য ভাই গরীব রয়ে গেলো।

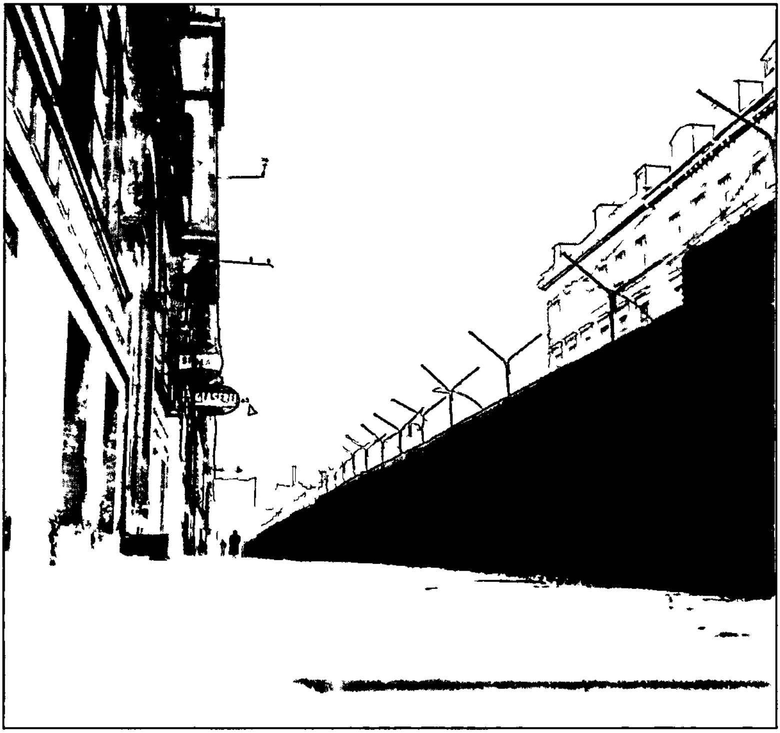
ফলাফলটা কি দাঁড়ালো?

পূর্ব জার্মানী থেকে দলে দলে লোক পশ্চিম জার্মানীতে চলে যেতে শুরু করলো। ১৯৪৫ সালের পর থেকেই এ অবস্থা তৈরি হলো। ১৯৪৮ সালে একবার বার্লিন নগরীতে ব্লকেড দিয়ে স্ট্যালিন নগরীর পশ্চিম অংশের মানুষকে না খাইয়ে মারার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমি আগেই বলেছি আমেরিকার অব্যাহত সহায়তায় কিছুই হয়নি বার্লিনের পশ্চিম প্রান্তের।

১৯৬১ সালে পূর্ব জার্মানীর কমিউনিস্ট নেতা ওয়াল্টার উলব্রিখট সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভের সাথে পরামর্শ করে বার্লিন নগরীকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৪৫ সালের পর থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পূর্ব জার্মানী থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক পশ্চিম জার্মানী চলে গেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে পূর্ব জার্মানী দেউলিয়া হয়ে পড়বে। তাছাড়া পৃথিবীর কাছে মান সন্মান বলেও তো একটা কথা আছে! সমাজতন্তের দুর্বলতাগুলো ঢেকে রাখতে হবে।

১৯৬১ সালের আগস্ট মাসের ১৩ তারিখ ১৬৫ কিলোমিটার লম্বা দেওয়াল নির্মানের কাজ শুরু করে পূর্ব জার্মানী। বার্লিন হয়ে পড়লো বিভক্ত নগরী। বিভক্ত বার্লিন বিভক্ত পৃথিবীরই প্রতীক।



চিত্র ২৮ : একই শহর তবে তার মাঝখানে গড়ে উঠেছিল এই বিভেদের কাঁটা তার।

এই দেওয়াল টপকাতে গিয়ে কত লোকের যে প্রাণ গিয়েছে তার হিসাব কে রাখে? ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর এই দেওয়াল ভেঙ্গে যায়। মুক্তির স্বাদ পায় দুই জার্মানীর লোক।

Cuban missile crisis-পুরো পৃথিবী কম্পমান হয়ে উঠেছিলো যে ঘটনায়:

জারিফ বললো, কিউবা হচ্ছে সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট মানুষদের জন্য একটা রোমান্টিক জায়গা। সমাজতন্ত্রের ভাবধারার বিশ্বাসী লোকদের কাছে কিউবার একনায়ক ফিডেল ক্যাস্ট্রো হচ্ছেন স্বর্গ থেকে উঠে আসা এক দেবদূত। আমি অবশ্য এসব দেবদূতে বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষের মাঝেই দোষ-গুণ বিদ্যমান। এটা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে আইনস্টাইন পর্যন্ত সবার মাঝেই ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। তাই আমি অনেক ঘাঁটাঘাটি



চিত্র ২৮ : একই শহর তবে তার মাঝখানে গড়ে উঠেছিল এই বিভেদের কাঁটা তার।

এই দেওয়াল টপকাতে গিয়ে কত লোকের যে প্রাণ গিয়েছে তার হিসাব কে রাখে? ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর এই দেওয়াল ভেঙ্গে যায়। মুক্তির স্বাদ পায় দুই জার্মানীর লোক।

Cuban missile crisis-পুরো পৃথিবী কম্পমান হয়ে উঠেছিলো যে ঘটনায়:

জারিফ বললো, কিউবা হচ্ছে সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট মানুষদের জন্য একটা রোমান্টিক জায়গা। সমাজতন্ত্রের ভাবধারার বিশ্বাসী লোকদের কাছে কিউবার একনায়ক ফিডেল ক্যাস্ট্রো হচ্ছেন স্বর্গ থেকে উঠে আসা এক দেবদূত। আমি অবশ্য এসব দেবদূতে বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষের মাঝেই দোষ-গুণ বিদ্যমান। এটা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে আইনস্টাইন পর্যন্ত সবার মাঝেই ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। তাই আমি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি

করে তোমার জন্য সবচেয়ে নিঁখুত ইতিহাস বলার চেষ্টা করবো। কারণ, আমি মনে করি নিরপেক্ষতা না থাকলে ইতিহাস মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

ক্যাস্ট্রো পূর্ববর্তী কিউবাঃ

আমি এই বইয়ের প্রথমেই বলেছিলাম, কিউবা ছিলো মূলত স্পেনীশ উপনিবেশ। ৪০০ বছর যাবত স্পেনের শাসনে থেকে কিউবা হয়ে পড়েছিলো স্পেনীশ সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আমেরিকার সাথে কোনো বিবাদ দূরের কথা, আমেরিকার ছত্রচ্ছায়ায় কিউবা এগোচ্ছিলো।

আমেরিকাই কিউবাকে স্বাধীন হতে সাহায্য করে। ১৮৯৮ সালে কিউবাকে স্বাধীন করতে গিয়েই স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে স্পেনের পরাজয় হলে কিউবা আমেরিকার তত্ত্বাবধানে আসে। ১৯০২ সালে নতুন সংবিধান প্রণীত হলে কিউবা থেকে আমেরিকানরা সরে আসে। স্বাধীন দেশ হিসেবে কিউবা তার যাত্রা শুরু করে।

কিউবার রোমান্টিক বিপ্লবী নায়ক ফিডেল ক্যাস্ট্রোর কাহিনী শুনতে হলে আগে জানতে হবে তাঁর পূর্বসূরী কিউবান শাসক বাতিস্তার কথা।

বাতিস্তা কিউবান জনগণের কাছে মিঃ জেকিল ও মিঃ হাইডের মতো। বাতিস্তা কিউবাকে দুই মেয়াদে শাসন করেছিলেন। ১৯২১ সালে বাতিস্তা সেনাবাহিনীতে যোগ দেন স্টেনোগ্রাফার হিসেবে। পরবর্তীতে সার্জেন্ট পদে উন্নীত হন। ১৯৩৩ সালে সার্জেন্টদের নিয়ে বিদ্রোহ করেন। পতন হয় স্বৈরশাসক মোরালেসের। বাতিস্তা হয়ে পড়েন কিউবার একচ্ছত্র অধিপতি।

তারপর ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বাতিস্তা কিউবা শাসন করেন। সেনাবাহিনী, আমলা ও শ্রমিক শ্রেণির ব্যাপক সমর্থন নিয়ে জনকল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন বাতিস্তা।

১৯৪০ সালে নির্বাচনও জিতে নেন। ১৯৪৪ সালে ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ শেষ হলে তিনি আমেরিকার ফ্লোরিডাতে চলে যান। সেখানে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

আট বছর ক্ষমতার বাইরে থাকেন বাতিস্তা। কিউবাতে আবারও শুরু হয় অপশাসন। জনগণের ডাকে বাতিস্তা আবারও কিউবাতে ফিরে আসেন। ১৯৫২ সালের মার্চে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সকারাসকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেন বাতিস্তা।

কিন্তু এবার এক অন্য বাতিস্তা! প্রথমবার যে বাতিস্তা ছিলেন জনদরদী শাসক, এবার তিনি হয়ে উঠলেন এক দোর্দণ্ড প্রতাপশালী স্বৈরাচারী। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে আইনসভা, সংবাদপত্র সবাই তাকে ভয় পেতো। বাতিস্তা কিউবাতে এক

ভয়াল শাসন শুরু করেন। পতনোন্মুখ অর্থনীতি থাকলেও তিনি রাজকোষ থেকে অর্থ সরাতে লাগলেন। জনগণের জীবনযাত্রার মান অবনতির দিকে যেতে লাগলো।

কিন্তু তার সমস্ত অপকর্মকে সমর্থন দিয়ে যেতে লাগলো মার্কিন প্রশাসন। কিউবার চিনি শিল্পসহ অধিকাংশ ভারী শিল্পই আমেরিকানদের দখলে। দুর্নীতিগ্রস্ত বাতিস্তা ছিলো মার্কিন স্বার্থের অনুকূলে, তাই বাতিস্তাকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিলো না।

বিপ্লবের ঢেউ লাগলো কিউবাতেঃ

পৃথিবীর ইতিহাস জুড়ে তাকালে দেখা যায় যে, যত বড় অন্যায়ই করুক না কেন, তার শেষ পরিণতি হয় ভায়াবহ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেই গিয়েছেন, "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে...।"

বাতিস্তার অপশাসনের বিরুদ্ধে নীরবে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন ফিডেল ক্যাস্ট্রো। যদিও বাতিস্তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেপথ্য নায়ক ছিলেন দুইজন ব্যক্তি। একজন হচ্ছেন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আরেক রোমান্টিক বিপ্লবী আর্জেন্টাইন বংশোদ্ভুত চে গুয়েভারা এবং ফিডেল ক্যাস্ট্রোর ছোট ভাই রাউল ক্যাস্ট্রো।

চে গুয়েভারাকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র হবে। আপাতত এটা জেনে রাখা দরকার, ১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারি ফিডেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা কিউবার রাজধানী হাভানা দখল করে। স্বৈরশাসক বাতিস্তা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান।



চিত্র ২৯ : আমেরিকার নাকের ডগায় মার্কিন বিরোধিতার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন কিউবার অবিসংবাদিত বিপ্লবী নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রো।

ফিডেল ক্যাস্ট্রোর সাথে আমেরিকার প্রাথমিক সম্পর্ক:

অথচ কিউবার বিপ্লবী ক্যাস্ট্রোর সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে আমেরিকার কোনো শত্রুতাই ছিলো না। বাতিস্তাকে হটিয়ে বরং ক্যাস্ট্রো আমেরিকা সফর করেন। মার্কিন মিডিয়া তাকে মাথায় তুলে নাচতে থাকে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাথে আলাপকালে ক্যাস্ট্রো কিউবান শিল্পে আমেরিকান বিনিয়োগকে প্রশংসা করেছিলেন। ক্যাস্ট্রো অঙ্গীকার করেছিলেন যে আমেরিকান কোম্পানীর জন্য তিনি ট্যাক্স মওকুফ করবেন।

ফিডেল ক্যাস্ট্রো লক্ষ্য করলেন, কিউবার যেসকল নাগরিক আমেরিকার মিয়ামিতে আবাসস্থল বানিয়েছেন, তারা ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপতৎপরতা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমেরিকা নীরব। আমেরিকা যেহেতু মুক্তবুদ্ধিকে লালন করে, কিউবার কিছু নাগরিক কি নিয়ে দিনযাপন করে, সেটা নিয়ে আমেরিকার বিশেষ কোনো মাথাব্যাথা ছিলো না।

কিন্তু আমেরিকা সফর থেকে ফিরে এসে ফিডেল ক্যাস্ট্রো কিউবার শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে ফেললেন। আগেই বলেছি, কিউবার প্রায় সমস্ত ভারী শিল্প



চিত্র ২৯ : আমেরিকার নাকের ডগায় মার্কিন বিরোধিতার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন কিউবার অবিসংবাদিত বিপ্লবী নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রো।

ফিডেল ক্যাস্ট্রোর সাথে আমেরিকার প্রাথমিক সম্পর্ক:

অথচ কিউবার বিপ্লবী ক্যাস্ট্রোর সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে আমেরিকার কোনো শত্রুতাই ছিলো না। বাতিস্তাকে হটিয়ে বরং ক্যাস্ট্রো আমেরিকা সফর করেন। মার্কিন মিডিয়া তাকে মাথায় তুলে নাচতে থাকে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাথে আলাপকালে ক্যাস্ট্রো কিউবান শিল্পে আমেরিকান বিনিয়োগকে প্রশংসা করেছিলেন। ক্যাস্ট্রো অঙ্গীকার করেছিলেন যে আমেরিকান কোম্পানীর জন্য তিনি ট্যাক্স মওকুফ করবেন।

ফিডেল ক্যাস্ট্রো লক্ষ্য করলেন, কিউবার যেসকল নাগরিক আমেরিকার মিয়ামিতে আবাসস্থল বানিয়েছেন, তারা ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপতৎপরতা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমেরিকা নীরব। আমেরিকা যেহেতু মুক্তবুদ্ধিকে লালন করে, কিউবার কিছু নাগরিক কি নিয়ে দিনযাপন করে, সেটা নিয়ে আমেরিকার বিশেষ কোনো মাথাব্যাথা ছিলো না।

কিন্তু আমেরিকা সফর থেকে ফিরে এসে ফিডেল ক্যাস্ট্রো কিউবার শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে ফেললেন। আগেই বলেছি, কিউবার প্রায় সমস্ত ভারী শিল্প

আমেরিকার পুঁজিপতিদের আয়ত্তে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার প্রশাসন ফিডেল ক্যাস্ট্রোর এহেন তৎপরতায় ক্ষেপে যান। বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠার যোগাড় আমেরিকার।

পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে আমেরিকা কিউবা থেকে চিনি আমদানির নির্ধারিত কোটা তুলে দেন। কিউবা পড়লো মহাবিপদে। আমেরিকা যদি চিনি না কিনে তাহলে কিউবার অর্থনীতি মাঠে মারা যাবে।

ঝামেলার সবে শুরু। সমাজতন্ত্রের দুই উপদেষ্টা ভাই রাউল আর চে গুয়েভারাতো ফিডেল ক্যাস্ট্রোর মাথার উপরে ছিলেনই। এই সংকটময় মুহূর্তে ফিডেল ক্যাস্ট্রো সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। কিউবাকে যে কোনো প্রকার সাহায্য করার জন্য রাশিয়া এক পায়ে নয়, দুই পায়ে খাড়া!

একে তো কিউবার অবস্থান আমেরিকার নাকের ডগায়, তার উপর আমেরিকার সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে শুরু করছে ফিডেল ক্যাস্ট্রো নামের এক ছোকড়া তরুণ, রাশিয়ার আনন্দ তখন দেখে কে?

১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি উচ্চপদস্থ সোভিয়েত নেতা আনাসতাস মিকোইয়ান কিউবা সফরে আসেন। কিউবার জন্য দিলদরিয়া সোভিয়েত এই নেতা কিউবার সাথে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতামূলক চুক্তি সই করেন। প্রচুর পরিমাণ টাকা লোন দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। কিউবার কাছ থেকে সব চিনি রাশিয়া কিনে নিবে, এ কথা ঘোষণা করে তিনি আরও বলেন যে বিনিময়ে কিউবাকে সস্তায় তেল সরবরাহ করবে রাশিয়া।

আবারও বিপদ! রাশিয়া যে তেল পাঠাবে, সে তেল পরিশোধন করা দরকার। কিউবাতে অবস্থিত সমস্ত তেল পরিশোধন ক্ষেত্রগুলোও আমেরিকান পুঁজিপতিদের। ফিডেল ক্যাস্ট্রো এবার সেগুলোকেও জাতীয়করণ করলেন। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার কিউবার সাথে সমস্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে। ১৯৫২ সাল থেকে টানা আট বছর আইসেনহাওয়ার ক্ষমতায়। ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে নতুন প্রেসিডেন্ট শপথ নিবেন। মার্কিন-কিউবা সম্পর্কের শেষ পেরেকটি মারলেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট। ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়ার অল্প কিছুদিন আগে তিনি কিউবার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করলেন।

সুদর্শন প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমলে কিউবাকে নিয়ে যতো ঝামেলাঃ

জন এফ কেনেডি মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর কেনেডি টের পান, কিউবার বিপ্লবী ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে উৎখাত করতে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ'কে দিয়ে

একটি গোপন পরিকল্পনা করেছিলেন আইসেনহাওয়ার। সিআইএর পরিচালক ছিলেন অ্যালান ডুলেস যিনি বিভিন্ন দেশে দেশে মার্কিন বিরোধী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সিদ্ধহস্ত। প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে জানানো হলো যে কিউবাতে আমেরিকার সহায়তায় একদল বিপ্লবী ক্যাস্ট্রোকে উৎখাত করবে। দরকার হলে আমেরিকা যাতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে রাজি হলেন না। তবে তিনি সবুজ সংকেত দিলেন। আমেরিকার ফ্লোরিডাতে বসবাসরত একদল প্রবাসী কিউবানদের নিয়ে একটা দল তৈরি করা হলো যাদেরকে সরাসরি প্রশিক্ষন দিলো সিআইএ।

'বে অব পিগস' হামলা, ক্যাস্ট্রোকে উৎখাত করার ব্যর্থ পরিকল্পনা :

১৫ এপ্রিল, ১৯৬১

আমেরিকান গোয়েন্দা ব্যর্থতার ইতিহাসে একটি কালো দিন শুরু হলো। ১৪০০ বিদ্রোহী কিউবান গুয়াতেমালা দিয়ে কিউবার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। কিন্তু কেনেডি প্রশাসন কোনো ধরণের বিমান হামলা দিয়ে তাদেরকে সহায়তা করতে রাজি হলো না। কিউবাতেও কোনো ধরনের রাজনৈতিক কিংবা মিলিশিয়া সংগঠন নেই, যারা এসব বিদ্রোহীদের পক্ষে কথা বলবে।

ফলাফল?

গোয়েন্দা মারফত ফিডেল ক্যাস্ট্রো খবর পেয়ে গেলেন, তাকে হত্যা করতে আসছে একদল বিদ্রোহী। ১৪০০ লোককে শায়েস্তা করতে ক্যাস্ট্রো কয়েক হাজার সুপ্রশিক্ষিত বাহিনী পাঠান।

১৭ এপ্রিলের মধ্যে সবগুলো ধরা পড়ে। অবশ্য গুলি বিনিময় কালে ১১৪ জন মারা পড়েন।

সবগুলোকে দড়ি বেঁধে টেলিভিশনের সামনে হাজির করা হলো। সারা দুনিয়া বুঝে গেলো ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে হত্যা করতে আমেরিকা এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত।

এ ঘটনায় বাড় বেড়ে গেলো ফিডেল ক্যাস্ট্রোর। তিনি সরাসরি সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে গলা ফাটাতে লাগলেন। আর ঘরের কোণে এই ছোট্ট কিউবার একনায়কের এই আস্ফালন সহ্য করতে হলো আমেরিকাকে।

আরেকটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়, কিউবার হাতে আটক ১১০০ বন্দীকে অনেক টাকার বিনিময়ে মুক্তি দেন ফিডেল ক্যাস্ট্রো।

কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস :

১৯৬২ সালে কিউবাকে নিয়ে এক অভূতপূর্ব সংকট দেখা দেয়। কেউ কেউ আশংকা করেছিলেন, এই বুঝি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে এখনি! ঘটনাবলী

এমনই টান টান উত্তেজনার দিকে মোড় নিয়েছিলো যে সবাই ধারণা করেছিলো, হয়তো এবার মুখোমুখি লড়াই লেগে যাবে আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে।

চলুন এবার শুনি সেইসব কাহিনী:

১৯৬২ সালে সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভের সময়টা ভালো যাচ্ছিলো না। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এক ধরনের অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্ব জার্মানি থেকে দলে দলে লোকজন পশ্চিম জার্মানিতে চলে যাচ্ছিলো কারণ সেখানকার জীবনযাত্রার মান উন্নত। বাধ্য হয়ে ১৯৬১ সালে পূর্ব জার্মানির দখলীকৃত বার্লিন নগরীর অংশে দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়।

চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে দূরত্ব তৈরি হচ্ছিলো দিনকে দিন। কুখ্যাত মাও সেতুং ক্রুশ্চেভকে দুষছিলেন যে রাশিয়া নাকি সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শ থেকে সরে আসছে। চীনের সাথে বৈরী সম্পর্ক শুরু হয়েছিলো রাশিয়ার ক্রুশ্চেভের আমল থেকে।

১৯৬১ সালে আমেরিকা তুরস্ক ও ইতালিতে ১০০-এর বেশি মিসাইল মোতায়েন করে। বিশেষ করে তুরস্ক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবেশী হওয়ার কারনে সেটা ছিলো তার জন্য আরও বেশি উদ্বেগজনক।

এই ফাঁকে যখন কিউবার নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে উৎখাত করার ব্যার্থ চেষ্টা উন্মোচিত হলো সবার সামনে তখন রাশিয়া কিউবাকে নিয়ে একটি ফন্দি আঁটলো।

কি সেই ফন্দি?

১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে ক্রুশ্চেভের সামনে একটা আইডিয়া এলো। সেটা হলো কিউবাতে কিছু ক্ষেপনাস্ত্র মোতায়েন করা দরকার; যাতে পরবর্তীতে আমেরিকা কিউবার একনায়ক ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে ঘিরে কোনো অপতৎপরতার কথা চিন্তা না করে।

দলের পলিটব্যুরোতে এ নিয়ে আলোচনা করার সময় ক্রুশ্চেভের কোনো কোনো সহকর্মী এ কাজে না জড়াতে ক্রুশ্চেভকে পরামর্শ দেন। তারা বলেন, ''কি দরকার আমেরিকার নাকের ডগায় কিছু ক্ষেপনাস্ত্র মোতায়েন করে তাকে ক্ষেপিয়ে তোলা? তারচেয়ে বরং অন্য ফ্রন্টে আমেরিকাকে ঘায়েল করার যুক্তি দিলেন তারা।''

কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত নিয়ে কিউবাকে কেন্দ্র করে দাবার ঘুটি সাজাতে লাগলেন ক্রুশ্চেভ। ১৯৬২ সালের জুলাই মাস থেকে সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টারা কিউবাতে ঘন ঘন আসতে লাগলেন।

সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ মিসাইল কিউবাতে আনা অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে। অক্টোবরের মাঝামাঝিতে মিসাইল মোতায়েনের কাজ শেষ হয়ে এলো। বাইরের পৃথিবীর কেউ এ ব্যাপারটি সম্পর্কে জানতে পারলো না। ১২০০ মাইল পাল্লার

ক্ষেপনাস্ত্র মোতায়েনের কাজ সমাপ্ত হলো। সোভিয়েত কূটনীতিকদের বলে দেওয়া হলো, কেউ যদি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ক্ষেপনাস্ত্র মোতায়েনের কথা জিজ্ঞেস করে তাহলে তারা যেন কিছুই জানে না-এরকম উত্তর দেয়।

১৪-২৭ অক্টোবর, ১৯৬২ টান টান উত্তেজনার ১৩ দিনঃ

১৪ অক্টোবর তারিখে আমেরিকার গোয়েন্দা বিমান ইউ-২ তে প্রথমবারের মতো ধরা পড়ে কিউবাতে গোপনীয় কিছু একটা হচ্ছে। নির্মানকাজের স্থান ও ছবি সনাক্ত করে আমেরিকার গোয়েন্দা বিমান। পাঠানো হয় প্রেসিডেন্ট কেনেডির দপ্তরে।

১৮ অক্টোবর সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনাতলি গ্রোমিওকোর সাথে পূর্বনির্ধারিত বৈঠক ছিলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির। প্রেসিডেন্ট সোভিয়েত নেতাকে কিউবাতে মিসাইল মোতায়েনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুব ভদ্র ভাষায় সুন্দরভাবে মিথ্যা কথা বললেন। তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।"

কিন্তু মার্কিন গোয়েন্দারা নড়ে চড়ে বসলো। এবার তারা প্রযুক্তি ব্যবহার করে ও লোক মারফত খবর নিয়ে আসল খবর জানালো। প্রেসিডেন্ট কেনেডি ২২ অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশন মারফত ভাষণ দিলেন। বলেন, "১৯৩০ সালের দুর্বিষহ পরিস্থিতি আমাদের জানা আছে। হিটলার ও মুসোলিনীর মতো শয়তানদের শায়েস্তা না করে তোষণ করা হয়েছিলো। যার কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দানা বাঁধলো। এবার আর সেই পরিস্থিতি হতে দেব না আমরা। বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবত আমরা যা খবর পেলাম তা হলো কিউবাতে ইতোমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া ক্ষেপনাস্ত্র মোতায়েন করেছে। আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই কিউবা অভিমুখী ক্ষেপনাস্ত্রবাহী যেকোন জাহাজকে আমরা ধ্বংস করে দিব। এ ব্যাপারে আমাদের গোয়েন্দারা তৎপর।"

যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো পেন্টাগন। প্রেসিডেন্ট বলে দিয়েছেন, যেকোন জাহাজকে ডুবিয়ে মারা হবে। যেকোন জাহাজ মানে রাশিয়ান জাহাজ, এতো সহজ হিসাব! আর রাশিয়ান জাহাজকে ডুবিয়ে মারলে রাশিয়া কি বসে থাকবে? আমেরিকান নৌবাহিনী পুরো কিউবান উপকূল চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। পুরো আমেরিকা জুড়ে আতংক ছড়িয়ে পড়লো। দুই দেশই পারমানবিক শক্তির অধিকারী। না জানি কি হয়ে যায়!

২৩ অক্টোবর-

কেনেডির বেতার ভাষণের পরের দিনের ঘটনা। কিউবা অভিমুখী রাশিয়ান জাহাজ তার গতিপথ থামিয়ে দিলো। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ক্রুশ্চেভ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি থামিয়ে দিলেন।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, এতসব পরিস্থিতির মধ্যে দুই দেশ আলোচনার দরজা বন্ধ করেনি। এ কারণেই হয়তো পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতির দিকে ধাবিত হয় নি।

২৭ অক্টোবরঃ

আবারও উত্তেজনা! কিউবাকে চক্কর দিয়ে ঘুরতে থাকা আমেরিকান গোয়েন্দা বিমান ইউ-২ কে গুলি করে ভূপাতিত করলো সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া। মার্কিন গোয়েন্দারা প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে প্ররোচিত করতে লাগলো যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করার এখনই সময়। কিউবার একনায়ক ফিডেল ক্যাস্ট্রো সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বেসর্বা নিকিতা ক্রুশ্চেভকে তারবার্তা পাঠালেন।

বলেন, “গুরু! আর দেরি কেন? পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করে আমেরিকার ২/৪ টা শহরকে ধ্বংস করে দিন জলদি। তারপর আপোষ মীমাংসা করা যাবে।”

কিন্তু ক্রুশ্চেভ পাগলামো করা থেকে বিরত থাকেন। তিনিও আমেরিকার সাথে ঝামেলা এড়াতে চাচ্ছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডিও শান্তির পক্ষে। এটা নিশ্চিত যে কোনো যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট হলে সরাসরি সংঘর্ষ লেগেই যেতো আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে।

আমেরিকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আনাতোলি ডবরিনিনের সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করে মার্কিন প্রশাসন। সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত দাবী জানান, তুরস্কে রাশিয়ার দিকে তাক করে রাখা হয়েছে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র। এটা রাশিয়ার জন্য অবমাননাকর। আমেরিকা যদি তুরস্কে মোতায়েন ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে ফেলে তাহলে কিউবা থেকে রাশিয়াও সবকিছু সরিয়ে ফেলবে।

২৮ অক্টোবর-

সোভিয়েত রাশিয়ার নেতা ক্রুশ্চেভ আমেরিকার দাবী মোতাবেক কিউবা থেকে সরে আসতে রাজি হন। আমেরিকাও তুরস্ক থেকে তার ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে ফেলার কথা ঘোষণা করে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো পুরো পৃথিবী।

এই যুদ্ধে কে জিতলো?

যেহেতু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়নি, সেহেতু শান্তির জয় হলো তাই বলা যেতে পারে আখেরে জয় হয়েছে মানুষেরই। তৃতীয় বিশ্বের রোমান্টিক নায়ক(!) কিউবার নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রেরা খায়েশ আর পূরণ করতে পারেন নি।

পর্ব-৬৫

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ স্প্রিং-১৯৬৮ সাল-

স্নায়ুযুদ্ধের সময় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে চেকোশ্লোভাকিয়াকে কেন্দ্র করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে সেটা 'প্রাগ স্প্রিং' নামে পরিচিত। সেখানেও হাঙ্গেরী স্টাইলে মানুষের দাবি দাওয়াকে পদদলিত করে মেহনতী মানুষের দল(!) সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউস্টিরা।

কি সেই ঘটনা?

চেকোশ্লোভাকিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অনেকেরই মনে আছে হিটলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেই চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করেন। রাশিয়ানরা জার্মানদেরকে হটিয়ে তাদের সাধের সমাজতন্ত্র কায়েম করে।

চেকোশ্লোভাকিয়া ছিলো পূর্ব ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র। চেক ও শ্লোভাক জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল ছিলো এ দেশটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা যখন মার্শাল প্ল্যানের আওতায় পশ্চিম ইউরোপের সবগুলো দেশকে সাহায্য দিতে শুরু করলো; তখন চেকোশ্লোভাকিয়া খুব করে চেয়েছিলো যাতে তারা আমেরিকার কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য পায়।

কিন্তু বড় ভাই রাশিয়া তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে। বাধ্য হয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া মার্শাল প্ল্যানের আওতা থেকে বাদ পড়ে। বছরের পর বছর রাশিয়ার পাল্লায় পড়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। রাশিয়ার হাতের পুতুল ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট নেতা নবতোনি অত্যন্ত অজনপ্রিয় হয়ে পড়তে লাগলেন।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে লাগলো। জনগণ বাকস্বাধীনতা চায়, চায় অর্থনৈতিক সংস্কার। নবতোনির পরিবর্তে শাসক হয়ে আসলেন আলেকজান্ডার ডুবেক।

আলেকজান্ডার ডুবেক রাশিয়ার কব্জা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন চেকোশ্লোভাকিয়া গড়তে চান। ডুবেক কমিউনিজমকে নাম দিলেন 'Socialism with a huamn face.'

ডুবেক বিভিন্ন সংস্কার কাজে হাত দিলেন:

১ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চান

২. অর্থনৈতিক পদ্ধতি সরকারের হাত থেকে শিথিল করতে চান

৩. বিদেশী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। উল্লেখ্য, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো কোনো পুঁজিবাদী দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতো না। বড় ভাই রাশিয়ার নির্দেশ ছিলো এটা।

৪. জনগণ যাতে অবাধে অন্য দেশে যাতায়াত করতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে চেয়েছিলেন।

৫. কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো গোপন পুলিশ। সেসব হিংস্র গোয়েন্দা পুলিশের ক্ষমতা হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "হাঙ্গেরীতে ১৯৫৬ সালে এরকম সংস্কার কাজে হাত দেওয়ার পরে সোভিয়েত রাশিয়া নিষ্ঠুরভাবে সে কর্মসূচিকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছিলো। সেটা জানার পরও ডুবেক এমন উদ্যোগ নিতে পারলো? ভয় করলো না হিংস্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে?"

জারিফ উত্তর দিলো, সেটা জানা ছিলো ডুবেকের। সেজন্য তিনি আগেভাগেই সোভিয়েত রাশিয়াকে জানিয়ে দিলেন, "আমরা সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক। হাঙ্গেরীর মতো আমরা ওয়ারশ্ প্যাক্ট থেকে সরেও দাঁড়াচ্ছি না। রাশিয়া আমাদের বড় ভাই। রাশিয়া আমাদের যেন ভুল না বুঝে।"

কিন্তু সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী রাশিয়ার বয়েই গেছে এরকম ভালো ভালো কথা শুনতে!!!

অথচ চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণ মুক্তির আনন্দে পাগল হয়ে যাচ্ছিলো। বসন্ত যেরকম প্রকৃতিতে নতুন কিছু নিয়ে আসে ঠিক তেমনি চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণও এরকম পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে বসন্তকালের সাথে তুলনা করে এটাকে নাম দিলো 'প্রাগ স্প্রিং'।

আর যায় কোথায়?

১৯৬৮ সালে ক্ষমতায় বসলেন সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ। নিজেকে কট্টর কমিউনিস্ট হিসেবে জাহির করার দরকার আছে তার।

২০ আগস্ট, ১৯৬৮

প্রায় ৬ লক্ষ সৈন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার রাস্তায়। ওয়ারশ্ জোটের সবকটি দেশের সৈন্যরা এসেছে রাশিয়ার নেতৃত্বে। উদ্দেশ্যে একটাই, চকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তিকামী জনগণের এসব উল্লাসকে থামিয়ে দেয়া।

ভয় পেয়ে গেলেন সংস্কারবাদীদের নেতা ডুবেক। রাশিয়ার ঘটনায় তিনি হতভম্ব। তিনিতো খারাপ কিছু করছেন না! তাহলে রাশিয়া কেন তার দেশে লাখ লাখ সৈন্য পাঠালো?

হাঙ্গেরীর ঘটনা মনে পড়লো ডুবেকের। তিনি উপলব্দি করলেন, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তার নিজের প্রাণটাও যাবে। তাই তিনি জনগণকে শান্ত থাকতে আহ্বান জানালেন। নিজেও ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করলেন। এভাবেই ১৯৬৮ সালের 'প্রাগ স্পিং' এর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো সোভিয়েত রাশিয়া।

হাঙ্গেরীর ঘটনার মতোই পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্ব থেকে কোনো ধরনের সাহায্য পায়নি চেকোশ্লোভাকিয়া।

১৯৬৮ সাল আমেরিকার জন্য এক মহা আতংকের বছর। কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র আমেরিকায়। আততায়ীর হাতে নিহত হলেন জন এফ কেনেডির ভাই রবার্ট কেনেডি ও মার্টিন লুথার কিং। ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে প্রতিদিন খারাপ খবর আসছে আমেরিকার কাছে।

এসব কারণে আমেরিকা কোনোভাবেই চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনায় মনোযোগ দিতে পারেনি।

নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! মাত্র ২১টি বছর পর ১৯৮৯ সালে আবার চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণ জেগে উঠে। ডুবেকের সমস্ত সংস্কার কাজ তখন পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনীতিতে আবারও ফিরে আসেন ডুবেক। জনগনের মৌলিক অধিকারকে দমন করার রাজনীতি কি চিরস্থায়ী হয়? কখনোই না।

পর্ব-৬৬

লিওনিদ ব্রেজনেভের আমল ১৯৬৬-১৯৮১:

নিকিতা ক্রুশ্চেভকে ১৯৬৬ সালে ক্ষমতা থেকে সরানোর পর সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো সমন্বিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অ্যালেক্সি কোসিগিন, নিকোলাই, পদগর্নি ও লিওনিদ ব্রেজনেভের সমন্বিত নেতৃত্ব রাশিয়ার ক্ষমতায় আরোহন করে। এর মধ্যে অ্যালেক্সি কোসিগিন প্রধানমন্ত্রী হলে ক্ষমতার মূল কেন্দ্রে যান লিওনিদ ব্রেজনেভ। গত পর্বে বলেছিলাম, লিওনিদ ব্রেজনেভ ক্ষমতায় আসার পর চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা ঘটে। ব্রেজনেভকে কেন্দ্র করে একটা মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে যেটা **'ব্রেজনেভ ডকট্রিন'** নামে পরিচিত। এই ডকট্রিনের মূল কথা হলো, 'কোনো কমিউনিস্ট দেশে সমাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে সেখানে যথাযথভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে; যাতে করে সেই আন্দোলন সফলতা লাভ করতে না পারে।

দাঁতাত; আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা:

সত্তরের দশকে পুঁজিবাদী বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব পৃথিবীতে একটা অনিবার্য বাস্তবতা হিসেবে বিরাজ করে। আমেরিকা ভাবলো, সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করেই আমেরিকাকে বাঁচতে হবে। এজন্য আমেরিকা সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে।

১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখ আমেরিকা পূর্ব জার্মানীকে স্বীকৃতি দেয়। সোভিয়েত রাশিয়াও যেকোন উপায়ে আমেরিকার সাথে উত্তেজনা কমিয়ে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চালায়।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ এই শুভ প্রক্রিয়া সূচনা করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে সেটা 'দাঁতাত' নামে পরিচিত।

দাঁতাতের মূল নায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করতে হবে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে। মার্কিন সমাজ তখন পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়েছিলো। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিভীষিকা, কমিউনিজম জুজু, কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন-এসব নিয়ে মার্কিনীরা এক ধরণের বিরক্তির মধ্যে ছিলো। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন মার্কিন সমাজের পাল্‌স বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেন।

১৯৭২ সালের মে মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন মস্কো সফর করেন। সেখানে তিনি সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভের সাথে দেখা করে দুদেশের সম্পর্ক বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয় অস্ত্র কমানোর ব্যাপারে। নিক্সন ও ব্রেজনেভ উভয়েই অনুধাবন করেন যে, দুই দেশের মধ্যে কীভাবে শান্তি আসবে যেখানে বিভিন্ন মহাদেশব্যাপী এক দেশ আরেক দেশের দিকে তাক করে মোতায়েন করা হয় বিভিন্ন প্রাণঘাতি ক্ষেপণাস্ত্র ।

শুরু হলো অস্ত্র হ্রাসের আলোচনা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যেটা 'Strategic Arms Llimitation Talks' নামে পরিচিত। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে অ্যান্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল, ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল ও সাবমেরিন নিয়ন্ত্রিত মিসাইলগুলো কমিয়ে ফেলা হবে।

যদিও বিভিন্ন কারণে নিরস্ত্রীকরণের এই আলোচনা ফলপ্রসু হয় নি, কিন্তু সত্তর দশকে এই আলোচনা বিশ্বকে প্রচুর স্বস্তি দিয়েছে। নিক্সন নিজেই ওয়াটারগেট কেলেংকারিতে ফেঁসে যান, তাই 'দাঁতাতের' উদ্যোগে ভাটা পড়ে। পরবর্তীতে সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তানে আগ্রাসন শুরু করলে এবং ১৯৮২ সালে

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি নিলে 'দাঁতাতে'র অপমৃত্যু ঘটে।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনা, রাশিয়ান ভিয়েতনামঃ

ভিয়েতনামে সেনা প্রেরণ করে আট বছর যাবত যুদ্ধ করে যে নাকানি চুবানি আমেরিকা খেয়েছিলো, সেই একই মাত্রার যন্ত্রণা রাশিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলো আফগানিস্তানে। সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন।

আফগানিস্তানের মতো কট্টর মোল্লাতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করার শখ হলো রাশিয়ার। ১৯৭৯ সালে কমিউনিস্ট নেতা বাবরাক কারমাল ক্ষমতায় বসেন। বাবরাক কারমাল সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য সোভিয়েতরা সেনা প্রেরণ করে।

টানা দশটি বছর আফগানিস্তানে অবস্থান করে নাজুক পরিস্থিতিতে পড়ে সোভিয়েত রাশিয়া। আফগানিস্তানের কট্টর মুজাহিদদের সমর্থনে এগিয়ে আসে আমেরিকা। টাকা পয়সা ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এসব মুজাহিদদের সমর্থন দেয় আমেরিকা। চীন সরাসরি বিরোধিতা করে এই আগ্রাসনকে।

১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে শেষ সোভিয়েত সেনা আফগানিস্তান ত্যাগ করে। সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তান দখলের প্রভাব অপরিসীম। আফগানিস্তানে সেনা পাঠিয়ে মানসিকভাবে রাশিয়া এতই বিধ্বস্ত হয়েছিলো যে, তার ক্ষত কোনোদিনই আর সারে নি। ১৫ হাজার সেনা নিহত হয় আফগানিস্তানে।

তালেবান, ওসামা বিন লাদেন কিংবা ইসলামপন্থী জঙ্গী আক্রমণ এরকম সব কিছুর জন্য দায়ী আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণের।

রোনাল্ড রিগ্যান ও গর্বাচেভঃ-

১৯৮০ সালের নির্বাচনে হলিউডের একজন শিল্পী, রোনাল্ড রিগ্যান যখন ক্ষমতায় আসলেন তখন তাকে নিয়ে বড় কোনো আশাবাদ ছিলো না কারও। হলিউডের একজন সামান্য অভিনেতা সোভিয়েত রাশিয়াকে কিভাবে মোকাবেলা করবে সেটা নিয়ে একটা কৌতুহল ছিলো বটে।

কিন্তু আট বছর দেশ শাসন করার পর দেখা গেলো, অনেক জ্ঞানী-গুণী ও যোগ্য প্রেসিডেন্টের তুলনায় রিগ্যান অনেক বেশি সফল।

সত্তরের দশকে পুঁজিবাদী বিশ্বের সাথে সমানতালে তাল মিলিয়ে চলছিলো রাশিয়া। আশির দশক শুরু হওয়ার পূর্বেও পুঁজিবাদী বিশ্ব আর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব

ছিলো পৃথিবীর বুকে অনিবার্য বাস্তবতা। কিন্তু নব্বই দশক হওয়ার পূর্বে সমাজতন্ত্র এভাবে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, তা সমাজতন্ত্রের শত্রুরাও কল্পনা করেনি।

কেন? ১৯৯১ সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিলো? এই অনুচ্ছেদের ছোট জায়গায় ছোট আকারে বিস্তারিত বলা সম্ভব না হলেও আমরা চেষ্টা করবো।

মূল কারণটা ছিলো অর্থনৈতিক:

১৯৮২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছিলো একেবারে শূন্যের কোঠায়। শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, প্রত্যেকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থমকে দাঁড়িয়েছিলো।

এই ভয়াবহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আফগানিস্তানে অনর্থক যুদ্ধ চলছিলো। সামরিক খাতে ব্যয় বাড়াতেই হবে। কিন্তু টাকা কই?

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো শিল্প পণ্য উৎপাদনে মনোযোগ দিয়েছে এতকাল। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, অস্ত্র নির্মান শিল্প, জ্বালানি উত্তোলন ও সরবরাহ শিল্প ইত্যাদি। কিন্তু ভোগ্য পণ্য নিয়ে কোনো পরিকল্পনা করা হয়নি এতকাল।

আশির দশকে দেখা গেলো, জীবনধারনের জন্য ভোগ্য পণ্য পাওয়া যাচ্ছে না সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে। চারিদিকে শুধু নেই নেই রব।

মাংস আছে তো রুটি নেই, রুটি আছে তো মাখন নেই, দুধ নেই। শাক-সবজি ফল-মূল নেই, কফি নেই। এই নেই এর তালিকা এক একটা দেশে আরও সুদীর্ঘ। রুমানিয়ায় টয়লেট পেপার পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বিদুৎ নেই, প্রচন্ড ঠান্ডায় লোকে ঘর গরম করতে পারেনি। মাংস, রুটি, আলু, মাখন, দুধ এইগুলো ইউরোপীয়দের প্রধান খাদ্য। এতে টান পড়লে সমাজতন্ত্রের আদর্শ চিবিয়ে খাবে আর কতদিন!

কার্ল মার্কস কী থিওরি দিয়েছিলেন, সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ কেবল গরিব হয়েই থাকবে? এই ব্যবস্থায় না মানুষ আরও বেশি সুখী থাকার কথা!

অথচ পশ্চিম ইউরোপের যেসব দেশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহন করে নি, তারা তো দিব্যি ভালো আছে।

পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ব্লকের লোকজন বুঝে গেলো, পুরো সিস্টেমটাই গলদপূর্ণ। আর কোনো আপোষ করা যায় না। এর একটা বিহিত করতেই হবে।

গর্বাচেভের ভূমিকা চিরস্মরণীয়ঃ

শুধু জনগণ বিপ্লব চাইলেই হবে? কখনো নয়। হাঙ্গেরীর জনগণ ১৯৫৬ সালে চায়নি? চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণ ১৯৬৮ তে চায়নি? তারা কি পেরেছে? কঠোর হাতে দমন করা হয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আওয়াজকে।

আজ একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, গর্বাচেভের মতো বুদ্ধিমান ও দুরদর্শী মানুষ সোভিয়েত রাশিয়ার নেতা হয়েছিলেন বলেই, অথর্ব সমাজতন্ত্রকে ভেঙে নতুন পৃথিবী নির্মান করা সম্ভব হয়েছিলো।

লিওনিদ ব্রেজনেভ মারা যান ১৯৮২ সালের ১০ নভেম্বর। নতুন নেতা নির্বাচিত হন ইউরি আন্দ্রোপভ। দুর্বল ও বয়স্ক লোক তিনি। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনিও মারা যান।

মারা যাওয়ার আগে তিনি গর্বাচেভকে প্রমোশন দিয়ে পার্টির উচ্চস্তরে নিয়ে আসেন। যে কারণে পরবর্তীতে গর্বাচেভের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার।

১৯৮৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন মিখাইল গর্বাচেভ। শুরু হলো অচল সোভিয়েত অর্থনীতিকে সচল করার পরিকল্পনা। নাগরিকদের উপর কঠোর নজরদারি বাদ দিলেন।

চালু হলো 'পেরেস্ত্রোইকা' :

'পেরেস্ত্রাইকা' একটি রুশ শব্দ যার বাংলা হলো পুনর্গঠন। ১৯৮৬ সালে গর্বাচেভ অর্থনীতিকে নতুনভাবে সাজানোর জন্য এ প্রকল্প হাতে নিলেন। ১৯৮৮ সালে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য আইন পাশ হলো। পশ্চিমী বিনিয়োগকারীরা রাশিয়াতে বিনিয়োগ করার জন্য আগ্রহী হলেন। জোরেশোরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বইতে শুরু হলো রাশিয়াতে।

এবার 'গ্লাসনস্ত' :

অর্থনৈতিক সংস্কারে হাত দেওয়ার পর শুরু হলো নতুন গেমপ্ল্যান। **রুশ ভাষায় 'গ্লাসনস্ত' শব্দের অর্থ হলো খোলামেলা আলোচনা।** অর্থনৈতিক সংস্কার কখনোই কার্যকর হবে না; যদি না মানুষের মন থেকে ভয় দূর না হয়। ১৯৮৮ সালের জুন মাস থেকে গ্লাসনস্ত শুরু হয়। ১৯২২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের পর থেকে এই প্রথম রুশ মিডিয়ায় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের সমালোচনা শুরু হলো।

কথা বলার স্বাধীনতা যে কি মুধর জিনিস বুঝতে শুরু করলো রাশিয়ান জনগণ। ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে ইউক্রেনের চেরনোবিলে পারমানবিক তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনার ফলাফল হয়েছিলো অত্যন্ত মারাত্মক। জনগন বুঝতে পারলো, কী এক অদৃশ্য দানব দেশের সমস্ত সমস্যাকে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলো। স্ট্যালিন আমলের সব হত্যাযজ্ঞ বেরিয়ে আসতে শুরু করলো। মিখাইল গর্বাচেভের সাথে ঘন ঘন মিটিং চলতে লাগলো পশ্চিমী দেশগুলোর।

পর্ব-৬৭

১৯৮৯ সাল, তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো কমিউনিজমের রোমান্টিকতা:

শুরুটা হয়েছিলো পোল্যান্ড থেকে। পোল্যান্ড একটা বিদ্রোহী জাতি। বীরের জাতি। গোঁড়া ক্যাথলিক খৃস্টান পোলিশদের সাথে নাস্তিক কমিউনিস্ট রাশিয়ানদের সহাবস্থান ছিলো অসম্ভব ব্যাপার।

১৯৮০ সালেই পোল্যান্ডের একজন শ্রমিক; যার নাম লেস ওয়ালেসা- 'সলিডারিটি' আন্দোলন নামে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলেন।

এই সামান্য ট্রেড ইউনিয়ন পোল্যান্ডের সমস্ত মানুষের কাছে বার্তা দিতে লাগলো ধীরে ধীরে।

১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে 'সলিডারিটি' আন্দোলনের সমর্থকরা রাস্তায় নেমে পড়লো। আর নয় সমাজতন্ত্র! বহুত লীলাখেলা দেখেছে পোল্যান্ডের জনগণ। এবার নির্বাচন হতে হবে। কমিউনিস্টদের স্বেচ্ছাচারিতা আর চলবে না।

১৯৮৯ সালের জুন মাসের ৪ তারিখ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কমিউনিস্টদের চরম ভরাডুবি হয়। জনগণ ঘৃণা ভরে কমিউনিস্টদের প্রত্যাখ্যান করে। সমাজতন্ত্র পতনের শুভ সূচনা শুরু হলো।

পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশ হাঙ্গেরীর সাথে সীমান্ত ছিলো পশ্চিমা সমর্থকপুষ্ট পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাস থেকেই হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়ার সাথে তার সীমান্ত খুলে দেয়।

এ খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। পূর্ব জার্মানি থেকে দলে দলে লোক হাঙ্গেরী সীমান্ত দিয়ে পশ্চিম জার্মানীতে ঢুকতে লাগলো। পূর্ব জার্মানির জনগণ আর বাধা মানছিলো না।

বিপ্লবের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া ও রোমানিয়াতেও। বাঁধভাঙ্গা উল্লাসে ফেটে পড়লো জনগণ। বিপ্লব শুরু হলো সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোতেও। বাল্টিক রাষ্ট্র এস্তোনিয়া, লাটভিয়া এবং ককেশাস অঞ্চল আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানেও বিপ্লবের ছোঁয়া লাগলো।

জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট কোহল পূর্ব জার্মানিকে অফার দেন দুই জার্মানিকে এক করার। নিরুপায় পূর্ব জার্মানি ভাবলো এর চেয়ে উত্তম প্রস্তাব আর হতে পারে না। কারণ, পূর্ব জার্মানির লোকজন এবার আর কোনো বাধা মানবে না। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরা এবার জার্মানীর একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনিও জার্মানীর সাথে তাল মিলিয়ে বলতে লাগলেন, ঐক্যবদ্ধ জার্মানী ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফ্রান্স এক হলে পুরো ইউরোপ হবে শান্তিময়। সময় এখন এসেছে বার্লিন দেওয়াল ভাঙ্গার।

পর্ব-৬৮

যে কারণে সমাজতন্ত্রের পতন হওয়া অনিবার্য ছিলোঃ

জারিফ মামুনকে প্রশ্ন করলো, "তুমি কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নাম শুনেছ?

মামুন বললো, "শুনবো না মানে? উনার বেশ কয়েকটা বই আমি পড়েছি। বেশ কিছু প্রবন্ধ গ্রন্থের লেখক উনি। তবে কিশোরদের জন্যও বেশ কয়েকটা বই তিনি লিখেছিলেন। সম্ভবত হোমারের ইলিয়াড অনুবাদ করেছিলেন তিনি। সেটা পড়েছি আমি। উনার আরেকটা সুখপাঠ্য বই ছিলো 'আমার পিতার মুখ'। সেটাও পড়েছি আমি।

জারিফ বললো, উনাকে আমি এজন্য স্বরণ করলাম যে, উনার লেখায় তুমি পাবে জগতের সমস্ত সমস্যার মূলে হচ্ছে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা। সূর্য কেন দেরীতে উঠলো? এটা যদি তুমি জিজ্ঞেস করো, তাহলেও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর উত্তর হবে 'পুঁজিবাদের' দোষ।

যদি জিজ্ঞেস করো, সব সমস্যা সমাধানের উপায় কি? তাহলে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর উত্তর হবে 'সমাজতন্ত্রই' হবে মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ। কিন্তু এ সমাজতন্ত্র কবে কোথায় মানুষের মুক্তি ঘটিয়েছে, সে ব্যাপারে কোনো উত্তর কিন্তু সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখায় নাই।

জারিফ বললো, তুমি তো জানই আমার প্রাণপ্রিয় লেখক হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি নিজেও কিন্তু সমাজতন্ত্রের সমার্থক ছিলেন। কিন্তু সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মত মহাঅন্ধ ছিলেন না। চিন্তা করো, এত বড় একজন বিদগ্ধ পন্ডিত সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী! অথচ সমাজ বিশ্লেষণের বেলায় নূন্যতম নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পারলেন না? বড়ই আজব লাগে! সমাজতন্ত্রের কোনো দোষ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর কোনো লেখায় আমি পাইনি, উনি কি একটুও বুঝতে পারলেন না সমাজতন্ত্র কিভাবে কোটি কোটি মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দিয়েছিলো দশকের পর দশক?

সেই ইতিহাস আজ তোমাকে বলবো আমি যাতে সমাজতন্ত্রের পতন সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণ ধারণা তোমার জন্ম নেয়।

আরেকটা কথা, আমার প্রিয়তম লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটা বই লিখেছিলেন 'ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ'। সেই বই পড়লে বোঝা যায়, সমাজতন্ত্র শুনতে ভালো মনে হলেও বাস্তবিক অর্থে সে সব থিওরীগুলো কত শোচনীয় রকমের অসার! আমি সুনীলের বই থেকে হুবহু তুলে দিব এ অধ্যায়ের অনেক জায়গায়।

স্ট্যালিনের প্রতি কমিউনিস্ট ভক্তদের বেহুদা আবেগঃ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে দুর্দান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে রুখেছিলেন জোসেফ স্ট্যালিন। সর্বকালের ইতিহাসে হিটলার এক নর দানব বলে গণ্য। খর্বকায়, নিরামিষভোজী সেই মানুষটি প্রায় অর্ধেক পৃথিবীতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলো, অকারণে লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ শিশুকে প্রাণ দিতে হয়েছে তার পাগলামিতে। নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করেও জিততে পারেনি, হিটলারের বাহিনী ছিলো অনেক শক্তিশালী সে তুলনায়। সেই সীমিত অস্ত্রবল নিয়েও অসীম মনের জোরে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত দেশের মানুষ হিটলারকে হটিয়ে দিয়েছে। শুধু বামপন্থীরাই নয়, সমস্ত মুক্ত বিশ্বের মানুষই সেজন্য ধন্য ধন্য করেছে স্ট্যালিনের নামে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীরপুরুষ স্ট্যালিন। তাঁকে নিয়ে বীরপুজা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। কত কবিতা, কত গান লেখা হয়েছে তাঁর নামে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার *'ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ'* বইটাতে জানাচ্ছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের একজন কবি স্ট্যালিনের নাম উচ্চারণ করলেই কত শুভ কাজ হয় তার তালিকা দিতে দিতে লিখেছিলেন, ''স্ট্যালিন, তোমার নামে গর্ভিনীর সুখ-প্রসব হয়।''

অথচ স্ট্যালিন ছিলো জানোয়ার। মানুষ নামের কলংক। কারণ তার মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকেই তার অন্য একটা পরিচয় প্রকাশিত হতে থাকে। এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিকেরাই নথিপত্র ঘেঁটে তথ্য উদ্ধার করছেন যে, স্ট্যালিনের নির্দেশে তার নিজের দেশে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন বা পাঁচ কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। শুধুমাত্র সামান্য সন্দেহ বা আক্রোশের বশে। জার্মানির মত সোভিয়েত ইউনিয়নেও অনেক কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ছিলো। সেখানে যাদের ভরা হতো, তাদের আর সন্ধান পাওয়া যেতো না। কয়েকজন বাঙালি বিপ্লবীও রাশিয়ার সেইসব কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে হারিয়ে গেছেন চিরতরে। হিটলারের আক্রমণে সোভিয়েত ইউনিয়নে তিন কোটি মানুষ নিহত হয়েছেন, আর স্ট্যালিন মেরেছেন পাঁচ কোটি স্বদেশবাসীকে। এ তথ্য প্রকাশ

করেছে রাশিয়ানরাই। রাশিয়াতে আজ সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত লোকটির নাম হচ্ছে স্ট্যালিন। কেউ ভুলেও আজ আর তার নাম উচ্চারণ করে না।

ব্যক্তি স্বাধীনতার বারোট বেজেছিলোঃ

যুগে যুগে পৃথিবীতে নির্যাতনকারী শাসকেরা এসেছে। তাদের কথার বিরুদ্ধে টু শব্দটি করলেই প্রাণহানির ভয় ছিলো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সব দেশে সমাজতন্ত্র টিকে ছিলো, তারা মানুষের মৌলিক অধিকার, বাক স্বাধীনতাকে এমন নির্লজ্জভাবে চেপে ধরেছিলো যে, পূর্ববর্তী শাসকদের নির্যাতনটাও নস্যি মনে হয়েছিলো। মা-বাবা বাচ্চাদের সামনে প্রাণখুলে ঠিকঠাকমতো কথা বলতে পারতোনা।

কেন?

কারণ সন্তানকে টাকার বিনিময়ে গোয়েন্দা এজেন্ট বানিয়ে রেখেছে কিনা তা কে জানে?

কে কোন বই পড়বে, সেটাও ঠিক করে দিবে পার্টি।এরকম কি হয় কখনো? ব্যক্তি স্বাধীনতা মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সম্পদ। মানুষ প্রাণ খুলে যদি মনের কথা বলতে না পারে-তাহলে তার বাকি সব অর্জন ব্যর্থ।

সমাজতান্ত্রিক দেশ রুমানিয়ার একনায়ক চসেস্কু করেছিলেন এক মজার কাণ্ড। গ্রামের চাষীদের বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে সেখানে তৈরি করেছিলেন লম্বা লম্বা ফ্ল্যাটবাড়ি। যেসব চাষীরা নিজস্ব বাড়িতে ফুলগাছ-টমেটো গাছ, গরু, ছাগল ও মুরগি নিয়ে থাকতো, তারা সেই সব নিয়ে উঠে যাবে দশতলার ফ্ল্যাটে। যত ছোটই হোক, তবুও একটি পরিবারের নিজস্ব বাসস্থান নির্বাচন ও ইচ্ছেমতো সাজাবার স্বাধীনতাটুকুও যদি না থাকে, তবে তা কিসের সাম্যবাদ?

মানুষ কি চায়?

মানুষকে যদি বলা যায়, তোমাকে জীবিকার জন্য হন্য হয়ে ঘুরতে হবে না। পরিবারের খাওয়া-পড়ার চিন্তা করতে হবে না, মাথা গোঁজবার ঠাঁই তুমি পাবে, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও রাষ্ট্র করে দেবে, তা হলে মানুষ এর বেশি আর কি চাইবে? সমস্ত জাগতির দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে সে সমাজ গড়ার জন্য সম্পুর্ণ শ্রম ও উদ্যম দেবে, এটাই তো স্বাভাবিক তবুও তা হয় না কেন? সেই মানুষকে যদি বলা যায়, তোমাকে খেতে-পড়তে দেওয়া হবে বটে, কিন্তু তুমি কী বই পড়বে, কী সিনেমা বা টি ভি প্রোগ্রাম দেখবে, তা আমি ঠিক করে দেব, বেশি দূর ভ্রমণের স্বাধীনতা তুমি পাবে না, বিদেশীদের সঙ্গে গাল-গপ্পো করো না, এসব অমান্য কিরলে কিন্তু তোমায় পুলিশে ধরবে। তা হলে কি সে তা মাথা পেতে মেনে নেবে? তদিন মানবে?

পর্ব-৬৯

বার্লিন দেওয়ালের পতনঃ

আজ আর আকাশে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায় না। ১৯৯০ সালের অক্টোবরের ২ তারিখ মধ্যরাতের পর থেকে আকাশে বাজি ফাটতে লাগলো। আকাশে উড়ল শত শত বর্ণাঢ্য হাউই। বিমান থেকে বোমা বর্ষণের বদলে মাটি থেকে উত্থিত হাউইগুলির ঝলমলে রঙে আকাশ রাঙিয়ে দেওয়ায় কত তফাত!

একই জায়গা, একই মনুষ্যজাতি, কখনও হিংসায় পরস্পরের দিকে অস্ত্র তাক করেছে, কখনও বন্ধুত্বে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছে।

সন্ধ্যে থেকেই এখানে সমবেত হয়েছিলো কয়েক লক্ষ মানুষ। কথা ছিলো প্রেসিডেন্ট বুশ, মিখাইল গর্বাচেভ, মার্গারেট থ্যাচার প্রমুখ রাষ্ট্রনায়ক-নায়িকারা উপস্থিত থাকবেন এই মিলন উৎসবে। কিন্তু এর মধ্যে ইরাকের সাদ্দাম হুসেন মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েতে এক লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে দেওয়ার কারণে সবাই বিচলিত ও ব্যস্ত, তারা আসতে পারেননি কেউ। অবশ্য এমন উৎসবের সময়ে এসব নেতাদের বক্তৃতার তেমন গুরুত্বও নেই।

দু'দিকের মানুষ প্রাণখুলে উৎসব করবে, হাত মিলাবে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। অনেক রাত পর্যন্ত বাজি পুড়িয়ে, বীয়ার পান করে ও সমবেত গান গেয়ে ভোরের দিকে সবাই শুতে গেল, ঘুমালো পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত।

৩ অক্টেবর, ১৯৯০

জাতীয় ছুটি ঘোষিত হয়েছে ঐক্যবদ্ধ জার্মানিতে। বার্লিন দেওয়াল আজ ভাঙ্গা হবে। দুই জার্মানীর একত্রীকরণ দিবসও বটে। আজ থেকে জার্মানী আর পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত নয়।

বার্লিন দেওয়ালকে কেন্দ্র করে সেই সব অপ্রয়োজনীয় সতর্কতা, পাহারা, অস্ত্রধারী সৈনিকদের এলাহি ব্যবস্থা কোন এক হাওয়ায় জানি উড়ে গেছে। দেয়াল ভাঙা, কাঁটা তারের বেড়া এখানে সেখানে গোটানো, শিকারী কুকুরগুলো কিনে নিয়ে গেছে বিভিন্ন দেশের ধনী কুকুর-প্রেমিকরা। কিছু কিছু অত্যুৎসাহী তরুণ-তরুণী হাতুড়ি-খন্তা এনে দেওয়াল ভাঙছে।

যারা ভেবেছিলো এই বিভেদের দেওয়াল হবে চিরস্থায়ী, তারা আজ কোথায়? মানুষের ইচ্ছাকে ধামাচাপা দিয়ে যারা এই ওয়াল নির্মান করেছিলো, তাদের কি একটু লজ্জা হচ্ছে না?

যে কারণে এই দেওয়াল ভাঙা অনিবার্য ছিলোঃ

মানুষ আদর্শ চিবিয়ে খায় না। আদর্শের জন্য অনেকে প্রাণ পর্যন্ত দেয়, সাধারণ মানুষও কিছু কিছু আত্মত্যাগ করতে রাজি থাকে। একটা সমাজ ব্যবস্থার যখন পালাবদল ঘটে তখন কিছু কিছু বিপর্যয় দেখা দিতে বাধ্য। উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, সাধারণ মানুষকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। কিন্তু কতদিন?

পাঁচ বছর? দশ বছর? পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে নিশ্চয়ই নয়। পুরো একটা প্রজন্ম শেষ হয়ে গেলো। নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা পালাবদলের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা অত মনে রাখে না। তারা দেখে যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, জাপান যদি সব দুর্যোগ সামলে নিয়ে এত সচ্ছল হতে পারে, তাহলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পারবে না কেন? সমাজতান্ত্রিক দেশে বিধি-নিষেধের কঠিন বন্ধন অথচ ওসব দেশের মানুষ খোলামেলা। এই মুক্তির টানে এবং পেটের টানেই দেয়াল ভাঙা হয়।

একটা ব্যাপার খুবই আশ্চর্যজনক। অনেক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্কসবাদে বিশ্বাসী ও সমাজতন্ত্রের সমর্থক। অনেক তাত্ত্বিক ও অধ্যাপক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নানারকম ব্যাখ্যা করেছেন এবং শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় তা প্রচার করে আসছেন। তারা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও শ্রদ্ধেয়। সমাজতন্ত্রের এসব ফাঁকফোকর নিয়ে তারা কখনো কিছু বলে নি কেন? জানতেন না? কিংবা জেনে শুনেও সত্য গোপন করেছেন? তাঁদের চোখে পড়েনি? পৃথিবীর সব শাসকদের মনে রাখা উচিত সত্যকে বেশিদিন চেপে রাখা যায় না।

****

বিংশ শতাব্দীর মধ্যপ্রাচ্যঃ আরব-ইসরাইল সমস্যার যত কাহিনী

পর্ব-৭০

জারিফ বললো, বিংশ শতাব্দীর মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে কমপক্ষে ১ হাজার পৃষ্ঠা প্রয়োজন। এ অঞ্চলের রাজনৈতিক মানচিত্র একেবারে তছনছ হয়ে গেছে বিংশ শতাব্দীতে।

মধ্যপ্রাচ্যে ছোট বড় অনেক দেশ আছে। আমরা প্রধানত কয়েকটি দেশের কথা আলোচনা করলেই মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির অবস্থা সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবে।

যেহেতু ইরান ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ এলাকা তুরস্কের দখলে ছিলো; তাই আমরা প্রথমে তুরস্কের ইতিহাস আলোচনা করবো।

ঐতিহাসিক ভূমি ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম ছিলো তুর্কিদের দখলে। ফিলিস্তিনীদের হটিয়ে সেখানে মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সারখ্যাত ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

তুরস্ক ও ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাহিনী বলার পর আমরা মিসর নিয়ে আলোচনা করবো।

তারপর মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ইরানের কথা বলতেই হবে। এরপর আসবে ইরাকের কথা। এসব আলোচনার ফাঁকে অবশ্যই চলে আসবে, সিরিয়া ও জর্ডানের কথা। তেল আবিষ্কারের কারণে ভোজবাজির মতো বদলে যাওয়া সৌদি আরবের কাহিনী আমাদের জানতেই হবে। আশা করি, উপরের দেশগুলোর কথা আলোচনা করলেই পুরো মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবে।

তুরস্কের ইতিহাস ও কামাল আতাতুর্ক প্রসঙ্গঃ

মামুন জারিফকে প্রশ্ন করলো, "কামাল আতাতুর্ক সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা আমার জন্য খুবই দরকার। আমাদের এই বাংলাদেশে ফেসবুকে বহু গ্রুপ আছে যারা কথায় কথায় কামাল আতাতুর্ককে কাফির, ইসলামবিরোধী বলে গালি দেয়। তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফতের প্রতি ব্যাপক আবেগ লক্ষ্য করি এক শ্রেণির মানুষের। আমি যে কোনো লোকের আবেগকে সন্মান করি। তাই, কারও আবেগ নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না। তবে তোমার কাছ থেকে সত্যি ইতিহাস জানতে চাই।"

জারিফ বললো, **According to** ফেসবুকীয় **People in our country** কামাল আতাতুর্কের বিরুদ্ধে দোষটা কি?

মামুন বললো যে দোষটা হলো :

ক. ইসলামী খেলাফত ধ্বংস।

খ. আয়া সোফিয়া মসজিদকে যাদুঘরে রূপান্তর।

গ. তুরস্কের মহিলাদেরকে পর্দা প্রথা থেকে বের করে নিয়ে আসা এবং হিজাব পড়া নিষিদ্ধককরণ।

ঘ. তুর্কী হরফকে আরবীর মতো না লিখে ল্যাটিনমুখী করণ

ঙ. আযান নিষিদ্ধকরণ........ ইত্যাদি

জারিফ বললো ওকে, আমি চেষ্টা করবো তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে। তবে, ভাই আমার ভিতরে কিন্তু এত আবেগ নাই। আমি ইতিহাস পড়ে যতটুকু জেনেছি, সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবো। আমার মতের সাথে তোমার নাও মিলতে পারে, তবে আমি আমার ব্যক্তিগত কোনো মতামত দিবো না।

তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফত কি আসলে ইসলামী খেলাফত ছিলো?

মিঃ মামুন! তোমার প্রথম প্রশ্ন ছিলো ইসলামী খেলাফত ধ্বংস করেছে কামাল আতাতুর্ক। তোমার প্রতি আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, ইসলামী খেলাফতের সংজ্ঞা তুমি ঠিকঠাক মতো দাঁড় করাতে পেরেছ কি? ইসলামের নবী হযরত মুহম্মদ সাঃ এর মৃত্যুর পর সর্বসম্মতভাবে খলীফা নিযুক্ত হন হযরত আবু বকর রাঃ। তারপরে খলীফা হন হযরত উমর রা। ইসলামের তৃতীয় ও চতুর্থ খলীফা ছিলেন যথাক্রমে হযরত উসমান ও হযরত আলী রাঃ।

ইসলামী খেলাফতের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে, মজলিশে 'শুরা' বা 'আলাপ-আলোচনা'র ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাঃ এর সময় থেকেই মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাঃ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন রাসুলের সহধর্মিনী হযরত আয়েশা রাঃ। যাহোক, চার খলীফাকে ইসলামের খিলাফতের শাসক বলতেই হবে। তাঁদের পরে ইসলামী খেলাফতটা কোথায় ছিলো বলো?

মামুন বললো, "কেন, উমাইয়া খেলাফত, আব্বাসীয় খেলাফত, উত্তর আফ্রিকার অনেকগুলো ইসলামী খেলাফত, তুরস্কের ইসলামী খেলাফত-এগুলো কি ইসলামী খেলাফত নয়?

জারিফ উত্তর দিলো, এই তো! এই তো পেয়ে গেলাম বঙ্গীয় মুসলমানের খিলাফতের সংজ্ঞা। শোনো, খিলাফতে রাজতন্ত্র বিলকুল হারাম। যেখানে রাজতন্ত্র আছে, সেখানে ইসলামী খেলাফত থাকতে পারে না। খেলাফতের চরিত্র হবে শতভাগ গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক। চার খলীফার পরে খিলাফত মুসলিম বিশ্বের কোথাও গড়ে উঠেনি। সব জায়গাতেই ছিলো রাজতন্ত্র। এসব রাজতন্ত্রের শাসকেরা নিজের ক্ষমতার জন্য আপন ভাইকে হত্যা করেছে, পিতার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করেছে, আপনজনদের নৃশংসভাবে খুন করে ক্ষমতায় বসেছে। এটা কি খিলাফতের চরিত্র? খিলাফতে তো ক্ষমতা চাওয়ারই নিয়ম নাই। যতগুলো মুসলিম রাজবংশ এখন পর্যন্ত বিশ্বে ক্ষমতায় এসেছে, তার মধ্যে আপনজনদের মধ্যে খুনোখুনি সবচেয়ে বেশি করেছে তুরস্কের উসমানীয়া সালতানাত।

এবার বলো, তুরস্কের উসমানীয়া বংশের শাসন ইসলামী খেলাফত, নাকি রাজতন্ত্র?

মামুন বললো, "তোমার কথা অনুযায়ী এটা তো তাহলে রাজতন্ত্রই।" জারিফ বললো, আমার কথা নয়। উসমানীয়া শাসন যদি ইসলামী খেলাফত হয়, তাহলে ভারতের মোঘলরা কি দোষ করলো? তারা উসমানীয়াদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলো না। বর্তমান সৌদি শাসকেরাও তো দুই পবিত্র নগরী মক্কা-মদিনার খাদেম, তারা কি ইসলামী খেলাফত চালাচ্ছেন?

রাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। যাই হোক, প্রথম একটা সিদ্ধান্তে আসলাম মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক। কোনো ইসলামী খেলাফত ধ্বংস করেন নাই, তিনি ৭০০ বছর যাবত বহমান একটি রাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত করেছেন পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে, যে রাজবংশের শাসকেরা ছিলেন মুসলিম। ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাদের উপমহাদেশে কেন জানি তুরস্কের উসমানীয়া সালতানাত নিয়ে এত আবেগ রয়েছে যে, স্বয়ং তুরস্কেও একটুকু আবেগ নেই। তবে কামাল আতাতুর্ককে নিয়ে বাদবাকী অভিযোগগুলো ঠিক আছে।

তুরস্কের দুই পাশে আবু জেহেল ও আবু লাহাবঃ

আবু জেহেল ও আবু লাহাব ছিলো হযরত মুহম্মদ সাঃ এর চাচা। ভাতিজার বিরুদ্ধে সর্বদা চরম শত্রুতায় লিপ্ত ছিলেন এই দুই কাফির সর্দার। ঠিক তেমনি উনিশ শতক ও বিশ শতকে তুরস্কের দুই পাশে ছিলো দুই শত্রু; যারা তুরস্কের অমঙ্গল কামনা করতো সবসময়। তুরস্ককে ধ্বংস করার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলো। সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রুটা ছিলো রাশিয়া। মনে রেখো, খ্রিস্টান জগতের প্রধান দুটি বিভাজন ছিলো রোম ও কনস্ট্যান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে। অনেকটা মুসলমানদের শিয়া-সুন্নীর মতো। রোমের পোপের অধীন খ্রিস্টানরা ছিলো ক্যাথলিক খৃস্টান। আর কনস্ট্যান্টিনোপলের খ্রিস্টানরা পরিচিত ছিলো গ্রীক অর্থডক্স নামে। ১৪৫৩ সালে তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ কনস্ট্যান্টিনোপলের খ্রিস্টান তথা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন। রাশিয়া ছিলো এই গ্রীক অর্থডক্স চার্চের অনুসারী একটি দেশ। যেহেতু তুরস্ক বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছে, তাই রাশিয়া তুরস্ককে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতো। তুরস্ককে দুর্বল করতে রাশিয়া ছিলো বদ্ধপরিকর। তুরস্কের সাথে রাশিয়ার শত শত বছর যাবত যুদ্ধ হয়েছে। রাশিয়াই তুরস্ককে উপাধি দিয়েছিলো 'ইউরোপের রুগ্ন

মানুষ'। রাশিয়ার বারংবার আঘাতের কারণে তুরস্ক আসলেই দুর্বল হয়ে পড়ে উনিশ শতকে। তাই, রাশিয়া ছিলো তুরস্কের কাছে সাক্ষাৎ আবু জেহেল।

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি গ্রীস ছিলো তুরস্কের জন্য আবু লাহাব। ১৪৫৩ সালে তুর্কীরা যে বাইজেন্টাইন সভ্যতার পতন ঘটিয়েছিলো, সে সভ্যতা ছিলো মূলত গ্রীক সভ্যতা। কিন্তু সেই গ্রীক সভ্যতা ১৪৫৩ সাল থেকে ছিলো তুরস্কের অধীনে পরাধীন একটি দেশ। ১৮০০ সালের কিছু পূর্ব থেকেই গ্রীসে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে গ্রীসে। গ্রীস কবি রিগাস তার কবিতায় প্রাচীন গ্রিসের গৌরব নতুনভাবে উপস্থিত করে দেশবাসীর প্রতি আকুল আবেদন জানান। তাঁর লেখনী গ্রীকদের জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ১৭৯৮ সালে তুর্কী সালতানাত গ্রীক কবি রিগাসকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। কিন্তু কবি রিগাসের মৃত্যু গ্রীকদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে। তুরস্কের জাত শত্রু রাশিয়ার মাটিতে গ্রীসের স্বাধীনতা খসড়া রচিত হয়। ১৮২১ সালে তুর্কীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ শুরু করে গ্রীস। তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ এক ফরমান জারি করেন। তিনি গ্রীকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়ার জন্য সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান। শুরু হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তুরস্কের সুলতানের প্রত্যক্ষ মদদে মুসলমানরা গ্রীকদের কচুকাটা করেন। ১৮২২ সালের এপ্রিল মাসে কিয়স দ্বীপে প্রায় বিশ হাজার গ্রীক নিহত হন। এই ঘটনার পর পশ্চিম ইউরোপীয়দের নজর পড়ে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর। গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়। গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে ছুটে যান প্রখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড বায়রন। কিন্তু গ্রীকদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সে অর্থে সহযোগিতা করেন নি কেউ। আবার এগিয়ে আসলো রাশিয়া। ১৮২৫ সালে রাশিয়ান জার আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই নিকোলাস ক্ষমতায় আসেন। তিনি এসেই গ্রীকদের স্বাধীনতার প্রশ্নের একটা মীমাংসা করতে চাইলেন। ব্রিটেন ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরী গ্রীকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে এতটা উৎসাহী ছিলো না। কিন্তু রাশিয়া একাই তুরস্কের বিরুদ্ধে নামলো। ১৮৩০ সালে গ্রীস স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

স্বাধীন হয়েই গ্রীস রাশিয়ার মদদে শক্তি বাড়িয়েই চললো। তুরস্কের জমি দখল করাই ছিলো গ্রীকদের একমাত্র উদ্দেশ্যে। আগে থেকেই রাশিয়ার জ্বালায় অতিষ্ঠ তুর্কীদের নতুন আজরাইল রুপে আবির্ভুত হলো গ্রীস। এই দুই দেশের তৎরপতায় প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ইউরোপের মাটি থেকে সব ভূ-খন্ড হারায় তুর্কীরা। প্রথম মহাযুদ্ধে যখন তুর্কী-জার্মান জোট হেরে যায়, তখন তুরস্ককে শাস্তি দিতে একপায়ে খাড়া মিত্র শক্তি। তুরস্কের মাটিতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া ও গ্রীসদের সৈন্য অবতরণ করে। যে তুরস্ক একদিন ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়া জুড়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলো, প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেই তুরস্কের নাম

নিশানা বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে যাওয়ার দশা হলো। তুরস্কের সেই কঠিন সময়ে ত্রাতা হয়ে মাঠে নামলেন চতুর সেনানায়ক মোস্তফা কামাল পাশা। কামাল ইউরোপীয়দের সমস্ত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে তুরস্কের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করলেন। কামাল না থাকলে তুরস্ককে ভাগ বাটোয়ারা করে গিলে খেতো মিত্র শক্তি। কৃতজ্ঞতা স্বরুপ তুর্কী জাতি কামালকে আতাতুর্ক বা তুর্কী জাতির পিতা উপাধিতে ভূষিত করে।

মনে রেখো মামুন! কামাল আতাতুর্ক ইসলামবিরোধী কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সেটা সত্য, কিন্তু আধুনিক তুরস্ককে ঐক্যবদ্ধ করে তার স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত মহানায়ক হলেন কামাল আতাতুর্ক। তার বিরুদ্ধে টু শব্দ করার সাহস বর্তমান তুর্কী প্রেসিডেন্ট এরদোগানেরও নাই।

পর্ব – ৭১

কামাল আতাতুর্কের চোখের সামনে তুরস্ক যখন আসলেই মুমুর্ষু :

কামাল আতাতুর্ককে মূল্যায়ন করতে হলে, সবার আগে দরকার তাঁর সময়কার তুরস্কের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা। তাহলেই কামালের সব কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করা যাবে।

১৫৬৬ সালে অটোম্যান সাম্রাজ্যের দশম সুলতান সুলাইমান মারা যাওয়ার পর থেকেই অটোম্যান সাম্রাজ্যের ক্ষয় হতে থাকে। তুরস্কের উসমানীয়া সাম্রাজ্যের ছিলো তুলনাহীন প্রভাব। পুরো বলকান অঞ্চল তো বটেই অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর হাপুসবুর্গ রাজশক্তি পর্যন্ত তুরস্কের ভয়ে তটস্থ থাকতো। বিখ্যাত খ্রিস্টান ধর্ম সংস্কারক মার্টিন লুথার কিং পর্যন্ত একবার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, খ্রিস্টানদের পাপের ফলেই প্রভু তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য মুসলমান তুর্কীদের পাঠিয়েছেন। তুর্কীদের নৌ-বাহিনীও ছিলো শক্তিশালী। হাপুসবুর্গ রাজবংশ তুরস্ককে কর দিতো আনুগত্য মেনে নিয়ে। উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া, এবং মিসর তুর্কীদের দখলে ছিলোই, মুসলমানদের দুই পবিত্র নগরী মক্কা-মদীনা সহ বিস্তীর্ন হেজাজ ও নজদ উপত্যকা, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইরাক, প্যালেস্টাইন সব ছিলো তুর্কীদের দখলে। কোনো পর্যটক আজও তুরস্কের তোপকাপি প্যালেস পরিদর্শন করলে দেখতে পারবেন, হযরত মুহম্মদ সাঃ এর স্মৃতিবিজড়িত অনেক জিনিসপত্র সেখানে রয়েছে। তুর্কীরা যখন মক্কা-মদিনার শাসক ছিলো তখন তারা এসব জিনিস তুরস্কে নিয়ে এসেছে।

এই সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো তার পিছনে অনেক কারন বিদ্যমান।

ইতিহাসের পাতা ঘাটলে দেখা যাবে, সব রাজশক্তিরই পতন হয়েছে। বরং তুর্কীদের পতন অনেক দেরীতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিপথ পরিবর্তনও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যতদিন পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগকারী একচেটিয়া জলপথ হিসেবে বিবেচিত ছিলো, ততোদিন তুর্কী সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর দিয়ে পরিচালিত ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে সুবিধা ভোগ করতো। কিন্তু ভাস্কো-দা-গামা কর্তৃক ভারত আসার জলপথ আবিষ্কার করায় ভূমধ্যসাগরের গুরুত্ব কমতে থাকে।

তুরস্কের পিছিয়ে পড়ার দ্বিতীয় কারণটা ছিলো ধর্মীয় ও সামাজিক। তুরস্কের প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয়ান শক্তিবর্গ আধুনিক জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে নতুন এক জগতে প্রবেশ করে। আধুনিক বিজ্ঞান জগতের পুরো মালিকানা চলে যায় ইউরোপীয়দের হাতে। তুরস্কে গেঁড়ে বসে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার। সুলতান তৃতীয় সেলিম (১৭৮৯-১৮০৭) তুরস্কের সংস্কার কাজে হাত দেন। কিন্তু তিনি প্রবল বিরোধিতার সন্মুখীন হন। সুলতান সেলিমকে ইসলাম বিরোধী আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহে সুলতান তৃতীয় সেলিম নিহত হন। তুরস্কে আধুনিক ও প্রগতিশীলদের সাথে ধর্মীয় রক্ষণশীলদের সংঘাত চলতেই থাকে।

তুর্কীদের অটোম্যান সাম্রাজ্য পতনের আরেকটি কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক। রাশিয়ান সম্রাট পিটার দ্যা গ্রেট (১৬৮২-১৭২৫) ঘোষণা করেন, তুর্কীদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত রাশিয়ার সংগ্রাম চলবেই। রাশিয়ার সাথে তুরস্কের সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৫৬৮ সাল থেকেই। সেই সময় থেকে শুরু করে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তুরস্কের সাথে রাশিয়ার অসংখ্যবার যুদ্ধ হয়েছে। রাশিয়া তুরস্ককে ধ্বংস করতে চেয়েছে বারবার। অবাক করার মতো ব্যাপার হচ্ছে, তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফতকে বাঁচিয়ে রেখেছে বৃটিশরা। রাশিয়া যাতে কোনোমতেই ইউরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ব্রিটেন চাইতো তুর্কীদের অটোম্যান সাম্রাজ্য যাতে রাশিয়ার সামনে প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বলতে দ্বিধা নেই, ব্রিটেন যদি তুর্কীদেরকে বাঁচিয়ে না রাখতো রাশিয়ার বিরুদ্ধে না গিয়ে তাহলে তুর্কী সালতানাত এত দীর্ঘ হতো না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে তুরস্ককে নিয়ে ব্রিটেন ও রাশিয়ার এই দীর্ঘ লড়াই নতুন এক পরিভাষার জন্ম দেয়; যার নাম 'Balance of power' বা 'শক্তিসাম্য' তত্ত্ব। সে কাহিনী অন্যত্র হবে।

কিন্তু ব্রিটেনের দয়ায় (কিংবা ছলনায়) আর কতদিন!

তুরস্কের শক্তিক্ষয় হতেই থাকলো। গতপর্বেই বলেছিলাম, প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই ইউরোপের মাটি থেকে সব ভূ-খণ্ড হারায় তুরস্ক। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ নেয়। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানীর যুদ্ধবিরতি

ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। তারও ১২ দিন আগে ৩০ অক্টোবর তারিখে তুরস্ক মিত্রশক্তির অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধবিরতিতে স্বাক্ষর করে। জার্মানীর মতো তুরস্কও হয়ে পড়ে পরাজিত শক্তি। তুরস্কের ইস্তাম্বুল নগরীতে প্রবেশ করে বৃটিশ ও ইতালিয়ান বাহিনী। অসহায়ের মতো চেয়ে দেখা ছাড়া তুরস্কের আর কিছু করার ছিলো না। তুরস্কের অটোম্যান সুলতান শক্তিহীন। দেশ চালাচ্ছিলো আধুনিকতার ঝাণ্ডাবাহী নব্য তুর্কীরা। লজ্জায়-অপমানে তারাও চুপচাপ। তুরস্কের হয়ে কথা বলার কেউ রইলো না।

ইস্তাম্বুল নগরীতে যখন বৃটিশ ও ইতালিয়ান বাহিনী মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঠিক তখনি পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে গ্রীক বাহিনী তুরস্কে ঢুকে পড়ে। স্মার্না নগরীতে গ্রীকরা যখন তুরস্কের জমি দখল করার খায়েশ নিয়ে আক্রমণ চালালো, স্মার্না নগরীতে বসবাসরত খ্রিস্টানরা গ্রীকদের স্বাগত জানালো। তুরস্কের প্রতি গ্রীকদের রাগের কোনো শেষ নেই। ৪০০ বছর যাবত গ্রীস ছিলো তুরস্কের অধীন। ১৮৩০ সালে তুর্কী অধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভ করে গ্রীস। এবার সুযোগ পেয়ে তুরস্ককে উচিত শিক্ষা দিতে চাইলো গ্রীস। ব্রিটেনের আস্কারা তো ছিলই গ্রীকদের এই আচরণের প্রতি। তুরস্কের মাটিতে দখলদারিত্ব কায়েম করে গ্রীকদের সে কি বুনো উল্লাস!

তুরস্কের পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ঢুকলো আর্মেনিয়ার খ্রিস্টানরা। আর্মেনিয়ার খ্রিস্টানরা গণহত্যার শীকার হয়ে তুরস্ক কর্তৃক। ১৯১৫ সালে আর্মেনিয়ার খ্রিস্টানদের পাইকারী হারে মারা শুরু করে তুর্কীরা। আর্মেনিয়ার খ্রিস্টানরা রাশিয়ানদের সাথে মিলে তুরস্কের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছিলো-এই অভিযোগে প্রায় ১৫ লাখ আর্মেনীয়কে হত্যা করা হয়; যেটা বিংশ শতাব্দীর প্রথম পরিকল্পিত জেনোসাইড। তাই, প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শেষ হয়, স্বল্প সংখ্যক আর্মেনীয় এবার তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিলো। হাতি কাদায় পড়লে চামচিকায়ও লাথি মারে-এমন অবস্থা হলো তুরস্কের। পশ্চিমা খ্রিস্টান শক্তির আস্কারা পেয়ে আর্মেনীয়রাও এবার তুরস্কের সাথে মাস্তানি করতে লাগলো।

১৯১৬ সালের কুখ্যাত সাইকস্-পিকট চুক্তি:

তুরস্কের বিপদ কেবল শুরু। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, পৃথিবীর সেরা দুইটি প্রণালীর মালিক তুর্কীরা। দার্দানেলস্ ও বসফরাস প্রণালী দখলে নেয়ার জন্য ১৯১৫ সালে ব্রিটেন-ফ্রান্স মরণকামড় চালায় তুর্কীদের উপর। ইতিহাসে সে যুদ্ধ গ্যালিপোলি নামে পরিচিত। কিন্তু অসমসাহসী বীর মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুর্কী বাহিনী সীমাহীন বীরত্ব দেখিয়ে এই দুই প্রণালী রক্ষা করে। তারপর থেকেই তুরস্কের প্রতি মহাক্ষ্যাপা ব্রিটেন-ফ্রান্স। এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মনে মনে হিসাব কষছিলো, আসুক কোনো এক সুদিন! তুরস্ককে খন্ড-বিখন্ড করা হবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতেও তুরস্কের অধীনে মধ্যপ্রাচ্যের বিরাট অংশ ছিলো। সবাই জানতো, তুরস্কের এসব সাম্রাজ্য অচিরেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাবে। তাই মধ্যপ্রাচ্যের, ইরাক, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন ও প্যালেস্টাইন-এসব দেশগুলো কিভাবে বণ্টিত হবে এটা নিয়ে ব্রিটেন আর ফ্রান্সের মধ্যে গোপন আঁতাত হয়। বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার মার্ক সাইকস্ আর ফরাসি প্রতিনিধি জর্জ পিকট তাদের দেশের প্রতিনিধি হয়ে চুক্তিটি সম্পাদন করেন। তুরস্কের পতন হলে কে কীভাবে তুর্কীকে ভাগ-বাটোয়ারা করবে তার গোপন দলিল। রাশিয়া ও ইতালির প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিলো এই চুক্তির প্রতি। এটা ছিলো ভয়াবহ একটি চুক্তি। ১৯১৬ সালের মে মাসে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। গ্যালিপোলির যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ব্রিটেন-ফ্রান্স সুদিনের আশায় অপেক্ষা করতে থাকে।

অবশেষ সেই সুদিন আসলো। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিপর্যস্ত তুরস্ককে চেপে ধরার এই তো সময়।

পশ্চিম দিকে গ্রীস, পূর্বদিকে আর্মেনিয়া, ইস্তাম্বুল নগরীতে বৃটিশ এবং ইতালিয়ান বাহিনী যখন তাদের দখলদারিত্ব কায়েম করলো-ফ্রান্স আর বসে থাকবে কেন? তুরস্কের দক্ষিণ সীমানা দিয়ে ফ্রান্সও ঢুকলো তুরস্কে। এইবার সেরেছে! তুরস্কের অস্তিত্ব বোধহয় আর থাকবে না। মিত্র বাহিনী নাম নিশানা মুছে ফেলবে তুরস্কের। তুরস্কের ভাগ্য কিছুটা ভালো ছিলো যে, তার সবচেয়ে কুখ্যাত শত্রু রাশিয়া এসব ডাকাতিতে ছিলো না। লেনিনের নেতৃত্বে যখন ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন থেকেই রাশিয়া এসব পুঁজিবাদী ডাকাতদের কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলো। তাই, প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া আর তুরস্কের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি।

ইতিহাসের সেই চরম সন্ধিক্ষণে কামাল আতাতুর্কের আবির্ভাব। ১৯১৯ সালের ১৯ মে থেকে ১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই পর্যন্ত চারটি বছর দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে একে একে সবাইকে তাড়িয়ে দেন তিনি। এই চার বছর হলো তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। যে জাতি শত শত বছর বহু দেশ শাসন করেছে, সেই জাতিকে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামেও নামতে হয়েছে। এটাই হলো আধুনিক তুরস্কের সূচনা।

আজকের আলোচনা শেষে জারিফ বললো, "কামাল আতাতুর্ক মনে প্রাণে ইসলাম বিদ্বেষী ছিলো। সেই কাহিনীও বলবো। একটু ধৈর্য ধরো। কামালও আমার কেউ না, তুরস্কও আমার আপন দেশ না। কারো প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আবেগ নাই। আমার সবটুকু আবেগ এই হতদরিদ্র বাংলাদেশকে নিয়েই।

পর্ব-৭২

শতবর্ষের ফেরারী কামাল আতাতুর্ক:-একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়নের চেষ্টা:

জারিফ বললো, তুরস্কের ইতিহাসের আলোচনা আজ আমরা শেষ করে ফেলবো। গত দুই পর্বে আমি বলেছিলাম, তুরস্কের মতো একটি শক্তিশালী দেশ প্রথম মহাযুদ্ধে হেরে যাওয়ার পরে গ্রীস, আর্মেনিয়া, বৃটিশ ও ইতালি এই চার দেশ তুরস্কের ভূমি দখল করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

শুরুটা হয়েছিলো ১৯১৮ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখ থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার মাত্র ১২ দিন আগের ঘটনা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুরস্ক শাসিত হয়েছিলো মূলত নব্য তুর্কীদের দ্বারা। খেলাফত ছিলো নামমাত্র। মিত্রশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করে তুর্কীরা। এজিয়ান সাগরের লেমনস্ দ্বীপে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'আগামেননে' বসে এই যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধবিরতি 'Armictice of Mudros' নামেও পরিচিত।

এই যুদ্ধবিরতির ৭ নাম্বার ধারাটি ছিলো খুব মারাত্মক। এতে বলা হয়েছিলো, মিত্র বাহিনী তুরস্কের যে কোনো অঞ্চল দখল করতে পারবে যদি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ হয়।

মামুন বললো, ''ব্রিটেন, ফ্রাস, ইতালিসহ মিত্রবাহিনীর সাহস তো কম না! তারা তুরস্কের মতো একটা ঐতিহ্যবাদী পরাশক্তির জমি দখল করে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলো?''

জারিফ উত্তর দিলো, এর মূল কারণ হলো প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি।'' তুরস্ক যেহেতু জার্মানীর পক্ষে ছিলো তাই ব্রিটেন-ফ্রান্সের নেতৃত্বে মিত্রশক্তি জার্মানী-তুরস্ক-অস্ট্রো/হাঙ্গেরী সমেত অক্ষশক্তিকে শাস্তি দিতে চাইলো। আমরা প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী যে ভার্সাই সম্মেলন দেখি, সে সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো অক্ষশক্তিকে শাস্তি দেওয়া।

Treaty of sevres: তুরস্ককে ধ্বংস করার বহুজাতিক সংগ্রাম-

প্যারিস শান্তি সম্মেলন চলতেছিলো বছরব্যাপী। তারপর ১৯২০ সালের ১০ আগস্ট তুরস্কের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এই চুক্তি। এই চুক্তির উদ্দেশ্যে ছিলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গী ও পরাজিত শক্তি তুরস্ককে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া।

চুক্তির কয়েকটি ধারা ছিলো, সেগুলো হলো :

১. মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, জর্ডান ও লেবানন জুড়ে তুর্কীদের যে সাম্রাজ্য ছিলো, তা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অধীনে নিয়ে নেওয়া হবে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে তুরস্ককে বিতাড়িত করা হলো-এ ধারার মাধ্যমে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দখলে থাকা ভূ-খন্ডকে ম্যান্ডেট প্রথার মাধ্যমে শাসন করার সুযোগ পেলো

এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। ফ্রান্স পেলো সিরিয়া ও লেবানন; আর ব্রিটেন পেলো প্যালেস্টাই, জর্ডান ও ইরাক।

২. অতি গুরুত্বপূর্ণ দার্দানেল্স প্রণালীর মালিকানা রইলো না তুরস্কের হাতে। আন্তর্জাতিক জলপথ ঘোষণা করে ইতালির হাতে এর দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

৩. তুরস্কের কাছ থেকে বেশ কিছু জমি নিয়ে আর্মেনিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৪. গ্রীসকে দেওয়া হলো ইজমির শহর। যে গ্রীস তুরস্কের অধীনে ছিলো শত শত বছর, তুরস্কের কাছ থেকে ভূ-খণ্ড নিয়ে সেই গ্রীসকে দেওয়া হলো।

৫. বসফরাস প্রণালীকেও আন্তর্জাতিক জলসীমা বলে ঘোষণা করা হলো।

৬. মিত্র বাহিনী নিজ দায়িত্বে তুরস্কের সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবে-এ মর্মেও শর্ত আরোপ করা হলো।

শুরু হলো কামালের লড়াই:

সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার হলো, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী আহমেদ পাশা তুরস্কের সার্বভৌমত্ব বিরোধী এসব চুক্তি মেনে নিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। উসমানীয়া সুলতান ষষ্ঠ মোহাম্মদ চুক্তিতে স্বাক্ষরও করে ফেলেছিলেন।

কিন্তু সেই সময়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তুর্কী বীর মোস্তফা কামাল পাশা। কামালের নেতৃত্বে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করলেন। ইতিহাসে সেটাই তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রাম। আর সেই সংগ্রামের অবিসংবাদিত নায়ক হলেন মোস্তাফা কামাল আতাতুর্ক।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে তুরস্ককে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা না হয় মানা যায়; তাই বলে দার্দানেল্স ও বসফরাস প্রণালীর মালিকানা থেকে তুরস্ককে সরিয়ে দেওয়া হবে? জাতশত্রু গ্রীসকে ইজমির শহর সহ অ্যাজিয়ান সাগরের সবটুকু মালিকানা দিয়ে দেওয়া হবে?

মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক হুংকার দিলেন, "এত অন্যায় সইবে না তুরস্ক।" রাশিয়ার কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে মোস্তফা কামাল গ্রীকদেরকে বিতাড়িত করলেন তুরস্কের মাটি থেকে। লেজ গুটিয়ে গ্রীস তার নিজ ভূ-খন্ডে ফিরে গেলো।

মোস্তফা কামাল এবার লীগ অব নেশন্স এর প্রতি চরমপত্র পাঠালেন। বললেন, "তুরস্ক যদি এবার গণহত্যা শুরু করে গ্রীকদের উপর তাহলে এই দায়ভার আপনাদের নিতে হবে।"

নানা সমস্যায় জর্জরিত ফ্রান্স-ইতালি কামালের এই অসমসাহসিকতার দরুণ তুরস্কের মাটি থেকে পিছু হটলো। ব্রিটেনও এতে যোগ দিলো। ব্রিটেন-ফ্রান্সের

বাহিনী চলে যাওয়ায় আর্মেনিয়াও তুরস্কের মাটি থেকে মানে মানে সরে পড়লো। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখের মধ্যে তুরস্ক থেকে সমস্ত দখলদারী সৈন্যরা চলে যেতে বাধ্য হলো।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কামাল পাশাকে নিয়ে উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা লিখেছেন:

"ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই

অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই

কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই

হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই।"

সবাই তুরস্ককে নিয়ে আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করলো। মিত্রশক্তি ভাবলো, "যেহেতু তুরস্কের প্রতি ট্রিটি অব সভ্রেস এর মাধ্যমে মারাত্মক অন্যায় করা হয়েছে; তাই কামাল আতাতুর্ককে তুরস্কের সর্বেসর্বা মেনে নতুন করে আরেকটা চুক্তিতে উপনীত হওয়া প্রয়োজন।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতেই হবে, আজ যে তুরস্কে ৯৯ শতাংশ লোক মুসলিম এর পিছনেও কামাল আতাতুর্কের একটা অবদান আছে।

গ্রীস থেকে ১১ লক্ষ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তিনি তুরস্কে নিয়ে আসলেন। বিনিময়ে তুরস্কের অভ্যন্তরে বসবাসরত ৩ লক্ষ ৮০ হাজার গ্রীক বংশোদ্ভুত খৃস্টানকে তিনি গ্রীসে পাঠালেন। মোস্তফা কামাল নিজে ছিলেন গ্রীসের বাসিন্দা, তাই তিনি জানতেন খৃস্টান অধ্যুষিত গ্রীসে বসবাস করা মুসলিমদের জন্য মঙ্গলজনক নাও হতে পারে।

'Treaty of Lussane' তুরস্কের জন্য স্বস্তিদায়ক চুক্তি:

আঙ্কারাকে কেন্দ্র করে কামাল আতাতুর্ক যে সরকার গঠন করেছিলেন, সে সরকারের পার্লামেন্ট ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসের ১ তারিখ খিলাফত বিলুপ্ত করে। শেষ হয় ৬২৩ বছরের তুরস্কের উসমানীয় খেলাফত। যদিও উসমানীয় খেলাফত পুরোটাই ছিলো বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র।

১৯২৩ সালের ২৪ অক্টোবর 'ট্রিটি অব লুজান' স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি তুরস্কের জনগণের কষ্টের ফসল। নিজেরা সংগ্রাম করে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে এ চুক্তি আদায় করেছে তুর্কিরা; যার মূল কারিগর মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক।

তুরস্ক মধ্যপ্রাচ্যের উপর তার সমস্ত দাবিদাওয়া প্রত্যাহার করে নেয়। বিনিময়ে মিত্রশক্তি বর্তমান তুরস্কের উপর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়।

সাইপ্রাসের উপর ব্রিটিশ আধিপত্য মেনে নেয় তুর্কিরা। বসফরাস ও দার্দানেল্স প্রণালীতে তুরস্কের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পর্ব-৭৩

আরব-ইসরাইল সমস্যার যত কাহিনী
যাযাবর ইহুদী বনাম আজকের দখলদার ইসরাইলঃ

জারিফ বলতে লাগলো, ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংকট সম্পর্কে বলার জন্য আমি তোমাকে নিয়ে যাবো দুই হাজার বছর আগের কাহিনীতে। যদিও ইসরাইল রাস্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪৮ সালে, আর ইহুদী ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে প্রায় ৪ হাজার বছর পূর্বে।

পুরো ইতিহাস একসঙ্গে বোঝার আগে চলো, দুই হাজার বছর আগের রোমান সাম্রাজ্যের এক গলিতে প্রবেশ করি।

সময়কাল ৭০ খৃস্টাব্দঃ

রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ানের ছেলে টাইটাস ৬০ হাজার দুর্ধর্ষ রোমান বাহিনী ও স্থানীয় কিছু সহায়তাকারীদের নিয়ে চার মাস যাবত জেরুজালেম নগরী অবরুদ্ধ করে রাখেন। নগরীর প্রতিরক্ষা দেয়ালের ভিতরে প্রায় ৫ লক্ষ ইহুদী (কোনো কোনো বর্ণনা মতে ১০ লক্ষের মতো) ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলো।

বিদ্রোহী জেরুজালেমের বাসিন্দাদের উপর চরম আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন রোমানরা। ঠিক ৫০০ বছর আগে এভাবেই ব্যবিলনের রাজা নেবুচাঁদনেজার ব্যবিলনকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিলেন।

এবারও জেরুজালেম নগরী ও তার বাসিন্দাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য রোমানরা মনস্থির করে ফেললো।

বাসিন্দাদেরকে হত্যা করার পূর্বে দ্বিতীয় টেম্পেল (মুসলিম বিশ্বাস অনুযায়ী আল-আকসা মসজিদ) জ্বালিয়ে দেওয়ার হুকুম দিলেন টাইটাস। রাজা সলোমন তাদের জন্য নির্মান করেছিলেন প্রথম টেম্পল। মুসলিম ধর্ম মতে, হযরত সুলাইমান আঃ কর্তৃক নির্মিত মুসলমানদের প্রথম কিবলা বায়তুল মোকাদ্দাসই হচ্ছে প্রথম টেম্পল। ব্যবিলনীয় রাজা নেবুচাঁদনেজার প্রথম কেবলা ধ্বংস করার পর পারসিক সম্রাট সাইরাস ইহুদীদের মুক্তিদূত হয়ে আসেন। তিনি ব্যবিলন দখল করেন। ইহুদীদেরকে মুক্তি দেন এবং তাদের জন্য আরেকবার দ্বিতীয় টেম্পল নির্মান করেন।

দ্বিতীয় টেম্পল যখন জ্বলছিলো, ক্ষিপ্ত রোমান সেনাপতি টাইটাস এবার মত বদলালেন।

"নিভিয়ে দাও আগুন, যেটুকু পোড়ার তা পুড়েছে, জড় পদার্থকে আগুন দিয়ে পুড়লে রোমানদের কলিজা ঠাণ্ডা হবে না। বেয়াদব ইহুদীদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করতে হবে। নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে তাদের নাম নিশানা।"

টাইটাসের এক হুকুমে বেঁচে যায় দ্বিতীয় টেম্পলের কিছু অংশ। আজকের ওয়েলিং ওয়াল সেই বেঁচে যাওয়া অংশেরই প্রতীক। সেনাপতির হুকুম তামিল করার জন্য সৈন্যদল প্রস্তুত হতে লাগলো।

অনেক বছর পরে বিংশ শতাব্দীতে জার্মান একনায়ক হিটলার ইহুদী নিধনের জন্য "অপারেশন ফাইনাল সল্যুশন"-শুরু করেছিলেন। ৬০ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করেন হিটলার। সম্ভবত ৭০ খৃস্টাব্দে রোমান কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াটা ছিলো ইহুদীদের উপর প্রথম জাতিগত নিধন।

যা হোক, রোমান সৈন্যরা ছিলো ইহুদীদের জন্য সাক্ষাৎ আযরাইল। ইহুদীদের সব প্রতিরোধ ভেঙ্গে গেলো। প্রতিরক্ষা দেয়ালের ভিতরে এই চরমতম সময়েও ইহুদীরা নানা দল উপদলে বিভক্ত। ইহুদীদের হাতে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ ছিলো। কিন্তু একদল ইহুদী সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ধ্বংস করে দিলো। বললো, "খাদ্যদ্রব্য থাকলে ইহুদীরা আক্রমণাত্মক হবে না। খাদ্য ধ্বংস হয়েছে বলেই তো এখন হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে রোমানদের।

অবশেষে শুরু হলো সেই নিধনযজ্ঞ। প্রতিদিন ৫০০ ইহুদীকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হচ্ছিলো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, ক্রুশ বানানোর মতো আর কোনো কাঠ নাই। রোদে পুড়ে পঁচে গলে যাচ্ছে ইহুদীদের লাশগুলো। কুকুর-শেয়ালে কামড়াকামড়ি করতে লাগলো ইহুদীদের পঁচা-গলা দেহ নিয়ে।

ইহুদী ইতিহাসবিদ জোসেফাস, যিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিলেন, বর্ণনা করেন যে ৬৬ সাল থেকে শুরু ৭০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মোট চার বছরে প্রায় ১০ লক্ষের মতো ইহুদী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই রোমান আক্রমণে। জীবতদেরকে রোমানরা ধরে নিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। ৭০ হাজার ইহুদীকে কাজে লাগানো হয় রোমানদের কলোসিয়াম বানানোর জন্য।

য পলায়তি স জীবতি :

যে পালিয়ে থাকে, সেই বেঁচে যায়। এই সংস্কৃত প্রবাদকে সত্য প্রমাণ করে বেশ কিছু ইহুদী পালিয়ে বাঁচলেন। জান বাঁচানো ফরয। জেরুজালেমে বসবাস করা পরে এই নীতিতে জীবিত ইহুদীরা ছড়িয়ে পড়লেন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়। মিসর, সিরিয়া, ইরান, গ্রীস, উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এমনকি ইসলামের পবিত্র নগরী মদিনাতেও। যদিও মদিনার তখনকার নাম ছিলো 'ইয়াসরিব'।

আজকের ইহুদীরা সেইসব ইহুদীদের বংশধর যারা ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলো।

মনে রাখতে হবে, ৭০ খৃস্টাব্দের গণহত্যার পরে জেরুজালেম থেকে ইহুদীরা ঝাড়ে বংশে উৎখাত হয়। আর ১৯৪৮ সালের ১৪ মে তারা সেই ভূ-খন্ডে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে।

প্রশ্ন হলো –

১. প্রায় দুই হাজার বছর যাবত ইহুদীরা কোথায় ছিলো?

২. রোমানরা কেনো ইহুদীদের প্রতি এতো ক্ষ্যাপা ছিলো?

৩. ইহুদী ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ কবে ও কোথায়?

চলো, আজকে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর খুঁজার চেষ্টা করি।

কেন ইহুদীদের উপর যমদূতের মতো আবির্ভাব হলো রোমানরাঃ

হোক পশ্চিম ইউরোপ অথবা পূর্ব ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, পারসিক সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা কিংবা মুসলিম শাসনের ইতিহাস, সর্বজয়ী রোমানদের নাম নিতেই হবে। পরাক্রমশালী রোমান সভ্যতা হয় এসব সভ্যতাকে পরাজিত করেছে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে নিজেরা পরাজিত হয়েছে।

টিবের নদীর মোহনায় রোম নগরীতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক আগে ৭৫৩ খৃস্টাব্দে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ৫০৯ খৃস্টপূর্বে। আস্তে আস্তে রোম সাম্রাজ্য তার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়েই চললো। উত্তর আফ্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা অত্যন্ত জৌলুসময় কার্থেজিয়ানদের হটিয়ে ভূ-মধ্যসাগরের এপার-ওপার মিলে রোম সাম্রাজ্যের আয়তন হয় বিশাল। রোমানদের এই উত্থানের আমলে ইহুদীরা জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে তাদের দিনযাপন করছে। রোমান সেনাপতি পম্পে খৃস্টপূর্ব ৬৩ সালে জেরুজালেম দখল করে একে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্ত করেন।

রোমান শাসনে ইহুদীরা কোনো বিদ্রোহ করেছিলো বলে খবর পাওয়া যায় নি প্রথমদিকে। রোমানরা তাদের নিয়োজিত গভর্নর নিয়োগ করত। সেই গভর্নর ট্যাক্স তুলে রোমানদের রাজকোষে পাঠিয়ে দিতেন। এরকমই একজন রোমান গভর্নর ছিলেন পন্টিয়াস পাইলট, যার হুকুমে খৃস্টধর্মের যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। খৃস্টধর্মের প্রবর্তক যীশুর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ সাজিয়েছিলেন জেরুজালেমের ইহুদীরা। তাই, পরবর্তীতে খৃস্টানরা শত শত বছর যাবত যীশু হত্যার অভিযোগে সুযোগ পেলেই ইহুদীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো।

রোমান সম্রাট ক্যালিগুলার পাগলামিঃ

৩৯ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট ক্যালিগুলা নিজেকে দেবতা ঘোষণা করলেন। ক্যালিগুলা নিজেকে দেবতা ঘোষণা করে ডিক্রি জারী করলেন যে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রত্যেক উপাসনালয়ে তার মূর্তি বানিয়ে তাকেই পূজা করতে হবে। রোমানরা ছিলো বহু দেবতায় বিশ্বাসী। কোন সময় কোন দেবদেবীর পূজা করে তার কোনো ঠিক নাই।

ইহুদীরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। তাঁরা হযরত ইবরাহীম আঃ এর প্রবর্তিত এক ঈশ্বরের উপাসনাকারী। হযরত ইব্রাহীম আঃ এর পুত্র হযরত ইসহাক আঃ এর বংশধর। ইহুদী মতে, যদিও হযরত ইবরাহীম আঃ ও হযরত ইসহাক আঃ এর নাম যথাক্রমে আব্রাহাম ও আইজাক বলে ডাকা হয়।

ইহুদীদের অহংবোধে লাগলো রোমানদের এই ঘোষণা। রোমান সাম্রাজ্যের সবাই ক্যালিগুলার আদেশ মেনে চললো। একমাত্র ইহুদীরা তা মানতে পারে নি। একদল ইহুদী প্রতিনিধি সম্রাটের সাথে দেখা করে বললেন, ইহুদীরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তারা আসলে এর বাইরে আর কাউকে দেবদেবী মানবে না। সম্রাট যাতে ইহুদীদের ধর্মবিশ্বাসটাকে একটু মর্যাদা দেন।

কিসের কি? ক্ষেপে উঠলেন রোমান সম্রাট ক্যালিগুলা। সর্বজয়ী রোমান সম্রাটের আদেশ মানতে অস্বীকার করে চুনোপুঁটি ইহুদীদের দল?

ক্যালিগুলা জেরুজালেমের উপাসনালয় ধ্বংস করার হুংকার দেন। ইহুদীদের কপাল ভালো যে ৪১ খৃস্টাব্দে উন্মাদ ক্যালিগুলা মারা যান। আপাতত ইহুদীরা রক্ষা পায়।

কিন্তু আসল দুর্দিন কেবল শুরুঃ

ক্যালিগুলার বিরুদ্ধাচরণ করায় ইহুদীদের দুর্ভোগ বাড়তে লাগলো। রোমান সৈন্যরা এখন ইহুদীদের উপাসনালয়ে জুতা নিয়েই উঠে পড়ে। বেশ কয়েকবার পবিত্র গ্রন্থও পুড়ে ফেলেছে।

৬৬ খৃস্টাব্দে রোমের মসনদে আরেক উন্মাদ সম্রাট নীরো। জেরুজালেমের গভর্নর ফ্লোরাস ইহুদীদের সেকেন্ড টেম্পল লুট করেন। ইহুদীরা আর চুপ থাকতে পারেনি। সেকেন্ড টেম্পল তাদের ধর্মীয় আবেগের জায়গা। জেরুজালেমে অবস্থিত রোমান সেনাঘাঁটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইহুদীরা। স্বল্পসংখ্যক রোমান সৈন্য ইহুদীদের সামলাতে পারেনি। পার্শ্ববর্তী সিরিয়ার রোমান গভর্নর সেস্টিয়াস গালাস জেরুজালেমের রোমানদের সাহায্যার্থে সৈন্যদল প্রেরণ করেন। ইহুদীরা রোমানদের সেই বাহিনীকেও কচুকাটা করেন।

এই বিজয়ে ইহুদীদের সাহস বেড়ে যায়। তারা ভাবলো রোমানদের পরাজিত করে ফেলবেন।

বিশ্ব ইতিহাসে ৬৬ সাল থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত সময়টা 'ইহুদী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। কিন্তু এই বিদ্রোহের পরিণতি ছিলো মারাত্মক। এই বিদ্রোহ ইহুদী জাতির জন্য ধ্বংস নিয়ে আসে। জেরুজালেম থেকে তারা হয় বিতাড়িত। ২ হাজার বছর যাবত ইহুদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বাস্তুর মতো বসবাস করতে থাকে। অনেক ইহুদী আজও স্বীকার করে, পরাক্রমশালী রোমানদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ করা ভুল ছিলো ইহুদীদের। বরং রোমানদের সাথে একটু আপোষ করে চললে তারা জেরুজালেম থেকে বিতাড়িত হতো না।

উদ্বাস্তুর মতো বসবাস করলেও ইহুদীরা জ্ঞান-চর্চা আর ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিলো। আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছিলো ইহুদীরাই। যেখানেই থাকুক, যেভাবেই থাকুক, ইহুদীদের মনে একটা স্বপ্ন ছিলো কোনো একদিন আবার তারা জেরুজালেম যাবে এবং তাদের নিজেদের একটা দেশ গড়বে জেরুজালেমে।

পর্ব-৭৪

ইহুদীবাদের সূচনার উৎস সন্ধানে :

মামুন জারিফকে প্রশ্ন করলো, "জানলাম রোমান সাম্রাজ্য থেকে ৭০ খৃস্টাব্দে ইহুদীরা বিতাড়িত হয়। তারপর থেকে তারা উদ্বাস্তুর মতো সারা পৃথিবীতে ঘুরতে থাকে। ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক কে? কবে এই ধর্মের সূচনা হলো?"

আরেকটা ব্যাপার হলো, '৭০ খৃস্টাব্দে ইহুদীরা যেহেতু বিতাড়িত হয়েছিলো জেরুজালেম থেকে তাহলে ২ হাজার বছর পরে তারা কোন যুক্তিকে এই ভূ-খন্ডে ফিরে যেতে চায়, যেখানে ইতোমধ্যে বহু আরবীয় জনগণ বসবাস করতে শুরু করেছিলো?

আন্তর্জাতিক বিষয়ের তুমুল বিশেষজ্ঞ জারিফ আলোচনা শুরু করলো, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে। প্রশ্ন করলো মামুন, তুমি বলো হজ্জ করা মুসলমানদের মধ্যে কি রকম কাজ?

মামুন বললো, "এটা একটা ফরয ইবাদাত। অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল প্রত্যেকটা মুসলমানদের জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।"

জারিফ বললো, মুসলমানদের জীবনে যেমন হজ্জ করা একটি ইবাদাত, ঠিক তেমনি ফিলিস্তিনী ভূ-খন্ডে বসবাস করতে পারা প্রত্যেকটা ইহুদীর কাছে একটা

ইবাদাত। ইহুদীরা মনে করে প্যালেস্টাইন এলাকাটা তাদের জন্য স্রষ্টা কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভূমি।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "এটা কিরকম কথা? ফিলিস্তিনে হাজার হাজার বছর ধরে মুসলমানসহ স্থানীয় আরব জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে আর ইহুদীরা তাদেরকে উচ্ছেদ করে বলবে, এটা স্রষ্টা কর্তৃক তাদের জন্য প্রতিশ্রুত ভূমি? এটা তো কোনো যুক্তির কথা হতে পারে না।"

ইহুদীরা মনে করে ফিলিস্তিনের আদি বাসিন্দা তারাই। এটা ঠিক সাড়ে চার হাজার বছর আগে ইহুদীরাই প্রথমে জেরুজালেম নগরীকে আশ্রয় করে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে। কিন্তু একটু আগে আমরা যে আলোচনা করলাম, রোমানদের হাতে বিতাড়িত হওয়ার পর ইহুদীরা উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। দুই হাজার বছর যাবত তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘুরে আবার যদি তারা জেরুজালেমের মালিকানা দাবী করে, তখন সেখানে বসবাসরত অ-ইহুদী জনগোষ্ঠীর কি হবে?

তাই ফিলিস্তিনের বুকে বিংশ শতাব্দীতে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে জবরদখল। এখন আমরা ইহুদী ধর্মের একদম শুরুর ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিব।

আব্রাহামিক ধর্ম কী?

আমরা এ পর্বে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করবো। তাই ইহুদীদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমরা মূলত দেখিয়ে দিবো, কীভাবে প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদী সংকটের সূচনা হয় এবং তার রেশ আজও আছে।

মুসলিমরা যাকে হযরত মুসা আঃ হিসেবে মানেন, ইহুদীদের চোখে মূলত তিনিই মোজেস। ইহুদীধর্মের গোড়াপত্তনকারী মহাপুরুষ তিনি। বর্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রটি মূলত হযরত ইউসুফ আঃ এর পিতা হযরত ইয়াকুব আঃ এর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত। হযরত ইয়াকুব আঃ ইসরাইল নামেও পরিচিত ছিলেন। ইহুদীরা প্রাচীনকাল থেকেই বনী ইসরাইল নামেও পরিচিত ছিলো। হযরত ইয়াকুব আঃ ওরফে ইসরাইল ছিলেন হযরত ইবরাহীম আঃ এর পুত্র হযরত ইসহাকের সন্তান।

আবার খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রিস্ট ছিলেন বনী ইসরাইলের বংশধর। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ সাঃ ছিলেন হযরত ইব্রাহীম আঃ এর আরেক পুত্র হযরত ইসমাঈল আঃ এর বংশধর।

তাই মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদী এই তিনটি ধর্মকে একত্রে আব্রাহামিক ধর্ম বলা হয়। এই তিনটি ধর্ম মূলত এসেছে হযরত ইবরাহীম আঃ এর দেখানো পথ ধরে

কিংবা হযরত ইবরাহীম আঃ এর বংশধরদের দ্বারা প্রচারিত হয়ে। তাই এই তিনটি ধর্মে বেশকিছু মিল আছে ।

ইহুদীরা সবচেয়ে প্রাচীন জাতি কিন্তু যাযাবরঃ

হযরত মুসা আঃ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্রকে নিয়ে স্রষ্টা কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভূমি কেনান বা বর্তমান প্যালেস্টাইনের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। যদিও হযরত মুসা আঃ নিজে কেনান পৌঁছতে পারেন নি, তার আগেই মারা যান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জশুয়ার নেতৃত্বে ইহুদীরা কেনান আসলেন। ইহুদীরা জয় করে নেন বর্তমান জেরুজালেম, হেবরন, জেরিকোসহ প্রায় গোটা প্যালেস্টাইন। ইহুদীরা বাস করতে লাগলেন তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে। এটা প্রায় তিন হাজার বছর আগের কথা।

কিন্তু প্রথিবীর ইতিহাস সবসময় একই গতিতে চলে না। হযরত দাউদ আঃ তথা ডেভিডের শাসনামলে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠিত হয় ইহুদীদের। দাউদ আঃ এর পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান আঃ। তিনিই মূলত বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মান করেন। হযরত সুলাইমান আঃ (ইহুদীমতে রাজা সলোমন) কে নিয়ে অনেক কিচ্ছা কাহিনী আছে। আমরা সেগুলো আলোচনাই করবো না। রাজা সলোমনের মৃত্যুর পর থেকেই ইহুদী রাষ্ট্র দুর্বল হতে থাকে। জেরুজালেম নগরীর ইহুদীদের উপর ভয়ংকর অত্যাচার চালান ব্যবিলনীয় শাসক নেবুচাঁদ নেজার। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালের ঘটনা সেটি।

জেরুজালেমকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেন নেবুচাঁদনেজার। হযরত সুলাইমান আঃ নির্মিত বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ইহুদীদেরকে শিকলে বেঁধে দাস হিসেবে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে দেওয়া হয়। ইহুদীদের এরকম বন্দীদশা খৃস্টপূর্ব ৫৩৯ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে।

তারপর ইহুদীদের জন্য মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভুত হলেন 'সাইরাস দ্য গ্রেট'। সাইরাস ছিলেন পারসিক সম্রাট। খৃস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে সাইরাস ব্যবিলনীয় সাম্রাজ্যকে পুরোপুরি পরাজিত করলেন।

ইহুদীরা যাতে নিরাপদে জেরুজালেম ফিরতে পারেন সেজন্য সাইরাস খৃস্টপূর্ব ৫৩৮ সালে ডিক্রি জারী করেন।

পারসিক সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রীকরা জেরুজালেম দখল করলেও তা ছিলো ক্ষণস্থায়ী। ইহুদীদের কোনো ক্ষতি হয়নি গ্রীকদের শাসনামলে।

গ্রীকদের পর জেরুজালেম দখলে আসে রোমানদের হাতে। রোমানদের হাতে ইহুদীদের কি পরিণতি হয়েছিলো, সেটা তো শুরুতেই বলেছি।

রোমানদের হাতে কচুকাটা হওয়ার পর থেকে দু'হাজার বছর ব্যাপী ইহুদীদের যাযাবর জীবন শুরু। বিশেষ করে ৩১৩ সালে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্টধর্ম খ্রিস্টান হওয়ার পরে ইহুদীদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার পিছনের নেপথ্য কারিগর ছিলো জেরুজালেমের ইহুদীরা। তাই পরবর্তীতে খ্রিস্টানরা অনর্থক ইহুদীদের উপর হামলে পড়তো। রোম সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্তেই ইহুদীরা ছিলো নির্যাতিত। বাধ্য হয়ে ইহুদীরা জেরুজালেমের বাইরে বেরিয়ে পড়ে। ইহুদীরা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া, মিসর, ভারতবর্ষ এমনকি ইসলামের অন্যতম পবিত্র নগরী মদিনাতেও। শুরু হলো ইহুদীদের যাযাবর জীবন। স্রষ্টা কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভূমিতে তারা আর ফিরতে পারে নি।

জারিফ বললো, মজার ব্যাপার কি জানো, ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের শত্রুতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় মূলত এই বিংশ শতাব্দীতে। তার আগে মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের সে অর্থে কোনো বিরোধ হয় নি। অবশ্য নবী সাঃ এর সময় ইহুদীদেরকে মদিনা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে। এছাড়া ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের সংঘাতের কোনো খবর নাই। মুসলমানরা যখন জেরুজালেম জয় করে খৃস্টানদের হাত থেকে, তখন জেরুজালেমে বসবাসরত ইহুদীরা স্বাগত জানিয়েছিলো। স্পেনের মুসলিম সভ্যতায় ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে মিশে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো। বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফতের সময়েও ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক রেখেছিলো। ইহুদীদের সাথে শত্রুতা ছিলো মুলত খ্রিস্টানদের। টানা দুই হাজার বছর যাবত খ্রিস্টানরা ইহুদীদেরকে নির্যাতন করেছে, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে উচ্ছেদ করেছে। এসব কথা বলতে গেলে কয়েক হাজার পৃষ্টার বই লিখতে হবে। পরের পর্বে আমরা এক লাফে বিংশ শতাব্দীর দিকে মনোনিবেশ করবো।

পর্ব-৭৫

থিওডোর হার্জেল, আধুনিক ইহুদীবাদের স্বপ্নদ্রষ্টাঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী ইউরোপে সমীহ জাগানো একটা সাম্রাজ্য ছিলো; বর্তমানে যার কোনো অস্তিত্ব নাই। সে সাম্রাজ্যের নাম ছিলো অস্ট্রো-হাঙ্গেরী। সে সাম্রাজ্যের জৌলুসময় নগরী বুদাপেস্টে ১৮৬০ সালের মে মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহন করেন থিওডোর হার্জেল।

রোমান কর্তৃক গণহত্যার শিকার হয়ে জেরুজালেম থেকে ইহুদীরা সরে পড়ে '৭০ খৃস্টাব্দে। তারপর দেশে দেশে শুরু হয় ইহুদীদের যাযাবর জীবন। ইহুদীরা

কোনো দেশকে আপন করে নিতে পারেনি। শতকের পর শতক যায়, ইহুদীদের চোখে একটাই স্বপ্ন তারা আবার জেরুজালেম যাবে।

সেই স্বপ্নের প্রথম চারাগাছ রোপন করলেন এই থিওডোর হার্জেল। ইহুদীদের জন্য শুধুমাত্র জেরুজালেমকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুলতে হবে একটি জাতীয় রাষ্ট্র সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে 'জায়নিজম'। 'জায়নিজম' এর বাংলা ইহুদীবাদ নয়, কারণ ইহুদীবাদ মানে হচ্ছে 'জুডাইজম'। জায়নিজম শব্দটিই সংকীর্ণ জাতীয়তাবদী স্বার্থে আজ্ঞাবাহী।

হার্জেল ছিলেন একজন আইনের মানুষ, ইউনিভার্সিটি অব ভিয়েনা থেকে আইনের উপর ডিগ্রী নিয়েছিলেন। ১৮৮৪ সালে ওকালতি করার লাইসেন্সও পান। কিন্তু আইন ব্যবসার দিকে মন নাই হার্জেলের। সাহিত্য চর্চা করতে ভালোবাসতেন। সেই সুবাদে টুকটাক নাটকও লিখতেন, আর পত্রিকায় পাতায় লিখতেন সাহিত্য সমালোচনা।

হার্জেল কোনো কট্টর ইহুদীও ছিলেন না। ইহুদীদের ভাষা হিব্রুও তিনি জানতেন না। আবার হার্জেলই একমাত্র ব্যক্তি নন, যিনি প্রথমবারের মতো ইহুদীদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছিলেন। ফরাসি সমরনায়ক নেপোলিয়ানও ইহুদীদেরকে প্যালেস্টাইনে পাঠানোর কথা চিন্তা করেছিলেন। যদিও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির কারণে তিনি সেটা বাস্তবায়ন করতে পারেন নি। বৃটিশ রাজনীতিবিদ বেঞ্জামিন ডিজরেইলী ও কার্ল মার্কসের একান্ত সহচর মোসেস হেস লিখেছিলেন, "ইহুদীদেরকে জেরুজালেমে স্থানান্তরিত করাই হবে মানবজাতির জন্য মঙ্গলজনক।"

রাশিয়াসহ ইউরোপে ইহুদীবিদ্বেষ, বদলে যাওয়া থিওডোর হার্জেল:

১৮৮১ সালে রুশ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার আততায়ীর হাতে নিহত হলে দোষ গিয়ে পড়ে ইহুদীদের উপর। হত্যাকাণ্ডে একজন ইহুদী জড়িত ছিলো বটে, কিন্তু এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ শুরু হয়। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত এই চারটি বছর রাশিয়ান ইহুদীদের উপর নির্যাতন শুরু হয় বিভিন্নমাত্রায়। রাশিয়ান ভাষায় এ পরিস্থিতি 'Pogrom' নামে পরিচিত। হয়তো ৪৬ জন লোক মারা গিয়েছিলো, কিন্তু এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ছিলো খুব মারাত্মক। হাজার হাজার ইহুদী নির্যাতনের শিকার হয়, তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়। ১৮৮৩ সালে ২৫ হাজার ইহুদী প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করে; যাদের অধিকাংশই রাশিয়া থেকে গিয়েছিলো। ফিলিস্তিনের ভূ-খন্ডে এটা ছিলো প্রথম ইহুদীদের আগমন।

থিওডোর হার্জেল বসবাস করে আসছিলেন ভিয়েনায়। রাশিয়ার এই সহিংসতা তার মনকে নাড়িয়ে দেয়। তিনি তখন থেকেই কট্টরপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

একটি পত্রিকার প্যারিস বিষয়ক সংবাদদাতার চাকরি নিয়ে ১৮৯১ সালে প্যারিসে যান। সেখানে গিয়েও টের পান, সব জায়গায় তীব্র ইহুদী বিদ্বেষ। ফরাসি সেনাবাহিনীতে একজন ইহুদী গুপ্তচর ধরা পড়েন, যিনি জার্মানদের হয়ে কাজ করছিলেন। পুরো ফ্রান্স ইহুদীবিদ্বেষে উত্তাল হয়ে পড়ে। প্যারিস থেকে হার্জেল লন্ডন গেলেন। সেখানকার ইহুদীদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন।

সব জায়গার খবর পেয়ে হার্জেল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে রাশিয়া থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স থেকে অস্ট্রিয়া সব জায়গায় ইহুদীদের প্রতি উগ্র জাতীয়তাবাদী বিদ্বেষ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এর একটা বিহিত করা দরকার। মনে হচ্ছে, ইহুদীদের জন্য আলাদা একটা রাষ্ট্র গঠন না করলে বিশ্বে হয়তো ইহুদীদের অস্তিত্বই আর থাকবে না।

হার্জেলের বড় ভরসা এখন জার্মানি আর তুরস্কঃ

১৮৯৬ সালে ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত হলো হার্জেলের বিখ্যাত পুস্তিকা 'The Jewish State.' পরের বছর ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বাসেল নগরীতে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বের প্রথম জায়নিস্ট কংগ্রেস। আত্মপ্রত্যয়ী হার্জেল বলেই ফেললেন, "আমি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবই। আজকে যদি এ কথাটা চিৎকার করে বলি, তাহলে সবার কাছে হাসির পাত্র হবো আমি। হয়তো ৫ বৎসর কিংবা নিশ্চিতভাবে ৫০ বছরের মধ্যে হলেও ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে।"

অধিবেশনে আবেগের ঠেলায় বক্তৃতা দেওয়া সোজা, কিন্তু বাস্তবতা অনেক কঠিন। হার্জেল দেখলেন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা শুধু মুখের কথা নয়। পশ্চিম ইউরোপে তৎকালীন সময়ে জার্মানীতে ইহুদী বিদ্বেষটা তুলনামুলক কম। মনে মনে এও ধারণা করে নিলেন, তার স্বপ্নের ইহুদী রাষ্ট্রে জার্মান ভাষাই হবে সাধারণ ভাষা। যেহেতু ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া সব জায়গাতেই ইহুদীদের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গড়ে উঠেছে, তাই জার্মানদের কাঁধে ভর করেই ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আবার জার্মানীর সাথে জেরুজালেমের তৎকালীন মালিক তুরস্কের অটোম্যান সুলতানদের দোস্তি জমে ক্ষীর। তুরস্ক হচ্ছে ইউরোপের রুগ্ন মানুষ, আর জার্মানি হচ্ছে ইউরোপের নব্য পরাশক্তি। জাঁদরেল পরাশক্তিরা জার্মানির উত্থানে ভীতসন্ত্রস্ত। রুগ্ন মানুষ তুরস্ক তাই জার্মানির আঁচলে থেকে নতুন করে শক্তি অর্জন করার স্বপ্ন দেখলো। তুরস্কের প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সবই চলে জার্মানীর মর্জিমাফিক।

হার্জেল চিন্তা করলেন, আলাদা ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে জার্মানীর সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ামকে হাত করতে হবে। জার্মান সম্রাটকে দিয়ে তুরস্কের কাছ থেকে জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে নতুন ইহুদী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে।

কিন্তু জার্মান সম্রাটও ইহুদীবিরোধী!ঃ

সরাসির জার্মান সম্রাটের কাছে যাওয়ার উপায় নেই। অন্য কোনো উপায়ে তদবির করতে হবে তাহলে। তদবির বিদ্যাটা ইহুদীদের ভালোই জানা আছে।

জার্মান কাইজারের (সম্রাটের উপাধি ছিলো কাইজার) চাচা ডিউক ফ্রেডরিকের কাছে গেলেন প্রথমে হার্জেল। ডিউক ফ্রেডরিক হার্জেলের কথার উপর বিশ্বাস রেখে কাইজারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু প্রিন্স অব ইউলেনবার্গকে কথাটা বলেন। প্রিন্স কথাটা বললেন জার্মান কাইজারকে। জার্মান কাইজার এ কথাটা প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, "শুনেছিলাম ইহুদীরা নাকি আর্জেন্টিনায় সেটেল্ড হচ্ছে। আমাদের ওগুলোকেও পাঠিয়ে দাও সেখানে। তাহলে বেঁচে যাই আমরা। যত তাড়াতাড়ি আমাদের দেশ থেকে এই আপদগুলো বিদায় হয়, আমাদের জন্য ততই মঙ্গল। ইহুদীরা আমাদের সাম্রাজ্যের পরগাছা "

হাসি ঠাট্টার পর জার্মান সম্রাট যখন দেখলেন তার বন্ধু প্রিন্স অব ইউলেনবার্গ সত্যিই সিরিয়াস জেরুজালেমে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে; এরপর তিনি বললেন, "সামনে আমার তুরস্ক সফর আছে। আমি সুলতানের কাছে বলবো। তিনি যদি তার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এলাকা ইহুদীদের দিয়ে দেন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাহলে এখানে আমার কোনো আপত্তি নেই।"

১১ অক্টোবর, ১৮৯৮!

জার্মান সম্রাট কাইজার এক রাজকীয় ট্রেনে করে ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ঠিক তার দুদিন পরে ১৩ অক্টোবর তারিখে হার্জেল চারজন সফরসঙ্গীসহ ভিয়েনা থেকে ইস্তাম্বুল রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য একটাই, জার্মান সম্রাটের সাথে ইস্তাম্বুলের মাটিতে সরাসরি কথা বলা। ততদিনে জার্মান সম্রাটের বিশ্বস্ত বন্ধুকে পুরোদস্তুর হাত করে ফেলেছেন হার্জেল। সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে সম্রাটের বন্ধু হার্জেলকে কথা দিয়েছেন, তুরস্কের মাটিতে হার্জেলের সাথে জার্মান সম্রাটের একটা সাক্ষাতের বন্দোবস্ত তিনি করবেন।

অবশেষে হলো সেই কাঙ্খিত সাক্ষাত। হার্জেলকে দেখে যথেষ্ট ভালো লাগলো জার্মান সম্রাটের। বুদ্ধিমান, কেতাদুরস্ত ও উদ্যমী লোক।

"তুরস্কের সুলতানকে কি বলতে হবে?" জার্মান সম্রাট জিজ্ঞেস করলো হার্জেলকে।

"আপনার সার্বিক তত্ত্বাবধানে সুলতানের সহায়তায় জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে আলাদা একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।" উত্তর দিলেন হার্জেল।

"ওকে, জেরুজালেম যাচ্ছি আজ-কালকের মধ্যে। সেখানে দেখা হবে। তুমিও চলো।" একথা বলে হার্জেলকে বিদায় দিলেন জার্মান সম্রাট। চলে গেলেন হার্জেল।

এবার শুনুন সুলতান আবদুল হামিদের বক্তব্যঃ

জার্মান সম্রাট হার্জেলের এই পরিকল্পনা সুলতানের কাছে উত্থাপন করলেন। শোনামাত্রই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "ইহুদীদের মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা থাকতে পারে। আমার সাম্রাজ্য যদি না থাকে, তবে ইহুদীরা এমনিতেই পারলে জেরুজালেম নিয়ে নিক। কিন্তু আমি জীবিত থাকতে এ প্রস্তাব মানা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র আমাদের লাশের উপর দিয়ে জেরুজালেমে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।"

বন্ধুরাষ্ট্র তুরস্কের সুলতানের এই অবস্থা দেখে জার্মান সম্রাট আর কথা বাড়ান নি। তিনি বুঝে গেলেন, তুরস্কের সুলতান কোনোমতেই আর রাজি হবেন না। তাই তিনিও হার্জেলের প্রস্তাবের উপর আগ্রহ হারালেন। তুরস্ককে আঘাত দেওয়া জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব।

পর্ব-৭৬

হার্জেলের উগান্ডা মিশনঃ

অচিরেই তুরস্কের সুলতানের এই মনোভাব হার্জেলের কানে পৌছলো। হার্জেল বুঝলেন, জেরুজালেমে বোধহয় আর ইহুদী বসতি নির্মান হবে না। চুপচাপ বসে রইলেন তিনি ইহুদীদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ নির্মানের স্বপ্ন নিয়ে।

১৯০৩ সালের এপ্রিলে রাশিয়াতে আবার ইহুদী নির্যাতন শুরু হলো। হার্জেল ছুটলেন রাশিয়ায়। নির্যাতিত ইহুদীদের জন্য কিছু করা যায় কিনা, সেই উদ্দেশ্যে। ইহুদী নির্যাতনের খলনায়ক ভন প্লেভ এর সাথে সরাসরি দেখা করলেন। ইহুদী নির্যাতন বন্ধে শেষবারের মতো পাশে চেয়েছিলেন জার্মানী ও তুরস্ককে; কিন্তু পেলেন না।

হার্জেলের দরকার নতুন সমর্থক গোষ্ঠী ও নতুন প্রস্তাব। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত সাইপ্রাস কিংবা সিনাই উপত্যকা আরেকটা ভালো জায়গা। সেখান থেকে পূন্যভূমি জেরুজালেম খুব বেশি দূরেও নয়। ধনকুবের রথসচাইল্ড পরিবারের মিঃ ন্যাটি ততদিনে হার্জেলের সমর্থক হয়ে উঠেছেন। হার্জেলকে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন, ব্রিটিশ সাইপ্রাসের শাসনকর্তা জোসেফ চেম্বারলিনের সাথে।

নতুন ইহুদী ভূ-খন্ডের খসড়া তৈরির কাজে একজন আইনবিদ দরকার। যেকোন মূল্যে ইহুদী বসতি স্থাপনের কাজে মরিয়া হার্জেল একজন আইনবিদের শরণাপন্ন হলেন।

কে সেই আইনবিদ?

তিনি আর কেউ নন। ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ডেভিড লয়েড জর্জ। আর কয়েক বছর পরে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যিনি ইহুদীদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করবেন। ক্রুসেড বীর সালাউদ্দিনের পর জেরুজালেমের ভাগ্য পরিবর্তনে যার কর্মকাণ্ড সবচেয়ে বেশি স্বরণীয়।

সেই খসড়া নিয়ে যাওয়া হলো ব্রিটেনের প্রধামন্ত্রী কাছে। প্রধানমন্ত্রী পদেও আরেক স্বরণীয় ব্যক্তিত্ব তখন ক্ষমতার মসনদে।

যার নাম আর্থার বেলফোর। কয়েক বছর পর ক্ষমতা হারিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে যিনি পররাষ্ট্র সচিবে পরিণত হবেন। ইহুদী জাতির জন্য তিনিই কাগজে কলমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিবেন। ইতিহাসে যেটা 'বেলফোর ডিক্লারেশন' নামে পরিচিত।

যে কথা বলছিলাম, সিনাই উপত্যকায় ইহুদী বসতি স্থাপনের খসড়া তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আর্থার বেলফোরের কাছে ডেভিড লয়েড জর্জ উপস্থাপন করলে। সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করেন বেলফোর। বলেন, ''এতসব ঝামেলায় না গিয়ে সব ইহুদীদেরকে আমি পুনর্বাসন করবো পূর্ব আফ্রিকার দেশ উগান্ডাতে।'' কোনো উপায় না দেখে হার্জেল ইহুদীদের জন্য 'উগান্ডা প্রস্তাব' মেনে নিলেন।

ডেভিড-বেন গুরিয়নের কিচ্ছাঃ

ইহুদী জাতির একজন মুক্তিদাতা হিসেবে হার্জেলের নাম ছড়িয়ে পড়েছে ততদিনে। ১৯০৩ সালে হার্জেল যখন ইহুদীদের জন্য পৃথক আবাসভূমি হিসেবে উগান্ডাকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন, তখন ১৭ বছরের একটা কিশোর ছেলে খুব আহত বোধ করলেন। কিশোর ছেলেটির নাম ডেভিড বেন গুরিয়ন। পোল্যান্ডে জন্ম নেওয়া এই ছেলে একদিন ইসরাইল রাষ্ট্রের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী হবেন। ডেভিড বেন গুরিয়নের স্বপ্নের নায়ক হলেন থিওডোর হার্জেল।

এদিকে হার্জেল যখন উগান্ডাকে ইহুদীদের আবাসভূমি হিসেবে মেনে নিলেন, তখনি এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে গিয়ে ইহুদীরা বেশ কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হলো। কেউ বললো, আর্জেন্টিনায়, কেউ বললো ইহুদীরা যাতে আমেরিকায় গিয়ে মার্কিন নাগরিক হিসেবে মিশে যায়, কেউ বললো সিনাই উপত্যকায়, কেউ বললো জেরুজালেম ছাড়া কোনো গতি নাই। বিশ্ব ইহুদী আন্দোলনের রাশ হার্জেলের হাত থেকে ছিটকে যেতে লাগলো।

১৯০৪ সালে অস্ট্রিয়াতে থিওডোর হার্জেল মারা যান। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর কৃতজ্ঞতা স্বরুপ হার্জেলের দেহাবশেষ পরে জেরুজালেমে স্থানান্তরিত করা হয়।

যাক সে কথা, ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে আবারও ইহুদীবিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লো। একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানে রাশিয়ার জারকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করা হয়। লেনিনের সহচর ট্রটস্কি এই অভ্যুত্থানে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ইহুদী। আবারও শুরু হলো ইহুদীদের বিরুদ্ধে ধরপাকড়। দলে দলে রাশিয়াসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে ইহুদীরা জেরুজালেমের দিকে রওয়ানা হলো। ইতিহাসে এটা 'দ্বিতীয় আলিয়া' নামে পরিচিত।

এরকম একটা জাহাজে করে ১৯০৬ সালের দিকে ডেভিড বেন গুরিয়ন প্রথমবারের মতো জেরুজালেম আসেন। ১৯১১ সালে আরবদের কাছে থেকে জমি ক্রয় করে ইহুদীরা একটা সমবায় খামার তৈরি করেন। ইহুদীদের ভাষায় এটা 'প্রথম কিবুৎজ'। আরবরা ঘৃণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি, এই নির্যাতিত ইহুদীরা একদিন তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে উল্টো নির্যাতন করবে। ডেভিড বেন গুরিয়ন তুর্কীদের সাথে মিশতে চাইলেন যে কোনো মূলে। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের উপর ডিগ্রীও নেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়টাতে ইহুদীবাদী আন্দোলন কিছুটা স্থিমিত হয়ে পড়ে।

জেরুজালেমের শাসক জামাল পাশার কাহিনীঃ

১৯০৮ সালে তুরস্কের দুর্বল সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠে। একদল তরুণ সুলতানের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে দেশ শাসন করেন। তুরস্কের ইতিহাসে এটা পাশা ত্রয়ীর শাসন নামেও পরিচিত। এনভার পাশা, তালাত পাশা, ও জামাল পাশা তুরস্কের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। এনভার পাশা ছিলেন যুদ্ধমন্ত্রী। এনভার পাশা নিজেকে ভাবতেন তুরস্কের নেপোলিয়ান।

১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জেরুজালেমসহ পুরো মধ্যপ্রাচ্যের মালিক তুরস্ক নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।

সে বছরের ১৮ নভেম্বর জামাল পাশা জেরুজালেমে তার আস্তানা বানান। জামাল পাশা সন্দিহান ছিলেন যে আরবরা তুর্কিদের প্রতি কতটুকু অনুগত থাকে। একটু সন্দেহ হলেই জামাল পাশা বিদ্রোহীদের ফাঁসি দিয়ে দিতেন প্রকাশ্যেই।

১৯১৫ সালে তুরস্কের কাছ থেকে দার্দানেল্‌স ও বসফরাস প্রণালী দখল করতে ব্যর্থ হওয়ায়, মিত্রশক্তি ব্রিটেন ও তুরস্ককে দুর্বল করার নতুন মিশনে নামলো। সে মিশনের মূল উদ্দেশ্যে ছিলো, তুরস্কের বিরুদ্ধে আরব মুসলিমদের ক্ষেপিয়ে তোলা। আরব মুসলিমদের স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে ব্রিটেন তাদেরকে তুর্কিদের

বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চাইলো এবং তাতে তারা সফল হলো। এবার আমরা শুনবো সেই সব কাহিনী।

পর্ব-৭৭

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহঃ

জারিফ আজকের আলোচনা শুরু করলো এই বলে যে, আমরা ইহুদীবাদ নিয়ে যতটুকু আলোচনা করেছি, এখন সময় এসেছে আরব বিশ্ব নিয়ে কথা বলার। কারণ যতই আমরা ইহুদীবাদ নিয়ে আলোচনা করবো ততই আরব বিশ্বের জটিলতা আমাদেরকে গ্রাস করবে। ইহুদীদের স্বপ্নভূমি প্যালেস্টাইন তো আরব ভূ-খন্ডেরই অংশ। তাই, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার আরব ভূ-খণ্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট না জানলে ইহুদীবাদ ও মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিয়ে আলোচনা একদম বৃথা।

ইরান বাদে প্রায় গোটা মধ্যপ্রাচ্য যখন তুরস্কের অধীনে পরাধীন জনপদঃ

নজর দেয়া যাক ষোড়শ শতকের দিকে। মুসলমানদের অধীনে তিন তিনটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য। ১৫২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের মোঘল সাম্রাজ্য; যেটি পরবর্তীতে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ দখল করে। ১৫০১ সালে ইরানে প্রতিষ্ঠিত হয় সাফাভিদ রাজবংশের শাসন। আর তুরস্কের উসমানীয়া সালতানাত অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু এই শতকে এসে সেই সালতানাত সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে।

১৫১২ থেকে ১৫২০ সাল পর্যন্ত তুরস্কের উসমানী সালতানাতের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান সেলিম। সুলতান সেলিমের পুরো রাজত্বকালটাই ছিলো মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকাকে ঘিরে।

সুলতান সেলিম প্রথম লড়াইটা চালান শিয়া ইরানের বিরুদ্ধে। সুন্নী তুর্কীদের চোখে শিয়ারা কাফের ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৫১৪ সালে সুলতান সেলিম ১ লক্ষ ১৪ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পারস্যের সাফাভিদ রাজবংশের রাজধানী তাবরিজ আক্রমণ করেন। 'ক্যালদেরান যুদ্ধ' নামে পরিচিত এই যুদ্ধে উসমানীয়দের হাতে শিয়া ইরান পর্যুদস্ত হয়। কিন্তু এই বিরাট শক্তিক্ষয়ের যুদ্ধে তুর্কীদের কোনো লাভ হয় নি। কারণ ইরানের শিয়ারা সুলতান সেলিমের চোখে এতই ঘৃণার পাত্র ছিলো যে, তিনি এই ভূ-খণ্ড দখলে রাখতেও অপছন্দ করেন। তুর্কীরা ইরান ছেড়ে চলে গেলো। ১৫১৭ সাল থেকে সুলতান সেলিম আবার মধ্যপ্রাচ্য অভিযানে নামলেন। মিসর দখল করলেন তিনি। এক বছরের মধ্যে

তুরস্কের উসমানীয়দের দখলে আসে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, লেবানন, জর্ডানসহ বর্তমান সৌদি আরবের হেজাজ উপত্যকা ও পবিত্র দুই নগরী মক্কা ও মদিনা।

তার মানে দাঁড়ালো, ১৫১৭ সাল থেকে ইরান বাদে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের শাসনকর্তা হচ্ছে তুর্কীরা। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে প্রায় ৪০০ বছর যাবত তুরস্কের অধীনে পরাধীনতার শেকলে আবদ্ধ গোটা আরব জাহান। অবশ্য এর মধ্যে ১৮৮২ সালে ব্রিটেন মিসর দখল করে ফেলে। কিন্তু বাকী এলাকায় উসমানীয় শাসন কার্যকর ছিলো।

মামুন বললো, "এজন্যই তো তুরস্কের অন্যতম সেরা পর্যটন গন্তব্য তোপকাপি প্যালেসে ইসলামের নবী মুহম্মদ সাঃ এর স্মৃতিবিজড়িত অনেক জিনিস রয়েছে। যেহেতু প্রায় ৪০০ বছর যাবত মক্কা-মদিনসহ আরব জাহানের শাসক ছিলো তুর্কীরা, তাই তারা এসব জিনিস নিজেদের দেশে নিয়ে এসে সংরক্ষণ করতে পেরেছে।"

জারিফ বললো, এক্সাক্টলি। ইস্তাম্বুল নগরীর তোপকাপি প্যালেসে হযরত মুহম্মদ সাঃ এর সীলমোহর, তরবারি, জোব্বা, পেয়ালা, জামার অংশ, দাঁড়ি মোবারক, ওহুদের যুদ্ধে ভাঙ্গা দুই দাঁতের অংশ এসব কিছুই সংরক্ষণ করে রাখা আছে। হযরত আলী রাঃ ও বীরকেশরী খালিদ বিন ওয়ালিদের তরবারিটিও আছে তোপকাপি প্যালেসে। যে কোনো মুসলমান ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্যালেসে গেলে আবেগী হয়ে যাবেন, নবী সাঃ এবং তার সাহাবীদের স্মৃতিবিজড়িত জিনিস দেখে।

সে যাই হোক। আরবদের কাছে তুরস্কতো দখলদার ব্যতীত আর কিছুই না। ৪০০ বছরের পরাধীনতার কালে মাঝে মাঝে আরব জাতীয়তাবাদ মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ শক্তির অভাবে স্বাধীন আরব ভূ-খন্ড প্রতিষ্ঠার কোনো সংগ্রামই কাজে আসে নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আসলো সেই সুযোগঃ

যদিও তুর্কীরা ছিলো আরব জাহানের শাসনকর্তা, তবুও তুর্কীদের কাছ থেকে ফরমান নিয়ে বিভিন্ন ভূ-খণ্ড শাসন করতো স্থানীয় গোত্রপতিরা। পবিত্র নগরী মক্কা শাসন করতেন ঠিক এরকমই একজন লোক। নাম তার হুসাইন বিন আলী। তাঁর ডাক নাম ছিলো শরীফ হোসাইন। আদতে তিনি ছিলেন তুরস্কের উসমানীয় সালতানাতের একজন প্রতিনিধি। তার বংশধরেরা বহুকাল আগে থেকেই উসমানীয়দের হয়ে দুই পবিত্র নগরীসহ বিস্তীর্ন হেজাজ অঞ্চল শাসন করতেন। শরীফ হোসাইন নিজেকে বলতেন হাশেমাইত। হযরত মুহম্মদ সাঃ এর দাদা আবদুল মুত্তালিব এর পিতার নাম ছিলো হাশেম। নবী সাঃ এর বংশ বনু হাশেম নামেও পরিচিত ছিলো। শরীফ হোসাইন এর দাবী অনুযায়ী তিনি ছিলেন বনু হাশেম গোত্রের লোক।

১৮৮০ সালে শরীফ হোসাইন এর চাচাকে হত্যা করে উসমানীয়রা। শরীফ হোসাইন উসমানীয়দের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেন। কিন্তু কোনো বিদ্রোহের দিকে যান নি। ১৯০৮ সালে তুরস্কের খলীফাকে ক্ষমতাহীন করে তুরস্কের শাসনভার গ্রহন করেন ইয়ং তুর্কীরা। সে সময়ই মক্কার আমির নিযুক্ত হন তিনি। তুরস্কের উসমানীয়দের প্রতি তিনি ছিলেন একান্ত অনুগত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে তিনি তুরস্কের পক্ষের লোকই ছিলেন।

শরীফ-ম্যাকমোহন পত্র বিনিময় শুরু:

মামুন, তুমি এমসিকিও পরীক্ষার জন্য নিশ্চয়ই গাইডে পড়েছো। ভারত-চীন সীমান্ত লাইন ম্যাকমোহন লাইন নামে পরিচিত-তাই না?

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

বৃটিশ কূটনীতিক মিঃ হেনরী ম্যাকমোহন এর নামে ম্যাকমোহন লাইনের নামকরণ করা হয়। মিঃ হেনরী ম্যাকমোহন আরেকটা কারণে ইতিহাসে স্বরণীয় হয়ে আছেন। তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে আরবদের ক্ষেপিয়ে তোলার প্রাথমিক কাজটা তিনিই করেছেন। ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন মিশরে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত।

তুরস্কের প্রতি ব্রিটেনের ছিলো মারাত্মক রাগ। আমি তো আগেই বলেছিলাম, দার্দানেলস্ প্রণালীর দখল নিয়ে তুরস্কের কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে বৃটিশ-ফ্রান্স মিত্রবাহিনী। দার্দানেলস্ প্রণালী দখল করতে না পারার কষ্ট বুকে নিয়ে বৃটিশরা এবার তুরস্কের দুর্বল পয়েন্টের দিকে নজর দেয়। তুরস্কের সেই দুর্বল পয়েন্টা হলো মধ্যপ্রাচ্যের আরব জাহান।

ঘুষ দিয়ে দলে লোক ভিড়ানো, ছলনা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, স্বাধীনতার আশ্বাস ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে আরব বিদ্রোহের পরিকল্পনা করে ব্রিটিশরা। ব্রিটিশরা চিন্তা করলো, তুরস্কের বিরুদ্ধে যদি মুসলমান আরবদের ক্ষেপিয়ে তোলা যায়, তাহলে এক ঢিলে অনেক পাখি মারা যাবে। তুরস্ক দুর্বল হবে, শায়েস্তা হবে জার্মান-তুর্কী জোট, আর মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা দখলে আসবে ব্রিটেনের।

ব্রিটেনের এই পাতা ফাঁদে পা দিলো মক্কার শাসক শরীফ হোসাইন। শরীফ হোসাইনকে ব্রিটিশরা টোপ দিলো, "কেন তুমি তুরস্কের অধীনে থাকবে? তুমি আমাদেরকে সমর্থন করো। আমরাই তোমাকে স্বাধীন আরব ভূ-খন্ডের মালিক বানিয়ে দিবো।"

১৪ জুলাই, ১৯১৫ সাল:

মক্কার শাসক শরীফ হোসাইন মিশরে নিযুক্ত ব্রিটিশ কূটনীতিক ম্যাকমোহনকে চিঠি দেন। শরীফ হোসাইন আশ্বাস চান, ব্রিটেন তাকে কতটুকু সহায়তা করবে?

তিনি যে মিশরের পূর্ব প্রান্ত থেকে শুরু করে জর্ডান, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক ও সৌদি আরবকে নিয়ে বিশাল ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন আরব ভূ-খণ্ড গঠন করতে চান, সেটা কি পারবেন? দরকার হলে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন কিন্তু বৃটিশরা তাকে সহায়তা করবে তো?

চিঠির জবাব দেন ম্যাকমোহন, তিনি শরীফ হোসাইনকে আশ্বস্ত করেন, তুর্কীদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি আরবদের জন্য যা যা করা দরকার তা করবেন। এভাবে একের পর এক পত্র বিনিময় চলতেই থাকে। তুরস্কের বিরুদ্ধে বিশাল ষড়যন্ত্রের জাল বুনেন শরীফ হোসাইন।

১০ জুন, ১৯১৬ সাল:

শরীফ হোসাইন পবিত্র নগরী মক্কায় অবস্থিত তুরস্কের সেনাঘাঁটিতে হামলার নির্দেশ দেন। শুরু হয় তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদের সর্বাত্মক বিদ্রোহের সূচনা। মুসলমানে মুসলমানে এই লড়াইয়ের পুরো ফায়দা নিতে ব্রিটেন তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

অনেকেই তুরস্কের কামাল আতাতুর্ককে দোষারোপ করেন, কেন তিনি খেলাফত প্রথা বাতিল করেছিলেন। মনে রেখো, কামাল আতাতুর্ক একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, "এই খেলাফত বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ, যেখানে তুরস্কের মুসলমানরা ব্রিটেন-ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত, ঠিক সে সময়ই আরবের মুসলমানরা তুরস্ককে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যাবতীয় নোংরা খেলায় মেতে উঠলো?"

হেনরী ম্যাকমোহন যদি হয়ে থাকেন আরব বিদ্রোহের প্রধান ইন্ধনদাতা, তাহলে আরব বিদ্রোহের অন্যতম আরেক স্তম্ভ হলেন, বৃটিশ ক্যাপ্টেন লরেন্স; যিনি 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' নামে সমধিক পরিচিত। আরবীয় রাজনীতির অন্যতম কিংবদন্তীতুল্য এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে না জানলে মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের মূলে যাওয়া যাবে না। তার আগে তুমি অতিবিখ্যাত 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' মুভিটি দেখে ফেলো।

****

পর্ব-৭৮

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধফ্রন্টগুলো:

জারিফ আলোচনা করলো, আজকের ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংকটের মূল আলোচনা করতে হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে।

কারণ মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-খণ্ডে দখলদার ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের পিছনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ঘটনাবলীই দায়ী।

১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন জার্মানীসহ উভয়পক্ষের সব শক্তিই ভেবেছিলো যে যুদ্ধ হবে ক্ষণস্থায়ী। শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীতে সবার হাতে আছে অঢেল টাকা আর মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র। সবাই মনে করলো, কয়েক সপ্তাহ কিংবা বড়জোড় কয়েক মাসের ব্যবধানে সব ফায়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু জার্মানীর দুর্বার আক্রমণের মুখে যখন ব্রিটেন-ফ্রান্স প্রতিরোধ গড়ে তুললো, তখনই একটা অচলাবস্তা সৃষ্টি হলো। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।

ঠিক সেই সময় জগৎজোড়া সাম্রাজ্য পরিচালনাকারী ধূরন্ধর বৃটিশ জাতি চিন্তা করলো, কোন্ কোন্ কূটনৈতিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে জার্মান-তুর্কী জোটকে শায়েস্তা করা যায়? এমন এক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে, যাতে যুদ্ধ করা ছাড়াই বড় ধরনের বিজয় অর্জন করা যায়।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, ''যুদ্ধের পথে না হেটে ব্রিটেন এরকম সিদ্ধান্ত নিলো কেন?'' জারিফ বললো, এর পিছনে প্রধান কারণ দু'টি। ১৯১৫ সালে 'গ্যালিপোলি'র যুদ্ধে তুরস্কের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করলো বৃটিশ-ফরাসি-অস্ট্রেলিয়ান যৌথ বাহিনী। দার্দানেলস্ প্রণালীর দখল নিতে গিয়ে উল্টো ভীষণভাবে মার খেলো তারা। তাই, এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়াটা জরুরী ছিলো ।

তুরস্কের কাছে আরেকটা লজ্জাজনক পরাজয়ের স্বীকার হলো ব্রিটেন। সেটা হলো ব্যাটল অব 'কুট-আল-আমরা'য় তুর্কীদের কাছে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বাহিনীর পরাজয়।

''অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মানে? সেখানে কি ভারতের সৈন্যরাও ছিলো?''

অফকোর্স! আমি তো আগেও আলোচনা করেছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করেছে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও ছিলেন এরকম একজন ব্রিটিশ সৈনিক। সে যাই হোক, গ্যালিপোলির যুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৯১৫ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া ১৯১৬ সালের ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত 'কূট-আল আমরার'র যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ব্রিটেন বুঝতে পারলো পুরো মধ্যপ্রাচ্যের দখলদার তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জেতা সম্ভব নয়। 'কূট-আল আমরা' বর্তমান ইরাকে অবস্থিত। বাগদাদ থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। ১৩ হাজার সৈন্যকে বন্দী করে ফেলে তুর্কীরা। অবনত মস্তকে আত্মসমর্পন করে বৃটিশ বাহিনী।

আসরে নামলেন-লরেন্স অব অ্যারাবিয়াঃ

৬ লক্ষ সৈন্যের বিশাল তুর্কী বাহিনী ৩৮টি ডিভিশনে বিভক্ত হয়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা করছিলো। ইরান ছাড়া পুরো মধ্যপ্রাচ্য তুরস্কের দখলে। ব্রিটেন ভাবলো, তুর্কীদের ঘায়েল করার একটাই পথ। সেটা হলো আরব জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেয়া। বৃটিশ নাগরিক টি.ই লরেন্স ছিলেন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ। বৃটিশ সরকারের মিশন নিয়ে তিনি আরবদের সাথে মিশে গেলেন। তাদের মতো করে পোশাক-পরিচ্ছদ পড়লেন, আর শুরু করলেন বৃটিশের নীল নকশা। তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সব আরব গোত্রপতিদের এক ছাতার নিচে জড়ো করলেন। মক্কার শরীফ হোসেন তো আগেই ছিলেন তুর্কীদের বিরুদ্ধে। এবার মধ্যপ্রাচ্য থেকে তুর্কীদের পায়ের তলার মাটি সরে যেতে শুরু করলো।



চিত্র ৩০ : 'লরেন্স অব এরাবিয়া' খ্যাত টি. ই. লরেন্স একজন আরব দরদী লোক হিসেবে পরিচিত। আরবদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরবরাই ছিলো মূল যোদ্ধা। তাদেরকে সহায়তা করেছে বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনী। ইয়েমেনের আকাবা বন্দর দখল করলো বৃটিশরা। ব্রিটেনকে সহায়তা করতে মিশরে গঠিত হলো, 'ইজিপ্সিয়ান এক্সপেডিশনারি ফোর্স'। ১৯১৭ সাল মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। তুর্কীদের

আসরে নামলেন-লরেন্স অব অ্যারাবিয়াঃ

৬ লক্ষ সৈন্যের বিশাল তুর্কী বাহিনী ৩৮টি ডিভিশনে বিভক্ত হয়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা করছিলো। ইরান ছাড়া পুরো মধ্যপ্রাচ্য তুরস্কের দখলে। ব্রিটেন ভাবলো, তুর্কীদের ঘায়েল করার একটাই পথ। সেটা হলো আরব জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেয়া। বৃটিশ নাগরিক টি.ই লরেন্স ছিলেন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ। বৃটিশ সরকারের মিশন নিয়ে তিনি আরবদের সাথে মিশে গেলেন। তাদের মতো করে পোশাক-পরিচ্ছদ পড়লেন, আর শুরু করলেন বৃটিশের নীল নকশা। তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সব আরব গোত্রপতিদের এক ছাতার নিচে জড়ো করলেন। মক্কার শরীফ হোসেন তো আগেই ছিলেন তুর্কীদের বিরুদ্ধে। এবার মধ্যপ্রাচ্য থেকে তুর্কীদের পায়ের তলার মাটি সরে যেতে শুরু করলো।



চিত্র ৩০ : 'লরেন্স অব এরাবিয়া' খ্যাত টি. ই. লরেন্স একজন আরব দরদী লোক হিসেবে পরিচিত। আরবদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরবরাই ছিলো মূল যোদ্ধা। তাদেরকে সহায়তা করেছে বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনী। ইয়েমেনের আকাবা বন্দর দখল করলো বৃটিশরা। ব্রিটেনকে সহায়তা করতে মিশরে গঠিত হলো, 'ইজিপ্সিয়ান এক্সপেডিশনারি ফোর্স'। ১৯১৭ সাল মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। তুর্কীদের

দখলদারিত্বের ৪০০ বছর পূর্তি হলো এ বছর। ১৫১৭ সালে তুরস্কের অটোম্যানরা প্রথম মিশর দখলের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-খণ্ড দখলের সূচনা করে। ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোর ইহুদী ধনকুবের রথসচাইল্ডের কাছে ওয়াদা করেছিলেন প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্য ব্রিটেন একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিবে। এই বেলফোর ঘোষণার প্রায় মাসখানেক পর ১৯১৭ সালের ১১ ডিসেম্বর বৃটিশ সেনাপতি স্যার এডমন্ড অ্যালেনবী 'ব্যাটল অব গাজায়' জয়লাভ করে জেরুজালেম দখল করেন। বৃটিশ সেনাপতি অ্যালেনবী হচ্ছেন ৩৪তম জেরুজালেম দখলকারী। প্রায় তিন হাজার বছর যাবত বিভিন্ন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সেনাপতিরা জেরুজালেম দখল করেন। শেষমেষ ১৯১৭ সালে এই জেরুজালেম দখল করলো বৃটিশরা। ক্রুসেডের পর এই প্রথম খ্রিস্টানদের হাতে গেলো পূণ্যভূমি জেরুজালেম। কে জানতো ব্রিটেন কর্তৃক জেরুজালেম দখল অনন্তকালের জন্য ফিলিস্তিনিদের কপালে দুঃখ বয়ে আনবে?

মামুন বললো, ''এখন আমি মধ্যপ্রাচ্যের ঝামেলার শুরুটা বুঝতে পারছি বলে মনে হচ্ছে। পুরো আরবজাহানের শাসক ছিলো তুরস্ক। আজকে তুরস্কের দখলে যদি মধ্যপ্রাচ্য থাকতো, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্মই হতো না। তুরস্ককে দুর্বল করতে সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে নামলো ব্রিটেন। আরবদেরকে উস্কিয়ে আর ইহুদীদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে ব্রিটেন তুরস্ককে হটিয়ে পুরো মধ্যপাচ্যের মাস্তান হয়ে পড়লো। তাই তার পক্ষে সম্ভব হয় ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেয়া। যেহেতু ব্রিটেন ইহুদীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তাদেরকে আবাসভূমি গড়ে দেয়ার ব্যাপারে, তাই ইহুদী ধনকুবের, বিজ্ঞানী আর গবেষকরা ব্রিটেনকে সহায়তা করলো সর্বাত্মকভাবে। আর শক্তির বলে মধ্যপ্রাচ্যের ভূমির মালিক যেহেতু হয়ে পড়লো ব্রিটেন তাই এ প্রতিশ্রুতি দেয়াটা বাস্তবসম্মতই ছিলো।''

জারিফ বললো, এক্সাক্টলি। চলো এবার আমরা বেলফোর ডিক্লারেশনটা একটু পড়ে নেই।

'বেলফোর ডিক্লারেশন' ২ নভেম্বর, ১৯১৭ঃ

৬৭টি শব্দ। যেন এক পারমাণবিক বোমা! যে শব্দগুলির বদৌলতে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি পেয়ে গেলো। আর আগুন জ্বললো মধ্যপ্রাচ্যে।

His majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievment of this object, it being clearly understood that nothing shall be done to prejudice the civil and religious rights of existin non-jewish comminities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by jews in any other country.

একটা জিনিস লক্ষ্য করো, ব্রিটেন কিংবা ইসরাইল কেউই 'বেলফোর ডিক্লারেশনটাও' ঠিকঠাকমতো মানেনি। প্রথম অংশে বলা আছে- The establishment in Palestine of a national home for the jewish people-মানে ইহুদীদের জন্য প্যালেস্টাইনে একটা জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্টার ব্যাপারটি বলা আছে।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশে একটা কথা স্পষ্ট বলা আছে- Nothing shall be done to prejudice the civil and religious rights of existin non-Jewish comminities in Palestine. মানে, প্যালেস্টাইনে অবস্থানরত অ-ইহুদী অধিবাসীদের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষুন্ন হয়, এরকম কিছুই করা হবে না।

কিন্তু অ-ইহুদী নাগরিক তথা মুসলিমদের কি নাগরিক অধিকার যে ইসরাইল দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য! মুসলমানদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে জোর করে আবাস গড়েছে ইহুদীরা। সে কাহিনী বড়ই নির্মম!

পর্ব-৭৯

ভাগবাটোয়ারার মিশন এবার প্যারিস শান্তি সম্মেলনে :

জার্মানী ও তুরস্ক তখন পরাজয়ের গ্লানিতে ধুঁকছে। তাদের তো বলার মতো কোনো কথা নাই। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের নেতৃত্বে প্যারিস শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ১৯১৯ সাল থেকে শুরু হওয়া এ সম্মেলন ১৯২০ সাল পর্যন্ত চলছিলো। ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইতালির মতো বিজয়ী শক্তিবর্গ নিজেদের পাওনা আদায়ের জন্য দরকষাকষিতে নামলো। সেই সম্মেলনে হাজির ইহুদী প্রতিনিধি ও আরবরা।

কিন্তু একি! আরবরা দেখলো তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। কিসের স্বাধীনতা, কিসের কি? উল্টো ব্রিটেন ম্যান্ডেট সিস্টেম চালু করলো। ব্রিটেনের ভাগে পড়লো ইরাক ও প্যালেস্টাইন (যার মধ্যে বর্তমান জর্ডান ও ইসরাইল), আর সিরিয়া ও লেবানন দখল করলো ফ্রান্স। আরবরা দেখলো ব্রিটেনের কথায় বিশ্বাস করে তারা ভীষণভাবে প্রতাড়িত হয়েছে।

ফ্রান্সকে কোনোরকমে সন্তুষ্ট করতে পারলেও ইহুদীরা কিন্তু ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলো।

মামুন বললো, "ইহুদীরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলো মানে? ব্রিটেন তাদেরকে এত আদর করে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দিলো-এর কি হলো?"

জারিফ বললো, ব্রিটেন প্রতিশ্রুতি দিয়েই বসে রইলো। কিন্তু কাজটা কীভাবে হবে, কবে হবে এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি। তাই ইহুদীদের চোখেও ব্রিটেন হয়ে গেলো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।

এর ফল হলো মারাত্মক। ইহুদীরা নিজেই ফিলিস্তিনে ইহুদীবাদী রাষ্ট্র গড়ার উদ্যোগ নিলো। বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে জড়ো হতে লাগলো। প্রাথমিক অবস্থায় ব্রিটেন ইহুদীদের এসব কাজে বাধা দিতো। কিন্তু ইহুদীরা বৃটিশ টহলদলকে আক্রমণ করে, স্থানীয় আরবদের সাথে গুন্ডামি করে বসতি স্থাপন করতে লাগলো। সেই থেকে শুরু হলো আরব-ইসরাইল অনন্ত লড়াই। যদিও একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ইসরাইলের আবির্ভাব হলো আরো অনেক পরে।

ম্যান্ডেট প্রথার পর যতসব ঝামেলাঃ

১৯২২ সালের ২৪ জুলাই থেকে প্যালেস্টাইনের উপর ব্রিটেনের 'ম্যান্ডেট' প্রথা কার্যকর হয়। ঘোষণা করা হয়, আগামী ২৫ বছর প্যালেস্টাইনের শাসক হবে ব্রিটেন। ১৯৪৭ সালের মধ্যে প্যালেস্টাইনকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে ব্রিটেন উক্ত অঞ্চল ত্যাগ করবে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, ইহুদীরা প্রথমে ফিলিস্তিনে আরবদেরকে খেপিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করতে চায়নি। খিয়াম ওয়াইজম্যান জেরুজালেমের গ্রাণ্ড মুফতিকে প্রাচীনকালের একটি কোরআন শরীফ উপহার দিয়ে বলেছিলেন, আরবদের স্বার্থের প্রতিকূলে ইহুদীরা কিছুই করবে না।

কিন্তু 'ম্যান্ডেট' প্রথার পর থেকে ফিলিস্তিনের আরব আর নব্য বসতিস্থাপনকারী ইহুদীদের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়তেই লাগলো।

২০ এপ্রিল, ১৯২০

এই দিনটিকে আমরা বলতে পারি আরব-ইসরাইলীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম দাঙ্গা। মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদী এই তিন ধর্মের চোখে শ্রদ্ধেয় পুরুষ হযরত মুসা আঃ এর স্বরণে নবী মুসা উৎসব চলছিলো। তিন ধর্মের তীর্থযাত্রীরা জেরুজালেমে জড়ো হলো।

জেরুজালেমের গ্রান্ড মুফতীর ভাই হাজী আমিন আল হুসাইনীর নেতৃত্বে আরবীয় মুসলিমরা স্লোগান দিলো, ইহুদীরা নিপাত যাক, জেরুজালেম আমাদের। ইহুদীরা পথের কুকুর ইত্যাদি। হাতাহাতি থেকে সংঘর্ষ শুরু হয়। ৫ জন ইহুদী ও ৪ জন আরব মারা যায়। বৃটিশ শাসক এই সংঘর্ষে জড়িতদের কঠোর হস্তে দমন করার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও দাঙ্গার অন্যতম হোতা মুফতী আমিন আল হুসাইনী জেরুজালেম থেকে পালিয়ে যান। তাকেও ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় কিন্তু পরে ক্ষমা পেয়ে যান।

১৯২১ সালে ২৬ বছর বয়সে এই মুফতী আমিন আল হুসাইনী জেরুজালেমের গ্রাণ্ড মুফতী নিযুক্ত হন। তিনি হয়ে উঠেন ফিলিস্তিনী আরব মুসলিমদের মুখপাত্র।

ফিলিস্তিন শাসনকারী বৃটিশরা চাইতো না, ইউরোপ থেকে এত বেশি সংখ্যক ইহুদী ফিলিস্তিনে আসুক। কিন্তু ধূরন্ধর ইহুদীরা সব বাধা অতিক্রম করে ফিলিস্তিনে আসতেই লাগলো। 'বেলফোর ডিক্লারেশনের' পর থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ৯০ হাজার ইহুদী ফিলিস্তিনে আসলো। কেবল ১৯২৫ সালেই আরবদের কাছ থেকে ৪৪ হাজার একর জমি কিনলো ইহুদীরা।

এদিকে ইউরোপে ইহুদীদের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করলো হিটলারের উত্থানে। ১৯৩৩ সালে ৩৭ হাজার, ১৯৩৪ সালে ৪৫ হাজার, ১৯৩৫ সালে ৬৬ হাজার ইহুদী ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে চলে আসলো।

১৯৩৬ সালে দেখা গেলো ফিলিস্তিনের আরব ও মুসলিমদের তুলনায় ইহুদীরা সংখ্যাগরিষ্ট হয়ে গেছে।

এবার জোর করে ফিলিস্তিন নিতে চাইলো ইহুদীরাঃ

প্রথম প্রথম খুব ভালো ভালো কথা বলতো ইহুদীরা। আরবদেরকে খেপানোর কোনো ইচ্ছা তাদের নাই, তারা আরবদের সাথে মিলেমিশে থাকবে, এমন সব আশ্বাসে কিছুটা হলেও আরবদের মন জয় করার চেষ্টা করতো।

শাসক ব্রিটেন নিজের জ্বালায় বাঁচে না। একদিকে ভারতসহ উপনিবেশগুলোতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র, অন্যদিকে হিটলারের উত্থানে ভয়ানক শঙ্কিত ব্রিটেন।

ফিলিস্তিনে ইহুদীদের গুণ্ডামি সামলানোর মতো পরিস্থিতি নেই ব্রিটেনের। ইহুদী নেতা বেন গুরিয়ন বৃটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য হাগানা মিলিশিয়া প্রস্তুত করলেন। বৃটিশ ও আরবদের বিরুদ্ধে গুপ্তহত্যা চালাতে লাগলো ইহুদীরা।

১৯৩৯ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল শুরু হলো। জার্মানীতে ইহুদীদের উপর চরম নির্যাতন শুরু হলো। হিটলার ইহুদীদের নির্মূল করার জন্য 'অপারেশন ফাইনাল সল্যুশন' শুরু করে দিলেন। হিটলারের ইহুদী নিধনে মহাখুশি হলেন জেরুজালেমের গ্রাণ্ড মুফতী আমিন আল হুসাইনী।

মুফতী হিটলারের সাথে সশরীরে সাক্ষাৎ করতে ইউরোপ ভ্রমণে গেলেন। ১৯৪১ সালের ২৭ অক্টোবর বেনিতো মুসোলিনী স্বয়ং মুফতীকে রোমে আমন্ত্রণ জানান। মুসোলিনী মুফতীকে আশ্বস্ত করলেন, ইউরোপে ইহুদীদের কোনো জায়গা নেই। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ইতালির সব ইহুদীদের বের করে দেওয়া হবে। আরবদের জন্য ঐক্যবদ্ধ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করা হবে।

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখ মুফতী হিটলারের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। মুফতীর সাথে কথা বলে হিটলার বেশ খুশি হলেন; কারণ দুজনেই ছিলেন মূলত ইহুদী বিদ্বেষী।

পর্ব-৮০

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

কিন্তু সব সমীকরণ পাল্টে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। জার্মানীর পরাজয় ঘনিয়ে এলে ইহুদীরা আরবদের উপর চড়াও হয়। ইহুদীরা বুঝতে পারে, ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা চলে যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশরা আরও দুর্বল হয়। জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে কিছু করার ক্ষমতা নাই বৃটিশের, এটা বিলক্ষণ বুঝে গেছে ইহুদীরা।

২৯ নভেম্বর, ১৯৪৭

জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের প্রস্তাব পাশ হলো। রেজুলেশন নং-১৮১। ইসরাইল রাষ্ট্রের পাশাপাশি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রও গঠিত হওয়ার কথা বলা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে ৩৩টি, বিপক্ষে ১৩টি। আর ১০টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। ২০০০ হাজার বছর যাবত একটি স্বাধীন দেশের অন্বেষণে যাযাবরের মতো ঘুরতে থাকা ইসরাইলীরা অবশেষে তাদের স্রষ্টা কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিবাস গড়তে সম্মত হয়।

ফিলিস্তিনী আরবদের জন্য মহাবিপর্যয় নেমে আসে। প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ ফিলিস্তিনী বাসস্থানচ্যুত হয়। তাদের এই বিপর্যয়ের নাম হয় 'নাকবা'।

১৪ মে, ১৯৪৮-বিকাল ৪ টাঃ

ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন ইহুদীবাদী আন্দোলনের স্রষ্টা থিওডোর হার্জেলের প্রতিকৃতির নীচে দাঁড়িয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। নবগঠিত রাষ্ট্রের নাম কি হবে সে ব্যাপারে কানাঘুষা চলছিলো। কেউ বললেন, জুডেয়া, জায়ন, কিংবা আইবেরিয়া অথবা হার্জেলিয়া। কিন্তু বেন গুরিয়নই প্রস্তাব দিলেন, সেটা হবে আমাদের আদি পিতা ইসরাইলের নামে।

১১ মিনিট পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারী এস ট্রুমান ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেন। নিউ ইয়র্ক নগরীতে বসবাসরত খিয়াম ওয়াইজম্যান স্বাধীন ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা শুনে উৎফুল্ল হলেন। প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন ওয়াইজম্যানকে আমন্ত্রণ জানালেন, ইসরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট হতে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান ওয়াইজম্যানকে আমন্ত্রণ জানালেন, সবার আগে হোয়াইট হাউজে সরকারিভাবে ভ্রমণ করতে।

ইসরাইলের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংবাদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের আনন্দ যেন আর ধরে না।

প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধ :

স্বাধীন ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংবাদ শুনে আরবদের রক্তে আগুন ধরে গেলো। আরব লীগের সেক্রেটারী আজম পাশা ঘোষণা দিলেন, **'এই যুদ্ধ হবে ইহুদী নির্মুলের এক গণহত্যা। এই গণহত্যা হবে মঙ্গোলিয়ান নৃশংসতা আর ক্রুসেডের নিষ্ঠুরতার মিশ্রণ।'**

ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণার পরের দিনই মিসর, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান ও লেবাননের সম্মিলিত আরব বাহিনী ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুখে যতই প্রতিরোধের কথা বলা হোক না কেন বহু দেশের সম্মিলিত বাহিনী শৃঙ্খলার অভাবে কার্যকরভাবে যুদ্ধ করতে পারলো না। আর ইসরাইলের কাছে এ যুদ্ধ ছিলো মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষার লড়াই।

যুদ্ধের কারণে বহু ফিলিস্তিনী বাস্তুচ্যুত হয়। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসের মধ্যে সবকটি দেশের সাথে ইসরাইলের শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়। ৩৫০টি ফিলিস্তিনী গ্রাম ধ্বংস হয়।

দ্বিতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধঃ

১৯৫৬ সালে মূলত মিসরের সাথে ইসরাইলের দ্বন্দ্ব হয়। ইসরাইলের সাথে যোগ দিয়েছিলো দুই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী দেশ ব্রিটেন-ফ্রান্স। মিসরের ইতিহাস বর্ণনা করার অধ্যায়ে সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে এখানে আর আলোচনা করা হলো না।

তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধঃ

ইসরাইল ততদিনে সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমেরিকার সহায়তায় বিভিন্ন প্রযুক্তি আয়ত্ত করে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। **১৯৬৭ সালের জুন মাসের ৫ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত সংঘটিত এ যুদ্ধ ছয় দিনের যুদ্ধ নামেও পরিচিত।**

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই সিরিয়া, মিসর, ও পশ্চিম তীর সংলগ্ন অঞ্চল থেকে হামলা হতো।

ছয় দিনের যুদ্ধ ইসরাইলের জন্য ছিলো মহাবিজয়। সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান মালভূমি, মিসরের কাছ থেকে সিনাই উপত্যকা দখল করে ইসরাইল। পশ্চিম তীর থেকে জর্ডানের বাহিনীকে বিতাড়িত করা হয় এবং গাজার দখল নিয়ে নেওয়া হয়। ইসরাইলের কাছে আরব রাষ্ট্রগুলির শোচনীয় পরাজয় হয়।

চতুর্থ আরব-ইসরাইল যুদ্ধ-

৬ অক্টোবর, ১৯৭৩ :

ইহুদীদের পবিত্র ধর্মীয় উৎসব ইয়ুম কাপুরের দিন। মিসরীয় ও সিরিয়ান বাহিনী ইহুদীদের উপর হামলে পড়ে। প্রথমদিকে ইসরাইলী বাহিনী কিছুটা ব্যাকফুটে ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে আবার রুখে দাঁড়ায়। যুদ্ধ শেষ হয় অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখ।

এই যুদ্ধের পর মিসরের সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক নাটকীয় মোড় নেয়। মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইসরাইলের সাথে শান্তি চুক্তির দিকে এগিয়ে যান। ফলশ্রুতিতে ইসরাইল মিসরকে সিনাই উপত্যকা ফেরত দেয়।

ইসরাইল-ফিলিস্তিনী সম্পর্কের ব্যাপারটা অসংখ্য ঘটনার ঘনঘটায় ভরপুর। এ বইতে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভবপর হলো না। পরবর্তীতে শুধুমাত্র ইসরাইল-ফিলিস্তিন সম্পর্ক নিয়েই পূর্নাঙ্গ একটি বই লিখার আশাবাদ ব্যক্ত করলাম।

পর্ব-৮১

সৌদি আরবের জন্ম:-

একবিংশ শতাব্দীর সৌদি আরব অর্থনৈতিক বলে বলীয়ান এক শক্তিশালী দেশ। তাকে সমীহ করে চলে আমেরিকাসহ বিশ্বের তাবত পরাশক্তি। তেল অর্থনীতি পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে বদলে দিয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। যদিও ধারণা করা হচ্ছে, জ্বালানি হিসেবে তেলের বিকল্প ইতোমধ্যে বিশ্ববাসী পেয়ে গেছে। একবিংশ শতাব্দীর অর্ধেকের পরের অংশেই তেলভিত্তিক অর্থনীতি পাল্টে যাবে। যা হোক, সে আলোচনা অন্যত্র করা যাবে।

জারিফ বললো, সাংবিধানিকভাবে সৌদি আরবের জন্ম ১৯৩২ সালে। জন্মের সময় সৌদি আরব ছিলো তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র এক দেশ। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তারা বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশে পরিণত হয়। এর পিছনে মূল তালিকাশক্তি হচ্ছে তেল।

১৯৩২ সালের পূর্ববর্তী ইতিহাস সৌদি আরবের জন্য লজ্জার ও অপমানের। শত শত বছর যাবত পরাধীনতার গ্লানি আর বহিঃশক্রর আক্রমণের মুখে নত হওয়ার ইতিহাস। বাঙালিদের মতোই সৌদি আরব পরাধীনতার গ্লানি টেনেছে বারবার। হযরত মুহম্মদ সাঃ এর মৃত্যুর পর খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র ছিলো মদিনা। তারপর থেকে আর কোনো রাজবংশের আমলেই সৌদি আরব ইসলামী শক্তির ভরকেন্দ্রে পরিণত হয় নি। উমাইয়াদের আমলে রাজধানী ছিলো সিরিয়ার দামেস্ক,

আব্বাসীয়দের আমলে ইরাকের বাগদাদ। সৌদি আরবের উষর ও অনুর্বর ভূমিতে রাজধানী স্থাপনের জন্য আগ্রহী ছিলো না কেউ। কিন্তু শাসন করার বেলায় এককাঠি সরেস। কারণ, ইসলামের দুই পবিত্র নগরীর খাদেম হওয়ার মর্যাদা ছিলো খুব গৌরবের ব্যাপার। আব্বাসীয়দের পর মিসরের আইয়ুবী রাজবংশ, ফাতেমীয় রাজবংশ, মামলুক রাজবংশের আমলেও সৌদি আরব তাদের অধীনস্ত অঞ্চল ছিলো।

১৫১৭ সালে অটোম্যান সুলতান সেলিম মিসরসহ পুরো মধ্যপ্রাচ্য দখলে অভিযান চালান। বহু হাত ঘুরে সৌদি আরব তারপর থেকে তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফতের অধীনে। উসমানীয়া খেলাফতের অধীন থেকে মুক্তি ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। বহু বছর যাবত তুরস্কের অধীনে থেকেও তুরস্কের কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতি সৌদি আরবকে স্পর্শ করতে পারে নি। বরং তুরস্ককে চিরকাল ঘৃণা করে আসছিলো সৌদি আরব। যার রেশ আজও রয়ে গেছে।

বিভিন্ন সময় তুরস্কের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে সৌদি আরব। প্রাথমিকভাবে কিছুটা সফল হলেও পরে নিষ্ঠুরভাবে সেসব প্রচেষ্ঠাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে তুরস্ক। চল, আমরা সেই সব কাহিনী শুনি।

১৭৪৪ সাল, ইতিহাসের প্রথম সৌদি রাষ্ট্রের জন্মঃ

মুহম্মদ বিন সৌদ-
মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব
জারিফ আলোচনা শুরু করলো।
সৌদি আরবের ইতিহাস বর্ণনা করতে হলে এই দুজনের নাম নিতেই হবে।

মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ছিলেন একজন বিশুদ্ধতাবাদী ইসলামিক স্কলার। ১৭০৩ সালে তিনি জন্মগ্রহন করেন সৌদি আরবের উয়াইনা শহরে। বিশুদ্ধতাবাদী মানে হচ্ছে-হযরত মুহম্মদ সাঃ এর মৃত্যুর পর নতুন যা কিছু ধর্মে যোগ হয়েছে, সবকিছু পরিত্যাগ করতে হবে। মূল ইসলামে ফিরে যেতে হবে। মূল ইসলামে ফিরে যাওয়ার এই যে প্রবণতা, তা ছিলো পূর্বসূরী দার্শনিক ইবনে তাইমিয়ার দর্শন।

মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের প্রবর্তিত ধর্ম ওয়াহাবী মতবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদ প্রচলিত সুফী সাধকদের বিভ্রান্ত মনে করে। আর তৎকালীন আরব বিশ্বের শাসক উসমানী খেলাফতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন এই মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "সুফী সাধকদের বিভ্রান্ত মনে করলে হবে? আমাদের উপমহাদেশে ইসলামের বিস্তার ঘটেছে মূলত সুফী সাধকদের দ্বারা। আর তুর্কিরা কি ইসলামের কোনো ক্ষতি করেছিলো?"

জারিফ উত্তর দিলো, এই বইয়ে এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না আমি। মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের মতে, ইসলাম ধর্মের যে কোন কিছুর ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য হযরত মুহম্মদ সাঃ এর কথা ও কাজই একমাত্র উৎস। অন্য কোনো ইমাম, মাজহাব কিংবা সুফী সাধকদের বাণী অনুসরণ করার দরকার নাই।

পরিস্থিতি মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের সাথে দিরিয়া অঞ্চলের শাসক মুহম্মদ বিন সৌদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্ম দেয়।

নিজের জন্মস্থান উয়াইনাতে মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হলে তিনি দিরিয়াতে চলে যান। সেখানে ১৭২৬ সাল থেকে মুহম্মদ বিন সৌদ ক্ষমতায়।

বিন সৌদ ওয়াহাবী মতবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে পড়েন। তাদের এই বন্ধন আরো জোরালো হয়, দুই পরিবারের মধ্যে বিয়ে-শাদীর প্রচলন হওয়াতে। তাই সিদ্ধান্ত হয়-

মুহম্মদ বিন সৌদ হবেন আমীর

মুহম্মদ বিন ওয়াহাব- হবেন ইমাম

মামুন প্রশ্ন করলো, "আমি তো জানতাম ১৫১৭ সাল থেকেই তুর্কীরা ছিলো সৌদি আরব তথা মধ্যপ্রাচ্যের শাসক। তাহলে কীভাবে ১৭৪৪ সালে সৌদি আরবের ভূ-খণ্ডে দিরিয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়?"

জারিফ উত্তর দিলো, সৌদি আরবের আয়তন যথেষ্ট বড়। লক্ষ্য করো, লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে মক্কা-মদিনা খুব দূরে নয়। মক্কা-মদিনাসহ সাগরের উপকূলবর্তী এলাকাতেই অটোম্যান শাসন সীমাবদ্ধ ছিলো। তাছাড়া মরুময় সৌদি আরবের অন্যান্য অনুর্বর এলাকাগুলোর প্রতি উসমানীয়দের এত আগ্রহ ছিলো না। দিরিয়া অঞ্চলের এলাকা নজদ নামেও পরিচিত। এটা মক্কা-মদিনা থেকে বহুদূরে। তাই মুহম্মদ বিন সৌদের দিরিয়া আমিরাত তুরস্কের জন্য কোনো মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি।

কিন্তু দিরিয়া আমিরাত নিজেই তার বিপদ ডেকে আনলো। মুহম্মদ বিন সৌদ ১৭৬৫ সালে মারা যান। তারপর তার ছেলে আব্দুল আজিজ ক্ষমতায় বসেন। ওয়াহাবী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আব্দুল আজিজ দিরিয়া আমিরাতের পরিধি বাড়িয়েই চললেন দিন দিন। সৌদি আরবের পূর্বদিকে বর্তমান কুয়েত ও ইরাকের কারবালা নগরী দখল করেন। শিয়াদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব ধারণ করতেন

ওয়াহাবীরা। মাজারে জড়ো হওয়া ও ইমামদের কবরকে অত্যন্ত জৌলুসময় করে তোলা শিয়াদের একটি রীতি ছিলো। আব্দুল আজিজের বাহিনী ইরাকের কারবালা নগরীতে রাসুল সাঃ এর দৌহিত্র ইমাম হোসায়েন রাঃ এর মাজারে ভাংচুর চালান। মুহম্মদ বিন ওয়াহাব ১৭৯২ সালে মারা যান।

ওয়াহাবী সাম্রাজ্য বাড়তেই লাগলো। আব্দুল আজিজের পরে আবার ক্ষমতায় বসেন আল সৌদ। আল সৌদ মারা যান ১৮১৪ সালে। আল সৌদের পর ক্ষমতায় বসেন আব্দুল্লাহ।

এবার তুরস্কের উসমানীয় সুলতানদের টনক নড়লো। ১৮০৩ সালে মক্কা-মদিনায় আক্রমণ চালান ওয়াহাবীরা। তুরস্কের অবস্থা তখন টালমাটাল। ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে বাহিনী পাঠানোর মতো অবস্থা নাই তুরস্কের। কিন্তু ১৮১৪ সালের পর ওয়াহাবীদেরকে মক্কা-মদিনা তথা হেজাজ অঞ্চল থেকে উৎখাত করার জন্য নতুন ফন্দি আঁটলেন তুর্কী সুলতান চতুর্থ মোস্তফা।

মিসরের উচ্চাভিলাষী অটোম্যান শাসকদের প্রতিনিধি মুহম্মদ আলী পাশা তুরস্কের সুলতানদের কোনো পাত্তাই দিতেন না। নিজের মতো করে মিসর শাসন করতেন। তুরস্ক না পারতো মুহম্মদ আলী পাশাকে শায়েস্তা করতে, না পারতো তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে। ওয়াহাবীদেরকে শায়েস্তা করতে তুর্কীরা মোহাম্মদ আলী পাশাকে কাজে লাগালেন। তুর্কী সুলতান চতুর্থ মোস্তফা পাশাকে বললেন, "আপনি হেজাজ ও নজদ অঞ্চল থেকে ওয়াহাবীদেরকে সমূলে উৎখাত করে ওই অঞ্চল আপনার নিজের আয়ত্তে আনেন। আপনার অধীনেই থাকবে হেজাজের মক্কা-মদিনা ও নজদ অঞ্চল।"

মৃত্যুঘন্টা বাজলো দিরিয়া আমিরাতের:

তুর্কী সুলতানের আস্কারা পেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠলেন মিসরের স্বাধীনচেতা শাসক মোহাম্মদ আলী পাশা। ১৮১৬ সালে মোহাম্মদ আলী পাশা ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা-মদিনা থেকে ওয়াহাবীদের উৎখাত করার মিশনে নামলেন। তুর্কীদের তাড়া খেয়ে ওয়াহাবীরা মক্কা-মদিনা থেকে দৌড়ে পালালো তাদের দিরিয়ায়। টানা দুই বছর ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে আঠার মতো লেগে থাকলেন উচ্চাভিলাষী মুহম্মদ আলী পাশা।

১৮১৮ সালে ওয়াহাবীদের চূড়ান্ত পতন ঘটে। দিরিয়া আমিরাতের শাসক আব্দুল্লাহকে তুরস্কের কনস্ট্যান্টিনোপলে নিয়ে আসা হয়। প্রকাশ্যে শিরশ্চেদ করা হয় তাকে। তার সহযোগী অন্যান্য ওয়াহাবী গোত্রপতিদের গণহারে ফাঁসি দেওয়া হয়। এভাবে তুরস্ক ওয়াহাবীদের প্রথম রাজ্য গঠনকে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করে। উসমানীয়দের একটা সেনাছাউনি স্থাপন করা হয় দিরিয়ায়।

দ্বিতীয় সৌদি রাষ্ট্রঃ

১৮২৪ সালে রিয়াদকে কেন্দ্র করে আবার স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ইবনে সৌদ বংশোদ্ভুত প্রিন্স তুর্কি মিসরীয় সেনাবাহিনীকে হটিয়ে তার নিজের শাসন কায়েম করেন। কিন্তু প্রিন্স তুর্কি পরবর্তীতে তুরস্কের উসমানীয় খেলাফতের সাথে সমঝোতায় আসেন। তুর্কি সার্বভৌমত্ব মেনে নেন। তুর্কিদের সাহিত্য-সংস্কৃতি সৌদি আরবের মরুময় প্রান্তরের জন্য নিয়ে আসে এক টুকরো শ্যামল সুবাতাস।

আবারও ঝামেলা বাঁধলো । ১৮১৮ সালে তুরস্কে যখন ওয়াহাবীদেরকে গণহারে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছিলো, সেই সময় বন্দীদশা থেকে পালিয়ে বাঁচা রাজপুত্র ফয়সাল প্রিন্স তুর্কিকে হত্যা করেন। ফয়সাল অটোম্যানদের মানতে অস্বীকৃতি জানান। মিসর থেকে তুর্কী বাহিনী গিয়ে ফয়সালকে গ্রেফতার করেন। এরপরের ইতিহাস আরও জটিল। এত জটিল আলোচনায় আমি যাবো না।

শুধু মনে রেখো, দ্বিতীয় সৌদি রাষ্ট্রে বারবার ক্ষমতার পট পরিবর্তন হচ্ছিলো। একবার উসমানীয়দের অনুগত শাসক ক্ষমতায় বসেন, পরে আবার বিদ্রোহ শুরু করে অন্য শাসক।

১৮২৪ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বহুবার তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে সৌদিরা। প্রায় সব বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

১৯৩২ সাল, তৃতীয় সৌদি রাষ্ট্র তথা আজকের সৌদি আরবঃ

১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সৌদি আরবের যাত্রা শুরু হয়। বৃটিশদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সৌদি আরবে রাজতন্ত্র শুরু হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৌদি আরবে বিবদমান দুটি গোষ্ঠী ছিলো। লোহিত সাগরের তীরে হেজাজ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলো শরিফ হোসাইন। আর সৌদি আরবের মধ্যাঞ্চলে নজদ অঞ্চলের শাসক ছিলেন ইবনে সৌদ পরিবার। বৃটিশদের সাথে দুই শাসকেরই ভালো সম্পর্ক ছিলো। কিন্তু বৃটিশরা দেখতে পেলো, শরিফ হোসাইন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। তিনি সৌদি আরবসহ গোটা আরব জাহানের ক্ষমতা চান। বিপরীতে নজদের শাসনকর্তা আবদুল আজিজ শুধুমাত্র সৌদি আরব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চান।

তাই বৃটিশরা অচিরেই আবদুল আজিজের পক্ষাবলম্বন করেন। আবদুল আজিজের বাহিনী হেজাজ অঞ্চল থেকে শরিফ হোসাইনকে বিতাড়িত করেন। আবদুল আজিজ তার পূর্বপুরুষ ইবনে সৌদের নামে দেশটার নামকরণ করেন- 'Kingdom of Saudi Arabia.'

তেলভিত্তিক অর্থনীতি, যেভাবে সৌদিকে বদলে দিলোঃ

১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে সৌদি আরব বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ ছিলো। ১৯৩৩ সালেই সৌদি আরবে তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়। আমেরিকার টেক্সাস কোম্পানী তেল উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত হয়। টেক্সাস কোম্পানীর নাম বদলে হয় 'Arabian American Oil Company (Aramco).'

যদিও আমেরিকান কোনো দূতাবাস সৌদি আরবে ছিলো না; কিন্তু সৌদি আরবকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে লাগলো আমেরিকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৌদি আরব একটু বিপাকে পড়েছিলো। জার্মানীর সাথে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ থাকলেও সৌদি বাদশাহ আমেরিকার দিকেই ঝুঁকে পড়লেন। গোপনে তিনি রুজভেল্টের সাথে যোগাযোগ করতে লাগলেন।

১৯৪৩ সালে সৌদি আরবের দাহরানে একটি বিমান ঘাঁটি নির্মান করার চুক্তি হয় আমেরিকা আর সৌদি আরবের মাঝে। যদিও যুদ্ধের সময় তার নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। যুদ্ধের পরে দাহরানে বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করা হয়। আজ তা আমেরিকার বাইরে আমেরিকার সবচেয়ে বড় ও সুসজ্জিত বিমান ঘাঁটি।

১৯৫০ সালের পর থেকে তেল রপ্তানি থেকে অর্থ ঢুকতে থাকে সৌদি আরবে। তেল বিক্রি করে অঢেল অর্থের মালিক হয় সৌদি আরব। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। আমেরিকা, জাপান, ব্রিটেনসহ উন্নত দেশগুলো সৌদি আরবের সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পর্ক তৈরি করে। আজ সৌদি আরবের মোট রপ্তানি আয়ের ৯০ ভাগের বেশি তেল রপ্তানী থেকেই আয় হয়।

****

পর্ব-৮২

বিংশ শতাব্দীর ইরানঃ

বিংশ শতাব্দীর ইরানের শুরুটা হয়েছিলো হালের গরু আর লাঙ্গল নিয়ে, একবিংশ শতাব্দীর সেই ইরান পারমাণবিক শক্তিধর এক উন্নত রাষ্ট্র। সে পরাশক্তি আমেরিকার সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে, মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার খ্যাত ইসরাইল একমাত্র ইরানকেই সমীহ করে চলতে বাধ্য হয়। পুরো বিংশ শতাব্দী জুড়ে ইরানের বুকে ব্যাপক পালাবদল ঘটেছে। আমরা ধীরে ধীরে সব কাহিনী শুনবো।

ইরানকে নিয়ে গল্পে যাওয়ার আগেঃ

প্রথমেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো মামুন," নিশ্চয়ই ইরানের ইতিহাস মানে সেই পশ্চিমা ডাকাতদের আগমন, লুটপাট, হত্যাযজ্ঞ এসব? কারণ তোমার সাথে

আলাপ আলোচনা করে যা বুঝতে পারলাম তা হলো, বিংশ শতাব্দীতে প্রত্যেকটা দেশ নিয়ে আলাপ করলেই সেখানে চলে আসবে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আনাগোনা।"

জারিফ বললো, তোমার ধারণা অনেকটাই ঠিক। তবে ইরানের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা ছিলো একটু অন্যরকম। ইরান একেবারে সাম্রাজ্যবাদীদের কলোনী হয়ে উঠে নি, ইরানে একটা রাজবংশ ছিলো, সেই রাজবংশই ইরানকে শাসন করতো। ভারতবর্ষ, মিসর, নাইজেরিয়া, ঘানা এসব দেশগুলি যে অর্থে ব্রিটেনের কলোনী হয়েছিলো সম্পুর্ণ পরাধীন হয়ে, ইরান এরকম পরাধীন ছিলো না। ইরানের কাজার রাজবংশ ইরানকে শাসন করতো বৃটিশের আনুগত্য লালন করে।

মামুন বললো, "তার মানে ইরানের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী হলো বৃটিশরা।"

শুধু বৃটিশ নয়, রাশিয়ানরাও এ ক্ষেত্রে ছিলো বৃটিশের সহযোগী-জারিফের উত্তর।

ইরান ছিলো ব্রিটেন-রাশিয়ার যৌথ প্রযোজনার ডাকাতির হালখাতা। ইরানকে নিয়ে ব্রিটেন-রাশিয়ার যুদ্ধটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে 'Great game' নামে পরিচিত। এই দু'টো শক্তিই ইরানকে ভাগ করে খেতে চাইতো, সরাসরি কোনো যুদ্ধে না জড়িয়ে। প্রথমেই বৃটিশকে নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করবো।

ইরানে বৃটিশ উপস্থিতিঃ

ইরানকে নিয়ে ব্রিটেনের বাড়তি মনোযোগের একটা কারণ হলো ভারতবর্ষ দখল। ইংরেজরা যখন মোঘলদের হটিয়ে ভারতবর্ষের শাসনভার নিতে যাচ্ছিলো, তখন দেখা গেলো, ভারতের রাজভাষা হচ্ছে ফারসি। আমরা জানি, আমাদের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান লেখার প্রাথমিক কাজটা করেছিলেন ইউরোপীয়রা। এ কাজটা ইংরেজরা করেছিলো তাদের নিজেদের স্বার্থে। কারণ উপনিবেশটাকে ঠিকঠাকমতো শাসন করতে হলে নেটিভদের ভাষা আগে শিখতে হবে।

ঠিক একই কারণে পুরো ভারতবর্ষের সমস্ত প্রশাসনিক কাজ, আগের দলিলপত্র সবকিছু ফারসি ভাষায় হওয়াতে বৃটিশের কর্মকর্তাগণ ইরানে গিয়ে ফারসি ভাষা শিখে ভারতবর্ষে আগমন করতো। এভাবেই ইরানের সাথে ব্রিটেনের প্রথম যোগাযোগটা স্থাপিত হয় ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে।

মনে রাখতে হবে, ইরানীরা ভারতবর্ষের লোকজনের মতো এতো নরম আর বহিঃশত্রু দ্বারা শত শত বছর যাবত শাসিত হওয়া কোনো জাতি নয়। বরং ব্রিটেনের জন্মের আরও হাজার বছর আগে ইরানীরা ছিলো দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদী। খৃস্টের জন্মের আরও ৫০০ বছর আগে ইরানে গড়ে উঠেছিলো আকামেনিদ সাম্রাজ্য। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, তুরস্ক, মধ্য এশিয়া এবং চীন-

পাকিস্তান জুড়ে ছিলো বিশাল আকামেনিদ সাম্রাজ্য। ইরানের ভূ-খণ্ডে গড়ে উঠা পারসিক সাম্রাজ্যকে বলা হয় বিশ্বের বুকে গড়ে উঠা প্রথম পরাশক্তি। তাই ইরানকে ভারতের মতো কলোনী বানাবার কথা বৃটিশরা চিন্তাও করেনি। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইরান অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে জেরবার হলে ব্রিটেন ইরানে প্রভাব বাড়ানোর সাহস পায়। বহু রাজবংশ ঘুরে ১৭৯৬ সাল থেকে ইরানে কাজার রাজবংশ ক্ষমতায়।

১৮০০ সালের পর থেকে ইরানের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। ইরানের দুর্বল অর্থনীতির সুযোগে বৃটিশরা তাদের প্রতিপত্তি বাড়ানোর চিন্তা করে। এর আগে রাশিয়ার কাছে বেশ কিছু ভূ-খণ্ড হারিয়ে ইরান আফগানিস্তানের হেরাত ও কান্দাহার প্রদেশ দখল করতে চেয়েছিলো।

যেহেতু ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন তখন জাঁকিয়ে বসেছে, আফগানিস্তান একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো অন্য সব পরাশক্তির কাছে। বৃটিশরা নিজেরা যেরকম আফগানিস্তান দখল করতে পারেনি, তাই অন্যরা যাতে এটা দখল করে বৃটিশের সীমানাকে স্পর্শ করতে না পারে, সেজন্য বৃটিশরা সজাগ ছিলো। তাই ইরান আফগানিস্তানের হেরাত দখলের পাঁয়তারা করলে বৃটিশের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধংদেহী অবস্থান তৈরী হয়।

অবশ্য দুর্বল ইরান ব্রিটেনের সামান্য তৎপরতায় সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ১৮৫৭ সালে ইরান-ব্রিটেনের মাঝে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিজেদের ভুল স্বীকার করে ইরান হেরাত থেকে সৈন্য সরায়।

এই ঘটনার পর থেকে ইরানে বৃটিশ উপস্থিতি আরও বৃদ্ধি পায় অর্থনৈতিক কারণে। দৈন্যদশায় জর্জরিত হয়ে কাজার বংশের শাসক নাসের-আল-দ্বীন শাহ ১৮৭২ সালে জুলিয়াস ডি রয়টার্সের কাছে ২ লাখ পাউন্ডের বিনিময়ে ইরানের রেল লাইন, সড়ক, বাঁধ ও খনিগুলো ইজারা দেন। ইনিই সেই বিখ্যাত রয়টার্স যার নামে পৃথিবী বিখ্যাত সংবাদসংস্থা।

১৮৯১ সালে নাসের-আল-দ্বীন শাহ তামাক পণ্যের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ আরেকজন বৃটিশ নাগরিক মেজর টালবুটের কাছে বিক্রি করে দেন। যদিও এটা নিয়ে রাশিয়ার আপত্তি এবং পুরো ইরান জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভের জন্ম হয়। ইতিহাসে এ আন্দোলন 'টোব্যাকো বয়কট' নামে পরিচিত। সোজা কথা ইরানের অর্থনীতি প্রায় অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিলো ব্রিটেনের দ্বারা।

ইরানে রাশিয়ার উপস্থিতি:

১৬৫১ সাল থেকেই রাশিয়ার সাথে ইরানের বিরোধ চলে আসছিলো ককেশাস অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। ইরানের বিরুদ্ধে একদিকে ছিলো তুরস্কের অটোম্যান

খেলাফত, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া। এই দুই শত্রুর মোকাবেলা করতে গিয়ে দিন দিন দুর্বল হচ্ছিলো ইরান। ১৮০৪ সাল থেকে শুরু হওয়া ককেশাস যুদ্ধে ইরান হেরে বসে। যুদ্ধ শেষ হয় ১৮১৩ সালে। ককেশাসের দেশ আজারবাইজান দখল করে রাশিয়ানরা।

১৮২৬ সালে আজারবাইজানের মালিকানা ফিরে পাওয়ার জন্য আবার যুদ্ধে নামে ইরান। উল্টো যুদ্ধে হেরে বসে এবং রাশিয়াকে আর্মেনিয়া দিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

ইরানের সাথে এই দুইটি যুদ্ধে রাশিয়ার সাহস বেড়ে যায়। ব্রিটেনের সাথে মিলে রাশিয়া ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইরানে দখলদারিত্ব চালালো।

১৯০৭ সালে ইরানকে নিয়ে ব্রিটেন-রাশিয়া একটা চুক্তি করে। ইউরোপের নব্য পরাশক্তি জার্মানীর উত্থানে ভীত হয়ে দুই দেশ সিদ্ধান্ত নেয়, রাশিয়াকে নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কোনো ঝগড়া বিবাদ করবে না। মীমাংসা হয় রাশিয়া আফগানিস্তানের দিকে নজর দিবে না। আর ইরানকে দুটি দেশ ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত করে কর্মকাণ্ড চালাবে। উত্তর ইরান ও ককেশাস অঞ্চলগুলি থাকবে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে, আর পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলগুলি ছিলো বৃটিশ-নিয়ন্ত্রিত। যদিও কর্মকাণ্ডগুলো ছিলো অর্থনৈতিক। রাজনৈতিকভাবে ইরান কখনোই কোনো দেশের কলোনীতে পরিণত হয়নি।

দুর্বল কাজার রাজবংশের পতন ও পাহলবীদের উত্থানঃ

ইরানের মাটিতে এভাবে যা খুশি তা করে বেড়াবে ব্রিটেন-রাশিয়া, সেটা সহ্য হচ্ছিলো না ইরানের মধ্যবিত্ত শ্রেণির। তারা আর একচেটিয়া রাজার শাসন মানতে পারছিলো না। প্রতিনিধিত্বকারী পার্লামেন্টের দাবিতে ১৯০৫ সালে ইরানে সাংবিধানিক বিপ্লব সংঘটিত হয়।

মধ্যবিত্তদের দাবির মুখে রাজার ক্ষমতা খর্ব করে ইরানের পার্লমেন্টে মজলিশ চালু হয় ১৯০৬ সালে।

কিন্তু হায়! পশ্চিমা পণ্ডিতদের কথা ধার করে বলতে হয়, প্রাচ্য দেশে আবার গণতন্ত্র? মজলিশ স্বাধীনভাবে চলতেই পারছিলো না। একদিকে রাজার হস্তক্ষেপ, অন্যদিকে বিদেশী দুই প্রভু ব্রিটেন-রাশিয়াকে মন খুশি রেখে চলতে হয়। এমতাবস্থায় পার্লামেন্ট কিভাবে সচল থাকে?

শেষমেষ পার্লামেন্ট ভেঙে যায় অন্য একটা কারণে। দুর্বল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য ইরানের পার্লামেন্ট ১৯১১ সালে আমেরিকান অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম মরগান সুস্টারকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। এই মার্কিন অর্থনীতিবিদ দেশের রাজস্ব ব্যবস্থাকে আমূল পাল্টে দেওয়ার উদ্যোগ নেন।

এই ভালো উদ্যোগটা পছন্দ হলো না ব্রিটেন-রাশিয়ার। তাদের তো দরকার দুর্বল ইরান। শক্তিশালী ইরান তাদের স্বার্থের বিরোধী। সুস্টারকে সরানোর জন্য ইরানের রাজা আহমেদ শাহকে চাপ দেয় ব্রিটেন-রাশিয়া। রাজা আহমেদ শাহ এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাবি মেনে সুস্টারকে সরিয়ে দেন ও পার্লামেন্ট মজলিশ ভেঙে দেন।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ব্রিটেন-রাশিয়ার কাছে ইরান হয়ে উঠে গুরুত্বপূর্ণ। অক্ষশক্তির দুই বন্ধুরাষ্ট্র জার্মানি ও তুরস্ক ইরান সীমান্তে সেনা পাঠায়। ইরানের সার্বভৌমত্ব বলতে কিছুই আর থাকলো না। যার মন চায় ইরানের ভিতর ঢুকে পড়ে সেনাবাহিনী নিয়ে। দুর্বল রাজা আহমদ শাহ কিছুই করতে পারেন না।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লব ইরানের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠে। রাশিয়ার নেতা ভ্লাদিমির লেনিন রাশিয়ার সব সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করে রাশিয়ার মূল ভূ-খণ্ডে ফিরে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী কুকুরদের কামড়াকামড়ি' হিসেবে অভিহিত করে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায় রাশিয়া।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইরানের উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করতে চাইলো ব্রিটেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটেন আর পারছিলো না, ইরানকে তাদের বশংবদ করে রাখতে। ১৯২১ সালের মধ্যে ব্রিটেন ইরান থেকে তাদের সমস্ত উপদেষ্টাদের ফিরিয়ে আনলো।

ইরানে যখন এরকম পালাবদল চলছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে তলে তলে শক্তি বাড়াচ্ছিলেন রেজা খান নামে এক সামরিক কর্মকর্তা। ১৯২১ সালেই রেজা খান তার অধীনস্ত সামরিক অফিসারদের নিয়ে রাজা আহমদ শাহের বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান ঘটান। ভীতসন্ত্রস্ত রাজা তাকে প্রথমে যুদ্ধমন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। সমস্ত সেনাবাহিনীর কাছ থেকেও আনুগত্য লাভ করেন রেজা খান।

পার্শ্ববর্তী তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের মতো স্বঘোষিত একনায়ক হওয়ার বাসনা জাগে রেজা খানের। ১৯২৫ সালে কাজার রাজবংশের সর্বশেষ রাজা আহমদ শাহকে উৎখাত করে রেজা খান 'রেজা শাহ' উপাধি লাভ করে ইরানের সর্বময় ক্ষমতা লাভ করেন। নিজের নামের শেষে পাহলভী উপাধি লাগিয়ে 'রেজা শাহ পাহলভী' রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সাজেন।

পর্ব – ৮৩

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইরানঃ

রেজা শাহ পাহলভী ১৯২৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ইরানের ক্ষমতায় ছিলেন। আধুনিক যুগের যত ভালো কিছু ইরানের সূচনা হয়েছে তার মূলে ছিলো রেজা শাহ পাহলভীর ক্ষমতাকাল। তিনি ইরানে নতুন যুগের গোড়াপত্তন করেন। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য বেশি প্রগতিশীল হতে গিয়ে নারীদের বোরখা পড়াকে নিষিদ্ধ করেন। বিয়ের জন্য নারীদের বয়স সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। চিকিৎসা, প্রকৌশলবিদ্যা সবদিক দিয়ে ইরান এগিয়ে যেতে থাকে। ইরানে ১৯০৮ সালেই রপ্তানিযোগ্য তেল সরবরাহে বিশ্বের দৃষ্টি কাড়তে সমর্থ হয়। বিদেশী কোম্পানীর সাথে অনেক দরকষাকষি করে দেশের স্বার্থের অনুকূলে রেজা শাহ যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নেন।

প্রাচ্যদেশীয় শাসকের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে, সে ব্যাপারটাতে অবশ্য পিছিয়ে ছিলেন না রেজা শাহও। সমস্ত দলকে নিষিদ্ধ করে, শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন বেআইনী ঘোষণা করে দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশ শাসন করছিলেন। ব্রিটেনের প্রভাব না থাকায় ইরান জার্মানির দিকে ঝুঁকে পড়ে। জার্মানি থেকে দলে দলে উপদেষ্টারা গিয়ে ইরানের তেলভিত্তিক অর্থনীতির হাল ধরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রেজা শাহের সাজানো সংসার এলোমেলো করে দিলোঃ

সবাই জানেন ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। জার্মানির ভয়ে পুরো ইউরোপ কম্পমান। ১৯৪১ সালে জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করে, তখন ব্রিটেন ভাবলো, এই বুঝি সব শেষ! জার্মানদের হাতে রাশিয়ানরা মাস খানেকের মধ্যেই পরাজিত হবে।

ব্রিটেনের ভাগ্য ভালো, রাশিয়ানরা জার্মানদের ঠেকিয়ে দিয়েছিলো। ইরান হয়ে উঠে ব্রিটেন-রাশিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইরানের শাসক রেজা শাহ বড্ড নাছোড়বান্দা। তিনি জার্মানীর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য পাগল হয়ে উঠছিলেন। এ কারণেই রেজা শাহকে ব্রিটেন ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেন। ক্ষমতায় বসানো হয় তার ছেলে মোহাম্মদ রেজা শাহকে। ১৯৪৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত শাহ মারা যান দক্ষিণ আফ্রিকায়।

মোসাদ্দেকের পতন ও শাহের উত্থানঃ

অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশের লোক মোহাম্মদ মোসাদ্দেকের জন্ম হয়েছিলো ১৮৮০ সালে। আইনশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা নেন সুইজারল্যান্ডের লুসান ইউনিভার্সিটি থেকে। তারপর ইরানে ফিরে আসেন ১৯১৪ সালে। গুরুত্বপূর্ণ

ফারস প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালে রেজা খানের সামরিক শাসন শুরু হলে তিনি তার বিরোধিতা করেন; পরে স্বেচ্ছায় অবসর নেন।

১৯৪১ সালে যখন ব্রিটেন-রাশিয়া যৌথভাবে শাহকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেন তখন তিনি আবার রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ১৯৪৪ সালে ইরানের পার্লামেন্ট মজলিশের সদস্য নির্বাচিত হন।

ধীরে ধীরে মোসাদ্দেক অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেন। ইরানের তেলক্ষেত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো কুখ্যাত এ্যাংলো-ইরানিয়ান তেল কোম্পানি; যার পরিবর্তিত বর্তমান নাম 'ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম বা বিপি'। বিপুল পরিমাণ তেলের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তেল থেকে অর্জিত রাজস্ব পুরোটাই চলে যেত ব্রিটেনের পেটে। মোসাদ্দেক দেশের তরুণ সমাজসহ শিক্ষিত সমাজকে প্রতিনিয়ত জাগিয়ে তুলেছিলেন এই বলে যে, আমাদের দেশের তেলক্ষেত্র আমাদের হাতেই থাকবে। তেল উত্তোলনের প্রযুক্তি ইরানই আয়ত্ত করবে।

১৯৫১ সালে সত্যি সত্যিই যখন মোসাদ্দেক দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন, তখন যেন মাথায় বাজ পড়লো ব্রিটেনের। ব্রিটেন আমেরিকার কাছে সাহায্য চাইলেন।

১৯৫২ সালে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আইসেনহাওয়ার শপথ নেওয়ার পরই তিনি সিআইএ-কে বলে দিয়েছিলেন, "যেভাবেই হোক ইরানের মোসাদ্দেককে সরাতে হবে।"

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা স্বৈরশাসক শাহ বহুগুনে ভালো আমেরিকার জন্য।

মামুন বললো, "তুমি বললে আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুরো বিশ্বের মুক্তিদাতা; সেই আমেরিকা কিভাবে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে শাহ এর মতো একনায়ককে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়?"

জারিফ বললো, আমি আমেরিকার প্রশংসা করি বিভিন্ন কারণে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত ইউরোপের পাশে যদি আমেরিকা না দাঁড়াতো তাহলে পুরো মানবজাতিই হুমকির মুখে পড়তো। তাছাড়া ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা যাতে তাদের কলোনীগুলোকে স্বাধীন করে দেয়, এ ব্যাপারে আমেরিকা সব সময়ই উচ্চ কণ্ঠ ছিলো।

কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের সময়কালে রাশিয়াকে ঠেকাতে গিয়ে আমেরিকা একটা ঘৃণ্য কাজ করেছে পুরো বিশ্বব্যাপী। তা হলো, রাশিয়ার পক্ষাবলম্বনকারী সরকার যতই ভালো হোক, যতই গণতান্ত্রিক হোক, সেই সরকারকে যে কোনো মূলে সরাতে হবে। সেই সরকারের বিরুদ্ধে নৃশংস সামরিক সরকারকে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে আমেরিকা।

এই কাজটা মধ্য আমেরিকার দেশ গুয়াতেমালায় হয়েছে, চিলিতে হয়েছে, কম্বোডিয়াতে হয়েছে, লাতিন আমেরিকার ১৫টি দেশে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করেছে শুধুমাত্র আমেরিকার সমর্থনে। পাকিস্তানের সামরিক সরকার ছিলো আমেরিকার ঘনিষ্ট মিত্র। আমেরিকা নিজের দেশে ও পশ্চিম ইউরোপে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলেছে, কিন্তু অন্যত্র কমিউনিজম ঠেকানোর দায়ে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। ঠিক সেই ঘটনাই ঘটেছে ইরানে ১৯৫৩ সালে।

আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-৬ এর যৌথ প্রযোজনাঃ-

আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও বৃটিশ গোয়েন্দ সংস্থা এমআই-৬, মোসাদ্দেককে সরানোর জন্য তৎপর হয়।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "একটি গোয়েন্দা সংস্থা কিভাবে অন্য একটি দেশের সরকারকে হটিয়ে দেয়?"

জারিফ বললো, সিআইএ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সেজন্য তোমাকে জানতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানটির জন্মই হয়েছিলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মার্কিন বিরোধী সরকারকে উৎখাত করার জন্য।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের নাতি কারমিট রুজভেল্টের নেতৃত্বে মোসাদ্দেক সরকারের বিরুদ্ধে সাজানো বিক্ষোভ আয়োজন করা হয় তেহরানে। ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসের ১৯ তারিখ মোসাদ্দেক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলবী ইরানের সর্বেসর্বা বনে যান।

মোসাদ্দেককে ক্ষমতা থেকে হটানোর পর ইরান আমেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ট মিত্রে পরিণত হয়। বিপ্লবের প্রথম তিন সপ্তাহ পরেই আমেরিকান সরকার ৬৮ মিলিয়ন ডলার জরুরি সহায়তা তহবিল ঘোষণা করে ইরানের জন্য। পরবর্তী দশ বছরে সেই সাহায্যের পরিমাণ ১.২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়।

ক্ষমতায় এসেই ইরান আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে একটি চুক্তি করে। রাষ্ট্রায়ত্ত তেলক্ষেত্রগুলোর ৪০ শতাংশ মালিকানা এসব দেশের কোম্পানীগুলোকে ২৫ বছরের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়। গোলামি আর কাকে বলে?

পর্ব-৮৪

আমেরিকান তাঁবেদার রেজা শাহের শাসনঃ-

মোসাদ্দেকের পতনের পর ইরানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন মোহাম্মদ রেজা শাহ। ইরান হয়ে উঠে আমেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র।

মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে আধুনিক ও প্রগতিবাদী দেশ হিসেবে ইরান পরিচিত হয়। ১৯৬৩ সালে রেজা শাহ হোয়াইট রেভ্যুলুশন শুরু করেন। ইরানে শুরু হয় ব্যাপক শিল্পায়ন, নগরায়ন ও পশ্চিমীকরণ। তেল বিক্রির টাকা থেকে ইরানের অর্থনীতির গতি সঞ্চার হয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইরান যতই আমেরিকার মিত্র হোক না কেন, চলনে-বলনে ইরানের শাহ ছিলেন অত্যন্ত স্বৈরাচারী। আর কে না জনে, আমেরিকা তার স্বার্থের অনুকূলে থাকলে যে কোন স্বৈরাচারকে কোলে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। মুখে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলে ফেনা তুলবে আমেরিকা; কিন্তু অজস্র স্বৈরাচার আমেরিকার ছত্রচ্ছায়ায় লালিত পালিত হচ্ছিলো দশকের পর দশক।

প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ১৯৭২ সালের মে মাসে ইরান সফর করেন। প্রতিবেশী ইরাকের বিরুদ্ধে যে কোন হুমকি মোকাবেলায় আমেরিকা পাশে থাকবে এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।



ছবি ৩১ : ইরানের রেজা শাহ পাহলবীর সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি। আমেরিকা আর ইরান ছিলো সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র।

মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে আধুনিক ও প্রগতিবাদী দেশ হিসেবে ইরান পরিচিত হয়। ১৯৬৩ সালে রেজা শাহ হোয়াইট রেভ্যুলুশন শুরু করেন। ইরানে শুরু হয় ব্যাপক শিল্পায়ন, নগরায়ন ও পশ্চিমীকরণ। তেল বিক্রির টাকা থেকে ইরানের অর্থনীতির গতি সঞ্চার হয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইরান যতই আমেরিকার মিত্র হোক না কেন, চলনে-বলনে ইরানের শাহ ছিলেন অত্যন্ত স্বৈরাচারী। আর কে না জনে, আমেরিকা তার স্বার্থের অনুকূলে থাকলে যে কোন স্বৈরাচারকে কোলে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। মুখে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলে ফেনা তুলবে আমেরিকা; কিন্তু অজস্র স্বৈরাচার আমেরিকার ছত্রচ্ছায়ায় লালিত পালিত হচ্ছিলো দশকের পর দশক।

প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ১৯৭২ সালের মে মাসে ইরান সফর করেন। প্রতিবেশী ইরাকের বিরুদ্ধে যে কোন হুমকি মোকাবেলায় আমেরিকা পাশে থাকবে এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।



ছবি ৩১ : ইরানের রেজা শাহ পাহলবীর সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি। আমেরিকা আর ইরান ছিলো সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবঃ

১৯৭৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ইরানের শাসক রেজা শাহ পাহলবী ইরানজুড়ে সামরিক আইন জারী করেন। কিন্তু শাহের বিরুদ্ধে ইরানের সর্বস্তরের মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লো।

১৯৭৮ সালে নভেম্বর মাসের ৫ তারিখ থেকে ইরানের রাজপথ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ছাত্র জনতা পথে নেমে পড়ে। লাখ লাখ ইরানি জনতা শাহের পতনের দাবিতে স্লোগান তুলে। বিস্ফোরোন্মুখ পরিস্থিতি দেখে পরের দিন ৬ নভেম্বর ইরানের টেলিভিশনে ভাষণ দেন। প্রতিবাদকারীদের প্রতি তিনি একাত্মতা ঘোষণা করেন।

কিন্তু শাহের মিষ্টি কথায় তুষ্ট হতে রাজি নয় ইরানিরা। পরিস্থিতি এমন হলো যে, জনতা রাস্তা থেকে কোনোমতেই সরতে রাজি নয়। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরের ২ তারিখ থেকে শুরু হওয়া পবিত্র মুহাররাম মাসেও জনতা কারফিউ চললো পুরো ইরান জুড়ে। ইরানের শাহ বুঝতে পারলেন তার বিদায়ের দিন সমাগত।

নতুন বছর ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারি ইরান থেকে মিসরে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি শাপুর বখতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে যান; যাতে করে তিনি ফ্রান্সে নির্বাসিত আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সাথে দর কষাকষি করে টিকে থাকতে পারেন। ইরানের শাহ চেয়েছিলেন, ক্ষমতা যাতে কোনোমতেই কট্টরপন্থী শাহের কাছে না যায়। শাপুর বখতিয়ার আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে ইরানে আসার অনুরোধ জানান।

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখ খোমেনী ইরান আসলেন। খোমেনীর জন্য আবেগে ভাসলো পুরো ইরান।

কিন্তু শাহের নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রীর সাথে কাজ করতে নারাজ খোমেনী। তিনি তার নিজের পছন্দের লোক মেহেন্দী বাজারগানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ তারিখ ইরানের সেনাবাহিনী জানিয়ে দিলো, তারা আর প্রধানমন্ত্রী শাপুর বখতিয়ারের নির্দেশ মানবে না। পতন ঘন্টা বেজে গেলো শাপুর বখতিয়ারের। বিপ্লবের ষোলোকলা পূর্ণ হলো ইরানে।

১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসের ১ তারিখ ইরানের নতুন নামকরণ করা হয় 'ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান'।

এখানে আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করতেই হবে। পরাশক্তিধর আমেরিকা শাহের আমলে ছিলো ইরানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু খোমেনীকে দেখতেই পারতো না আমেরিকা। ইসলামী বিপ্লবের পর ইরান বন্ধু রাষ্ট্র থেকে রাতারাতি শত্রু রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তারপর ইরানের ছাত্ররা আমেরিকান দূতাবাসের কর্মকর্তাদের বন্দী

করলে শত্রুতার উপর চিরস্থায়ী সিলমোহর পড়ে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এটা আমেরিকার জিম্মি সংকট নামেও পরিচিত।

ঘটনার বিস্তারিত এখানে তুলে ধরা হলোঃ

ইরানের ক্ষমতাচ্যুত শাহ মিসরে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু তার ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শাহের ইচ্ছার প্রতি সন্মান জানিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার তাকে আমেরিকা আসার জন্য ভিসা দেন। এ সংবাদে ফুঁসে উঠছিলো ইরানের সাধারণ জনগণ।

৪ নভেম্বর, ১৯৭৯:

শাহ আমেরিকায় পা রাখলেন। আর যায় কোথায়! এ খবর পাওয়ামাত্রই ইরানের ছাত্ররা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো। কিন্তু সমস্যা হলো, মনের ঝাল মেটানোর রাস্তা কোথায়? ইরানের ছাত্ররা কাকে আক্রমণ করবে, কিংবা কার উপর প্রতিশোধ নিবে?

অবশেষে ঘৃণ্য পথ বেছে নিলো ইরানের ছাত্র জনতা। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, একটা দেশের দূতাবাস অন্য কোনো দেশে অবস্থিত হলেও অবস্থানকারী দেশের কোনো আইন কানুন কিংবা সার্বভৌমত্ব দূতাবাসের উপর প্রযোজ্য নয়।

ইরানে তখনও আমেরিকান দূতাবাস ছিলো। আইন অনুযায়ী সে দূতাবাস আমেরিকার সম্পত্তি। তাই সেখানে ইরানের কোনো নিয়ম কানুন প্রযোজ্য নয়। ইরানের ছাত্ররা সব রাগ গিয়ে ঝাড়লো আমেরিকান দূতাবাসের উপর। দূতাবাসে প্রবেশ করে ব্যাপক ভাংচুর করলেন, আসবাবপত্র তছনছ করলেন। আর ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন ৬৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে। শুরু হলো দূতাবাসের জনবল নিয়ে জিম্মি তৎপরতা।

৬৬ জনের মধ্য থেকে পরবর্তীতে ১৩ জনকে ছেড়ে দেওয়া হলো। কারণ এদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা ছিলেন, কয়েকজন অন্য দেশের নাগরিক ছিলেন। খোমেনী বলেছিলেন, "এরা আমেরিকার আগ্রাসনের স্বীকার।" স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে আরও ১ জনকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ৫২ জনকে জিম্মি করে ইরানের খেলা শুরু হলো।

ইতোমধ্যে নতুন বছর ১৯৮০ সাল চলে এলো। সে বছর আমেরিকার সাধারণ নির্বাচন। আমেরিকার লোকজন দেখলো, জিমি কার্টার অযোগ্য ও ব্যর্থ। তিনি আমেরিকান দূতাবাসের নিরাপত্তা দিতে পারেন না। আমেরিকান মিডিয়া জিমি কার্টারকে শাপ-শাপান্ত করতে লাগলো।

জিমি কার্টার দেখলেন, এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে তিনি হারতে চলেছেন। তিনি যে কোনো উপায়ে জিম্মি উদ্ধারে তৎপরতা চালালেন। সামরিক উপায় বেছে নিলেন।

১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে "অপারেশন ঈগল ক্ল" নাম দিয়ে তিনি একটা বাহিনী তৈরী করলেন। যাদের কাজ হবে, তুমুল অভিযানের মাধ্যমে জিম্মিদেরকে ইরানের মাটি থেকে নিয়ে আসা। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ হলেও জিমি কার্টার করতে চাইলেন।

কিন্তু হায়! জিমি কার্টারের কপাল খারাপ। মরুঝড়ের কবলে পড়ে অপারেশন পরিচালনাকারী বিমান। আটজন দুর্ধর্ষ কমান্ডোর মৃত্যু হয়।

নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। জিমি কার্টারের অবস্থা জঘন্য। বাস্তবে হলোও তাই। বিপুল ভোটে জিমি কার্টারকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসলেন রিপাবলিকান প্রার্থী রোনাল্ড রিগ্যান। রোনাল্ড রিগ্যানের প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিলো, শপথ নিয়েই তিনি জিম্মি উদ্ধার করবেন। এটা হবে তার প্রথম কাজ।

২১ জানুয়ারি, ১৯৮১

রোনাল্ড রিগ্যান ক্ষমতা নেওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই জিম্মিদের মুক্ত করে দেয় ইরান। ৪৪৪ দিন পর মুক্তির স্বাদ পায় কূটনীতিকেরা। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, ইরানের শাসকগোষ্ঠীর সাথে মাথা নত করে রিগ্যান তাদের সব দাবি মেনে নিয়েছিলেন গোপনে, তাই রিগ্যান সফল হয়েছিলেন। রিগ্যান অবশ্য নিজে সেসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

জিম্মি উদ্ধার সফল হলেও ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক আর গড়ে ওঠেনি; যেটা অদ্যাবধি বিরাজমান।

পর্ব-৮৫

বিংশ শতাব্দীর মিসরঃ

বিংশ শতাব্দীর মিসরের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে হবে তুরস্কের উসমানীয়া সুলতানদের শাসন ও ফরাসি সমরনায়ক নেপোলিয়ানের নাম। যদিও ১৮৮২ সাল থেকে মিসর ছিলো ব্রিটেনের দখলে আর নেপোলিয়ান মারা যান তারও আগে ১৮২১ সালে।

তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফতের নাম এজন্য নিতে হবে, কারণ ১৫১৭ সাল থেকেই মিসর ছিলো তুরস্কের উসমানীয়া সালতানাতের অধীনে। তুরস্কের সুলতানদের প্রতিনিধিরা মিসর শাসন করতেন। উসমানীয়া সালতানাত দুর্বল হয়ে গেলে মিসরের শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীনভাবেই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন।

১৭৯৯ সালে ফ্রান্সের সমরনায়ক নেপোলিয়ান মিসর দখল করেন। নেপালিয়ান নিজেকে ইসলামের অনুরাগী ও প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার একজন সমঝদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আধুনিক মিসরের সূচনাই হয়েছিলো নেপোলিয়ানের আক্রমণকালকে কেন্দ্র করে।

মিসরের মানুষের মন জয় করতে চেয়েছিলেন নেপোলিয়ান। ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করেছিলেন নেপোলিয়ান। স্থানীয় জনসাধারণের সাথে মিশতে চেয়েছিলেন।

কারণ, মিসর দখলে রাখা নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য ছিলো না। নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য ছিলো ভারতবর্ষ দখল করার। বৃটিশের অতি প্রিয় উপনিবেশ ভারতবর্ষ দখল করে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্য তছনছ করে দিতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ বিরোধী মহীশুরের শাসক টিপু সুলতানের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো নেপোলিয়ানের।

যাই হোক, শেষশেষ কোনকিছুই ব্যাটে-বলে হয়নি নেপোলিয়ানের জন্য। ৩ বছর যাবত অবস্থান করে অবশেষে নেপোলিয়ান মিসর ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

কিন্তু আজকে আমরা প্রাচীন মিসরের যে অমূল্য সম্পদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাই, তার মূলে আছে নেপোলিয়ানের ভূমিকা। নেপোলিয়ান প্রচুর বৈজ্ঞানিক ও গবেষক নিয়ে মিসরে পা রেখেছিলেন।

সুয়েজ খাল ও বৃটিশঃ

নেপোলিয়ন মিসর থেকে পরিত্যাগ করার পর আবার অথর্ব উসমানীয়া শাসকরা মিসরের শাসন ক্ষমতায় বসে। তুরস্ক নিজেই ছিলো ইউরোপের রুগ্ন মানুষ, মিসরকে সে কতটুকু উন্নত করবে? মিসর হয়ে পড়ে বৃটিশ আর ফ্রান্সের লুটপাটের এক মহাযজ্ঞ।

১৮৬৯ সালে সুয়েজ খালের উদ্বোধন করা হলে বিশ্ববাণিজ্যে মিসরের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। এর আগে ইউরোপ থেকে ভারতে আসতে হলে পুরো আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে আসতে হতো। সমুদ্রপথে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষের মোট দূরত্ব ছিলো ১৯৮০০ কিলোমিটার। কিন্তু সুয়েজ খাল দিয়ে সে দুরত্ব দাঁড়ায় ১১৬০০ কিলোমিটার। ১৮৭৫ সালে সুয়েজ খালের ৪৪ শতাংশ মালিকানা কিনে নেয় বৃটিশ সরকার। বাকি মালিকানা ছিলো ফ্রান্সের।

এদিকে অথর্ব অটোম্যান শাসকরা ব্রিটেন আর ফ্রান্স থেকে প্রচুর অর্থ ধার করেন। ১৮৭৬ সালে মিসর হয়ে পড়ে পুরোপুরি দেউলিয়া।

১৮৮২ সাল থেকে মিসর হয় ব্রিটেনের প্রটেক্টরেট বা আশ্রিত রাজ্য। অন্যান্য কলোনীগুলোর মতো পুরোপুরি দখল করেনি, যদিও মিসরের সবকিছুকে ব্রিটেন নিয়ন্ত্রণ করতো। তাঁবেদার শাসকদের ক্ষমতায় বসিয়ে ব্রিটেন তার সব উদ্দেশ্যে হাসিল করতে পারতো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ১৫ লক্ষ মিসরীয় ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষকে শাসন করার জন্য সুয়েজখাল দিয়ে যাতায়াত করতে হয় বিধায় মিসরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ব্রিটেনের জন্য খুবই জরুরি ছিলো।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, “মিসরের উপর ব্রিটেনের এই নিয়ন্ত্রণের ফলে ফ্রান্স কি অসন্তুষ্ট হয়নি?”

জারিফ উত্তর দিলো, প্রথম প্রথম অসন্তুষ্ট হয়েছিলো, কিন্তু পরে যখন ফ্রান্স দেখলো আফ্রিকার অন্যান্য দেশে তারা নির্দ্বিধায় তাদের উপনিবেশ বিস্তার করছিলো, এবং তাতে বৃটেন বাধা দিচ্ছে না; তখন মিসরের উপর ব্রিটেন আধিপত্যকে তারা মেনে নেয়। হাজার হোক, দুই ডাকাত যদি মিলেমিশে না চলে তাহলে তো আরামসে লুটপাট করা যাবে না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিসরে স্বাধীনতার ডাক উঠে। মিসরের স্বাধীনতা আন্দোলনের সোচ্চার কণ্ঠ ছিলেন জগলুল পাশা। তার নেতৃত্বে ওয়াফদ পার্টি গড়ে উঠে। কারারুদ্ধ হন জগলুল পাশা। জনমতের চাপে বৃটিশ সরকার তাকে মুক্তি দেন এবং ১৯১৯ সালে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে জগলুল পাশা মিসরের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তাবেদার রাজতন্ত্র ও একনায়ক নাসেরের উত্থান:

১৯২২ সালে মিসরীয়রা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার চাপে পড়ে নামমাত্র স্বাধীনতা দেয় ব্রিটেনকে। ফুয়াদ পাশাকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করে মিসরের সিংহাসনে বসায় ব্রিটেন। মিসরে চালু হয় গোঁজামিল শাসন। ব্রিটেন না পারে মিসরকে স্বাধীনতা দিতে, না পারে দখল করতে। ১৯৩৬ সালে ফুয়াদ পাশার মৃত্যু হয়। সিংহাসনে বসেন তার ছেলে ফারুক। এসব অথর্ব রাজাদের অধীনে কিছুদিন পর পর প্রধানমন্ত্রীর পদে বসে আরও অথর্বরা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জার্মানি মিসর দখল করার হুমকি দেয়। মিসরের জনগণ ব্রিটেনের এসব গোঁজামিল মার্কা গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পরিবর্তে জার্মানির শাসন কামনা করছিলো।

রাজা ফারুকের শাসনকাল নানা ঘটনার ঘনঘটায় ভরপুর। চরমপন্থী মুসলমানদের বিভিন্ন সংগঠন গজিয়ে উঠে। ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মুসলিম ব্রাদারহুড অত্যন্ত জনপ্রিয় সংঘটন ছিলো। এর প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্না একজন কার্যকর সংগঠক ছিলেন। সমাজের সর্বস্তরে মুসলিম ব্রাদারহুড জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৮ সালে। মিসরসহ পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলো ইসরাইলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদিও কার্যকর কিছু করতে পারেনি আরবদের মধ্যকার অনৈক্য আর যথাযথ নেতৃত্বদানের অভাবে।

২৩ জুলাই, ১৯৫২:

মিসরের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। রাজা ফারুককে বিতাড়িত করার জন্য একটা সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন মিসরের সামরিক

অফিসার জামাল আবদেল নাসের। আড়াই হাজার বছর যাবত মিসর কেবলমাত্র অন্যের দ্বারা শাসিত হচ্ছিলো। খৃস্টের জন্মের আরও ৫০০ বছর আগে মিসর পারসিকদের কাছে তার স্বাধীনতা হারায়। তারপর থেকে গ্রীক, রোমান, ইসলামি খেলাফত থেকে ওসমানি শাসন হয়ে, বৃটিশ জাতি, সবাই ছিলো মিসরের বাইরের শক্তি। নাসের যদিও ছিলেন একজন সামরিক শাসক, তবুও মিসরের ইতিহাসে নাসের এক অন্যরকম প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মিসরীয় জাতীয়তাবাদকে তিনি সফল করে তুলেছিলেন।



চিত্র-৩২: মিসরের সামরিক শাসক জামাল আবদেল নাসের আধিপত্যবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন।

পর্ব-৮৬

স্বাধীনচেতা নাসের ও ১৯৫৬ সালের সুয়েজ খাল সংকট:

তবে শুরুতেই বলে রাখা ভালো, প্রাচ্যদেশীয় সামরিক একনায়ক বলতে যা বোঝায় নাসের তেমনই ছিলেন। ক্ষমতায় এসেই অন্য সব রাজনৈতিক দলকে তিনি নিষিদ্ধ করেন। বিরোধীমতকে দমন করেন নিষ্ঠুরভাবে। সে আলোচনাগুলো একপাশে সরিয়ে রাখলে নাসের ছিলেন আপন মহিমায় উজ্জ্বল।

অফিসার জামাল আবদেল নাসের। আড়াই হাজার বছর যাবত মিসর কেবলমাত্র অন্যের দ্বারা শাসিত হচ্ছিলো। খৃস্টের জন্মের আরও ৫০০ বছর আগে মিসর পারসিকদের কাছে তার স্বাধীনতা হারায়। তারপর থেকে গ্রীক, রোমান, ইসলামি খেলাফত থেকে ওসমানি শাসন হয়ে, বৃটিশ জাতি, সবাই ছিলো মিসরের বাইরের শক্তি। নাসের যদিও ছিলেন একজন সামরিক শাসক, তবুও মিসরের ইতিহাসে নাসের এক অন্যরকম প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মিসরীয় জাতীয়তাবাদকে তিনি সফল করে তুলেছিলেন।



চিত্র-৩২: মিসরের সামরিক শাসক জামাল আবদেল নাসের আধিপত্যবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন।

পর্ব-৮৬

স্বাধীনচেতা নাসের ও ১৯৫৬ সালের সুয়েজ খাল সংকট:

তবে শুরুতেই বলে রাখা ভালো, প্রাচ্যদেশীয় সামরিক একনায়ক বলতে যা বোঝায় নাসের তেমনই ছিলেন। ক্ষমতায় এসেই অন্য সব রাজনৈতিক দলকে তিনি নিষিদ্ধ করেন। বিরোধীমতকে দমন করেন নিষ্ঠুরভাবে। সে আলোচনাগুলো একপাশে সরিয়ে রাখলে নাসের ছিলেন আপন মহিমায় উজ্জ্বল।

সময়টা ছিলো স্নায়ুযুদ্ধের উত্তাল কালঃ

জারিফ বললো, মনে রাখবে মামুন, ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকট বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেন-ফ্রান্সের আধিপত্য অবসানের উপর স্থায়ীভাবে সীলমোহর পড়ে। ব্রিটেন-ফ্রান্সের লজ্জাজনক পিছুটান বিশ্বকে এই বার্তা দেয় যে শত শত বছর ধরে অন্যের দেশ দখল করে যে মাস্তানি দেখিয়েছে এই দুই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ, বিশ্ব তাদের দাপট আর দেখবে না। ব্রিটেন-ফ্রান্সের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার হিসেবে খ্যাত ইসরাইলে সামরিক কূটনীতিও মার খায় এই সুয়েজ সংকটকে কেন্দ্র করে।

আগেই বলেছি, সুয়েজ খাল ছিলো ব্রিটেনের অর্থনীতির লাইফলাইন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে ব্রিটেন যখন ভারতসহ অধিকাংশ কলোনীকে স্বাধীন করে দিচ্ছিলো, তখন অন্য পরাশিক্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও তার কলোনীগুলো স্বাধীনতার জন্য লড়ছিলো। কলোনীগুলো রক্ষা করা দূরের কথা, নিজের দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সামাল দেওয়াই কঠিন কাজ ছিলো এই দুই দেশের জন্য। সুয়েজ খালের মালিকানা তখনও ছিলো যৌথভাবে ব্রিটেন-ফ্রান্সের হাতে।

কিন্তু রাজা ফারুককে হটিয়ে নাসের সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান ১৯৫২ সালে, আর ১৯৫৪ সালে নাসের হন মিসরের প্রেসিডেন্ট ও সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী।

কিন্তু বাঁধলো গন্ডগোল!

তিন তিনটি কাজ করে নাসের পুরো বিশ্বে হইচই ফেলে দেন। চলো আমরা এবার সেই কাহিনীগুলো শুনি।

নাসের ক্ষমতায় এসেই প্রথমে সাইজ করেন দখলদার ইসরাইলকে। সিনাই উপত্যকাকে ঘেঁষে লোহিত সাগরের যে ধারা ইসরাইলের দিকে গিয়েছে, সেটার উৎসমুখের মালিকানা মিসরের। সেই রাস্তার প্রবেশপথ বন্ধ করে দিলেন নাসের। ইসরাইলের জন্য লোহিত সাগরে প্রবেশ করা হয়ে উঠলো অসম্ভব।

দ্বিতীয় কাজটি হচ্ছে আসওয়ান বাঁধ নির্মানে আমেরিকার সাহায্য থেকে সরে আসা।

আমরা সবাই জানি, মিসর হচ্ছে নীলনদের দান। নীলনদের পানির প্রবাহ মিসরের সব জায়গায় সমান নয়। মরুময় মিসরকে শস্য-শ্যামলা করার জন্য আসওয়ান বাঁধ তৈরি করার একটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্প হাতে নেয় মিসর। ব্রিটেন ও আমেরিকা আসওয়ান বাঁধ নির্মানের জন্য প্রথম ধাপে প্রায় ২৭০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে রাজি হয়। কিন্তু কমিউনিস্ট রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে নাসের অস্ত্র আমদানির একটি গোপন চুক্তি করেন। এই চুক্তির কথা যখন ফাঁস হয়ে যায়, তখন আমেরিকা-ব্রিটেন মিসরকে সাহায্য করার অঙ্গীকার থেকে সরে আসে।

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসের ২০ তারিখ মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন, আসওয়ান বাঁধ নির্মানের জন্য মিসরকে কোনো প্রকার সহায়তা দেওয়া হবে না।

এই তপ্ত পরিস্থিতিতে আগুনে আরও ঘি ঢাললেন নাসের। ডালেসের ঘোষণার ঠিক ৬ দিন পর ২৬ জুলাই তারিখে সুয়েজ খাল জাতীয়করণের কথা ঘোষণা দিলেন নাসের।

ভূ-খণ্ড মিসরের, নীলনদ-লোহিত সাগর, আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর সবকিছুর মালিকানা মিসরের, তাহলে কোন যুক্তিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ সুয়েজ খালের মালিকানা থাকবে ইউরোপীয় ডাকাত ব্রিটেন-ফ্রান্সের হাতে? ১৮৬৯ সাল থেকে সুয়েজ খালের লাভের গুড় খেয়েছে ব্রিটেন-ফ্রান্স। নাসের ঘোষণা করলেন, এসব মাস্তানির দিন শেষ। সুয়েজ খাল এখন মিশরের।

শুরু হলো তিন শয়তানের নাটক ও মাস্তানিঃ

নাসের কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়কারণের পর পুরো বাংলা সিনেমার চিত্রনাট্য শুরু করলো ব্রিটেন-ফ্রান্স। এ কাজে তাদের যোগ্য সহচর হলো নব্য রাষ্ট্র ইসরাইল।

ইসরাইলের মাথা গরম। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সে চারপাশে শত্রু রাষ্ট্র দ্বারা আবদ্ধ। তার উপর সাম্প্রতিককালে নাসেরের মতো নেতার কঠোর পদক্ষেপের কারণে লোহিত সাগরে প্রবেশ করার সামর্থ্য নাই। ১৯৪৮ সালে প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল প্রায় হেরেই যাচ্ছিলো। আরবদের অনৈক্য আর নেতৃত্বের অভাবের কারণে ইসরাইলের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। ১৯৪৮ সালে ইসরাইলের তুলনায় সম্মিলিত আরবদের শক্তি তুলনামুলক বেশি ছিলো।

কিন্তু এই আট বছরে পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। ইসরাইল প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বাড়িয়ে আমেরিকার সহায়তায় যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে গিয়েছে। তাই নাসেরকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইসরাইলের হাত নিশপিশ করছিলো।

নাটকের প্রথম অঙ্ক প্যারিসেঃ

২২ অক্টোবর, ১৯৫৬

সুয়েজ খাল জাতীয়করণের তিন মাস কেটে গিয়েছে।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এ্যান্থনি ইডেন রাগে ফেটে পড়েছেন, ‘‘নাসেরের এত বড় সাহস! জগৎজোড়া কলোনী সামলেছি আমরা। আর নাসেরের মতো এক ভুঁইফোড় নেতা ব্রিটেনকে পাত্তাই দিলো না’’।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তার পররাষ্ট্র দপ্তরের সমস্ত কর্মকর্তাদের বলে দিলেন, ‘‘যেভাবেই হোক নাসেরকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে হবে।’’

অক্টোবরের ২২ তারিখে প্যারিস থেকে অনতিদূরে একটি খামার বাড়িতে নম্বরবিহীন গাড়িতে করে তাশরীফ আনয়ন করলেন ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিয়ান পিনো। আগে থেকে সেই বাড়িতে অপেক্ষা করছেন ৭০ বৎসর বয়স্ক ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ন। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর সাথে চিফ অব স্টাফ মোশে দাইয়ান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শিমন পেরেজ।

আরেক ষড়যন্ত্রকারী ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যালউইন লয়েড লন্ডনে তার বাড়িতে বসে ঝিমাচ্ছিলেন। বিকালের দিকে তিনিও প্যারিস রওয়ানা হলেন।

গোপন মিটিংয়ে কি আলোচনা হয়েছিলো, সে ব্যাপারে বাইরের পৃথিবীর কেউই জানতে পারেনি। তবে সেই আলোচনা পুরোটাই যে মিসরের বেয়াড়া শাসক নাসেরকে শায়েস্তা করা বিষয়ক সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই।

গোপন বৈঠকে স্বয়ং জড়িত ছিলেন বৃটিশ প্রধামন্ত্রী এ্যান্থনী ইডেন ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট গাই মলেট।

শ্যাম্পেন ভাগাভাগি চললো তিন শয়তান ইসরাইল-ব্রিটেন-আর ফ্রান্সের ক্ষমতাধরদের মধ্যে।

কি হলো মিটিংয়ে?

সিদ্ধান্ত হলো, মিসর যেহেতু লোহিত সাগরের প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়েছে, তাই ইসরাইল সে পথের দখল নেওয়ার জন্য অক্টোবরের ২৯ তারিখ ২৪ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী মিসরের সিনাই উপত্যকা বরাবর তুমুল হামলা চালাবে। অপারেশনের নামও দেয়া হয়েছে 'অপারেশন কাদেশ'।

ইসরাইলের হামলার জবাবে মিসর অবশ্যই তার সেনাবাহিনীকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে মোতায়েন করবে, এ কথা পাগলেও জানে। শুরু হয়ে যাবে ইসরাইল-মিসর যুদ্ধ। তখনি করতে হবে আসল নাটক।

ব্রিটেন-ফ্রান্স যৌথ বিবৃতি দিয়ে বলবে-

কি শুরু করেছ দুষ্টু ছেলের দলেরা?

যুদ্ধ করা ভালো নাকি?

সুয়েজ খালের মতো এতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যুদ্ধ করে কেউ? বোকা ছেলের দল? তাড়াতাড়ি ইসরাইল আর মিসরকে যুদ্ধবিরতি করতে বলা হবে। ইসরাইল বিদ্যুগতিতে মিসরের সিনাই উপত্যকার অনেকটা দখল করবে।

দখলদার ইসরাইলীদের নিয়ে মিসর যখন ব্যস্ত থাকবে তখন ব্রিটেন-ফ্রান্স আলটিমেটাম দিবে উভয় পক্ষকে।

বলবে, "দুষ্ট ছেলেরা! এবার অনেক হয়েছে, তোমরা যে যেখানে আছো, আর অগ্রসর হয়ো না, যুদ্ধ থামাও। যদি তোমরা যুদ্ধ না থামাও, তাহলে কিন্তু আমরা হস্তক্ষেপ করবো।"

শুরু হলো অপারেশন কাদেশঃ

১৯৫৬ সালের ২৯ অক্টোবর তারিখে পূর্ব পরিকল্পিত নাটক অনুযায়ী ইসরাইল আচমকা মিসরের সিনাই উপত্যকায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে অনেকখানি অঞ্চল দখল করে নিলো। নাসের দিশেহারা। কি করবেন তিনি? নিজের যা সামর্থ্য আছে সে অনুযায়ী ইসরাইলের বিরুদ্ধে বাহিনী পাঠালেন।

৩১ অক্টোবরঃ

যুদ্ধ শুরু হওয়ার ৪৮ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। ইসরাইলের পেটে মিসরের অনেকখানি ভূ-খণ্ড ঢুকে পড়েছে। এবার ব্রিটেন-ফ্রান্স নামার পালা। উভয়পক্ষকে আলটিমেটাম দিলো বিশ্ব রাজনীতির পুরনো দুই ডাকাত। বললো, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে, নইলে উনারা নাকি হস্তক্ষেপ করবেন। আলটিমেটাম মেনে নিলে ইসরাইলের লাভ, কারণ মিসরের অনেকখানি ভূ-খণ্ড তার দখলে চলে এসেছে। যুদ্ধ বন্ধ হলেই ইসরাইলের লাভ।

কিন্তু মিসরের কাছে এই যুদ্ধ জীবনমরণ প্রশ্ন। নিজের দেশের ভূ-খণ্ড যদি কেউ নিয়ে যায়, তাহলে কি আর নীরব থাকা যায়?

ব্রিটেন-ফ্রান্সের আহ্বানকে পাত্তা না দিয়ে মিসর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলো। এটাই তো চেয়েছিলো ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইসরাইল!

যদিও মিসরের ঘনিষ্ট মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আপাতত মিসরের ঘটনায় মনোনিবেশ করতে পারছিলো না।

এবার বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপদেশ মাল্টা, ফ্রান্সের দখলে থাকা আলজেরিয়া এবং ব্রিটিশ সাইপ্রাস থেকে ৪৫ হাজার বৃটিশ সৈন্য, ৩৪ হাজার ফরাসি সৈন্য মিসরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিলো।

অভিযানের নাম হলো-অপারেশন মাস্কেটিয়ারঃ

ব্রিটেন-ফ্রান্সের চোখে মিসরের একনায়ক নাসের হচ্ছেন-মুসলিম মুসোলিনী। ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে অবতরণ করে নীল নদের মোহনা বরাবর মিসরের রাজধানী কায়রোর পথ ধরলো। দিশেহারা নাসের বড় বিপদের আশংকা করছিলেন। এবার সেটাই সত্যি হলো। সিনাই উপত্যকা থেকে অর্ধেক সৈন্য এবার তিনি আলেকজান্দ্রিয়া প্রেরণ করা শুরু করলেন। যদিও প্রথম যুদ্ধটা শুরু হলো সাগরে।

আমেরিকা-রাশিয়া এক বিন্দুতে মিলে গেলোঃ

স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার এই একটিমাত্র ঘটনা আমেরিকা-রাশিয়াকে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিলো। যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই আমেরিকান ভোটাররা তাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ভোট দিয়েছিলেন। হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীকে কঠোর ভাষায় হুমকি দিলেন।

দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ চালানোর জন্য মিসর তার সামরিক বাহিনীর মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এর মধ্যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ছিলো ৫০ হাজার সৈন্য। মোট ১৬৫০ জন মিসরীয় সৈন্য নিহত হয়। ইসরাইলের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিলো ৪৫ হাজার। মোট নিহত হয়েছিলো ১৮৯ জন।

সুয়েজ খালের ঘটনা ব্রিটেন-ফ্রান্সের ইমেজের মারাত্মক ক্ষতি করেছিলো। এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সুদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই শেষ হয়েছিলো। সুয়েজের ঘটনা ছিলো সেই সুদিন অবসানের সীলমোহর। শত শত বছর যাবত বিশ্বে দাবড়িয়ে বেড়ানো ব্রিটেন-ফ্রান্স পরাশক্তির মর্যাদা হারালো ।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ভগ্নহৃদয়ের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যান্থনী ইডেন পদত্যাগ করলেন। ফ্রান্সে ক্ষমতার পালাবদল ঘটলো। আলজেরিয়ার বসবাসরত ফরাসিদের তৎপরতায় ফ্রান্সে চতুর্থ রিপাবলিকের অবসান ঘটলো। ক্ষমতায় ফিরলেন 'চার্লস দ্য গল'।

নাসের পরবর্তী মিসরঃ

নাসেরের সময় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ছিলেন আনোয়ার সাদাত। আনোয়ার সাদাত ছিলেন একজন সামরিক কর্মকর্তা। রাজতন্ত্র উৎখাতের সময় থেকেই তিনি ছিলেন নাসেরের ঘনিষ্ট সহচর। ১৯৭০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর নাসেরের মৃত্যু হলে তিনি ক্ষমতায় বসেন। পরে অক্টোবরের ৫ তারিখ এক তথাকথিত গণভোটের মাধ্যমে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরশাসকদের আবার গণভোট!

যা হোক, পররাষ্ট্রনীতিতে সাদাত প্রথমে নাসেরের মতো কট্টর ইসরাইল বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর মতো করে চলতে থাকেন। অচিরেই তিনি হয়ে পড়েন ইসরাইল পন্থী।

শুধু তাই নয়, ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৭৮ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান যৌথভাবে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মোনাহেম বেগিনের সাথে। সাদাতের এই অপ্রথাগত কর্মকাণ্ডের কারণে মিসরকে আরব লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। উগ্রপন্থী মুসলিমদের একটি দল তাকে হত্যা করে ১৯৮১ সালে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে শত্রুতা ও ইসরাইলের সাথে যুদ্ধঃ

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা ছিলো সাদাতের পূর্বসূরী নাসেরের প্রধান কাজ। কিন্তু সাদাত ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭২ সালে কয়েক হাজার সোভিয়েত উপদেষ্টাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। ইসরাইলকে ঠেকানোর জন্য রাশিয়া আগের মতো সাহায্য করছে না, এই অভিযোগে সাদাত এই কাজ করেন।

কিন্তু এরপর সাদাত নিজেই ইসরাইলের সাথে শান্তি স্থাপন করতে এগিয়ে আসেন। সাদাতের দাবি ছিলো, ইসরাইল যদি ১৯৬৭ সালের দখলীকৃত ভূমি মিসরকে ফেরত দেয় তাহলে ইসরাইলের সাথে শান্তি আলোচনা করা সম্ভব। কিন্তু ইসরাইল এ প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় সাদাত নিজেই মিসরের জমি শক্তির বলে নিজের দখলে আনার উদ্যোগ নেন।

১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে (৪-১০ জুন) ইসরাইল অনেকখানি জায়গা দখল করে। সিরিয়ার দখলে থাকা গোলান মালভূমি, মিসরের দখলে থাকা সিনাই উপত্যকা এবং পশ্চিম তীর দখল করে। ছয় দিনের যুদ্ধ পুরো আরব বিশ্বের জন্য মারাত্মক মানসিক আঘাত। ইসরাইল এমন মাস্তানি দেখিয়েছে যে, তা বলাই বাহুল্য। ছয় দিনের যুদ্ধে পরাজয়ের পর নাসের ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। হতাশা তাকেও ঘিরে ধরে। এই পরাজয়ের পর নাসের বেশি দিন বাঁচেন নি।

১৯৭৩ সালে আনোয়ার সাদাত ছয় দিনের যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সিরিয়াকে সাথে নিয়ে আবার ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ইসরাইলও পাল্টা আক্রমন শুরু করে। বীরোচিত জবাব দেয় ইসরাইল। কিছুই করতে পারেনি সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রগুলো। তারপর থেকেই আনোয়ার সাদাত ইসরাইলের সাথে সমঝোতা করার পথ খুঁজছিলেন।

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮:মিসর-ইসরাইল সমঝোতার খবর

উদ্যোগটা প্রথম নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। কার্টার ইসরাইল ফিলিস্তিনি সংকটে বহুজাতিক সমাধানের পথ খুঁজছিলেন। ১৯৭৭ সালের পর থেকেই ইসরাইল ও মিসরের মধ্যে গোপন বৈঠক হতে থাকে। ১৯৭৭ সালের ৯ নভেম্বর সাদাত মিসরের পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, "ইসরাইলের সাথে শান্তি আলোচনার জন্য তিনি সশরীরে জেরুজালেম যেতে প্রস্তুত। কালবিলম্ব না করে ইসরাইলী সরকার আনোয়ার সাদাতকে নিমন্ত্রণ জানায়।"

১৭ নভেম্বর, ১৯৭৭:

এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখলো বিশ্ববাসী। মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইসরাইলী পার্লামেন্টে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনটি বিষয়ের উপর ভাষণ দিচ্ছিলেন আনোয়ার সাদাত। প্রথমতো, জাতিসংঘের ২৪২ ও ২৩৮ নম্বর ধারা মেনে চলতে হবে। দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্যের সকল রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণভাবে বসবার করবে। তৃতীয়ত, দখলীকৃত সিনাই উপত্যকা থেকে ইসরাইল সরে যাবে। তাহলে মিসরের সাথেও ইসরাইলের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।

২৬ মার্চ, ১৯৭৯:

ইসরাইলের সাথে মিসরের শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয়। চুক্তি মোতাবেক ১৯৮২ সালের মধ্যে মিসরের সিনাই উপত্যকা থেকে সমস্ত সৈন্য সরিয়ে ফেলে ইসরাইল। আনোয়ার সাদাত মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র নেতা যিনি ইসরাইলের কাছ থেকে ভূমি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ইসরাইলের সাথে শান্তিচুক্তি করার জন্য জীবন দিয়ে খেসারত দিতে হয় আনোয়ার সাদাতকে। ১৯৭৯ সালে আরব লীগ থেকে মিসরকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সেই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে।

১৯৮১ সালের ৬ অক্টোবর সেনাবাহিনীর প্যারেড চলাকালে আনোয়ার সাদাত নিহত হন।

আনোয়ার সাদাতের পর ক্ষমতায় বসেন হোসনী মোবারক যিনি ২০১১ সালের আরব বসন্তে ক্ষমতা থেকে উৎখাত হন।

সাম্রাজ্যবাদের পতন, এশিয়া ও আফ্রিকায় স্বাধীনতার নতুন সূর্য

পর্ব-৮৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেও এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ দেশ পরাধীনতার গ্লানি টানছিলো। স্থানীয়দের মতামতকে তোয়াক্কা না করে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা তাদের শাসন চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায় সাম্রাজ্যবাদীদের সব দখলদারিত্ব। ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫-এই তিরিশ বছরের মধ্যে বিশ্বে কমপক্ষে ৬০টি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে উদিত হয় স্বাধীনতার নতুন সূর্য।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে তো হিটলারকে ধন্যবাদ দিতে হয়, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে। কারণ হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টি করেছিলেন বলেই তো আমরা তৃতীয় বিশ্বের লোকজন এত তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা পেয়েছি।

জারিফ বললো, কথাটা আংশিক সত্যি বটে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই একমাত্র কারণ নয়, সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য। এটা ঠিক যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ব্রিটেন-ফ্রান্সের মতো সনাতনী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কোমড় ভেঙে গিয়েছিলো, তারা আর উপনিবেশ ধরে রাখার মতো শক্তিশালী ছিলো না।

কিন্তু এটাও ঠিক যে, উপনিবেশগুলো জুড়েই স্থানীয় লোকজন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো। আমাদের ভারতবর্ষে স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছিলো। ঠিক সেভাবে ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, নাইজেরিয়াসহ অধিকাংশ পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের আর সহ্য করতে পারছিলো না স্থানীয় জনগণ।

সাম্রাজ্যবাদীদের পতনের পিছনে আমেরিকার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত ইউরোপকে অঢেল টাকা দিয়েছিলো আমেরিকা। সাহায্য দেওয়ার সময় আমেরিকা একটা শর্ত দিয়েছিলো, কোনোভাবেই যেনো কোনো দেশকে জোর জবরদস্তি করে দখল না করে ইউরোপীয়রা। বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারী এস ট্রুমান দখলদার ইউরোপীয়দের প্রতি কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

নেদারল্যান্ড যখন ইন্দোনেশিয়া দখল করতে চাইলো ট্রুমান সরাসরি হুমকি দিয়েছিলেন নেদারল্যান্ডকে। বলেছিলেন, "ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা না দিলে

নেদারল্যান্ডকে মার্শাল প্ল্যানের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হবে।" যা হোক, আমরা প্রথমে আফ্রিকার ইতিহাস আলোচনা করবো।

আফ্রিকায় যেভাবে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হলোঃ

প্রথম অধ্যায়ে আমরা মানচিত্রসহ দেখিয়ে দিয়েছিলাম, কিভাবে পুরো আফ্রিকাকে ভাগ বাটোয়ারা করে নিজেদের করায়ত্ত করে রেখেছিলো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা। সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে কেবল রক্ষা পেয়েছিলো দাসদের জন্য মুক্তভূমি হিসেবে খ্যাত লাইবেরিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়া।

ইথিওপিয়া দখল করতে এসেছিলো ইতালি ১৮৯৬ সালে, কিন্তু শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

১৯২২ সাল থেকে ইতালির ক্ষমতা পান মুসোলিনী। উন্মাদ মুসোলিনী ইতালির জনগণকে স্বপ্ন দেখান তিনি আবার রোম সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে আনবেন।

১৯০৮ সালে তুরস্কের দখল থেকে লিবিয়া দখল করার পর ইতালি পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া দখল করে। ইথিওপিয়ার হাতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসোলিনী ১৯৩৫ সালে আবার দেশটি দখল করার অভিযানে নামেন।

১৯৩৫ সালে ইতালির দখলীকৃত ভূমি সোমালিয়ার সাথে সীমান্ত সংঘাত শুরু হয় ইথিওপিয়ার। তুচ্ছ সেই ঘটনাকে পুঁজি করে মুসোলিনী ইথিওপিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। মনে মনে ইথিওপিয়ার হাতে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধের মিশন।

৩ অক্টোবর, ১৯৩৫ সালঃ

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইতালিয়ান বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্বল ইথিওপিয়ার উপর। ইতালির এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করলো লীগ অব নেশনস্ । কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। ব্রিটেন ছাড়া আর কোনো ইউরোপীয় শক্তি ইতালির এই আচরণের প্রতিবাদ করলো না। লাইবেরিয়া ছাড়া পুরো আফ্রিকা মহাদেশ এখন ইউরোপীয় ডাকাতদের কবলে।

পরিস্থিতি যখন বদলাতে লাগলোঃ

আগেই বলছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাজুক অবস্থায় পড়লো সাম্রাজ্যবাদী দুই দেশ ব্রিটেন-ফ্রান্স।

১৯৫৭ সালে ঘানা ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ঘানার অবিসংবাদিত নেতা ডঃ নক্রুমা দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ব্রিটেনের দখলে থাকা সুদান, নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিওন শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা পায়।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে ৮টি আফ্রিকান দেশ ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

ইতালির দখলে থাকা তিনটি দেশ-লিবিয়া, ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার নিয়ন্ত্রণভার পায় ব্রিটেন। লিবিয়া ১৯৫১ সালে, ইথিওপিয়া ১৯৪১ সালে ও সোমালিয়া ১৯৬০ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির পতন হওয়ায় এসব দেশ কোনো ধরণের রক্তপাত ছাড়াই সহজে স্বাধীনতা লাভ করে।

কিন্তু আফ্রিকার বড় খেলোয়াড় হচ্ছে ফ্রান্স। ১৪টিরও বেশি স্বাধীন দেশ ফ্রান্সের কবল থেকে মুক্তি লাভ করে। উত্তর আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়াকে নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। তাই সেটা নিয়ে বিস্তারিতভাবে বলতে হবে। আলজেরিয়া ছাড়া ফ্রান্সের কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলি হলো- তিউনিসিয়া, গিনি, সেনেগাল, টোগো, মালি, মাদাগাস্কার, বেনিন, নাইজার, বুরকিনা ফাসো, আইভরি কোস্ট, চাদ, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গ্যাবন, মৌরিতানিয়া, জিবুতি ইত্যাদি। স্বাধীনতা লাভের পর আজও এসব দেশ ফ্রান্সের উপর নির্ভরশীল। ফ্রান্স এসব দেশের উন্নয়নে কিছুই করেনি বললেই চলে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ফ্রান্সের তুলনায় অনেক ভালো ছিলো। তারা উপনিবেশের স্বার্থে অনেক উন্নয়ন করেছিলো কিন্তু ফ্রান্স শুধু লুটপাট চালিয়েছে।

পর্তুগালের কাছ থেকে গিনি বিসাউ, মোজাম্বিক ও কেপ ভার্দে স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে।

স্পেনের দখলে আফ্রিকার কোনো উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ছিলো না। মরক্কো স্পেনের দখলে থাকলেও সেখানে তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার লাভ করতে পারেনি। নামমাত্র স্পেনীশ উপনিবেশ ছিলো মরক্কো। ১৯৫৬ সালে মরক্কোর উত্তরাঞ্চল ও ১৯৫৮ সালে মরক্কোর দক্ষিণাঞ্চল স্পেনের কবল থেকে মুক্ত হয়। ১৯৭৬ সালে স্পেনের কাছ থেকে পশ্চিম সাহারা স্বাধীনতা লাভ করে।

আফ্রিকা মহাদেশের ইতিহাসে বেলজিয়াম একটা কুখ্যাত সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে পরিচিত। ছোট্ট দেশ বেলজিয়াম বিশাল আয়তনের দেশ কঙ্গোকে লুটেপুটে খেয়েছে। কিন্তু কঙ্গোর জনগণের জীবনমান উন্নয়ণ করাতো দূরের কথা, রাবার সংগ্রহ না করতে পারার কারণে স্থানীয় জনগণের হাত কেটে নেওয়া হয়েছিলো। সেই অসহায় কঙ্গো ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা লাভ করে বটে, কিন্তু দেশে একজনও ডাক্তার ছিলো না। শিক্ষা-দীক্ষায় অত্যন্ত নাজুক অবস্থা ছিলো কঙ্গোর। কঙ্গো আজও বিশ্বের অত্যন্ত দরিদ্র দেশগুলির একটি। যার নেপথ্য কারণ ছিলো বেলজিয়ামের অত্যাচার।

আলজেরিয়ার কাহিনীঃ

১৮৩০ সালে ফ্রান্স যখন তুরস্কের অটোম্যান শাসক হুসাইনের কাছ থেকে আলজেরিয়া দখল করে, তার আগে প্রায় ৩০০ বছর ব্যাপী আলজেরিয়া শাসন

করতো তুর্কীরা। দুর্বল তুরস্কের কাছ থেকে সাম্রাজ্য নিয়ে আলজেরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করে ফ্রান্স।

বৃটিশদের কাছে যেরকম মহামূল্যবান ছিলো ভারতবর্ষ, ঠিক তেমনিভাবে ফরাসিদের কাছে সেরকম মূল্যবান ছিলো আলজেরিয়া।

ফ্রান্স কোনোমতেই আলজেরিয়াকে তাদের হাতছাড়া করার কথা চিন্তাও করতে পারেনি। কিন্তু এখানেও সবকিছুর মূল হলো দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স জয়ী হলেও শক্তির দিক দিয়ে তারা নিঃশেষিত।

ভারতবর্ষের মতো আলজেরিয়াতেও ফরাসি বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধছিলো। ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে জার্মানদের দখলে চলে যায় আলজেরিয়া। কিন্তু জার্মানরা পরাজয়ের স্বীকার হলে ফ্রান্স আবার আলজেরিয়ার দখল ফিরে পায়।

আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিলো এক অদ্ভুত সমীকরণের মিশেল। আলজেরিয়াতে প্রচুর ফরাসি নাগরিক যুগ-যুগ ধরে বসবাস করছিলো। তারা কখনোই আলজেরিয়ার স্বাধীনতা চায়নি। তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলো শহুরে শিক্ষিত শ্রেণি, যারা ফরাসিদের অধীনে থাকতে পছন্দ করতো।

জাতীয়তাবাদী নেতা ফরহাত আব্বাস পার্লামেন্টে আলজেরিয়ান স্থানীয় লোকদের প্রতিনিধিত্ব রাখার দাবি দাওয়া পেশ করেন সাম্রাজ্যবাদী ফরাসিদের কাছে ১৯৪৩ সালের মার্চে। কিন্তু এসব দাবি দাওয়ার ব্যাপারে একমত হতে পারেনি আলজেরিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়।

১৯৫৪ সাল থেকে আলজেরিয়ার জাতীয় মুক্তি মঞ্চ স্বাধীনতার দাবিতে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। মরিয়া ফ্রান্স যে কোনো মূলে আলজেরিয়াকে দখলে রাখতে চাইলো। একপর্যায়ে ৫ লক্ষ ফরাসি সৈন্য আলজেরিয়াতে মোতায়েন করা হলো। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ আর নৃশংসতা চালালো ফরাসিরা। প্রায় ১৫ লক্ষ আলজেরিয়ান প্রাণ হারালো ফরাসি বাহিনীর হাতে।

১৯৫৮ সালে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন চার্লস দ্য গল। তিনি আলজেরিয়ার স্বাধীনতার ব্যাপারে নমনীয় হতে শুরু করেন। কিন্তু আলজেরিয়াতে বসবাসরত ফরাসি জনগোষ্ঠী কোনোমতেই আলজেরিয়া ছাড়তে চাইছিলো না। তারা ফ্রান্সের অধীনে থাকার জন্য চেষ্টা চালালো।

কিন্তু দূরদর্শী রাজনীতিবিদ চার্লস দ্য গল বুঝতে পেরেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদীদের যুগ শেষ। জোর করে শক্তি প্রয়োগ করে আর কলোনী টিকিয়ে রাখা যাবে না।

১৯৬২ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ আলজেরিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষেই ভোট বেশি পড়ে।

১৯৬২ সালের জুলাইয়ের ৫ তারিখ আলজেরিয়া ফ্রান্সের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। আট বছর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসান ঘটে আলজেরিয়ায়।

উত্তর আফ্রিকার দেশ মিসর তুরস্কের অটোম্যানদের অধীনে ছিলো ১৫১৭ সাল থেকে। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল উদ্বোধন করার পর মিসর হয়ে পড়ে বিশ্ব বাণিজ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ পথ। ১৮৮২ সাল থেকে মিসর হয়ে পড়ে ব্রিটেনের অধীন এক পরাধীন রাষ্ট্র। মিসরের পুরো ইতিহাস মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস বর্ণনা করার সময় বলা হয়েছে, তাই এখানে আর পুনরুল্লেখ করা হলো না।

এবার এশিয়ার পানে দৃষ্টিঃ

এশিয়া মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদীদের চলে যাওয়ার দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথমেই বলতে হয় ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষ ছিলো বৃটিশের সবচেয়ে লোভনীয় কলোনী। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পরই বৃটিশের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ শাসন করার নীলনকশা প্রণয়ন শুরু করে। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিলো। সেই বিদ্রোহকে কঠোরহাতে দমন করে বৃটিশরা, পুরো ভারতবর্ষের একচ্ছত্র শাসক বনে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী থেকে শাসনক্ষমতা চলে যায় সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে।

ভারতবর্ষের সম্পদে ফুলে ফেঁপে উঠে লন্ডন। ভারতবর্ষের মালিক হওয়ায় বৃটিশদেরকে অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা হিংসার চোখে দেখতো। দিনে দিনে বৃটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ প্রতিবাদমুখর হতে শুরু করলো। জার্মানদের উত্থানে ভারতীয়রা আশান্বিত হয়ে উঠলো। ভারতীয়রা ভাবতে শিখলো, সর্বজয়ী বৃটিশরাও তাহলে মার খায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশরা যখন জার্মানদের হাতে নাকানি চুবানি খাচ্ছিলো তখন সুযোগ বুঝে ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী "ভারত ছাড়" আন্দোলন শুরু করলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশরা ভাবতে পারেনি ভারতবর্ষ তাদের হাত ছাড়া হবে।

যুদ্ধশেষে বৃটিশরা বিজয়ী হলেও কলোনী ধরে রাখার মতো কোনো শক্তি তাদের আর অবশিষ্ট নেই।

শান্তিপূর্ণভাবেই বৃটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশকে স্বাধীনতা দিয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সেই পরিস্থিতিকে জটিল করে তুললো। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সমস্যার কারণে দ্বিখণ্ডিত হয় ভারত। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পরের দিনই ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ।

ভারতবর্ষ যখন বৃটিশের হাতছাড়া হয়, তখন থেকেই মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে বৃটিশ। ভারতবর্ষের পড়শি মিয়ানমার ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখে স্বাধীন হয়। শ্রীলংকা স্বাধীনতা লাভ করে এর ঠিক ১ মাস পর; ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। এভাবেই দক্ষিণ এশিয়া ব্রিটিশমুক্ত হয়।

মোটকথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভের একটা হিড়িক পড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রভাবশালী দেশ মালয়েশিয়া ১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করে। কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখলের জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলো। কিছু রক্তপাত হয়েছিলো বটে, কিন্তু বৃটিশরা স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়ায় এ আন্দোলন রক্তপাতের দিকে যায় নি। মালয়েশিয়া থেকে ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুর আলাদা হয়ে যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন সহিংসতার দিকে যাচ্ছিলো নেদারল্যান্ডের লোভ আর গোয়ার্তুমির কারণে। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন ডঃ সুকর্ন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পুরো ইন্দোনেশিয়া দখল করে জাপানীরা। ইন্দোনেশিয়ার আপামর জনতা জাপানকে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করতে শুরু করে। ডাচদের প্রতি ক্ষিপ্ত ছিলো ইন্দোনেশিয়ার জনগন; কারণ শত শত বছর যাবত ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার জনগনকে শোষণ করে আসছিলো।

১৯৪৫ সালে জাপান আত্মসমর্পন করলে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। কিন্তু লোভী নেদারল্যান্ড আবারও ইন্দোনেশিয়া নিজের দখলে রাখতে চায়।

নেদারল্যান্ডকে হুমকি দিলেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারী এস ট্রুমান। ডাচদের বিরুদ্ধে গেরিলা হামলা শুরু করে দিলেন ইন্দোনেশিয়াবাসী। নেদারল্যান্ডের শহর হেগে এ নিয়ে সম্মেলন শুরু হলো ১৯৪৯ সালে। ১৯৪৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে স্বাধীন সার্বভৌম ইন্দোনেশিয়ার জন্ম হয়।

ইন্দোচীনের তিনটি দেশ লাওস, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আলাদা একটি অধ্যায় রয়েছে। সেখানে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও জটিলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শেষপর্যায়ে আমরা এ কথা বলতে চাই, সাম্রাজ্যবাদ ছিলো শতভাগ অন্যায় ও অন্যায্য কাজ। বিভিন্ন দোহাই দিয়ে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো দখল করার প্রচেষ্টাকে জায়েয করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু

এটাকে জায়েয করার কোনো সুযোগ ছিলো না। এসব তথাকথিত উন্নত ও সভ্য ইউরোপীয়রা এমন কোনো নৃশংসতা নেই যা তারা করেনি।

দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের কারণে দুর্বল হয়ে যাওয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের আস্ফালন বন্ধ হয়েছে তাড়াতাড়ি, তা না হলে হয়তো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে এখনও পরাধীনতার গ্লানি টানতে হতো।

চীন, জাপান ও কোরিয়ার ইতিহাস

পর্ব-৮৮

একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের চীন বর্তমান পৃথিবীর একটা পরাক্রমশালী দেশ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাদের সামরিক শক্তিও সমীহ জাগানো। চীন-জাপান নিয়ে আলোচনার শুরুতেই জারিফ বললো, চীনের মতো একটা বিশাল দেশ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কতটুকু দুর্বল ছিলো সে সম্পর্কে কী তোমার ধারণা আছে?

মামুন বললো, "**গল্পে গল্পে বিশ্বভ্রমণ** বইতে আমি পড়েছি, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তি চীনের কাছে অন্যায়ভাবে আফিম বিক্রি করতে চেয়েছিলো উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই। আফিম বিক্রি করাকে কেন্দ্র করে ব্রিটেনের সাথে চীনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অবশ্য চীন পরাজিত হয়। তারপর ব্রিটেন অন্যায়ভাবে চীনের কাছ থেকে হংকং কেড়ে নেয় ও বিভিন্ন বৈষম্যমূলক চুক্তি চাপিয়ে দেয়।"

জারিফ বললো, এতো গেলো ব্রিটেনের সাথে চীনের দ্বন্দের কথা। কিন্তু চীনের আয়তনের ২৫ ভাগের এক ভাগ সমতুল্য দেশ জাপান; যার জনসংখ্যা ছিলো চীনের ৬ ভাগের এক ভাগ। চীনের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে প্রায় ৫০ বছর যাবত (১৮৯৪ থেকে ১৯৪৫); সেটা ভাবলে আজও চীনের নতুন প্রজন্ম শিউরে উঠে।

মামুন বললো, "কেন চীনের প্রতি এতো ক্ষ্যাপা ছিলো জাপান, সে সম্পর্কে বিস্তারিত ইতিহাস তাহলে আমাদের জানতেই হবে। আজকের শক্তিধর দেশ সেই সময় কেন এতো দুর্বল ছিলো সেটা সম্পর্কেও জানা জরুরি।"

বিংশ শতাব্দীর দুর্বল রাষ্ট্র চীন দিয়েই আলোচনা শুরু:

চীন মানে ইতিহাস
চীন মানে জনসংখ্যা
চীন মানে বিশাল ভূ-খন্ড।

অন্তত চার হাজার বছর পূর্বেই চীনে সভ্যতা বিকশিত হচ্ছিলো। সেসব আলোচনায় আমরা যাবো না। আমরা আলোচনা করবো, বিংশ শতাব্দীর শুরুর

দিকের একটা দুর্বল রাষ্ট্র চীনের কথা। যে চীন ছিলো পশ্চাৎপদ, অনুন্নত এবং আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে একদম বঞ্চিত।

চীনের প্রথম দুর্বলতা ছিলো তার রাজতন্ত্র নিয়েঃ

১৬৪৪ সালের মিং রাজবংশকে উচ্ছেদ করে যে চিং রাজবংশ, তার যাত্রা শুরু হয়েছিলো বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো অন্ত ছিলো না। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় পুরোটা কাল চীনের ছিলো অধঃপতনের যুগ। চীনকে নিয়ে ছেলেখেলায় মেতে উঠেছিলো বিভিন্ন দেশ। চীনকে নিয়ে প্রথম খেলাটা খেলেছিলো সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন।

ব্রিটেনের দরকার ছিলো চীনের চা। কিন্তু চীন ব্রিটেনের কাছ থেকে কোনো পণ্য কেনার প্রয়োজন বোধ করলো না। অর্থনীতির 'Balance of payment' -এ ভারসাম্য রাখার ক্ষেত্রে সেটা খুব জরুরি।

নেপোলিয়ানের কথা ধার করে বলা যায়, দোকানদারের জাত ব্রিটেন চীনে জোর করে আফিম চালান দিতে চাইলো।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "কি তাজ্জব কাহিনী! একটা দেশ অন্য একটা দেশ থেকে কোনো কিছু কিনতে চাইলো না, তাই বলে নেশাজাতীয় দ্রব্য আফিম গছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা? কি সাংঘাতিক ব্যাপার!"

জারিফ উত্তর দিলো, এই আফিম চালান নিয়ে ব্রিটেনের সাথে চীনের দুই দুইবার যুদ্ধ হলো। ইতিহাসে যেটা 'আফিমের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। ব্রিটেনের সাথে কি আর দুর্বল চীন পেরে উঠতে পারে? প্রথম আফিম যুদ্ধে ব্রিটেনের কাছে হারলো চীন। বাধ্য হয়ে অপমানজনক চুক্তি স্বাক্ষর করতে হলো চীনকে। দ্বিতীয় আফিমের যুদ্ধেও চীন হারলো। চীনের কাছ থেকে হংকং নিয়ে যায় ব্রিটেন ১৮৯৮ সালে।

দ্বিতীয় দুর্বলতা ছিলো জাপানকে নিয়েঃ

চীনের চেয়ে ২৫ গুন ছোট জাপানের উত্থান ছিলো অত্যন্ত ভীতিকর। ১৮৬৮ সালে সম্রাট মেইজি ক্ষমতায় বসার পর জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অনুকরণ করে ২০ বছরের মধ্যে ইউরোপীয় পরাশক্তিদের সমান কাতারে চলে আসলো। শক্তিশালী হয়েই জাপান চিন্তা করলো, অন্যান্য শক্তিশালী দেশের তুলনায় তার কোনো কলোনী নেই। দুর্বল চীনের প্রতি লোভ জাগ্রত হলো জাপানের। ১৮৯৪-৯৫ সালে কোরিয়ানদের ফুঁসলিয়ে চীনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলো জাপান। কোরিয়া শত শত বছর যাবত চীনের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ ছিলো। কিন্তু এবার জাপানের ষড়যন্ত্রে কোরিয়া চীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চীনারা ভয় পাচ্ছিলো কোন সময় না জানি জাপান তাদের দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়।

তৃতীয় দুর্বলতা ছিলো পশ্চিমা শক্তিকে নিয়েঃ

শুধুমাত্র ব্রিটেন নয়, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও চীনকে হাতের পুতুল মনে করতো। জার্মানী চীনের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ জিয়াও ঝু দখল করে নিজের মতো করে ঘাঁটি তৈরি করলো। কেউ কিছু বলতে পারলো না। অনেক আগে থেকেই ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারীরা চীনে খৃস্টধর্মের প্রচার চালাতে লাগলো। চীনের জনগণ এসব মিশনারীদের দু'চোখে দেখতে পারতো না।

'Boxer revolution' পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলনঃ

চীন যখন সবদিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়লো তখন রাজার প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা রইলো না। চীনের সাধারণ জনগণ বিপর্যস্ত। একে তো ক্ষমতায় বসে আছে অপদার্থ, অকর্মন্য রাজা, অন্যদিকে ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন ছল ছুতোয় চীনের ভূ-খণ্ড দখল করেই যাচ্ছিলো। ১৮৯৭ সালে দুজন জার্মান মিশনারী স্থানীয় চাইনিজদের হাতে খুন হয়। এই অজুহাতে জার্মান নৌবাহিনী জিয়াও ঝু প্রদেশে হামলে পড়েন। অপদার্থ চৈনিক সম্রাট জার্মানদের বাধা দেওয়াতো দূরের কথা, উল্টো জার্মানীর সাথে সন্ধি করে বসলেন। চীনের সাথে ৯৯ বছরের জন্য এই ভূ-খণ্ড ইজারা নিয়ে দখলদারিত্ব কায়েম করে জার্মানরা। ব্রিটেন অনেক আগেই হংকং দখল করে বসে আছে। বিদেশীদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করা দরকার।

২০ জুন, ১৯০০ সালঃ

চীনের একদল বিদ্রোহী তৎকালীন পিকিং নগরীতে বিদেশীদের আস্তানা, খ্রিস্টানদের চার্চ ও রেলস্টেশনে হামলা চালান। সম্রাজ্ঞী ঝুঝি এসব হামলাকে মৌন সমর্থন দেন। কারণ তিনি নিজেও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বিরক্ত। হামলাকারীরা খাকি পোশাক ও হাফপ্যান্ট পরিহিত ছিলো বিধায় ইউরোপীয়রা তাদেরকে বক্সার নামে আখ্যায়িত করেন। ইতিহাসে সেটাই 'বক্সার বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

হামলার পরের দিনই সম্রাজ্ঞী ঝুঝি বক্সারদের সাথে তাল মিলিয়ে চীনে অবস্থানরত সমস্ত বিদেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

নড়েচড়ে বসলো চীনে অবস্থানরত সব বিদেশীরা। চীনকে লুটেপুটে খাওয়ার দিন কি তাহলে শেষ হয়ে এলো?

কয়েক হাজার ইউরোপীয়ান খৃস্টান বক্সারদের হামলায় নিহত হলো। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ৮টি রাষ্ট্র চীনের বক্সারদেরকে হটাতে একজোট হলো। আগস্টের ১৪ তারিখ ২০ হাজার সৈন্যের এক সুসজ্জিত বাহিনী চীনে পৌঁছলো । দেশগুলো হচ্ছে-অস্ট্রো-হাঙ্গেরী, জাপান, ইতালি, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী ও

যুক্তরাজ্য। অচিরেই বক্সার বিদ্রোহ প্রশমিত হলো। ইউরোপীয় অধিবাসীরা নিরাপদ হলো।

পরের বছর ১৯০১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চীনের সাথে চুক্তি হলো ইউরোপীয়দের। চুক্তির শর্ত মোতাবেক চীনে বিদেশী সৈন্য উপস্থিত থাকলো। চীনের কাছ থেকে ৩৩০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করলো ইউরোপীয়রা।

আরেকটা মজার তথ্য জানিয়ে রাখি, আমেরিকা পরবর্তীতে চীনকে এ টাকা ফেরত দিয়ে দেয়। কিন্তু শর্ত দিয়ে রাখে যে, এ টাকা দিয়ে যাতে বেইজিং নগরীতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

চিন্তা করে দেখো, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চীনে একটা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছিলো না। অথচ সমসাময়িক ইউরোপীয় শক্তিরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অনেক দূর এগিয়ে ছিলো।

আসরে নামলেন সান-ইয়াত সেনঃ

চীনকে এরকম অপমানজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য বিধাতা যেন সান ইয়াত সেনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আধুনিক চীনের জনক হচ্ছেন সান-ইয়াত সেন। ১৮৬৬ সালের ১২ নভেম্বর কোয়াংতুং প্রদেশে জন্মগ্রহন করেন। চীনের ভাগ্য ভালো, তাদের সেই অপমানজনক সময়ে সান-ইয়াত সেনের মতো লোকই দরকার ছিলো।



চিত্র-৩৩ : অপদার্থ রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার মূল কারিগর হলেন সান ইয়াত সেন। তিনি আধুনিক চীনের জনক।

যুক্তরাজ্য। অচিরেই বক্সার বিদ্রোহ প্রশমিত হলো। ইউরোপীয় অধিবাসীরা নিরাপদ হলো।

পরের বছর ১৯০১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চীনের সাথে চুক্তি হলো ইউরোপীয়দের। চুক্তির শর্ত মোতাবেক চীনে বিদেশী সৈন্য উপস্থিত থাকলো। চীনের কাছ থেকে ৩৩০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করলো ইউরোপীয়রা।

আরেকটা মজার তথ্য জানিয়ে রাখি, আমেরিকা পরবর্তীতে চীনকে এ টাকা ফেরত দিয়ে দেয়। কিন্তু শর্ত দিয়ে রাখে যে, এ টাকা দিয়ে যাতে বেইজিং নগরীতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

চিন্তা করে দেখো, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চীনে একটা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছিলো না। অথচ সমসাময়িক ইউরোপীয় শক্তিরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অনেক দূর এগিয়ে ছিলো।

আসরে নামলেন সান-ইয়াত সেন:

চীনকে এরকম অপমানজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য বিধাতা যেন সান ইয়াত সেনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আধুনিক চীনের জনক হচ্ছেন সান-ইয়াত সেন। ১৮৬৬ সালের ১২ নভেম্বর কোয়াংতুং প্রদেশে জন্মগ্রহন করেন। চীনের ভাগ্য ভালো, তাদের সেই অপমানজনক সময়ে সান-ইয়াত সেনের মতো লোকই দরকার ছিলো।



চিত্র-৩৩ : অপদার্থ রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার মূল কারিগর হলেন সান ইয়াত সেন। তিনি আধুনিক চীনের জনক।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, ১৮৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দীপপুঞ্জের হনলুলুতে একটি খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকেই পাশ্চাত্য সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হন তিনি। সানের কাছে ভালো লাগতে শুরু করে পাশ্চাত্যের মুক্ত চিন্তা। ১৮৮৪ সালে তিনি খৃস্টান ধর্মেও দীক্ষিত হন। হনলুলুর সেই মিশনারী স্কুলের একজন সেরা ছাত্র হিসেবেও তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিলো।

তারপর ১৮৮৭ সালে তিনি হংকং চলে যান। মেডিক্যাল বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দেন। চিকিংসা বিদ্যায়ও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। পশ্চিমের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি তার নখদর্পনে। দুটি বই ছিলো তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। একটি হচ্ছে এডমন্ড বার্কের 'A history of the French revolution' এবং চার্লস ডারউইনের 'Evolution'।

চিকিৎসাবিদ্যায় পড়াশোনা শেষ করে তিনি কিছুদিন ডাক্তারি প্রাকটিস করেন। কিন্তু তার চিন্তায় ও মগজে একটাই মাত্র চিন্তা। কিভাবে অথর্ব রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে জনগণের রাষ্ট্র গঠন করবেন।

১৮৯৫ সালে অল্প কিছু সমর্থক সংগ্রহ করে ক্যান্টনে একটা ব্যর্থ বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। বিপ্লব ব্যর্থ হলে সান ইয়াত সেনের সঙ্গী সাথীরা কেউ কেউ ধরা পড়েন। স্বয়ং সান ইয়াত সেন হংকং পালিয়ে যান। নিজের দেশে হয়ে পড়েন একজন ফেরারী আসামী। তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়।

১৮৯৬ সালে সান ইয়াত সেন লন্ডন পালিয়ে যান। কিন্তু অচিরেই তিনি চীনের সরকারি প্রতিনিধিদের হাতে ধরা পড়েন। কিছুদিনের মধ্যেই বন্দীদশা থেকে তিনি পালিয়ে যান। বইপত্র লেখা শুরু করেন চীনের অচলাবস্থা নিয়ে। লন্ডনের এসব কর্মকাণ্ডে চীন ধীরে ধীরে বহির্বিশ্বে পরিচিত হতে শুরু করে।

টানা দুই বছর তিনি পুরো ইউরোপ ঘুরে বেড়ান। চীনের মুক্তির জন্য তিনটি পথকে অপরিহার্য মনে করেন তিনি। পথ তিনটি হলো- 'Nationalism, democracy and socialism'.

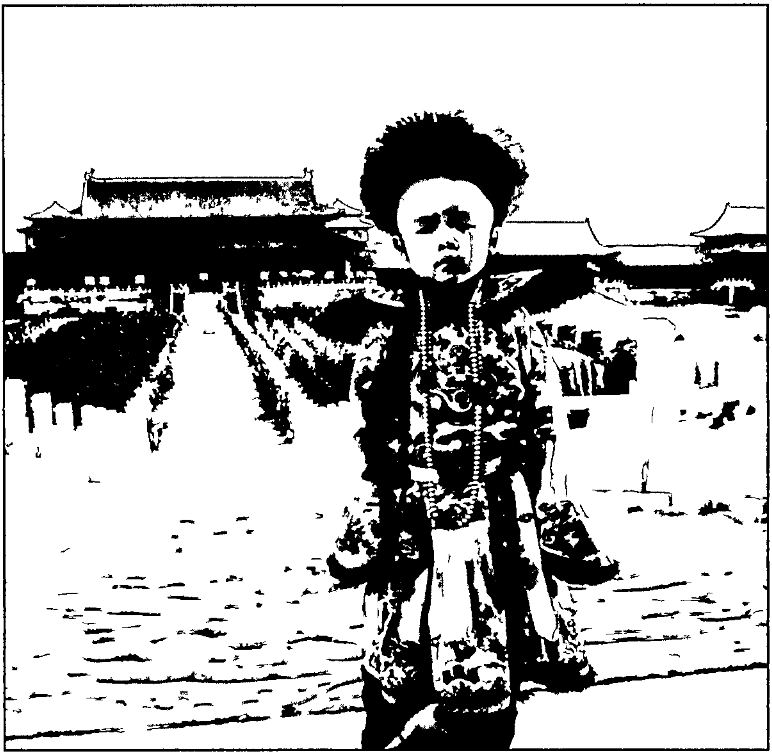
সান ইয়াত সেনের ভাষায়-এই তিনটির চাইনিজ রুপ হলো-

চীনের রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা আর সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক মুক্তি।

তারপর তিনি জাপান ফিরে আসেন। ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত তিনি জাপান কাটান। এসময় বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। সারা বিশ্বের মানুষের কাছে সান ইয়াত সেনই হয়ে উঠেছিলেন নতুন চীনের ধারক ও বাহক।

১৯০৪ সালের দিকে ভবঘুরে সান ইয়াত সেনকে আমরা দেখি আবার আমেরিকায়। তিনি একটা ইশতেহার লিখলেন, **"The True Solution to the Chinese Question."**

ইয়েল ইউনিভার্সিটির আইনের ছাত্র ওয়াং-চুই হুই-তাকে এ ইশতেহারের খসড়া লিখতে সহায়তা করেন।



চিত্র-৩৪: চীনের নাবালক সম্রাট পুয়ি

চিং রাজবংশের পতন:

সান ইয়াত সেনের উদ্দেশ্য একটাই। অথর্ব রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে হবে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলেই চীনের মুক্তি আসবে।

১৯১১ সালে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য প্রবল বিদ্রোহ শুরু হয় উচাংয়ে। ১০ অক্টোবর থেকে চলা এই বিক্ষোভের জেরে চীনের নাবালক সম্রাট পুয়ি ১৯১২

১৯০৪ সালের দিকে ভবঘুরে সান ইয়াত সেনকে আমরা দেখি আবার আমেরিকায়। তিনি একটা ইশতেহার লিখলেন, **"The True Solution to the Chinese Question."**

ইয়েল ইউনিভার্সিটির আইনের ছাত্র ওয়াং-চুই হুই-তাকে এ ইশতেহারের খসড়া লিখতে সহায়তা করেন।



চিত্র-৩৪: চীনের নাবালক সম্রাট পুয়ি

চিং রাজবংশের পতন:

সান ইয়াত সেনের উদ্দেশ্য একটাই। অথর্ব রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে হবে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলেই চীনের মুক্তি আসবে।

১৯১১ সালে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য প্রবল বিদ্রোহ শুরু হয় উচাংয়ে। ১০ অক্টোবর থেকে চলা এই বিক্ষোভের জেরে চীনের নাবালক সম্রাট পুয়ি ১৯১২

সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। শেষ হয় হাজার হাজার বছর ধরে চলা রাজতন্ত্র।

কিন্তু এই বিপ্লবের সময় সান ইয়াত সেন চীনে ছিলেন না। তিনি তখন আমেরিকার ডেনভারে ছিলেন।

রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পর সেনাপতি ইউয়ান সিকাই ক্ষমতালোভী হয়ে উঠলেন। আসলে সান ইয়াত সেন রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পূর্বে ইউয়ান সিকাইয়ের সাথে একটা সমঝোতায় আসেন। সেই সমঝোতার শর্ত ছিলো, সান ইয়াত সেনকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট বানাতে হবে। পরবর্তীতে ইউয়ান সিকাই হবেন চীনের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। সান ইয়াত সেন এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। কারণ তিনি ক্ষমতালোভী ছিলেন না। রাজতন্ত্রের পতনটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় ছিলো।

বিপ্লব পরবর্তী অরাজকতার কাল, যুদ্ধপতিদের দখলে খন্ড-বিখণ্ড চীন:

১৯১২ সালে সান ইয়াত সেন অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। কয়েক বছর যেতে না যেতেই ক্ষমতালোভী ইউয়ান সিকাই ১৯১৫ সালে নিজেকে চীনের সম্রাট ঘোষণা করেন। সিকাইয়ের এ ঘোষণায় বিরক্ত হয়ে উঠলো চীনের সাধারণ জনগণ। তারা কোনোমতেই সম্রাট শাসিত চীন দেখার জন্য রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করেনি।

ইউয়ান সিকাই ১৯১৬ সালে মারা যান। পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। বিশাল বড় দেশ চীনের সেনাবাহিনী ছিলো খন্ড-বিখন্ড। অনেকগুলো খন্ড-খন্ড প্রদেশে বিভক্ত চীন চলে যায় সামন্ত চিন্তাধারার অধিকারী যুদ্ধপতিদের হাতে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সান ইয়াত সেন রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করলেন, তার কিছুই হলো না। শতধা বিভক্ত চীনকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সান ইয়াত সেন গুয়াংজুকে কেন্দ্র করে তার সরকার সাজালেন ১৯২১ সালে।

যেভাবেই হোক চীনকে একত্র করতে হবে। সান ইয়াত সেন মারা যান ১৯২৫ সালে।

মুখোমুখি আধুনিক চীনের দুই চিরবৈরী নেতা চিয়াং কাইশেক ও মাও সেতুং, ন্যাশনালিস্ট বনাম কমিউনিস্ট:

চীনের জাতীয়তবাদী দল ন্যাশনালিস্ট পার্টির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন আধুনিক চীনের জনক সান-ইয়াত সেন। তিনিই ১৯১২ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হলে এর ঢেউ চীনে এসেও পড়ে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালের জুলাই মাসে।

অবাক করা তথ্য হলো, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা অবাধে ন্যাশনালিস্ট দলের সদস্যপদ পায়। ন্যাশনালিস্ট দলের অভ্যন্তরে বিপুলসংখ্যক কমিউনিস্ট সদস্য ঢুকে পড়ে।

কিন্তু ১৯২৫ সালে সান-ইয়াত সেন মারা যাওয়ায় ঝামেলা দেখা দিলো। ন্যাশনালিস্ট পার্টির সর্বেসর্বা হন জেনারেল চিয়াং কাইশেক। এখানেই আপত্তি তরুণ কমিউনিস্ট নেতা মাও সেতুংয়ের। ১৯২২ সালে মাও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

১৯১৭ সালে মাওয়ের বয়স যখন ২৪ তখনই রাশিয়াতে বিপ্লব হয়। মার্কসের রচনাবলীর সাথে পরিচিত হন তিনি। মাও সেতুং এর কাছে কমিউনিজম হয়ে উঠে মুক্তির পথ।

১৯২৭ সালে ৩৪ বৎসর বয়স্ক মাও 'কমান্ডার ইন চিফ অব রেড আর্মি' নিযুক্ত হন।

১২ এপ্রিল, ১৯২৭:

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু করেন চিয়াং কাইশেক। শুরু হলো চিয়াং কাইশেকের ন্যাশনালিস্ট দলের সাথে মাও সেতুং এর কমিউনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্ব। ১৯২৭ সাল থেকে শুরু হওয়া এই দ্বন্দের শেষ হয় ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত। অন্তত ২ কোটি লোক মারা যায় এই দ্বন্দ্বের বলি হয়ে।

ক্ষমতার লড়াইয়ে আপাত জয়ী হন চিয়াং কাইশেক। বিশাল চীনের অধিকাংশ এলাকাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তিনি দেশ শাসন করতে লাগলেন।

১৯৩৪ সালে কমিউনিস্টদের শক্ত ঘাঁটি জাংসীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে চিয়াং কাইশেকের বাহিনী। নেতা মাও সেতুং তার অনুগামীদের হুকুম দিলেন, লংমার্চ করার জন্য। হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে শুরু হলো লংমার্চ। চিয়াং কাইশেকের নাগালের বাইরে শাংসী প্রদেশে পাড়ি জমালেন কমিউনিস্ট সমর্থকরা।

মাও সেতুং হয়ে উঠলেন কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতা। যদিও চিয়াং কাইশেকের সরকারের সামনে কমিউনিস্টরা একেবারে কোনঠাসা।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ:

১৯৩৭ সাল:

সাম্রাজ্যবাদী জাপান চীন আক্রমণ শুরু করলো। চীনের ভূ-খন্ড দখল করার জন্য লোভী জাপান নিষ্ঠুরতা শুরু করলো। রাজধানী নানজিং এ নরহত্যা চালালো

জাপানীরা। তিন লাখ লোক মারা গেলা। লক্ষ লক্ষ নারী ধর্ষিত হলো। হায়রে জাপানের অত্যাচার!

জাপানীদের ঠেকাতে বিভেদ ভুলে একজোট হলো ন্যাশনালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি।

চিয়াং কাইশেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র। যুদ্ধ চললো বছরের পর বছর। জাপান আত্মসমর্পন করলো ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট। কিন্তু চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা চিয়াং কাইশেকের কপালে মহা বিপদ।

যে কমিউনিস্টরা দুর্বল ছিলো; চিয়াং কাইশেকের বাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারতো না, সেই কমিউনিস্টরা এখন সবল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে চীনের সর্বত্র অবাধে বিচরণ করে কমিউনিস্টরা। গুছিয়ে নিয়েছে তাদের সংগঠন। আর জাপানীদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র দখলে নিয়ে কমিউনিস্টরা হয়ে গেছে দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধা।

এই বিপদের মুহূর্তে আমেরিকাকে পাশে পায়নি চিয়াং কাইশেক। ১৯৪৬ সাল থেকে আবারও শুরু হলো লড়াই। ভয়াবহ নৃশংসতায় চীনের অধিকাংশ এলাকা দখল করে মাও সেতুং। মাও সেতুং কে সাহায্য করে সোভিয়েত রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিন। চীনের মূল ভূ-খন্ড থেকে পালিয়ে চিয়াং কাইশেক চলে গেলেন তাইওয়ানে। বলে রাখা ভালো, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘে চীনের প্রতিনিধি ছিলো তাইওয়ান।

পর্ব-৮৯

১ অক্টোবর, ১৯৪৯:- চীনে প্রতিষ্ঠিত হলো সমাজতন্ত্র:

একটা কথা বলে রাখা ভালো। নিষ্ঠুরতায় মাও সেতুং তুলনাহীন। হিটলার-স্ট্যালিনের মতোই নরহত্যাকারী মাও সেতুং। মাও সেতুংয়ের কমিউনিস্ট শাসনে ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ১০ কোটি লোক মারা যায় শুধুমাত্র অনাহারে। সমাজতন্ত্রের বড় বড় বুলি নিয়ে হাসতে হাসতে মানুষ খুন করেছেন মাও সেতুং। নিজের জেদের প্রতি অবিচল মাও চারপাশের কোনো ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিতেন না।

মাও সেতুংয়ের লাল বাহিনী ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর তিয়েন আন মেন স্কয়ারে বিপ্লবের পতাকা উড়ান। কাগজে কলমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের সাধারণ জনগণ ভেবেছিলো, এবার বুঝি শান্তি আসবে। নিষ্ঠুর মাও সেতুং জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। জনগণ তখনও জানতো না, কি যে এক আজরাইলের খপ্পরে পড়েছেন তারা!

'গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব' কোটি কোটি আদম সন্তানের অহেতুক মৃত্যুঃ

১৯৫৮ সাল-

আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রীদের রোমান্টিক নায়ক মাও সেতুংয়ের মনে হঠাৎ শখ হলো, চীনকে আগামী ১০ বছরের মধ্যে ব্রিটেনের সমকক্ষ ও ২০ বছরের মধ্যে আমেরিকার সমকক্ষ বানাবেন। চীনের জনগণ নাকি সব পারে! কি করতে হবে তাহলে?

দুটি কাজ করতে হবে প্রথমতো। ব্যাপক কৃষি উৎপাদন ও শিল্পোন্নয়ন। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিকে উৎখাত করে সমবায়ভিত্তিতে কৃষিকাজ শুরু হলো। কৃষকেরা দেখলো তাদের সাধের জমি নিয়ে নিয়েছে সরকার। এবার সারাদিন কাজ করতে হবে।

কৃষকদের খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, অবসর নেই, স্বাধীনতা নেই শুধু কাজ আর কাজ। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সরকারের চামচারা আছে; যারা পান থেকে চুন খসলেই অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু করে। কোন জমিতে কি উৎপাদন করা হবে, এ ব্যাপারে কোনো শৃঙ্খলা নাই। অনাহারে মারা যেতো লাগলো কোটি কোটি লোক। মাও সেতুংয়ের মনে হলো, চড়ুই পাখি হলো চীনের দুশমন। এই চড়ুই পাখি নাকি চীনের কৃষিজ ফসল খেয়ে ফেলে!

চড়ুই পাখি মারার হুকুম জারী করা হলো। সাধারণ জনগণকে অহেতুক চড়ুই পাখির শত্রু বানিয়ে বাস্তুসংস্থান নষ্ট করা হলো। হায়রে তামাশা!

কৃষির বারোটা বাজিয়ে শিল্পকেও নষ্ট করার পাঁয়তারা চললো। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নাম করে পরিকল্পনাহীনভাবে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো হলো। কিন্তু জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত না হলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প দিয়ে কি হবে?

১৯৬১ সাল-

মাত্র তিন বছরের মধ্যে এই পাগলামি বন্ধ হলো। এই পাগলামির অফিসিয়াল নাম ছিলো- 'Great leap forward.'

প্রায় ৫ কোটি লোকের অসহায় আর্তনাদ আর প্রাণহানির মধ্য দিয়ে এই মহান (!) মাও সেতুংয়ের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মৃত্যু ঘটলো। কিন্তু আরো খেলা তখনও বাকী ছিলো কমরেড মাও সেতুংয়ের!

'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬:

১৯৫৩ সালে রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার সাথে চীনের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। মাও সেতুংয়ের ধারণা হলো, রাশিয়া সমাজতন্ত্রের পথ থেকে সরে গিয়ে আপোষনামার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্ট্যালিনকে বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন মাও সেতুং। স্ট্যালিন পরবর্তী নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের নাম নিশানা মুছে ফেলতে নানা উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। এটা সহ্য হচ্ছিলো না চেয়ারম্যান মাওয়ের। ক্রুশ্চেভকে এড়িয়ে মাও সেতুং নিজের মতো করে দেশ চালাচ্ছিলেন।

গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের সময় ৫ কোটি লোক মারা গেলেও মাও সেতুং এতটুকু নরম হন নি। বরং আরো কঠোর হলেন কমিউনিজম প্রচারে। মাও সেতুং ভাবলেন, রাশিয়া কমিউনিজম থেকে সরে গেলেও চীন কখনো সরবে না। সারা দেশে কমিউনিজমের মহান আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে। চীনই হবে কমিউনিজমের কেন্দ্রস্থল; বিপথগামী রাশিয়া নয়।

১৬ মে, ১৯৬৬-

কীভাবে কমিউনিজমের আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে হবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বলা হলো, "তোমরা গ্রামে ফিরে যাও, লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ো। লোকজনকে সমাজতন্ত্রে আর দীক্ষা দাও। আর দেখো, কারা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলছে। তাদের চিহ্নিত করে খতম করো।"

প্রায় দেড় কোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে নিয়ে গঠন করা হলো 'রেড গার্ড'। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লাল বাহিনীর সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়লো। চেয়ারম্যান মাও কিংবা কমিউনিজম নিয়ে সমালোচনামূলক কিছু কথা বললেই শিক্ষক, শিল্পীসহ সমাজের যে কোনো স্তরের মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হতো।

আহারে! সরকারের সামান্য সমালোচনা করলেই প্রাণ হারাতো এসব অসহায় মানুষেরা। মাও কে রিপোর্ট পাঠাতো এসব অল্প বয়সের ছাত্ররা। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কি নিদারুণ হত্যাযজ্ঞ?

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় মাও সেতুংয়ের সৈন্যরা যা করেছে, তার বর্ণনা দিতে গেলেও একজন সুস্থ মানুষ মানবিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। পুরাতন সাংস্কৃতিক সব ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নতুনভাবে সব শুরু করার কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন সব স্থাপত্য আর জাদুঘরে রক্ষিত হাজার হাজার বছরের মূলবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। আজকের চীনে পুরাতন যা কিছু দেখা যায়, সব নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে পরবর্তীতে।

সব জায়গায় স্থাপন করা হলো মাও সেতুংয়ের ছবি। মাও সেতুং বললেন, ‘‘পড়াশোনার এত দরকার নাই। সব থেকে মুক্তির পথ একটাই তাহলো কমিউনিজম। ’’

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পড়াশোনা বাদ দিয়ে গ্রামে গিয়ে কৃষিকাজ করলো আর মাওয়ের সমাজতন্ত্রের গুণগান গাইতে লাগলো।

তবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবই ছিলো মাও সেতুংয়ের সর্বশেষ মাস্তানি। অন্তত ৩ কোটি লোক মারা গেলো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে সমাজতন্ত্র প্রচার করতে গিয়ে। বিংশ শতাব্দীর এই কুখ্যাত লোকটি ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মারা যায়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরও পতন ঘটে।

রাশিয়ার সাথে দোস্তি খতম:

আগেই বলেছিলাম, ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার নতুন নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভের সাথে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিলো না চীনের। যদিও ১৯৫৪ সালে ক্ষমতায় বসার পর ক্রুশ্চেভ প্রথম বিদেশ সফর চীন দিয়েই শুরু করেছিলেন। কিন্তু চীনের চোখে ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদী; যিনি সমাজতন্ত্রের আসল পথ থেকে সরে গেছেন।

১৯৬০ সালের পর থেকে চীন প্রকাশ্যেই রাশিয়ার সমালোচনা করতে লাগলো। ১৯৬৬ সালে চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হলে চীনের বিপ্লবী রেড গার্ড রাশিয়ান সীমান্তে লাউড স্পিকার বাজিয়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে গালাগাল দিতে লাগলো অনবরত।

২ মার্চ, ১৯৬৯

চীন-রাশিয়া সম্পর্কের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। চীন-সোভিয়েত রাশিয়ার সীমান্তে উসুরি নদীর মধ্যকার এক দ্বীপ নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগে গেলো দুই দেশের সৈনিকদের মধ্যে। চীনের সৈন্যরা হঠাৎ করে টহলরত রাশিয়ান সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালালো। এতে ৬০ জনেরও অধিক রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয়।

রাশিয়ানরাও পাল্টা হামলা চালালো। কিন্তু বরফাচ্ছন্ন নদীতে খুব একটা সুবিধা করতে পারলো না রাশিয়ানরা।

রাশিয়ান নেতৃবৃন্দ চীনের সাথে টেলিফোনে কথা বলে একটা আপোষ-মীমাংষা করার চেষ্টা করলো। মাও সেতুংয়ের টেলিফোন লাইনে সরাসরি ফোন আসলো মস্কো থেকে। কিন্তু অপারেটর মাও সেতুংয়ের সাথে সংযোগ করিয়ে দিলো না রাশিয়ানদের। খবরটা মাও সেতুংয়ের কানে গেলে তিনি টেলিফোন অপারেটরকে বলে দিলেন যে- যদি আবারও ফোন আসে তাহলে যেন রাশিয়াকে সমাজতন্ত্রের শত্রু বলে আচ্ছামতো গাল দেওয়া হয়।

এবার রাশিয়া খেপে গেলো। চীনকে পারমানবিক হামলার হুমকি দিলো রাশিয়া। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ পুঁজিবাদী বিশ্ব দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের ঝগড়া তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে লাগলো।

সীমান্তে সৈন্য জড়ো করলো রাশিয়া। এবার পরিস্থিতি বেগতিক দেখে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই পদগর্নির সাথে কথা বললেন। উত্তেজনা প্রশমিত হতে লাগলো। কিন্তু এ ঘটনার পর থেকে চীন রাশিয়ার দুটি পথ দুদিকেই গেলো বেঁকে।

আমেরিকার সাথে ঐতিহাসিক মিলনঃ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন কুখ্যাত হয়ে আছেন 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির' জন্য। বিরোধী পক্ষের নির্বাচনী কৌশল জানার জন্য গোপন ক্যামেরার কারসাজি করা নিক্সন আমেরিকার একজন খলনায়কও বটে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিক্সন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তার শান্তিবাদী ভূমিকার জন্য।

১৯৬৮ সালের নির্বাচনে জেতার পর একদিকে তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে আমেরিকাকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেন, অন্যদিকে রাশিয়া সফরে যান লিওনিদ ব্রেজনেভের সাথে দেখা করার জন্য, আবার ইরানের শাহের সাথে গভীর বন্ধুত্ব দেখাতে গিয়ে ইরান সফর করেন। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের চীন সফর।

রাশিয়ার সাথে চীনের সীমান্ত সংঘাতসহ বিবিধ বিষয়ে ঝগড়া বিবাদের কারণে আমেরিকা একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেলো চীনের সাথে সম্পর্ক বাড়ানোর। ভিয়েতনাম যুদ্ধে জর্জরিত মার্কিন সমাজকে স্বস্তি দিতে নিক্সন ঐতিহাসিক চীন সফরে যান।

১৯৭১ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখ প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবিসি রেডিওতে এক অনুষ্ঠানে বলেন, তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাইয়ের আমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং আগামী বছরের শুরুর দিকে তিনি চীন যাবেন।

১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ১১ দিন ব্যাপী চীন সফর করেন নিক্সনঃ

জাতিসংঘে চীনের প্রতিনিধি হিসেবে তাইওয়ানের সদস্যপদ শেষ হয়ে যায়। মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বাধীন চীনকে মেনে নেয় আমেরিকা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়।

দেং জিয়াংপের সংস্কারঃ

আমরা বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে চীনের দুঃখ-দুর্দশা আর হাহাকারের গল্পই শুনলাম এতক্ষণ। সেই ১৮৯৪ সালে জাপানের হাতে পরাজয়, তারপর বক্সার বিদ্রোহের কারণে ইউরোপীয়দের হাতে হেনস্তা হওয়া, ১৯১২ সালে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, তারপর ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তছনছ হয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি মাও সেতুংয়ের নৃশংসতার কারণে চীন কেবল পিছিয়েই পড়ছিলো।

১৯৭৬ সালে মাও সেতুংয়ের মৃত্যুর পর থেকে এক নয়া যুগে প্রবেশ করলো চীন। দেং জিয়াংপে অর্থনৈতিক সংস্কার কাজে হাত দিলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগদখলের একটা সুযোগ দিলেন বিভিন্ন আইন কানুন প্রণয়ন করে। কাজের পরিবেশ তৈরি হলো। ১৯৭৮ সাল থেকে এক সন্তান নীতি চালু হলো।

পুরো বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত হলো চীন। জাপানের সাথে শান্তি চুক্তি স্থাপিত হলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথেও মৈত্রী স্থাপিত হলো। কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি থেকে বাজার ভিত্তিক অর্থনীতি চালু হলো।

১৯৭৯ সালে দেং জিয়াংপে প্রথম কোনো চাইনিজ শীর্ষ নেতা হিসেবে আমেরিকা সফর করেন। আমেরিকার বিনিয়োগকারীরা অবাধে বিনিয়োগের সুযোগ পেলো চীনে।

রকেট গতিতে দারিদ্র্য বিমোচন হতে লাগলো চীনে। বিশ্ব অর্থনীতির পাওয়ার হাউসে পরিণত হলো চীন।

১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দেং জিয়াংপে ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৮৯ সালে গণতন্ত্রের দাবিতে বেইজিংয়ের তিয়েন আনমেন স্কয়ারে ছাত্র বিক্ষোভ হলে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়।

চীন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে অন্য কোন বইয়ে।

পর্ব-৯০

কোরিয়া সমস্যার গোড়ার কথাঃ

১৯৫০ সালের পূর্বেও দুই কোরিয়া ছিলো একটি ঐক্যবদ্ধ অঞ্চল । হাজার হাজার বছর যাবত তাদের একটি সমৃদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতির ইতিহাস ছিলো। স্বাধীন ও সার্বভৌম না হলেও, কোরিয়া উপদ্বীপ ছিলো চীনের একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। কিন্তু ১৯৫০ সালের পর থেকেই কোরিয়া বিভক্ত হয়ে যায়। 'উত্তর কোরিয়া' ও 'দক্ষিণ কোরিয়া'-এ নামে দেশ দুটি বিভক্ত হয়। তারপর থেকেই এ দু'দেশের দু'টি আলাদা পথ যেন দুদিকেই গেছে বেঁকে।

৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখাকে ঘিরে যেন এক চিরন্তন লড়াইঃ

কোরিয়া উপদ্বীপের ইতিহাস চীনের সাথে জড়িত। শত শত বছর যাবত চীনের অধীনে থেকে কোরিয়ানরা স্বাধীনসত্তা বজায় রেখেই চলছিলো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে চীন যখন দুর্বল হয়ে পড়লো, তখনই বাঁধলো গণ্ডগোল। ১৮৯৪-৯৫ সালের মধ্যে নব্য পরাশক্তি জাপান চীনের কাছ থেকে কোরিয়াকে ছিনিয়ে নিলো। ১৯১০ সালে জাপান পুরোপুরিভাবে কোরিয়াকে গ্রাস করলো। কোরিয়া হয়ে গেলো জাপান কর্তৃক আশ্রিত এক অসহায় জাতিসত্তা।

কিন্তু জাপানীদের দখলদারিত্বেই কোরিয়াতে গণজাগরণ শুরু হলো। কোরিয়ান জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধে উঠলো। জাপানী হানাদার বাহিনীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে উঠলো। ঠিক সেই পরিস্থিতির মধ্যে এক জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন সিংম্যান রি। রি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। আমেরিকা থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করা প্রথম কোরিয়ান। সিংম্যান রি এক স্বাধীন কোরিয়ার স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্ন নিয়ে তিনি ১৯১৯ সালে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন। আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমেরিকানদের চোখে রি এক উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই নয়। জাপানীদের সাথে ইউরোপ-আমেরিকার মিত্র শক্তির তখন ব্যাপক বন্ধুত্ব। জাপানের অধীনেই কোরিয়া থেকে গেলো। কিন্তু সিংম্যান রি পত্রপত্রিকা প্রকাশ, বইপত্র লেখা ইত্যাদি কাজ অব্যাহত রেখে স্বাধীন কোরিয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সিংম্যান রি আমেরিকানদের কাছে বলতে লাগলেন, ''জাপানকে শায়েস্তা করতে হলে আমেরিকার উচিত কোরিয়াতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা কারণ তা না হলে রাশিয়ানরা কোরিয়াতে কমিউনিজম রপ্তানি করবে; যা আমেরিকার স্বার্থের প্রতিকূল।''

আমেরিকাকে অনুকরণ করে সিংম্যান রি যখন স্বাধীন কোরিয়ার ভবিষ্যৎ আঁকতে লাগলেন, তখন বেড়ে উঠছেন আরেকজন কোরিয়ান বিপ্লবী; নাম যার কিম ইল

সুং। বর্তমান উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উনের দাদা। কিম ইল সুং ৮ বছর বয়সেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য হয়ে বছরের পর বছর দখলদার জাপানের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালান। পুরো চীন জুড়ে কিম ইল সুং এর নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪১ সালে জার্মানী যখন রাশিয়া আক্রমণ করে তখন কিম ইল সুং রাশিয়ান লাল ফৌজের যোদ্ধা হিসেবে নাম লেখান। হিটলারের জার্মানীর বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করেন কিম ইল সুং। ১৯৪৫ সালে তিনি যখন কোরিয়াতে ফিরে আসেন তখন তিনি ছিলেন মুলত রাশিয়ান সেনা অফিসার।

এই ফাঁকে ঘটে গেলো আরেকটি সামান্য ঘটনা; যদিও সে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আজ পর্যন্ত দুই কোরিয়া বিভক্ত। ঘটনাটি হলো, জাপানের দুর্বার আক্রমণে আমেরিকা নাজেহাল। যুদ্ধে নামলো আমেরিকা আঁটঘাট বেঁধে। আমেরিকার সাথে রাশিয়ার দোস্তি তখন চরমে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন অক্ষশক্তির দুই খেলোয়াড় জার্মানি ও ইতালি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত, জাপান কিন্তু তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা আর রাশিয়া মিলে কোরিয়াকে ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখায় বিভক্ত করে জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে রণপরিকল্পনা সাজায়। রাশিয়া নিয়ন্ত্রণ করে উত্তর কোরিয়া, আর আমেরিকার তত্ত্বাবধানে থাকে দক্ষিণ কোরিয়া। এটা ছিলো নেহায়েত একটা সাময়িক ব্যবস্থা। আমেরিকা-রাশিয়া উভয়ই ভেবেছিলো, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর একটা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন কোরিয়ার জন্ম হবে।

কে জানতো? সাময়িক ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখাই হবে বিবাদের মূল কারণঃ

আমেরিকার নিয়ন্ত্রণাধীন দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রভাব বাড়িয়ে চললেন কোরিয়ান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ সিংম্যান রি। সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তর কোরিয়ায় সবকিছু কব্জা করলেন কমিউনিস্ট নেতা কিম ইল সুং। একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমেরিকা-রাশিয়া কেউই চায়নি কোরিয়াকে কেন্দ্র করে তারা কোনো দখলদারিত্ব বজায় করুক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্নায়ুযুদ্ধের বাতাস শুরু হলেও কোরিয়াকে নিয়ে আমেরিকা-রাশিয়া কারোই কোনো মাথাব্যাথা ছিলো না। স্নায়ুযুদ্ধের ভরকেন্দ্র ছিলো কেবলই ইউরোপ।

১৯৪৮ সালের মে মাসে রিপাবলিক অব কোরিয়া নাম দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ঠিক তার কিছু দিন পরেই কিম জং ইল ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কোরিয়া নাম দিয়ে উত্তর কোরিয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখার দুই পাশে দুইটি রাষ্ট্র গড়ে উঠলে আমেরিকা-রাশিয়া উভয়ই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তারা ভাবলো, যাক অন্তত কোরিয় উপদ্বীপে যুদ্ধ আর হবে না। এটা ভেবে দুই দেশই তাদের সৈন্যবাহিনী কোরিয়ার মাটি থেকে প্রত্যাহার করে। কিন্তু খেলা কেবল শুরু!

১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট চীনের উত্থান, উত্তর কোরিয়ার আস্ফালন শুরু:

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে মাও সে তুং এর নেতৃত্বে চীনে কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। রাশিয়ার পর বিশাল দেশ চীনেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর আমেরিকানরা হয় আতংকিত, রাশিয়ানরা হয় উৎফুল্ল। চীনের নেতা মাও সেতুং রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিনকে বড় ভাই হিসেবে শ্রদ্ধা করেন।

এদিকে দুই কোরিয়া পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের খেলা শুরু করে। দক্ষিণ কোরিয়ায় কমিউনিস্টদের উপর ধরপাকড় শুরু হয়। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে নির্যাতিত কমিউনিস্টরা উত্তর কোরিয়ায় পালিয়ে যেতে থাকে। উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা কিম ইল সুং দক্ষিণ কোরিয়া দখল করে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়ায় সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চান। সেই উদ্দেশ্যে মাথায় রেখে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে কিম ইল সুং রাশিয়ায় তাশরীফ আনয়ন করেন বড়ভাই স্ট্যালিনের আশীর্বাদ নিতে। উদ্দেশ্য ছিলো একটাই, দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ। স্টালিন কিম ইল সুংকে উপদেশ দিলেন, "তুমি দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করতে পারো যদি চীন তোমার সাথে থাকে। যদি মাও সেতুং রাজি হয়, তবে তুমি দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করো; রাশিয়া তোমার সাথে আছে। মাও সেতুং রাজি না হলে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করার দরকার নাই।"

বড়ভাই স্ট্যালিনের কথা মেনে উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা কিম ইল সুং-১৯৫০ সালের পরের মাসে(মে মাস) চীন সফর করেন। মাও সেতুং এর মাথায় তখন বিপ্লব কিলবিল করছে। আগের বছরই তিনি মার্কিন বন্ধু চিয়াং কাইশেককে উচ্ছেদ করে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটান। এখন পড়শি ছোট ভাই উত্তর কোরিয়ার নেতা এসেছেন, দক্ষিণ কোরিয়া দখল করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাতে, তিনি কি আর না বলতে পারেন! রাশিয়াকে মাও সেতুং জানিয়ে দিলেন ছোট ভাই কিম ইল সুং দক্ষিণ কোরিয়া দখল করতে পারলে করুক। চীন পুরোদস্তুর উত্তর কোরিয়ার পাশে আছে। রাশিয়া আপাতত নীরব থাক।

২৫ জুন, ১৯৫০।-

উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদল ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা পার হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার জমিতে চলে গেলো। হঠাৎ আক্রমণে দক্ষিণ কোরিয়া দিশেহারা। তিনদিনের মাথায় দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের পতন হলো। সিংম্যান রি রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। উত্তর কোরিয়া বড়ভাই স্ট্যালিনকে তারবার্তা পাঠালো-বড়জোড় ৩টি সপ্তাহ লাগবে পুরো দক্ষিণ কোরিয়া দখল করতে। উত্তরে রাশিয়াও অভিনন্দন জানালো।

কিন্তু উত্তর কোরিয়ার এই আগ্রাসনে এবার নড়েচড়ে বসলো আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট ট্রুমান জাপানে মোতায়েন আমেরিকান বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন উত্তর কোরিয়াকে প্রতিরোধ করতে। ঘটনাটাকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ে গেলো আমেরিকা। শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব পাশ হলো। উত্তর কোরিয়াকে বলা হলো যে তাড়াতাড়ি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সৈন্য সরাও, নয়তো আমেরিকার নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়বে বহুজাতিক বাহিনী। রাশিয়া ভোটদানে বিরত থাকলো। তাই জাতিসংঘকে খুব সহজে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা উত্তর কোরিয়াকে শায়েস্তা করার জন্য তৈরি হলো।

এবার আমেরিকানরা সরাসরি যুদ্ধে নামলো। যুদ্ধের মূল নেতৃত্ব দিলেন আমেরিকান সেনাপতি ডগলাস ম্যাকআর্থার। ১৯৫০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কোরিয়াকে মুক্ত করার জন্য তুমুল লড়াই শুরু করলো আমেরিকানরা। জলে-স্থলে উত্তর কোরিয়ান বাহিনীকে নাকানি চুবানি খাইয়ে দিলো। যোগ দিলো আমেরিকান বিমান বাহিনীও। অক্টোবরের ১ তারিখেই দক্ষিণ কোরিয়ার মাটি থেকে পালিয়ে বাঁচলো উত্তর কোরিয়ার সৈন্যরা। অবশ্য ১ লক্ষ সৈন্য আমেরিকার হাতে বন্দী হলো। আমেরিকান সেনাপতি ডগলাস ম্যাকআর্থারের লক্ষ্য ছিলো পুরো উত্তর কোরিয়াকে দখল করে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে মিলিয়ে দেওয়া।

এবার আসরে নামলো উত্তর কোরিয়ার দুই বড় ভাই-চীন ও রাশিয়াঃ

রাশিয়ার একনায়ক স্টালিন দেখলেন, তার ছোট ভাই উত্তর কোরিয়ার অবস্থা ভয়ংকর খারাপ। আমেরিকান বাহিনী তছনছ করবে পুরো উত্তর কোরিয়া। ছোট ভাইকে তো বাঁচাতে হয়! তড়িঘড়ি করে চিঠি লিখলেন চীনের মাও সেতুং এর কাছে। বললেন, ‘‘উত্তর কোরিয়াকে বাঁচাতে চীন যেনো ৫/৬ ডিভিশন সৈন্য পাঠায়। যেই কথা সেই কাজ। তিনি তার কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্যদের নিয়ে বসলেন। যদিও পলিটব্যুরোর সদস্যরা উত্তর কোরিয়ায় সৈন্য পাঠাতে রাজি ছিলেন না, তবুও মাও সেতুং সবাইকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলেন। চীন ৯ ডিভিশন সৈন্য পাঠাতে প্রস্তুতি নেয়।

আমেরিকান বাহিনী উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়ং দখল করে ফেলে। সেই মুহূর্তে চীনা লাল ফৌজ আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর আক্রমণ শুরু করে। আমেরিকান সেনাপতি ডগলাস ম্যাকআর্থারি চীনাদের সৈন্যসংখ্যা নিয়ে অন্ধকারে ছিলেন। পাল্টা বিপর্যয় শুরু হলো আমেরিকানদের। ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল আবার উত্তর কোরিয়ার দখলে চলে যায়। ক্রুদ্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে যুদ্ধ শেষ করতে চাইছিলেন। যদিও তিনি শেষমেষ সরে আসেন তার পরিকল্পনা থেকে। এপ্রিল মাসের ১১ তারিখ সেনাপতি ডগলাস ম্যাকআর্থারকে তিনি অপসারিত করেন।

পুরো পৃথিবী আতংকিত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে, এবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো নাকি! কিন্তু ১৯৫১ সালে আবার সিউল দখল করে আমেরিকানরা। ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা বরাবর দুই কোরিয়া অবস্থান নেয় নিজ নিজ জায়গায়। উত্তেজনা কমে আসে।

যুদ্ধ যেভাবে শেষ হলোঃ

আমেরিকান জনগণ প্রবলভাবে যুদ্ধবিরোধী হয়ে উঠলো। ইউরোপের লোকজনও আমেরিকান নেতৃত্বকে বোঝাতে সক্ষম হলো যে ছোট্ট কোরিয়াকে কেন্দ্র করে শুধু শুধু যুদ্ধ করার কোনো মানে হয় না। রাশিয়ার সাথে আমেরিকার চরমমাত্রায় স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ইউরোপে। চীনের নেতা মাও সেতুংও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। একমাত্র রাশিয়ার একনায়ক স্ট্যালিন চেয়েছিলেন যে যুদ্ধটা চলুক। যাতে করে আমেরিকানরা ইউরোপে কম মনোযোগ দেওয়ার সাহস পায়। কিন্তু ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ স্ট্যালিন মারা যাওয়ার পর পরিস্থিতি পুরোই পাল্টে যায়। তার আগে কোরিয়া যুদ্ধের জেরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান আমেরিকায় অজনপ্রিয় হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনেই দাঁড়ান নি। নতুন প্রেসিডেন্ট হন জেনারেল আইসেনহাওয়ার। তিনি নির্বাচনের প্রচারের সময়ই ঘোষণা দিয়েছিলেন, কোরিয়া যুদ্ধ শেষ করাই হবে তাঁর প্রধান কাজ। কোরিয়া যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক তিন বছর পর ১৯৫৩ সালের ২৫ জুন যুদ্ধবিরতি হয়। আমেরিকার দেওয়া সব প্রস্তাব রাশিয়ানরা মেনে নেয়। দুই কোরিয়ার মুখ দেখাদেখি সম্পূর্ণ বন্ধ। যুদ্ধে দুই কোরিয়ার অন্তত ৩০ লক্ষ লোক নিহত হয়। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত দুই কোরিয়া শত্রুভাবাপন্ন দেশ।

পর্ব-৯১

জাপানের কিচ্ছা-

মামুন মনে রেখো, বিশ্বযুদ্ধ কথাটার সাথে কিন্তু জড়িয়ে আছে সারা পৃথিবী উলটপালট হয়ে যাওয়ার ইতিহাস। বেশ কয়েকটি দেশ জড়িত আছে বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পিছনে। বর্তমান পৃথিবীতে আমেরিকা সবচেয়ে শক্তিশালী, যদি সামরিক বিষয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে চীন তার সাথে জোর টক্কর দেয়! যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা নাই এজন্য যে সবাই আমেরিকা ও চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা গেছে যে, প্রত্যেকটা শক্তিশালী দেশ নিজের মতো করে পৃথিবী শাসন করতে চেয়েছে, তার সমমনা জোটগুলোর সাথে বন্ধুত্ব করেছে, আর বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে পাল্টা জোট গড়েছে। এসব সংঘাতের কারণেই মূলত মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছে।

চলো, আজকে আমরা বিশ্বযুদ্ধ সময়কার এক ভীতিকর পরাশক্তি জাপানের গল্প বলি।

তার আগে জাপান সম্পর্কে একটা গল্প শেয়ার করি তোমার সাথে। বাংলাদেশের একজন ছাত্র জাপানে পড়াশোনা করতে গেছে। ক্লাসে সে হোমওয়ার্ক এর কাজ করে নিয়ে যায় নি। কোর্স শিক্ষক একজন জাপানি। ক্লাস শেষ করার পর শিক্ষকের রুমে ডাক পড়লো ওই ছাত্রের। বাংলাদেশী ছাত্র ভাবলো, না জানি কি তিরস্কার অপেক্ষা করছে তার জন্য! রুমে গিয়ে তো ওই ছাত্রের মাথা নষ্ট হওয়ার যোগাড়। জাপানি শিক্ষক ছাত্রের সামনে হাতজোড় করে দুঃখ প্রকাশ করলো। বললো, ''আমি আসলে তোমাকে বোধহয় পড়াটা ভালো করে বোঝাতে পারিনি, তাই তুমি হোমওয়ার্কটা করতে পারো নি। এখন বলো, তোমার হোমওয়ার্ক করার কাজে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি? ছাত্রের তো মাথায় হাত। এ কোন কল্পনার স্বর্গরাজ্যে আসলো সে। মানুষ এতো ভদ্র আর ভালো হয় কিভাবে?

আমি যেটা ইঙ্গিত করতে চাই সেটা হলো, আজকের বিশ্বে জাপানীদের মতো ভদ্র মানুষ আর একটাও হয় না। কিন্তু এই জাপান যে কতটুকু অসভ্য আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছিলো ১৮৯৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সেটা ভাবতে গা শিউরে উঠে।

সময়কাল ১৮৬৮-জাপান হতে চাইলো প্রাচ্যের ব্রিটেনঃ

হাজার হাজার বছর যাবত জাপান নিঃসঙ্গ হয়ে বাস করতো। পৃথিবীর আর কোনো দেশের সাথে তার কোনো ধরণের যোগাযোগ ছিলো না। ইউরোপীয় অভিযাত্রীরাও জাপানে এসে কিছু করতে পারেনি। -"গল্পে গল্পে বিশ্বভ্রমণ" বইয়ে আমি কিছুটা উল্লেখ করেছি। কিন্তু চীনের সাথে সংঘটিত ব্রিটেনের 'আফিম যুদ্ধে' এর পরিণতি দেখে ভীত হয়ে পড়লো জাপান। ১৮৩৯ থেকে ১৮৪২ সালে সংঘটিত প্রথম আফিম যুদ্ধ এবং ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ সাল সংঘটিত দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধে চীন অসহায়ভাবে ব্রিটেনের কাছে পরাজিত হয়। জাপান আশংকা করছিলো, ব্রিটেন বুঝি এইবার তাকেও ধরে ফেলবে। আর ব্রিটেনের সাথেতো কোনোভাবেই পেরে উঠবে না জাপান। তাহলে উপায়?

শিমাজু নারিয়াকিরা নামে একজন জাপানী বুদ্ধিজীবী জাপানী রাজতন্ত্রকে একটা পরামর্শ দিলেন।

একটু পরে দেখো, কতটুকু দূরদর্শিতা লুকিয়ে আছে-

Japan lies to the east of China; as is in such a position as to necessitate immediate steps to prepare against meeting the same fate as that which has befallen the chinese;as soon as England achieves its design in China, It will most certainly direct its

military might eastward.If we take the initiative we can dominate. If we don't, we will be dominated.

সরল বাংলায় এর অর্থ হচ্ছে, জাপান যেহেতু চীনের পূর্বে এমন একটা অবস্থানে পড়েছে, চীনের মতো দুর্ভাগ্য ঠেকানোর জন্য একটা জরুরী পদক্ষেপ নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। যেইমাত্র ব্রিটেন চীনকে পুরোপুরি কজা করবে, তখনি ব্রিটেন পূর্বদিকে তার সামরিক তৎপরতা বাড়াবে। যদি জাপান উদ্যোগ নেয়, তাহলে সেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে; আর যদি উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তবে উল্টো জাপান নিয়ন্ত্রিত হবে।

১৮৬৭ সালে সম্রাট মেইজি জাপানের সিংহাসনে বসেন। শিমাজু নারিয়াকিরার পরামর্শটা খুব ভালো লাগলো তার। তিনি জাপানকে শিল্পায়িত করার দিকে নজর দিলেন। উৎপাদনমুখী কলকারখানা চালু হলো। পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সম্পর্ক বাড়িয়ে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলো জাপানের। রেললাইন স্থাপিত হলো হাজার হাজার কিলোমিটার, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের মতো ভারী শিল্পে জাপান হয়ে উঠলো বিশ্বসেরা। ১৮৬৮ সাল থেকে শুরু হওয়া এই সংস্কার কাজের বদৌলতে মাত্র ২০ বছরের ব্যবধানে এক সামন্ততান্ত্রিক দেশ থেকে শিল্পায়িত দেশে পরিণত হয়ে গেলো জাপান। জাপান হয়ে গেলো এশিয়ার সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র। সামরিক খাতে বিপুল পরিমান বিনিয়োগ করে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীও বানিয়ে ফেললো জাপান। জাপানের এই শক্তি দেখে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার মতো দেশগুলো জ্বি হুজুর করতে লাগলো । ভয়ে কাঁপতে লাগলো দুর্বল চীন।

সাম্রাজ্যবাদী জাপানের প্রথম শিকার হলো কোরিয়াঃ

বর্তমান দুই কোরিয়া ছিলো মূলত চীনের উপনিবেশ। চীনের অধীনে একটি করদ রাজ্য ছিলো কোরিয়া। ১৮৬৮ সালে জাপানে আধুনিকতার সূচনা হলে, কোরিয়ার দিকে নজর দেয় জাপান। ১৮৭৬ সালে কোরিয়ার সাথে জোরপূর্বক একটি চুক্তি করে জাপান। কোরিয়া থেকে সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করে তার কাছে আবার পণ্য বিক্রি করে বাজার সৃষ্টি করার চেষ্টায় ছিলো জাপান। যেহেতু কোরিয়া ছিলো চীনের উপনিবেশ, জাপান কোরিয়াকে ফুঁসলিয়ে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইন্ধন দিতে লাগলো। কারণ কোরিয়া স্বাধীন হলে আখেরে লাভ জাপানেরই। কারণ, চীন তখন আর নাক গলাতে পারবে না। কোরিয়াতে গড়ে উঠলো চীনপন্থী ও জাপানপন্থী দুই দল। চীন কোরিয়াতে সৈন্য পাঠালো তাদের অনুগত সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে। ১৮৯৪ সালে কোরিয়াকে কেন্দ্র করে চীন-জাপানের মধ্যে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। চীনের ৮টি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিলো জাপান। দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো জাপানিজ বাহিনী। কিছুই করতে পারলো না চীন। বাধ্য হয়ে চীন কোরিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেয়। ১৮৯৫ সালের ১৪ এপ্রিল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কোরিয়া হয় স্বাধীন। এবার জাপান মনমতো

কোরিয়াতে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করতে পারলো। কোরিয়া হলো জাপানী পণ্যের বাজার।

'ব্যাটল অব পোর্ট আর্থার' (১৯০৪) পশ্চিমা বিশ্ব অবাক হয়ে দেখলো জাপানের শৌর্যবীর্য:

মামুন, তুমি মানচিত্রে লক্ষ্য করো; কোরিয়ার সাথে রাশিয়ার সীমান্ত আছে। আর চীনের সাথে তো আছেই। রাশিয়া অনেকদিন যাবত ইউরোপের রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকায় ও তুর্কী খেলাফতের সাথে বারবার যুদ্ধ করার কারণে সে পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে মনোযোগ দিতে পারেনি। সাইবেরিয়া দখলে থাকার কারণে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা অংশও রাশিয়া পায়। সামরিক শক্তিতে হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে উঠা জাপানের নৌবাহিনীও ছিলো অত্যন্ত চৌকষ। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ার একটি সামরিক ঘাঁটি ছিলো। চীনের কাছ থেকে মাঞ্চুরিয়া দ্বীপটি চুক্তির বলে নিয়ে নেয় রাশিয়া। জাপান এশিয়ার এত ভিতরে রাশিয়ার উপস্থিতি সহ্য করতে পারছিলো না। রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়ার পোর্ট আর্থার ঘাঁটি ছেড়ে দিতে বললো জাপান। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমর্থন নিয়ে রাশিয়া জাপানের এই হুমকিকে পাত্তা দেয় নি। অবশেষে বাধলো লড়াই জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে। জাপানী এডমিরাল তোগো হেইচাচিরো-পোর্ট আর্থারে রাশিয়ান ঘাঁটিতে হামলা চালান। তারিখটি ছিলো ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখ মধ্যরাতে। পুরো বছরটাই জাপানের সাথে রাশিয়ার থেমে থেমে নৌযুদ্ধ হয়েছিলো। যুদ্ধ অনেকটা অমীমাংসিত থাকলেও জাপানের হাতে মারাত্মক মার খাচ্ছিলো রাশিয়ানরা। অনেকেই পোর্ট আর্থার যুদ্ধকে জাপানের বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করে। এই প্রথম একটা এশিয়ান দেশ ইউরোপের কোনো দেশকে পরাজয়ের স্বাধ দিলো। জাপান যে রাশিয়ার সাথে এভাবে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে হটিয়ে দিতে পারে, তা ইউরোপীয়দের কাছে বিস্ময় ঠেকেছিলো।

১৯১০ সাল, জাপান কর্তৃক কোরিয়া দখল:

জাপান নিজের স্বার্থের জন্য কোরিয়াকে স্বাধীন করে দিলেও ১৯১০ সালে কোরিয়াকে নিজের উপনিবেশ ঘোষণা করে। কোরিয়ান লোকদের উপর বছরের পর বছর অকথ্য নির্যাতন চালায় জাপান। লাখ লাখ কোরিয়ান নারীকে জাপানের সৈন্যরা ধরে ক্যান্টনমেন্টে বন্দী করে রাখে। তাদেরকে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করে জাপান। কোরিয়া ভাষা নিষিদ্ধ হয়। জাপান সরকার কোরিয়াকে বাধ্য করে সন্তানদের নাম জাপানীদের মতো রাখতে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কোরিয়াকে দখলে রেখেছিলো জাপান। এই ৩৫টি বছর জাপানের হাতে চরম বর্বরতার স্বীকার হয় কোরিয়ানরা। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান ছিলো হিটলারের অন্যতম মিত্র। জাপান চেয়েছিলো পুরো এশিয়া মহাদেশ দখল করতে। যা হোক, সাম্রাজ্যবাদী

জাপানের খেলা সাঙ্গ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে, সেটা তো সবাই জানে। ১৯৪৫ সালের পর থেকে জাপান হয়ে পড়ে বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিকামী ও সুসভ্য দেশ। তবে কোরিয়ানরা আজও জাপানীদের বর্বরতার কথা ভুলতে পারেনি। তুমি অন্তত কোরিয়ান মুভি দেখতে পারো।

পর্ব-৯২

১৯৩১ সাল, জাপানের মাস্তানি শুরু:

সাম্রাজ্যবাদী জাপানের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হলো কেবল। ১৮৬৭ সালে সম্রাট মেইজি ক্ষমতায় আরোহনের পর ২০ বছরের মধ্যে জাপান হয়ে উঠলো এশিয়ার শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক পরাশক্তি। পারলে জাপান ইউরোপ আমেরিকাকেও ঠেক্কা দিয়ে ফেলবে আর কি!

কিন্তু জাপানের সমস্যা দুটো।

এক নাম্বার সমস্যা হচ্ছে, জাপানের আয়তন অত্যন্ত ছোট। পরাশক্তি হতে গেলে ভৌগোলিক দিক দিয়ে বড়সড় অবস্থান থাকতে হয়। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে ব্রিটেনও ছোট দেশ ছিলো। কিন্তু ব্রিটেনের ছিলো জগৎজোড়া সাম্রাজ্য। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কলোনীগুলো থেকে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে ব্রিটেন শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্বে দিলো। তাই ছোট আয়তন ব্রিটেনের জন্য কোনো সমস্যা হয়নি।

কিন্তু জাপানেরতো নাই কোনো কলোনী। সে কিভাবে পরাশক্তিদের কাতারে উঠবে? মনে রাখতে হবে সময়টাই ছিলো দখলদারিত্ব আর লুন্ঠনের।

জাপানের দ্বিতীয় সমস্যাটা ছিলো আরও জটিল। শিল্প উৎপাদনের জন্য জাপানের নেই কোনো কাঁচামাল। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, রাবার ও জ্বালানি তেল দরকার জাপানের। কিন্তু জাপানের মূল ভূ-খণ্ডে প্রাকৃতিক সম্পদ একেবারেই অপ্রতুল।

এ দুই সমস্যা থেকে তাহলে কিভাবে মুক্তি পাবে জাপান? পথ একটাই তাহলো জবরদখল করে আশেপাশের সব দেশগুলো দখল করতে হবে।

জাপান ঘোষণা করলো, 'Asia for the Asian'. জাপানের উদ্দেশ্যে ছিলো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে ফ্রান্স-ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ড যে সাম্রাজ্যগুলো চালাচ্ছে এগুলোকে যেকোনো মূলে কব্জা করতে হবে। এসব দেশগুলোকে দখল করার জন্য জাপানীরা নীলনকশা প্রণয়ণ করতে লাগলো।

৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ সাল–

চীনের উত্তরাঞ্চলীয় মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে জাপানের মালিকানাধীন রেলওয়ে লাইনে ছোটখাটো একটা বিস্ফোরণ ঘটলো। এ ঘটনাকে পুঁজি করে জাপান বলতে

লাগলো, চীনের বিরুদ্ধে মাঞ্চুরিয়ার জনগণ প্রতিরোধ গড়তে চায়। এই বিস্ফোরণই তার প্রমান। বলা নেই কওয়া নেই, জাপান বিনাবাধায় মাঞ্চুরিয়া দখল করে ফেললো। চিয়াং কাইশেক আর মাও সেতুংয়ের মধ্যকার গৃহযুদ্ধে জেরবার চীনের শক্তি নেই অজেয় জাপানকে বাধা দেওয়ার। ১৯৩৩ সালে জাপান লীগ অব নেশন্স থেকে সরে দাঁড়ায় আপনমনে মাস্তানি করার নেশায়। ১৯৩৬ সালে মঙ্গোলিয়াতে জাপান তার তাঁবেদার সরকার বসায়। এভাবে মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও তৎসলগ্ন বিশাল এলাকা জাপানের দখলে আসে। জাপান তার নীলনকশা মোতাবেক এগোতে লাগলো।

জাপান-জার্মানি ও ইতালির মধ্যে গড়ে উঠা ঐক্যজোটঃ

জাপানের এই চরিত্রের সাথে খাপে খাপ মিলে যায় ইতালি ও জার্মানির। ইতালি ও জার্মানী দুটি দেশেই গণতন্ত্রের বদলে ফ্যাসিবাদী শাসন গড়ে উঠেছে। দুটি দেশই লীগ অব নেশন্স থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। দুটি দেশই ব্রিটেন-ফ্রান্সের জগৎজোড়া সাম্রাজ্য দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। এই দুটি দেশই অন্যের জায়গা-জমি দখল করার জন্য মনে মনে ফন্দি আঁটছে।

তাই জাপানের সাথে ইতালি ও জার্মানির মিল না হয়ে যায় কোথায়?

জার্মানী ও ইতালি ১৯৩৬ সাল থেকেই গভীর মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ। হিটলার খুব অবাক চোখে জাপানের কাণ্ডকীর্তি দেখছিলেন। কিভাবে জাপানের ভয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভয়ে কাঁপছে সেটা ইউরোপে বসে উপভোগ করেছিলেন হিটলার।

১৯৪০ সালের মে মাসের ৯ তারিখ যখন হিটলার একসাথে ইউরোপের চার দেশ আক্রমণ করেন, তখন জাপান সেটা সমর্থন দিয়েছিলো। শুধু তাই নয়, ১৯৪০ সালের ২২ জুন যখন হিটলারের হাতে ফ্রান্সের পতন হয়, ঠিক সেই সময় ঝড়ের বেগে ফ্রান্সের দখলে থাকা ইন্দোচীনের তিন দেশ-লাওস, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় হামলে পড়ে জাপান। ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্বকারী শাসকগোষ্ঠী জাপানীদের কোনো বাধা না দিয়ে আত্মসমর্পন করে বসেন।

ইন্দোচীনের ফ্রান্সের কলোনী দখল করার পরে জাপান হয়ে পড়ে জার্মানীর প্রিয় বন্ধু।

১৯৪০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জার্মানী-জাপান ও ইতালির মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সংঘটিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে অক্ষশক্তি হিসেবে ঘোষিত হয় তিন দেশ। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীদের ধ্বংস করার শপথ নিয়ে বিশ্বকে চূর্ণবিচূর্ণ করার মরণখেলায় মেতে উঠে এই তিন দেশ।

সেই পার্ল হারবার!

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "আমার এখনও বুঝে আসছে না ১৯২৯ সালের মহামন্দার পর থেকে আমেরিকা যেখানে বিশ্ব রাজনীতি থেকে দূরে সরে পড়লো, সেখানে জাপান কেন আচমকা ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর পার্ল হারবারে অবস্থিত মার্কিন নৌঘাঁটিতে হামলা চালালো ?"

জারিফ উত্তর দিলো, হামলাটা আচমকা হতে পারে কিন্তু আমেরিকার সাথে জাপানের তিক্ততা আচমকা নয়। ১৯৩০ সালের পর থেকে জাপানের সাথে আমেরিকার তিক্ততা শুরু হয়। দিন দিন সেটা তিক্ততার চরম পর্যায়ে পৌঁছে। এবার শোনো সেইসব কাহিনী।

জাপানের সাথে আমেরিকার তিক্ততা সেই ১৯৩১ সাল থেকে। পৃথিবী যেহেতু গোল তাই তুমি দেখবে পূবের দেশ জাপানের সাথে পশ্চিমের দেশ আমেরিকার জলসীমান্ত রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরের দেশ জাপানের আধিপত্যমূলক কর্মকাণ্ড ভালো লাগেনি প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পাড়ের দেশ আমেরিকার। জাপানের আগ্রাসীমূলক কর্মকাণ্ডের কয়েকটা তালিকা দেখো:

১. ১৯৩১ সালে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের পর আমেরিকা জাপানকে নিয়ে ভীত হয়ে পড়ে।

২. ১৯৩৩ সালে জাপান 'লীগ অব নেশন্স' থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়।

৩. ১৯৩৬ সালে জাপান মঙ্গোলিয়া দখল করে সেখানে পুতুল সরকার বসায়।

৪. ১৯৩৭ সালে জাপান-চীনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে। আমেরিকার ঘনিষ্ট মিত্র চীনের শাসক চিয়াং কাইশেককে বাঁচানো আমেরিকার একান্ত কর্তব্য ছিলো।

৫. ১৯৪০ সালে জুন মাসে ইউরোপে হিটলারের হাতে ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডের পতন হলে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র ব্রিটেন-ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবগুলো কলোনী দখল করার উদ্যোগ নেয় জাপান। এ ঘটনায় আমেরিকার হৃদকম্প শুরু হয়। আমেরিকা ভাবতে থাকে, জাপান পুরো প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা নিজের করে নিবে। সেখানে আমেরিকার কোনো ঘাঁটি থাকতে পারবে না হয়তো।

এত এত আগ্রাসীমূলক কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য জাপানকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয় আমেরিকা। আগেই বলেছিলাম, জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ বলে কিছুই ছিলো না। এক আমেরিকার কাছ থেকে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতো জাপান।

জাপান তার মোট তেল আমদানির ৮০ শতাংশ আমেরিকা থেকে সংগ্রহ করতো। ১৯৪১ সালে আমেরিকা জাপানের উপর তেল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। শুধু তাই

নয়, আমেরিকা তার নিজের দেশে অবস্থিত জাপানী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৪১ সালেই দেখা গেলো জাপানের সাথে সবরকম বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলো আমেরিকার।

ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো জাপান। আমেরিকা জাপানকে তেল সরবরাহ না করায় জাপানের সবরকম আগ্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ হওয়ার উপক্রম। যদিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়ায় ছিলো প্রচুর তেল। মালয়েশিয়ার ছিলো রাবার। এ দুই দেশ দখল করে জাপান তার তেলের চাহিদা আপাতত মিটালো বটে কিন্তু জাপান দেখলো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন-ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান আমেরিকার। আজ হোক, কাল হোক, আমেরিকা এসব দেশকে অবশ্যই সাহায্য করবে। আমেরিকান সহায়তায় জাপানের বিরুদ্ধে এসব দেশগুলো ভিতরে ভিতরে একজোট হচ্ছে।

তাই এসব দেশের সম্মিলিত শক্তি একত্রিত হবার পূর্বেই আমেরিকাকে ভয়ংকর শাস্তি দিতে হবে। এমন আঘাত হানতে হবে, যাতে করে আমেরিকা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোকে সহায়তা করা তো দূরের কথা, নিজেই যেন আতংকে সটকে পড়ে।

তাহলে কি সেই উপায়?

জাপানী সমরবিদরা চিন্তা করলো, মূল আমেরিকান ভূ-খণ্ডে আঘাত হানা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করলো, মূল আমেরিকান ভূ–খণ্ড অনেক দূর। সেনাবাহিনী নামিয়ে আক্রমণ চালানো অসম্ভব। এতদূর গিয়ে বিমান বাহিনী আক্রমণ চালাতে পারবে না কারণ জ্বালানি তেল ফুরিয়ে যাবে।

একটা উপায় অবশেষে পাওয়া গেলো।

প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবারে একটা মার্কিন নৌঘাঁটি আছে। সেখানে যদি হামলা করা যায় তাহলে এক ঢিলে অনেক পাখি মারা যাবে।

আমেরিকার নৌঘাঁটি ধ্বংস হবে। আমেরিকান সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধজাহাজগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আমেরিকার আর সাহস হবে না প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে নামার।

সেই চিন্তা থেকেই জাপান পার্ল হারবারে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর সেই কারণে জাপান পার্ল হারবারে মার্কিন নৌঘাঁটিতে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পার্ল হারবার হামলা ও তার পরবর্তী ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনী নামক অধ্যায়ে বলা আছে। তাই এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাপানের অন্তিম দিনগুলোঃ

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাচ্ছিলো। জার্মানীর কবল থেকে ইউরোপের সব দেশ মুক্ত করে জার্মানীর মাটিতে চলে গিয়েছিলো মিত্র বাহিনী ও সোভিয়েত রাশিয়া। এপ্রিলের ৩০ তারিখ হিটলার আত্মহত্যা করে, এর এক সপ্তাহ পর ৮মে জার্মানী নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করে ।

ইউরোপ জুড়ে উদযাপিত হয় 'V.E-day-/Victory of Europe day.'

প্রশান্ত মহাসাগরে তখনও জাপানের নৌবাহিনী ব্যাপক ক্ষমতাশালী। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলের পূর্বেই জাপানের দখলে থাকা মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ও ইন্দোচীনের দেশগুলোকে মুক্ত করে আমেরিকান বাহিনী। তাদেরকে সহায়তা করে ব্রিটেন।

কিন্তু জাপানকে চূড়ান্ত আঘাত করতে হবে? পার্ল হারবারে জাপান যে অন্যায় করেছে, এবার তার ভয়ংকর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এসব পরিকল্পনা করেই এগোতে লাগলো মার্কিনীরা।

উপায় একটাই আছে। সেটা হলো ওকিনাওয়া দ্বীপপুঞ্জে আঘাত হানতে হবে। ওকিনাওয়া দ্বীপপুঞ্জে আঘাত করতে পারলেই জাপানের প্রতিরোধ করার মতো আর কোনো শক্তি থাকবে না। তখন জাপানের মূল ভূ-খন্ড চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলা হবে।

সে লক্ষে ১ লক্ষ ৮০ হাজার সুপ্রশিক্ষিত স্থল সেনা ও নৌসেনার সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে আমেরিকা প্রস্তুত হলো। অভিযানের নাম দেওয়া হলো 'অপারেশন আইসবার্গ'

১ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে জাপানের জেনারেল মিতসুরো উশিজিমা ওকিনাওয়া দ্বীপপুঞ্জের প্রতিরোধবুহ্য গড়ে তুললেন।

এপ্রিলের ১ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এ যুদ্ধ স্থায়ী হয় জুন মাসের ২২ তারিখ পর্যন্ত।

আমেরিকাকে ঠেকাতে জাপান তলব করলো তার আত্মঘাতী কামিকাজে পাইলটদের। কামিকাজে পাইলট এমন ধরনের বিমান চালক যাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কিভাবে বিমান নিয়ে শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করতে করতে মরে যাওয়া যায়। বর্তমান সমাজের আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদীদের মতো। আত্মঘাতী কামিকাজে পাইলটদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলো আমেরিকা।

ওকিনাওয়াতে শুরু হলো জাপানীদের গণ আত্মহত্যাঃ

কামিকাজে পাইলটদের অচিরেই শেষ করতে পেরেছিলো আমেরিকা। যদিও আমেরিকানদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো। ওকিনাওয়ার সাধারণ জনগণ যখন বুঝতে পারলো, জাপানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তখন গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে আমেরিকা কোনো জাপানীকে জীবিত রাখবে না। যদিও এ গুজবের কোনো ভিত্তি নেই।

সাধারণ জাপানীরা দলে দলে আত্মহত্যা করতে লাগলো। ৭ হাজার জাপানী সৈন্য ধরা পড়ে আমেরিকানদের হাতে। কিন্তু এসব সৈন্যরাও সুযোগ বুঝে পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে, নিজের পেটে ছুরি চালিয়ে আত্মসমর্পন করার চেষ্টা চালিয়েছে।

জুনের ২২ তারিখ যখন জাপানীদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়,তখন জেনারেল উশিজিমা তার চিফ অব স্টাফ নিয়ে আয়োজন করে আত্মহত্যা করেন।

আর ওকিনাওয়া দ্বীপে জাপানের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত হয়ে যায় জাপানের ললাটে খুব শিগগিরই লজ্জাজনক অপমান অপেক্ষা করছে।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমা নিক্ষেপঃ

এত শক্তিহীন হয়েও জাপান যুদ্ধ বন্ধ করতে চায় না। জাপানের ইতিহাসটাই অদ্ভুত। জাপানী সমাজে কারও কাছে নত হওয়া, কোনো কিছুতে আত্মসমর্পন করা মহাপাপ।

আত্মসমর্পনটা করবে কে? রাজা, প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি, কে বইবে আত্মসমর্পনের এই কলংক? তাই খন্ড-খন্ড যুদ্ধ চলতেই থাকলো।

মার্কিন সেনাপতি ডগলাস ম্যাকআর্থার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে বলেছিলেন, জাপানকে চূড়ান্তভাবে শায়েস্তা করতে হলে 'অপারেশন ডাউনফল' নামে নতুন আরেকটি অভিযান শুরু করতে হবে। কিন্তু জাপানীরা যে গোঁয়ার ও আত্মঘাতী কাজে অভ্যস্ত তাতে সে অভিযানে সফল হতে গেলে ১০ লক্ষ আমেরিকান মারা পড়তে পারে।

রাগে গরগর করতে লাগলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান। জুলাই মাসে জার্মানীর পটসডাম সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন, "অচিরেই জাপান আত্মসমর্পন না করলে চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।" পটসডাম সম্মেলন চলাকালেই পারমানবিক বোমার সফল পরীক্ষার কথা জানতে পারেন ট্রুমান। মার্কিন প্রেসিডেন্টের হুমকিতেও জাপানের আত্মসমর্পনের নাম নেই।

অগত্যা ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান। আনবিক বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান সপারিষদ। বেছে নেওয়া হলো টোকিও থেকে ৫০০ মাইল দূরের হিরোশিমা শহরকে।

৬ আগস্ট, ১৯৪৫ সাল-

লিটলবয় নামে প্রথম আনবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয় হিরোশিমায়। মুহূর্তেই মাটির সাথে মিশে যায় কমপক্ষে লাখখানেক মানুষ। এরপরেও জাপান নির্বিকার। যুদ্ধ বন্ধের নাম নেই। আমেরিকা মনে করেছিলো, হয়তো হিরোশিমায় বোমা নিক্ষেপের সাথে সাথেই আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পনের প্রস্তাব পাঠাবে জাপান।

৯ আগস্ট, ১৯৪৫-

হিরোশিমায় লিটল বয় নামের পারমানবিক বোমা নিক্ষেপের তিনদিন পরেই নাগাসাকি শহরে ফ্যাটম্যান নামে আরেকটি বোমা নিক্ষেপ করলো আমেরিকা। আবারও বিরাট ক্ষয়ক্ষতি। প্রায় ৬৫ হাজারের উপরে মানুষ মারা গেলো সেখানে।

এবার বোধহয় টনক নড়লো জাপানের। জাপান তখন ভাবলো, প্রেস্টিজের কথা ভেবে আত্মসমর্পন করতে রাজি না হলে অচিরেই জাপান নামক রাষ্ট্রের নাম-নিশানাই পৃথিবী থেকে মুছে যাবে এবার।

১৫ আগস্ট, ১৯৪৫ সাল–

অবশেষে জাপানী সম্রাট হিরোহিতো বেতার ভাষণে আত্মসমর্পনের কথা বললেন। আমেরিকাজুড়ে উল্লাস শুরু হলো। যদিও আত্মসমর্পনের কথা শুনে বহু জাপানী আত্মহত্যা করেন। জাপানের আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরোপুরি শেষ হয়।

আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র জাপানঃ

রাজনীতিতে আসলে শেষ কথা বলে কিছু নাই। যে আমেরিকা আর জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলো টানা ৪ বছরের বেশি সময়; উভয়পক্ষেরই মারা গিয়েছিলো লাখ লাখ মানবসন্তান; সেই দুটি দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হয়।

সাহায্যের থলি নিয়ে হাজির হয় আমেরিকা। ২.২ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয় আমেরিকা জাপানকে। এর মধ্যে ১.৭ বিলিয়নই ছিলো অনুদান; বাকি ৫০০ মিলিয়ন ডলার ছিলো ঋণস্বরূপ। আমেরিকার সাহায্যের উপর ভর করে জাপান আবার অর্থনৈতিক পরাশক্তি হয়ে পড়ে। কিন্তু সার্বভৌমগত কিছু আপোষ করতেই হয় আমেরিকার সাথে। যেমনঃ

১. আমেরিকার পরামর্শে জাপান তার সংবিধান সংশোধন করে। যুদ্ধ করার সমস্ত বাসনা ত্যাগ করে জাপান হয়ে পড়ে পুরোপুরি শান্তিবাদী রাষ্ট্র।

২. জাপানের নিরাপত্তা দেখভাল করবে আমেরিকা। বিনিময়ে জাপানে স্থায়ীভাবে মার্কিন সৈন্যরা ঘাঁটি গড়বে। এসবের সমস্ত খরচ বহন করতে হবে আমেরিকাকেই।

তবে বলা ভালো, জাপান আমেরিকাকে যে পরিমাণ ভুগিয়েছে সে তুলনায় জাপানকে আমেরিকা যে টুকরো টুকরো করেনি সেটাই তাদের ভাগ্য।

১৯৫৬ সালের মধ্যেই জাপান ১৯৪০ সালের আগের অর্থনৈতিক শক্তিতে ফিরে যায়। এ এক আজব জাতি!

জার্মানীর সাথে এ ব্যাপারে মিল আছে জাপানের। দু'টি দেশই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছিলো কিন্তু মাত্র দশ বছরের মধ্যে তারা আবার অর্থনৈতিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়।

আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর ইতিহাস

পর্ব-৯৩

(ASEAN=Association of South-East Asian Nations)- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০টি দেশের সমন্বয়ে আসিয়ান গঠিত। আসিয়ান মূলত একটি অর্থনৈতিক সংগঠন। সদস্যদেশগুলো নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক কোনো ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করে না। এক দেশ আরেক দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করে না। বিশ্ব রাজনীতি অর্থনীতির ইতিহাসে এ দেশগুলি যথেষ্ট প্রভাবশালী। আমরা এক এক করে এসব দেশগুলোর ইতিহাস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো।

এশিয়ার উন্নত রাষ্ট্র মালয়েশিয়াঃ

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশরা ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে ভারতে তাদের অপ্রতিহত সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে মনোযোগ দেয়। সমুদ্রের দখলদারিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে স্পেন ও পর্তুগাল অগ্রণী ভূমিকা নিলেও অচিরেই তারা পিছিয়ে পড়ে। ভারতীয় উপমহাদেশে ফ্রান্স বৃটিশের আধিপত্য মেনে নিয়ে বিদায় নেয় উপমহাদেশের রঙ্গমঞ্চ থেকে।

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বৃটিশদের সাথে সমানতালে টক্কর দিয়ে যাচ্ছিলে পুঁচকে দেশ হল্যান্ড। সমুদ্রবিদ্যায় হল্যান্ডই হয়ে গেলো ব্রিটেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দী। তাই মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস মানেই ব্রিটেন-নেদারল্যান্ডের যতসব কাণ্ডকীর্তি।

১৮২৪ সালের 'অ্যাংলো-ডাচ চুক্তি' মালয় দ্বীপপুঞ্জ ভাগাভাগির দলিলঃ-

সেই চিরাচরিত ইতিহাস! দেশ কার, জমি কার-আর ভাগাভাগি করে কে? দুই ইউরোপীয় ডাকাত ১৮২৪ সালে চুক্তি করে নিজেদের মধ্যে যাতে মালয় উপদ্বীপের ভূ-খণ্ড নিয়ে কোনো ঝামেলা না হয়।

ব্রিটেনের দখলে থাকে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া, আর হল্যান্ডের দখলে থাকে ইন্দোনেশিয়া।

এসব অঞ্চলে উপনিবেশের ইতিহাসটা একটু অন্যরকম ছিলো। স্থানীয় রাজাদের তাঁবেদার বানিয়ে ব্রিটেন মালয়েশিয়াকে কুক্ষিগত করে। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরকে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থে কাজে লাগায় বৃটিশ সরকার।

চুক্তিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজিত হয়েছিলো। তা হলো, তৃতীয় কোনো উপনিবেশিক শক্তির আগমন প্রতিহত করবে ব্রিটেন-হল্যান্ড যৌথভাবে। উদীয়মান ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছিলো যে, কৃষি ও

খনিজপণ্যের বিপুল সম্ভাবনাময় মালয় জগতকে আপোষে ভাগ-বাটওয়ারা করার মাধ্যমেই তাদের সৌভাগ্য নিহিত।

সে এক জমানা ছিলো বটে! সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে অন্যের জমি নিয়ে ব্যবসা করার কি এক সুবর্ণ সুযোগ। আজকের লন্ডন, ম্যানচেষ্টার, আমস্টারডাম, রটারডাম যতই সুসভ্য হোক না কেন, তারা কি তাদের আদি পাপকে খণ্ডাতে পারবে?

বিংশ শতাব্দীর মালয়েশিয়া:

একটা অবাক করা তথ্য হচ্ছে, যেকোনো উপনিবেশের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকজন আন্দোলন সংগঠিত করলেও মালয়েশিয়াতে বৃটিশদের বিরুদ্ধে কোনো রকম সংঘটিত বিপ্লব ছিলো প্রায় অনুপস্থিত। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বৃটিশরা জনশূন্য পেনাং ও সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়া শাসন করতো স্থানীয় অভিজাত শ্রেণিদের দ্বারা। বিত্ত ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকায় বৃটিশের বিরুদ্ধে কোনো অভিজাতে শ্রেণি প্রতিবাদ করেনি। আবার স্থানীয় জনগণের সাথে বৃটিশের কোনো রকম সংশ্রব না থাকায় তারাও কোনো রকম বিপ্লবের দিকে ধাবিত হয়নি।

মামুন প্রশ্ন করলো, "মালয়েশিয়াতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চীনা নাগরিক বংশ পরম্পরায় বাস করে, এর কারণ কি? তাছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় তামিল জনগোষ্ঠীর লোকজনও মালয়েশিয়াতে আছে, ঘটনা কি?"

জারিফ উত্তর দিলো, এর পিছনেও আছে বৃটিশ শাসন। ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের সাথে সাথে ভারতীয়-চীনা কুলি ও ব্যবসায়ীদের এ অঞ্চলে আগমন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।

১৯১১ সালে মালয়দের সংখ্যা ছিলো ১৪,৩৭,০০০, চীনা ৯,১৬,০০০ এবং ভারতীয়দের সংখ্যা ছিলো ২,৬৭,০০০। কিন্তু ১৯৪১ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায়, মালয়দের সংখ্যা- ২২,৭৮,০০০, চীনাদের সংখ্যা ২৩,৭৯,০০০ এবং ভারতীয়দের সংখ্যা ৭,৪৪,০০০।

ব্রিটেন প্রথমদিকে চীনাদের সমর্থন করে তাদেরকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে ব্রিটেন 'ডিভাইড এন্ড রুল' পলিসির আওতায় মালয়দের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া শুরু করে। ব্রিটিশরা চীনাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে মালয়দের। একারণে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মালয়দের কোনো আন্দোলন দানা বাঁধেনি।

আর দক্ষিন ভারতের তামিলনাড়ু ও কেরালা থেকে অনেক লোকজন জাহাজের কুলিগিরি করতে সিঙ্গাপুর হয়ে মালয়েশিয়া প্রবেশ করে। আজকের ভারতীয়

লোকজন ওইসব কুলিদের বংশধর। ভারতীয়রা বর্তমানে যথেষ্ট উন্নত ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে উঠেছে।

মালয়েশিয়ার মাটিতে যখন জাপানী ফৌজঃ

ব্রিটিশদের শান্তিপূর্ণ জীবনে বিভীষিকা নিয়ে আসে জাপানী বাহিনী। মালয়েশিয়ায় জাপানী আগ্রাসন শুরু হয় ১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর। ১৯৪২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মাসে সিঙ্গাপুরের পতন হয়। জাপানীদের আগ্রাসনকে মালয়েশিয়ার লোকজন খুশি মনে গ্রহন করে। কারণ জাপানীরা ছিলো তীব্র চীন বিরোধী। মালয়েশিয়ার জনগণ ভাবলো, জাপানীদের ভয়ে চীনাদের পরিস্থিতি শোচনীয় হবে। হয়েছিলোও তাই। সিঙ্গাপুর পতনের পর জাপানের সমস্ত আক্রোশ পড়ে তথাকার প্রভাবশালী চীনাদের উপর। অসংখ্য চীনাকে ধরে ধরে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। তাদের সহায় সম্পত্তি লুট করা হয়। বস্তুত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চীনাদের প্রতি জাপানের অত্যাচার ছিলো এক নিষ্ঠুর বর্বরতা।

ভারতীয়দের প্রতি জাপানের আচরণ মোটামুটি ভালোই ছিলো। ভারতীয়রা জাপানি যুদ্ধ তহবিলে প্রচুর অর্থ দান করেন। নেতাজি সুভাষ বোসের নেতৃত্বে জাপানী সহায়তায় ভারত স্বাধীন করার একটা পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া।

তবে জাপান দখলের পর মালয়ের অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে আসে। মালয়দের মধ্যে জাপান বিরোধী মনোভাব বেড়ে উঠে। বৃটিশদের প্রতিও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মালয়রা দেখলো, বৃটিশরা তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। তাই জাপানের মালয় দখলের মধ্য দিয়ে নতুন মালয় জাতীয়তাবাদ মাথা চড়া দিয়ে উঠে।

জাপানের আত্মসমর্পনের দু'সপ্তাহ পর ১৯৪৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মালয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্রত্যাবর্তন করে। ধীরে ধীরে মালয়ের তিনটি জাতিসত্তা মালয়, চীনা ও ভারতীয়রা তিনটি পৃথক পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। তারপর বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতার দাবি গ্রহন করে। ১৯৫৭ সালের আগস্টে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মালয় ভাষাই জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং কেবলমাত্র ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা পায়। ইসলাম রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা পায়, যদিও অন্য ধর্মকে সহ্য করা হয়। মালয়ে একজন নির্বাচিত রাজা থাকবেন তবে সংসদীয় গণতন্ত্র গৃহীত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার ইতিকথাঃ

প্রথমেই মামুন তার গুরু জারিফের কাছে প্রশ্ন করলো, ‘‘দেখো মামুন! একটা জিনিস আমার বুঝে আসে না। সেটা হলো, আমরা সবাই জানি জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম দেশের নাম হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া। প্রায় ২৪ কোটিরও অধিক মুসলমান এই দেশটিতে বসবাস করে। কিন্তু এই দেশের মুদ্রায় ভারতীয় দেবতা গনেশের ছবি কেন?’

‘‘৯৯ শতাংশ জনগণ যেই দেশে মুসলিম, সেই দেশের মুদ্রায় গনেশের ছবি। ব্যাপারটা তাজ্জব না?’’

জারিফ উত্তর দিলো, আসলে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ব্যাপারটা তাজ্জবেরই কথা। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার হাজার বছরের ইতিহাস জানলে এ ব্যাপারটাকে খুবই স্বাভাবিক মনে হবে। ব্যাপারটা এ জন্যই স্বাভাবিক যে আজকে আমরা যে ইন্দোনেশিয়ার কথা জানি, সেখানে ভারতীয় হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি প্রবলভাবে বিরাজমান ছিলো শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিলো ইন্দোনেশিয়ার। সেই সূত্রে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে ইন্দোনেশিয়াতে।

জারিফ উত্তর দিলো, যা হোক; ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের দিকে আমাদের এতো আলোচনা করার দরকার নাই। কারণ আমরা আলোচনা করতে বসেছি বিংশ শতাব্দীর ইন্দোনেশিয়া নিয়ে।

মামুন তাকে থামিয়ে দিলো, “নিশ্চয়ই ইন্দোনেশিয়া নিয়ে আলোচনা করলেও অবধারিতভাবে চলে আসবে ইউরোপীয় ডাকাতের দল। কারণ তোমার সাথে আলোচনা করে যা বুঝলাম, পৃথিবীর এমন কোনো প্রান্তসীমা নাই যেখানে ইউরোপীয়রা দখল, লুণ্ঠন, হত্যাযজ্ঞ চালায় নি। কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পর পরই সারা পৃথিবীকে সভ্য করার নামে, খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের নামে, বাণিজ্যের লোভে ইউরোপীয়রা সারা পৃথিবীকেই তাদের চারণভূমি বানিয়ে ফেলে।

জারিফ বলে, এক্সাক্টলি। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ইন্দোনেশিয়া নিয়ে আলোচনা করবো আর ইউরোপীয় ডাকাতেদের কথা আলোচনা করব না, সেটা হয় নাকি? ইতিহাস চিরাচরিত অন্যান্য পরাধীন ভূ-খণ্ডের মতোই।

ইন্দোনেশিয়া মূলত দ্বীপপুঞ্জ। পুরো দেশটাতেই ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জের ছড়াছড়ি। প্রচুর মসলা হতো ইন্দোনেশিয়ায়। সব ডাকাতদের আদি গুরু পর্তুগীজরা প্রথমে তাবু গড়ে ইন্দোনেশিয়ায়।

স্বাধীনতার পথে ইন্দোনেশিয়াঃ

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হচ্ছেন সুকার্নো। ১৯০১ সালের ৬ জুন তিনি জন্মগ্রহন করেন। পিতা ছিলেন জাভা দ্বীপের অধিবাসী একজন স্কুলশিক্ষক, মা ছিলেন হিন্দুপ্রধান বালি দ্বীপের লোক। সুকার্নো পেশায় ছিলেন একজন স্থপতি। বান্দুং টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে তিনি পড়াশোনা করে ১৯২৭ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি তার নিজ দায়িত্ব বুঝে নেন। তিনি বুঝতে পারলেন, সাম্রাজ্যবাদী ডাচদের কবল থেকে তার মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে হবে।

১৯২৮ সালে তিনি ইন্দোনেশিয়ান জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। ১৯৩১ সালে ডাচরা তাকে গ্রেফতার করে এবং ফ্লোরেস দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসনে পাঠায়। বহু বছর যাবত তিনি সেখানে বন্দী থাকেন। বাইরের জগতের সাথে কোনো যোগাযোগ ছিলো না বললেই চলে।

আসলো নতুন উস্তাদ জাপানঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আক্রমণে ডাচরা দিশেহারা। সাম্রাজ্যবাদী জাপানের উদ্দেশ্য ছিলো এশিয়া মহাদেশ থেকে সব সাম্রাজ্যবাদীদের হটিয়ে তাদের কব্জায় সব দেশগুলোকে নিয়ে আসা। জাপানের সৈন্যরাই সুকার্নোকে ফ্লোরেস দ্বীপের বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে। সুকার্নো ভাবলেন, স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া গড়ার এইতো মহাসুযোগ! তিনি জাপানী বাহিনীর সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে লাগলেন। জাপানকে সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন। কিন্তু বিধি বাম! জাপান নিজেই পরাজয়ের দিকে যেতে লাগলো দিন দিন। সুকার্নো বুঝে গেলেন জাপানের পর আবার ইন্দোনেশিয়া দখল করতে আসতে পারে ডাচরা। গেরিলা বাহিনী নিয়ে তিনি এবার ডাচদের মোকাবেলা করার জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে সুকার্নোর সামনে নতুন বিপদ আবির্ভূত হলো। ইন্দোনেশিয়ায় ব্রিটিশ বাহিনী ঢুকলো ডাচদের সহায়তা করার জন্য। 'এক রামে রক্ষা নেই তার আবার সুগ্রীব দোসর!'

ব্রিটিশ আর ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের মিলিত আক্রমণের মুখে পড়লো সুকার্নোর নেতৃত্বাধীন গেরিলা বাহিনী।

কিন্তু সুকার্নোর জয় ছিলো সময়ের ব্যাপার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেই সব দেশকে স্বাধীন করে দিচ্ছে পরিস্থিতি বুঝে। তারা ডাচদেরকে আর কী সাহায্য করবে?

এদিকে মার্কিন প্রেসিডন্ট হ্যারী এস ট্রুমান ডাচদেরকে হুমকি দিলেন, "হিটলারের দাবড়ানি খাওয়ার পরেও কি শিক্ষা হয়নি এখনও? তাড়াতাড়ি তোমরা ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দান করো আর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে আসো"

দখলদার ডাচদের জন্য এর বিকল্প আর কিছু ছিলা না। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার জন্ম হয় ১৯৪৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর।

নেদারল্যান্ডের রাণী জুলিয়ানা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ওই দিন জাকার্তার গভর্নর জেনারেল ভবন হতে ডাচ পতাকা নামিয়ে ইন্দোনেশীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। আর এভাবেই জন্ম হয় স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার।

সুকার্নোর শাসনামল ও ন্যাম প্রতিষ্ঠাঃ

সুকার্নো বিশ্ব রাজনীতিতে এক অদ্ভুত সমীকরণের জন্ম দেন। তিনি প্রকাশ্যেই আমেরিকাসহ পশ্চিমাদের নিন্দা করতেন। তার মানে এই নয় যে, তিনি আবার রাশিয়ার সহচর ছিলেন। রাশিয়ানদের কাছ থেকেও দূরে থাকতেন। চীনের সাথেও ভালো সম্পর্ক ছিলো না তাঁর।

দ্বিমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিপরীতে তিনি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে সচেষ্ট হন। এজন্য ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং নগরীতে 'ন্যামের' প্রথম রুপরেখা প্রণয়ন করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রথমদিকে সংসদীয় গণতন্ত্র মোটামোটি সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু স্থিতিশীল সরকার গড়ে উঠতে পারেনি।

একপর্যায়ে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী সুকর্ন 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' চালু করেন। বিরোধীদের স্বাধীন মতামত প্রদানের ক্ষমতা বন্ধ হয়। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দেশ শাসন করেন সুকর্ন।

সুহার্তোর ক্ষমতাদখল ও পতনঃ

প্রায় পঁচিশ বছর মহাপ্রতাপে শাসনকার্য পরিচালনা করার পর ১৯৬৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থান ঘটনার পর থেকে সুকর্ন দ্রুত অস্তাচলে ঢলে পড়েন। একদল বিপ্লবী সেনা কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট সুকর্নকে উচ্ছেদের চেষ্টা চালান। তারা ৬জন শীর্ষস্থানীয় জেনারেলকে হত্যা করেন।

অচিরেই আন্দোলনের রাশ চলে যায় সেনাবাহিনীর এক অংশের কমান্ডার জেনারেল সুহার্তোর কাছে।

জেনারেল সুহার্তো ইন্দোনেশিয়াতে পুরো একনায়কতন্ত্র কায়েম করেন। প্রায় ৩২ বছর দোর্দণ্ডপ্রতাপে দেশ শাসন করার পর ১৯৯৮ সালে অভ্যুত্থানে সুহার্তোর পতন হয়।

পর্ব-৯৪

বিংশ শতাব্দীর মিয়ানমার–

মিয়ানমার হচ্ছে আমাদের জন্য বাড়ির পাশে আরশিনগর। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, মিয়ানমারের সাথে আমাদের সম্পর্ক এত শীতল যে বাড়ির কাছের এই প্রতিবেশী সম্পর্কে আমরা খুব বেশি কিছু জানতেও পারি না। প্রতিবেশী ভারতে সবচেয়ে বেশি পর্যটক যায় বাংলাদেশ থেকে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে যাওয়া মিয়ানমারের পর্যটক সংখ্যা একদমই হাতে গোনা। মিয়ানমার থেকেও এদেশে বেড়াতে আসে না কেউ সচরাচর। রোহিঙ্গা ইস্যুর কারণেই দুই দেশের সম্পর্ক আন্তরিক নয়।

আমরা বিংশ শতাব্দীর মিয়ানমারের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করবো–

সেই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ, তার পরে দুর্ধর্ষ জাপানঃ

মিয়ানমার ১৮৮৫ সালে সম্পূর্ণভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮২৪ সাল থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে ইংরেজরা মিয়ানমার দখলের জন্য তিনবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যদিও ১৬৪৭ সালে ব্রিটেন তৎকালীন বার্মা মুল্লুকে পদার্পন করে।

বার্মা বৃটিশ-ভারতের অধীনস্থ হওয়ায় ভারতবর্ষের অনেক এলাকা থেকে লোকজন বার্মায় ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে ছিলেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকজনের কাছে বার্মা ছিলো বাড়ির উঠান ঘরের ন্যায়। ১৯৩৭ সালে বৃটিশরা বার্মাকে ভারত থেকে আলাদা করে ফেলে। তারপর থেকে বার্মায় ভারতীয় জনগোষ্ঠীর যাতায়াত সংকুচিত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা ফ্রন্টঃ

১৯৪১ সালের পার্ল হারবারে মার্কিন নৌঘাঁটিতে বিমান হামলার পর জাপান পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবগুলো দেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য দুর্বার গতিতে আক্রমণ শুরু করে। ৩৫ হাজার সদস্য নিয়ে সহজেই বার্মা থেকে বৃটিশদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় জাপান। দুর্বল ভারতীয় বাহিনী বার্মা থেকে পালিয়ে বাঁচলো।

জাপানীদেরকে বার্মার জনগণের একটা অংশ সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসের ১ তারিখ বার্মাকে স্বাধীন ঘোষণা করে দখলদার জাপানীরা। বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা অং সান জাপানকে সমর্থন করেন।

কিন্তু মিত্রবাহিনীর আক্রমণে জাপানের পরাজয় ঘনিয়ে আসে। অং সান পক্ষবদল করে বৃটিশদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়ান। বৃটিশ বাহিনী বার্মাকে পুনরুদ্ধার করেন।

বিজয়ীর বেশে বৃটিশরা রাজধানী রেঙ্গুনে ফিরলেও বাস্তবতার জমিনে নামতে হয় তাঁদের। অং সানের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। আলোচনার জন্য অং সান লন্ডনে আসলেন। বৃটিশরা বার্মাকে স্বাধীনতা দিতে রাজি হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখ বার্মা বৃটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

রক্তাক্ত ইন্দোচীন-

ইন্দোচীন বলতে মূলত তিনটি দেশকে বোঝায়। যথা লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম। প্রথমে আমরা ভিয়েতনাম নিয়ে আলোচনা করবো, তারপর যথাক্রমে কম্বোডিয়া ও লাওসকে নিয়ে কথাবার্তা হবে।

জারিফ জিজ্ঞেস করলো, ভিয়েতনামের ইতিহাস বলতে প্রথমেই তোমার ধারণাটা কি?

মামুন বললো, "বেশি কিছু জানিনা। শুধু এটুকু জানি, আমেরিকা ভিয়েতনামে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলো। ১০ বৎসর যাবত যুদ্ধ হয়েছিলো এবং চরম পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে আমেরিকা ভিয়েতনাম থেকে পিছু হটে।"

জারিফ বললো, আমেরিকার জন্য ভিয়েতনাম ছিলো চরম পরাজয়ের চেয়ে বেশি কিছু। ৫৮ হাজার আমেরিকান সৈন্য ভিয়েতনামে প্রাণ হারায়। তার চেয়ে বহুগুণ সৈন্য আহত হয়। আমেরিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ভিয়েতনাম যুদ্ধ এমনই এক ক্ষত সৃষ্টি করে যে তার রেশ রয়ে যাবে বহুদিন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, কোনো ভূখণ্ড দখল কিংবা কোনো প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা লাভের জন্য এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। ভিয়েতনামকে কেন্দ্র করে আমেরিকার কোনো অর্থনৈতিক হিসাব নিকাশও ছিলো না।

এ যুদ্ধটা ছিলো নেহায়েত এক বোকামি। সমাজতন্ত্র যাতে ভিয়েতনামের মাটিতে সফল না হতে পারে, সেজন্য একটা প্রচেষ্টা ছিলো আমেরিকার। সেই প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় ভিয়েতনামকে ঘিরে। যাই হোক, কেবল ভিয়েতনাম নয়, ইন্দোচীনের অন্তর্গত তিনটি দেশের বিস্তারিত ইতিহাস আমরা জানবো। এ জন্য আমাদেরকে প্রথমেই উনবিংশ শতাব্দীতে ফিরে যেতে হবে। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেও দখলদারিত্বের থাবা বসিয়েছিলো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা।

ইন্দোচীন সম্পর্কে আলোচনার আগে!

জারিফ মামুনকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর 'Glimpses of the world history' বইটা পড়েছে?

মামুন উত্তর দিলো, "অনেক আগে পড়েছিলাম বেশ খানিকটা অংশ কিন্তু এখন আসলে বইয়ের বিষয়বস্তু এত মনে পড়ছে না। শুধু এটুকু মনে আছে, জেলে বন্দী নেহেরু তার কন্যা ইন্দিরাকে চমৎকার ভাষায় চিঠি লিখতেন বিশ্বের যাবতীয় ইতিহাস বর্ণনা করে। সেই চিঠিপত্রগুলোর সংকলন হচ্ছে এই বইটি।

জারিফ বললো, যাই হোক, জওহরলাল নেহেরুর সেই বইটি খুব চমৎকার একটা বই। পিতা কর্তৃক কন্যাকে খুব সহজ ভাষায় পুরো পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার একটা চেষ্টা। সেই বইতে নেহেরু বৃহত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের একটা চিত্র এঁকেছেন যার মধ্যে বর্তমান আসিয়ানের প্রায় ১০টি দেশ অন্তর্গত।

মামুন বললো, "তাজ্জব ব্যাপার! ভারতীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে আসিয়ানভুক্ত দেশ পড়বে কেন? এ দেশগুলি কেন নেহেরুর স্বপ্নের বৃহত্তর ভারত হবে?"

জারিফ বললো, ইন্দোচীন কথাটা বিশ্লেষণ করে দেখো। ইন্ডিয়া ও চীনের সংমিশ্রণে ইন্দোচীন কথাটি উদ্ভুত। এই দেশগুলিতে ভারত ও চীনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান শত শত বছর ধরে। অন্তত ২ হাজার বছর আগে থেকে দক্ষিণ ভারত থেকে বাণিজ্য জাহাজ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া এমনকি ফিলিপাইন পর্যন্ত যেতো। যার কারণে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি এসব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। 'গল্পে গল্পে বিশ্বভ্রমণ' বইতে আমি বলেছি, বিশ্বের সবচেয়ে বড় হিন্দু মন্দির অবস্থিত কম্বোডিয়ায়। তাছাড়া ভারতে জন্ম নেওয়া বৌদ্ধ ধর্ম সেসব দেশে বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্ম চীন দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। চীনের শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে এসব দেশগুলিতে বিভিন্ন অভিযান চালায়। চৈনিক সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব অত্র অঞ্চলে বিদ্যমান।

তাই বলা যায় যে চীন ও ভারতের মিলিত প্রভাবের কারণেই এ অঞ্চলগুলোকে ইন্দোচীন বলা হয়। ইন্দোচীনের আওতার মধ্যে লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ছাড়াও থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, ফিলিপাইনও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দখলদার সাম্রাজ্যবাদী ফরাসিরা যেহেতু এই তিনটি দেশকেই ইন্দোচীন নামে আখ্যা দিয়ে লুটপাট চালিয়েছে, তাই লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামকেই ইন্দোচীন বলা হয়।

পর্ব-৯৫

ফরাসীদের দখলে ইন্দোচীনঃ

এবার আবার সেই পুরনো গল্প এবং অবশ্যই ইউরোপীয় ডাকাত দলের কাহিনী। ইন্দোচীনে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য দুই ইউরোপীয় ডাকাত স্পেন ও ফ্রান্স বিভিন্ন মিশনারী পাঠায় সতেরোশো শতকে। ভিয়েতনামে বেশ কিছু লোকজন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিলো মিশনারীদের তৎপরতায়।

তবে দুই দুইবার আফিমের যুদ্ধে চীন যখন ব্রিটেনের কাছে হেরে যায়, তখন ফ্রান্স খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পাশাপাশি বাণিজ্যিক লাভের দিকে মনোনিবেশ করলো। ১৮৫৭ সালে ভিয়েতনামের রাজা তু ডাক দুইজন স্পেনীশ খ্রিস্টান ধর্মযাজককে হত্যা করলেন।

এই তো মওকা পেয়ে গেলো ফ্রান্স। খ্রিস্টান ধর্মযাজককে হত্যার ঘটনাকে পুঁজি করে ভিয়েতনামের ভূ-খণ্ড দখলে হাত বাড়ালো।

১৮৫৮ সালে ফ্রান্স ও স্পেনের যৌথ বাহিনী ভিয়েতনাম আক্রমন করলো। দখলদার ফ্রান্সের সাথে ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলতেই লাগলো বছরের পর বছর। ১৮৮৪ সালের দিকে সমগ্র ভিয়েতনাম দখল করলো ফ্রান্স। ১৮৮৭ সালে ফ্রেন্স ইন্দোচীন নাম দিয়ে ভিয়েতনাম শাসন পাকাপোক্ত করা হলো। ভিয়েতনাম হলো ফ্রান্সের দখলে থাকা পুরোপুরি পরাধীন এক দেশ।

মামুন বললো, "ইন্দোচীনের বাকি দুই দেশ লাওস ও কম্বোডিয়ার খবর কি? জারিফ উত্তর দিলো, সে দুই দেশও দখলে আসলো ফ্রান্সের হাতে। অল্প কয়েক বছর পর। কম্বোডিয়া ছিলো থাইল্যান্ডের সিয়াম রাজাদের দখলে। আসলে থাইল্যান্ডের প্রাচীন নামই ছিলো সিয়াম (কিংবা শামদেশ)। থাইল্যান্ড যখন দেখলো ইউরোপীয় ডাকাত ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ করা বৃথা, তাই ১৮৬৭ সালে কম্বোডিয়ার মালিকানা ফ্রান্সের হাতে তুলে দিলো। কম্বোডিয়ার রাজতন্ত্র ফ্রান্সের হাতের পুতুল হয়ে টিকে রইলো রাজধানী নমপেনের এক সংরক্ষিত এলাকায়।

লাওসের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটলো। ১৮৯৩ সালে ফ্রান্সের সাথে থাইল্যান্ডের রাজবংশের যুদ্ধ শুরু হলো। লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ার-এই তিনটি দেশকে ঘিরে রয়েছে মেকং নদী।

মেকং নদীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ছিলো লাওসের ভূ-খণ্ড। এবারও থাইল্যান্ডের সাথে জয়ী হলো ফ্রান্স। থাইল্যান্ড লাওসের দখলদারিত্বও ফ্রান্সের হাতে তুলে দিলো।

মামুন আবার প্রশ্ন করলো, "আমরা যে সাধারণ জ্ঞান বইয়ে পড়ি থাইল্যান্ড কখনো পরাধীন হয়নি, এখন তো দেখছি থাইল্যান্ডও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে যুদ্ধে হেরেছে।"

জারিফ উত্তর দিলো, "থাইল্যান্ডকে ইউরোপীয়রা দখল করেনি নিজেদেরই স্বার্থে। তুমি মানচিত্রে লক্ষ্য করো, থাইল্যান্ডের পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে বৃটিশ কলোনী- মিয়ানমার ও ভারতবর্ষ। থাইল্যান্ডের দক্ষিণে রয়েছে বৃটিশ কলোনী মালয়েশিয়া ও ডাচ কলোনী ইন্দোনেশিয়া। থাইল্যান্ডের পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে ইন্দোচীনের তিনটি দেশ।

থাইল্যান্ডের অবস্থানটা এরকম ছিলো যে একে স্বাধীন রাখলে কোনো ইউরোপীয় ডাকাত কেউ কারো প্রতিবেশী হতে পারবে না। থাইল্যান্ড স্বাধীন থাকলে, সে হয়ে থাকবে গুরুত্বপূর্ণ 'বাফার স্টেট'। ইউরোপীয় শক্তিগুলো নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্যই মূলত থাইল্যান্ডকে দখল করেনি।

তাই থাইল্যান্ড স্বাধীন হয়ে রইলো। আমি আবারও বলছি, এজন্য থাইল্যান্ডবাসীর কোনো কৃতিত্ব নেই।

অবিসংবাদিত নেতা হো চি মিন এবং পরাধীন ভিয়েতনামঃ

এখন আমরা ভিয়েতনামকে শিরোনাম করে ইন্দোচীনের পুরো ইতিহাস জানবো। কারণ, ভিয়েতনাম হচ্ছে এই তিন দেশের মধ্যে আয়তনে বড় এবং প্রভাব বিস্তারকারী দেশ। ভিয়েতনাম নিয়ে আলোচনা করলেই মূলতঃ ইন্দোচীনের পুরো ইতিহাস জানা হয়ে যায়।

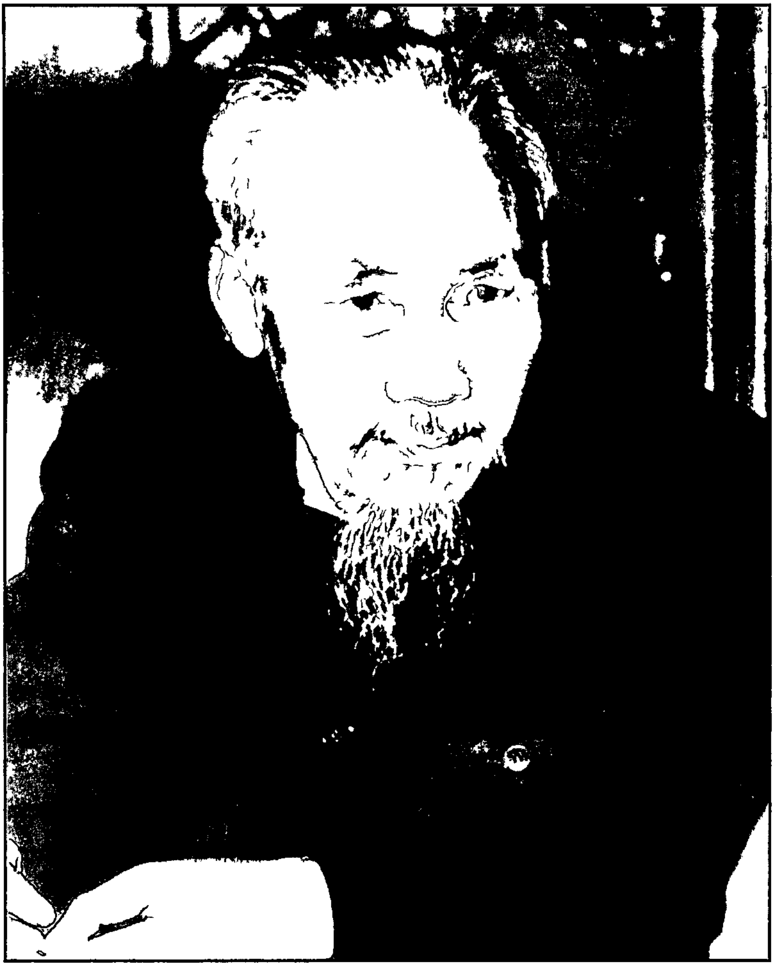
বিংশ শতাব্দীর ভিয়েতনামের প্রথম অর্ধেকের ইতিহাস পুরোপুরি পরাধীনতার ইতিহাস।

ফ্রান্স ভিয়েতনামকে শোষণ করে। নামমাত্র উন্নয়ন ঘটিয়েছে তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তারপর যা হয় আর কি!

ফ্রান্সের দখল থেকে মুক্তি পেতে চাইলো ভিয়েতনাম। কিন্তু স্বাধীনতা চাইলেই তো পাওয়া যায় না। ভিয়েতনামে সেরকম কোনো নেতাও ছিলো না। ঠিক সেরকম পরিস্থিতিতেই ভিয়েতনামে ১৮৯০ সালে জন্ম নিলো এক ক্ষণজন্মা নেতা। নাম যার হো চি মিন।

অবশ্য শেক্সপীয়রের 'রোমিও এন্ড জুলিয়েট' নাটক থেকে সংলাপ ধার করে বলা যায়, নামে কি বা আসে যায়! কমবেশি ৩২টির মতো ছদ্মনাম পাওয়া যায় হো চি মিনের। এসব নাম তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করেছেন তাঁর শত্রুদের ধোকা দেওয়ার জন্য।

ভিয়েতনামের নেতা হো চি মিনের সাথে আমাদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের তুলনা করা যায়। বঙ্গবন্ধু যেমন সারাটা জীবন শুধুমাত্র দেশকে ভালোবেসে কাটিয়ে দিয়েছেন, হো চি মিনও ঠিক তেমনি। বঙ্গবন্ধু এবং হো চি মিনের জীবনী পাঠ করলে একটা জিনিস পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে স্বদেশপ্রেম।



চিত্র ৩৫ : ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ হো চি মিন।

ভিয়েতনামের নেতা হো চি মিনের সাথে আমাদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের তুলনা করা যায়। বঙ্গবন্ধু যেমন সারাটা জীবন শুধুমাত্র দেশকে ভালোবেসে কাটিয়ে দিয়েছেন, হো চি মিনও ঠিক তেমনি। বঙ্গবন্ধু এবং হো চি মিনের জীবনী পাঠ করলে একটা জিনিস পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে স্বদেশপ্রেম।



চিত্র ৩৫ : ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ হো চি মিন।

এই দু'জনের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই, তাদের জীবনে অন্য সবকিছু তুচ্ছ; শুধুমাত্র দেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা করাই ছিলো তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত।

পরাধীন ভিয়েতনামে জন্ম নিয়ে হো চি মিনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো কিভাবে ফ্রান্সকে তাড়ানো যায়। সে চিন্তার জন্য যা যা করা দারকার-সেগুলো করার জন্যই তিনি বড় হচ্ছিলেন।

হো চি মিন সায়গনের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে কারিগরি বিদ্যায় জ্ঞান অর্জন করে জীবিকার পথে বেরিয়ে পড়লেন বিশ্বভুবনে। তাঁর বড় শখ ছিলো, দখলদার ফরাসিদের পিতৃভূমি ফ্রান্স ঘুরে দেখার। তাঁর মতো গরীব মানুষের এই শখ পূরণ হওয়া কঠিন ছিলো। ১৯১১ সালে তিনি জাহাজে বাবুর্চির কাজ নিয়ে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তার কাজে মুগ্ধ হয়ে কর্তৃপক্ষ তাকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার বিভিন্ন শহরে তিনি ঘুরতে লাগলেন জাহাজে করে।

উপার্জনের জমানো টাকা নিয়ে তিনি লন্ডন শহরে থিতু হলেন ১৯১৫ সালে। ২ বছর লন্ডনে কাটানোর পর অবশেষে তিনি দখলদার ফ্রান্সের মাটিতে আশ্রয় নিলেন। ১৯১৭ সালে ফ্রান্সের মাটিতে গিয়েই তিনি একটি সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলেন। সেখানে বসবাসরত ভিয়েতনামীদের তিনি ঐক্যবদ্ধ করেন।

সেই হো চি মিন যিনি সামান্য একজন বাবুর্চির কাজ নিয়ে বাড়ি ছাড়েন, শুধুমাত্র দেশকে স্বাধীন করবেন বলে। মনের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়। হো চি মিন তারই এক বাস্তব উদাহরণ।

বাবুর্চি হো চি মিন এবার প্যারিস শান্তি সম্মেলনেঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর। দুনিয়ার তাবড় সব নেতাদের ভিড়ে ভিয়েতনামের জনগণের সম অধিকার আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে হো চি মিন হাজির প্যারিসে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের অরল্যান্ডোতো ছিলেনই, আরো ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা।

কিন্তু হো চি মিনের কথা কে শুনে? লিকলিকে চেহারার এই ছোকড়া কথা বলার কোনো সুযোগই পেলেন না। সুযোগ পেলেই বা কি, তাকে পাত্তা দিত কে?

আট দফা দাবি নিয়ে হো চি মিন হাজির হয়েছিলেন সেখানে, সবাইকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, দখলদার ফ্রান্স কিভাবে ভিয়েতনামের লোকজনের উপর জুলুম করছে।

যদিও প্যারিস শান্তি সম্মেলনে হো চি মিন কিছুই পেলেন না, কাজের কাজ একটা হলো যে-প্যারিসে বসবাসরত ভিয়েতনামের লোকজনের কাছে তার নামডাক ছড়িয়ে পড়লো।

সারাজীবনের জন্য ঝুঁকলেন কমিউনিজমেঃ

ইতোমধ্যে ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে বিপ্লব হলো লেনিনের নেতৃত্বে। সারা বিশ্বের পরাধীন জাতিগোষ্ঠী আশায় বুক বাঁধলো, সাম্রাজ্যবাদীরা যেহেতু কোনো দিন স্বাধীনতা দিবে না তাই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াই হলো তাদের আশা-ভরসার স্থল। প্যারিসের ব্যর্থ শান্তি সম্মেলনের পর হো চি মিন ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের আস্তানায় থেকে ভিয়েতনামের জন্য কিছুই করতে পারবেন না, এটা যখন তিনি বুঝে গেলেন তখন তিনি সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে চললেন ১৯২৩ সালে। ততদিনে তিনি রাশিয়ার সমাজতন্ত্রীদের কাছেও পরিচিত মুখ। ১৯২৪ সালে যখন লেনিন মারা যান, তিনি তখন সমাজতন্ত্রীদের মুখপাত্র প্রাভদা পত্রিকায় শোক কলাম লিখেন।

১৯২৪ সালেই হো চি মিন চীনের ক্যান্টনে চলে আসলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, সেখানে বসে তিনি বিপ্লবী তৈরী করবেন। দখলদার ফরাসীদের তাড়া খেয়ে ভিয়েতনামের অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্যান্টিনে আস্তানা গাড়লেন।

মামুন বললো, ''আসলে একবিংশ শতাব্দীতে এসব কাহিনী রূপকথার মতো মনে হয়, আমরা একটু চাকরি কিংবা নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ছাড়া সমাজকে নিয়ে ভাবিই না কিন্তু হো চি মিনের মতো লোকজন সারাজীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে শুধু দেশের কথা ভেবে। নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভাববার কোনো অবকাশ ছিলো না এসব বিপ্লবীদের। তাই তো তারা এই নশ্বর পৃথিবীতে সারা জীবনের জন্য নমস্য।

চীনের ভূ-খণ্ড ক্যান্টনেও বিপদের পদধ্বনিঃ

চীন থেকে একদল কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের আস্তানা ছিলো ক্যান্টনে। চীনের জাতীয়তবাদী নেতা চিয়াং কাইশেকের দু'চোখের বিষ হচ্ছে এই কমিউনিস্টরা। চিয়াং কাইশেক যখন জানতে পারলেন, ক্যান্টন এলাকাটা সব কমিউনিস্টদের আস্তানা তখনই তিনি ধরপাকড় শুরু করলেন। হো চি মিন আবার আশ্রয় নিলেন সোভিয়েত রাশিয়ায়। সেখান থেকে ব্রাসেলস-প্যারিস হয়ে থাইল্যান্ডে আশ্রয় নিলেন। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি থাইল্যান্ডে ছিলেন। রাশিয়াকে ভালোবেসে তিনি কম্যুনিজম ছড়ানোর কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। নিজের দেশ

ভিয়েতনামে ফিরতে পারতেন না কারণ সাম্রাজ্যবাদী ফরাসি সরকারের পয়লা নম্বরেরর দুশমন ছিলেন তিনি।

১৯২৯ সালে ইন্দো-চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন করেন। হো চি মিনের জীবনের অন্যতম সেরা এক অভিজ্ঞতা হলো তিনি চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সেতুং এর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে হো চি মিন চীন যান এবং মাও সেতুং এর সাথে কয়েক মাস কাজ করেন।

১৯৩৯ সালে শুরু হলো দুনিয়া কাঁপানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইন্দোচীন দখল করা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয় হলো ইউরোপে ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মে। জার্মান আক্রমণে ধরাশয়ী হলো ফ্রান্স।

উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন লড়াকু হো চি মিন। এবার হানাদারদের তাড়াতে হবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য চীনের শাসক চিয়াং কাইশেকের কাছে বার্তা পাঠালেন সাহায্যের জন্য। কিন্তু আজন্ম কমিউনিস্ট বিদ্বেষী চিয়াং কাইশেক হো চি মিনকে সাহায্য করাতো দূরের কথা, ফাঁদ ফেলে হো চি মিনকে গ্রেফতার করলো চীনারা। প্রায় ১৮ মাস জেলখানায় বন্দী হয়ে রইলেন হো চি মিন। ১৮ মাস পর এক বন্ড সই দিয়ে চীনের কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন হো চি মিন। বন্ডসইয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন যে তিনি চিয়াং কাইশেকের সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করবেন না।

পর্ব-৯৬

বহু ডাকাতের আস্তানা যখন ভিয়েতনামকে ঘিরেঃ

জারিফ বললো, আমি ভিয়েতনামের সমস্ত জনগণকে সশ্রদ্ধ সালাম জানাই, কারণ বিশ্বে যদি বীরের জাতি হিসেবে কোনো মাপকাঠি থাকতো তাহলে ভিয়েতনাম বিপুল ভোটে প্রথম স্থান অধিকার করতো অনায়াসে।

মামুন পাল্টা প্রশ্ন করলো, "দুনিয়াতে এত এত জাতি থাকতে ভিয়েতনামের প্রতি তোমার এতো শ্রদ্ধা কেন? কারণ কি?"

কারণ হচ্ছে, পৃথিবীতে এরকম অনেক দেশ আছে যারা অল্পদিন কোনো এক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেই তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে দুনিয়ার কল্প-কাহিনী জুড়ে দেয়। দুনিয়াতে অনেক দেশ আছে যারা সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সাথে হুইস্কি খেয়ে বৈঠক করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাদেরও সে কি দেশপ্রেম!

কিন্তু ভিয়েতনামের ইতিহাসে প্রতি ইঞ্চিতে রক্তের দাগ। প্রতি ইঞ্চি কথাটা শুধুমাত্র কথার কথা নয়। পরবর্তীতে অনেক ইতিহাস বললেও এই মুহূর্তে আমি একটা ইঙ্গিত দেই তোমাকে। ফ্রান্স যখন ভিয়েতনামকে করায়ত্ত করে ১৮৮৭

সালে, তার আগে চাইনিজদের সাথে বহু লড়াই করেছে ভিয়েতনামবাসী। ফ্রান্সের অধীনে থেকে নিরন্তর সংগ্রাম করেছে তারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পতন হলে চীনের নজর পড়ে ভিয়েতনামের উপর। জাপানও বসে থাকে নি, তারাও দক্ষিণ ভিয়েতনাম দখল করে রাখে। আমেরিকান বাহিনী জাপানকে হারিয়ে ভিয়েতনামে প্রবেশ করে। যদিও আমেরিকানরা যুদ্ধ শেষ হলে সরে পড়ে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই লোভী সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স তার দোসর ব্রিটেনকে সাথে নিয়ে ভিয়েতনামীদের উপর হামলে পড়ে। আবারও শুরু হয় ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৯৫৪ সালে ভিয়েতনাম থেকে ফ্রান্স পিছু হটলেও দুই ভিয়েতনামে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

আসরে নামে আমেরিকা। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনামে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। ১৯৭৫ সালে লজ্জাজনক পরাজয় নিয়ে ভিয়েতনাম থেকে পিছু হটে আমেরিকা।

যদি মনে করো, ভিয়েতনামের রক্তাক্ত ইতিহাস শেষ তাহলে ভুল করবে। আমেরিকাকে হটিয়ে দুই ভিয়েতনাম যখন এক হয় তখনি চীনের সাথে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হয়। প্রতিবেশী কম্বোডিয়ার নরঘাতক পলপটকে নিয়ে চীনের সাথে যুদ্ধ বাধে ভিয়েতনামের। ১৯৭৯ সালের পর ভিয়েতনাম ঠাণ্ডা হয়।

মামুন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, "এ কি শুনলাম আমি! একটা দেশের জনগণ এত সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে দেশকে ভালোবাসতে পারে? আমার পক্ষ থেকেও ভিয়েতনামের সংগ্রামী জনগণকে স্যালুট এবং কমিউনিস্টদের মতো বলতে চাই, লাল সেলাম।"

জারিফ বললো, ভিয়েতনামের জনগণ যাদের বিরুদ্ধে লড়েছে, চলো তাদের একটা তালিকা করে পাশাপাশি সাজাই।

চীনের বিরুদ্ধে – ইউরোপীয় উপনিবেশ শক্তি আসার আগে

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে – বহু বছর যাবত লড়াই করে ১৮৮৭ সালে পরাধীন

জাপানের বিরুদ্ধে – ইউরোপে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটলে জাপান ভিয়েতনাম দখল করে।

ব্রিটেন-ফ্রান্সের বিরুদ্ধে – জাপানের পরাজয় ঘটলে আগের ডাকাত ফ্রান্স ব্রিটেনের সহায়তায় আবার ভিয়েতনাম দখল করে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে – কম্যুনিস্ট ঠেকানোর জন্য আমেরিকা ৫ লক্ষ সৈন্য পাঠায় এবং হেরে ভুত হয়।

আবারও চীনের বিরুদ্ধে – ১৯৭৯ সালে চীন তিন সপ্তাহ ব্যাপী ভিয়েতনামে হামলা চালায়।

কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে – কম্বোডিয়ার নরদানব পল পটকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ১৯৭৯ সালে ভিয়েতনাম হামলা চালায় কম্বোডিয়ায়। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত যুদ্ধাবস্থা ছিলো কম্বোডিয়ার সাথে।

১৮৮৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০০ বছর ভিয়েতনামের লোকজন শুধু যুদ্ধই করে গেছে। কখনো পিছ পা হয়নি।

যাহোক, সব ইতিহাস আমরা ধীরে ধীরে জানবো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভিয়েতনামঃ

যে আলোচনা আমরা করছিলাম একটু আগে। ইউরোপে ফ্রান্সের পতন হলো ১৯৪০ সালের ২২ জুন। যদিও ফ্রান্সে একটা তাবেদার সরকার বসায় হিটলার। সেই তাবেদার সরকারের হাতেই কলোনীগুলোর নিয়ন্ত্রণ ছিলো। ফ্রান্সের সরকারের এই করুণ দশায়, আসরে নামলো নতুন ডাকাত জাপান। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে জাপান ভিয়েতনামের সায়গন নগরী দখল করে।

হো চি মিন দেখলেন, এতো ভারী বিপদ! ফ্রান্স দুর্বল হয়ে পড়ায় সহজেই স্বাধীন ভিয়েতনামের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিলো, তা এখন অলীক কল্পনা। কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র নন হো চি মিন। ১৯৪১ সালে হো চি মিন গেরিলা বাহিনী তৈরি করেন; যার নাম হয় 'ভিয়েতমিন'। এই বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো জাপানকে হটানো। চীনের সাহায্য চেয়ে উল্টো জেলে গেলেন চিয়াং কাইশেকের নির্দেশে। তাই ভিয়েতমিন গেরিলা বাহিনীর কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়লো।

সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স জাপানীদের সাথে কোনো যুদ্ধে যায় নি; উল্টো সন্ধি করে বসে। ভিয়েতনামের কেউ কেউ জাপানী দখলকে একরকম মুক্তদশা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলো। আরেকটা মজার তথ্য হচ্ছে, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে নৃশংসতা করেছে, ভিয়েতনামে তার ছিঁটেফোটা দেখা যায় নি। ভিয়েতনামের লোকজনের মন জয় করতে চেয়েছে জাপান। জাপানী মুভি দেখানো হতো। জাপানী সাহিত্য ভিয়েতনামিজ ভাষায় অনুবাদ করে লোকজনকে পড়ানো হতো।

দৃশ্যপটে আমেরিকার আগমনঃ

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট প্রথমদিকে সাম্রাজ্যবাদী ফরাসি সরকারকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছিলেন; যেহেতু ইউরোপে ফ্রান্স হচ্ছে হিটলারের হাতে পরাজিত শক্তি। ফরাসি সরকার কর্তৃক জাপানীদের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক নিয়েও আমেরিকার কোনো আপত্তি ছিলো না।

যেইমাত্র জাপান পার্ল হারবারে আক্রমণ চালিয়ে সরাসরি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তখন ভিয়েতনামের ভূ-খন্ড থেকে জাপানকে তাড়ানো আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার কাজের আওতায় চলে আসলো।

১৯৪৩ সালে রুজভেল্ট জাপানীদের কাছ থেকে ভিয়েতনামকে মুক্ত করে স্বাধীনতা দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন।

হো চি মিন ভাবলেন, এইতো আসল লোক পেয়ে গেছি। চীনের জেল থেকে ততদিনে মুক্ত হয়েছেন তিনি। আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয় হো চি মিন ও তাঁর গেরিলা বাহিনীর। দখলদার জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে শুরু হয় তুমুল লড়াই।

মামুন বললো, "এতো ভারী তাজ্জবের ব্যাপার! আমেরিকার সাথে হো চি মিন কোনো কালে ঘনিষ্ঠ ছিলো, এ তথ্য তো জানতাম না। তিনি না কমিউনিস্ট ছিলেন?"

জারিফ বললো, যদিও হো চি মিন কমিউনিস্ট ছিলেন, তবুও তার কাছে সবার আগে ছিলো দেশ। দেশের স্বার্থে তিনি যে কারো হাত ধরতে পারতেন, যেকোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন।

পাগলা জাপান ক্ষ্যাপা দিলো ফ্রান্সের উপরঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের কাহিনী সবার জানা। আমেরিকান নেতৃত্বাধীন মিত্র বাহিনীর সাথে জাপানের শুরু হলো তুমুল লড়াই। পরাজয় ঘনিয়ে আসলো জাপানের। হো চি মিনের গেরিলা বাহিনীও জাপানকে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে ভিয়েতনামে। জাপানের তখন মাথা ঠিক নাই। সব রাগ গিয়ে পড়লো সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স সরকারের উপর।

"তোমরা মিত্রবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে ও গেরিলাদের সাথে সন্ধি করে আমাদের পরাজয় ডেকে আনছো? " এই অপবাদে ফ্রান্সের সরকারী কর্মকর্তাদের পাইকারী হারে হত্যা করে জাপান। সাধারণ সৈনিকদের বন্দী করে তাদের হাত থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়। সমস্ত বর্বরতা ও নৃশংসতার আশ্রয় নিয়ে ফ্রান্সকে একদম শক্তিশুন্য করে জাপানীরা।

ভিয়েতনামে আর থাকা সম্ভব হবে না জাপানীদেরও, এ সত্য উপলব্দি করে জাপান ভিয়েতনামের পুতুল সম্রাট বাও দাইকে আমন্ত্রণ করে ভিয়েতনামের শাসনভার গ্রহন করতে অনুরোধ জানায়। বাও দাই ফরাসীদের সময়েই নামমাত্র রাজা ছিলেন ভিয়েতনামের। জাপান বাও দাইকে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে অনুরোধ জানায়।

কিন্তু এ আসলে সমস্যার শেষ নয়, শুরুঃ

জারিফ বললো, তুমি যদি মনে করো ভিয়েতনাম নিয়ে গল্প বোধহয় এবার শেষ হবে, তাহলে ভুল। গল্প শুরু হলো মাত্র। তুমি হয়তো ভেবেছো, সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স একেবারে নিঃশেষিত, জাপান নিজের ইচ্ছায় ভিয়েতনামকে স্বাধীনতা দিয়ে দিচ্ছে,

জাপানের চরম শত্রু আমেরিকাও স্বাধীন ভিয়েতনাম চায়। তাহলে আর সমস্যা কি?

প্রথম সমস্যা হচ্ছে দৃশ্যপটে সম্রাট বাও দাইয়ের আগমন। ফ্রান্সে পড়াশোনা করা সম্রাট দেশের কোনো খবরই রাখতেন না। জনগণ তাকে উপাধি দিয়েছিলো প্লেবয় সম্রাট।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সময়কালে হো চি মিনের নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী উত্তর ভিয়েতনামে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। হো চি মিন সম্রাট বাও দাইকে অনুরোধ করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে। হো চি মিনের উদ্দেশ্য ছিলো উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অংশকে একত্র করে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম।

এই ফাঁকে ঘটে গেলা আরেক ভয়ংকর ঘটনা। জাপানীদের পাগলা খেলার শিকার হয়ে যে ফ্রান্সের নাম নিশানা মুছে গিয়েছিলো, তারা আবার ইন্দোচীন দখল করতে চায়। ফ্রান্স ছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্র শক্তি। জাপান-জার্মানী-ইতালির অক্ষশক্তি পরাজিত হলে ফ্রান্স আবারও মাথাচড়া দিয়ে উঠতে চাইলো। ইন্দোচীনের অন্তর্গত তিনটি দেশে তার কলোনীগুলো প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো।

মিটিংয়ের পর মিটিং শুরু হলো প্যারিসে। হো চি মিন নিজেও প্যারিস গেলেন। ফ্রান্সের এক কথা, তারা ভিয়েতনামে আবার যাবে। এবার অবশ্য সুর কিছুটা নরম। তারা ভিয়েতনামকে স্বাধীন সরকার গড়ারও অনুমতি দিতে চাইলো। শুধু প্রতিরক্ষা আর অর্থনীতি হাতে রাখতে চাইলো।

হাইফং গণহত্যা–প্রথম ইন্দোচীন যুদ্ধ শুরু (১৯৪৬ ১৯৫৪):

২০ নভেম্বর, ১৯৪৬!

হাইফং বন্দরে নোঙর করলো ফরাসি নৌবাহিনীর একটি জাহাজ। স্থানীয় লোকজন এসব দখলদারদের প্রতিহত করতে চাইলেন। কোনো কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই ২৩ জন ফরাসি সৈন্য মারা গেলো। ২২ নভেম্বর আর ৬ জন ফরাসি সৈন্য মারা গেলো। ফরাসি কমান্ডার ভ্যালুয়ে এবার ভাবলেন, বেয়াড়া ভিয়েতনামিজদের কিছু উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

অবশেষে আসলো সেই কলংকিত দিন। ২৩ নভেম্বর, ১৯৪৬ সাল ৬০০০ ভিয়েতনামিজ জনসাধারণ মারা গেলো দখলদার ফরাসিদের হাতে। শুরু হলো ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

ফ্রান্স ভেবেছিলো, যুদ্ধ বুঝি তাড়াতাড়ি শেষ হবে। কিন্তু হো চি মিনের গেরিলা বাহিনীর সাথে কোনোভাবেই পেরে উঠছিলো না। দু'পক্ষে ব্যাপক শক্তিক্ষয় চললো।

ফ্রান্স তখন তড়িঘড়ি করে সম্রাট বাও দাইকে ক্ষমতায় বসানোর তোড়জোড় শুরু করে দিলো দক্ষিণ ভিয়েতনামকে কেন্দ্র করে। আরেকটা কথা বলাই হয় নি। বাও দাইকে দৃশ্যপটে এনেছিলো মূলত জাপান। কিন্তু প্লেবয় বাও দাই যখন দেখলেন, স্বাধীন ভিয়েতনাম আপাতত সম্ভব নয়, এক দিকে ফরাসি বাহিনী আরেক দিকে উত্তরে হো চি মিনের কমিউনিস্ট। তাই তিনি হংকং চলে গেলেন।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়ে বাও দাইয়ের পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসালো ফ্রান্স।

ঝামেলা আরও বাড়লো। কারণ, উত্তর ভিয়েতনাম পুরোটাই হো চি মিনের দখলে। হো চি মিন তো পুরো ভিয়েতনাম চান। দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে তুললেন 'ভিয়েত কং গেরিলা বাহিনী'। ভিয়েতনামের মাটি থেকে শান্তির আশা সুদুর পরাহত।

আমেরিকা আবারও দৃশ্যপটে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে ঘিরে। কারণ ১৯৪৯ সালে চীনে ঘটে গেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার সমস্ত জায়গায় লড়াই করতে চান। হো চি মিনের কমিউনিস্ট প্রেমের কথা সুবিদিত। চীনের কমিউনিস্ট নেতা মাও সেতুংয়ের জানি জিগির লোক হচ্ছেন হো চি মিন। তাই দক্ষিণ ভিয়েতনামের বাও দাই সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা আমেরিকার ইমানী দায়িত্ব!

তারপর থেকে ভিয়েতনামের যুদ্ধে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লো আমেরিকা। যদিও প্রথম দিকে আমেরিকা বাও দাই সরকারকে সাহায্যের জন্য সামরিক উপদেষ্টা পাঠাতেন। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারকে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ ও সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ ছিলো না আমেরিকার। ভিয়েতনামের সাথে আমেরিকার আসল যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো আরও অনেক পরে।

'দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধ' ফ্রান্সের কপালে ঝাঁটার বাড়িঃ

ইন্দোচীনের মানচিত্র অদ্ভুত রকম একটা সুবিধা দিয়েছিলো উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট বাহিনীকে। ভিয়েতনামের পশ্চিম সীমান্তের অনেকটা অংশ লাওসকে কেন্দ্র করে। কমিউনিস্টরা লাওসের ভিতর দিয়ে ঢুকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে চলে আসতো বিভিন্ন আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য। লাওসের ভিতর দিয়ে ঢুকে ভিয়েতন্যামের কমিউনিস্টরা যাতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের 'ভিয়েত কং গেরিলা' যোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য ফ্রান্স দিয়েন বিয়েন ফু নগরী দখল করে কমিউনিস্টদের সাপ্লাই লাইন বন্ধ করার উদ্যোগ নিলো।

কিন্তু গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী নগুয়েন গিয়েপ ৪০ হাজার কমিউনিস্ট যোদ্ধা নিয়ে ফরাসি বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন। বিমান যোগাযোগ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে ফ্রান্স এই নগরী থেকে বের হতে পারলো না।

১৯৫৪ সালের মে মাসের ৭ তারিখ ফ্রান্সের চূড়ান্ত পতন হয়। লজ্জাজনক পরাজয়ের পর ফ্রান্স ভাবলো, "বহুত হয়েছে, আর ভিয়েতনামের ভূ-খন্ড দখলে রাখার কোনো মানেই হয় না।"

পরের দিন মে মাসের ৮ তারিখ থেকে ফ্রান্স সরকার হো চি মিনের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা শুরু করলো ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে।

চূড়ান্ত আলোচনা শেষ হয় ১৯৫৪ সালের ২১ তারিখ সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে। চূড়ান্ত বৈঠকে প্রায় সব পরাশক্তিগুলো উপস্থিত ছিলো-আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই বিবদমান পক্ষ এবং প্রতিবেশী লাওস ও কম্বোডিয়া।

বৈঠকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়-দুই ভিয়েতনামকে সাময়িকভাবে ১৭ ডিগ্রী অক্ষরেখায় সাময়িকভাবে বিভক্ত করা হলো। ১৯৫৬ সালের মধ্যে গণভোটের আয়োজন করতে হবে, দুই ভিয়েতনামকে এক করার বিষয়ে। গণভোটের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে।

পর্ব-৯৭

কিন্তু এবার বাগড়া দিলো আমেরিকাঃ

মার্কিন প্রশাসন এটা বুঝে গিয়েছিলো, পুরো ভিয়েতনামেই হো চি মিনের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশি। গণভোট আয়োজন করলে দুই ভিয়েতনামে পাকাপোক্ত হবে কমিউনিস্ট শাসন।

মনে রাখতে হবে, স্নায়যুদ্ধের তখন উত্তাল সময়। সবকিছুর আগে আমেরিকার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কমিউনিজম ঠেকানো। আমেরিকান প্রতিনিধিরা জানিয়ে দিলো, তারা এই চূড়ান্ত চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য নয়। আমেরিকার নেতৃত্বে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুতুল সরকারও শেষ মুহুর্তে চুক্তিতে সই করেনি।

জেনেভা চুক্তি যদি সব পক্ষ ঠিকঠাক মেনে চলতো তাহলে ভিয়েতনামে আর রক্তগঙ্গা বইতো না, শান্তির সুবাতাস নেমে আসতো মেকং নদীর প্রান্তরে। কিন্তু আমেরিকার কমিউনিজম ঠেকানোর মরণ খেলার কারণে সব ভেস্তে গেলো।

উত্তর ভিয়েতনামে শুরু হলো লাল পতাকার শাসনঃ

সব দোষ আমেরিকাকে দিয়েও লাভ নেই। ১৭ ডিগ্রী অক্ষরেখার উত্তর দিকে হো চি মিনের নেতৃত্বে 'উত্তর ভিয়েতনাম' রাষ্ট্র গঠিত হলো। চরম নিপীড়ণমূলক শাসন।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এতক্ষণ হো চি মিনের গুণগান গাইলে, এখন আবার বলছো উত্তর ভিয়েতনামে নিপীড়নমূলক শাসন। ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেলো না!"

জারিফ উত্তর দিলো, সত্যি কথা বললে যদি কোনো মহাপুরুষ খারাপ হয়ে যায়-হোক। তবুও আমি তোমাকে সত্য কথাই বলবো। হো চি মিন অবশ্যই পুরো ভিয়েতনাম জুড়ে জনপ্রিয় ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু গায়ের জোরে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্টা করেছে সমস্ত বামপন্থী বিপ্লবীরাই। হোন তিনি স্ট্যালিন, মাও সেতুং, ফিডেল ক্যাস্ট্রো কিংবা হো চি মিন। এটাতো ভারতবর্ষ নয় যে, নির্বাচন করে ক্ষমতায় গেছে বামপন্থীরা।

উত্তর ভিয়েতনামে প্রথমেই শুরু হলো জমি সংস্কার। কৃষকদের কাছ থেকে সমস্ত জমি কেড়ে নেওয়া হলো। বললো, তোমরা আর তোমাদের জমিতে ইচ্ছেমতো ফসল ফলাতে পারবে না। সমস্ত ভূ-খন্ড রাষ্ট্রের। কমিউনিস্ট শাসনে এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়।

গ্রামীণ কৃষকদের কাছে জমি হলো সন্তানের মতো। স্বাভাবিকভাবেই তারা অনিচ্ছুক ছিলো। শুরু হলো অত্যাচার। ১৫ হাজার কৃষককে মেরে ফেলা হলো ভিয়েতনামে। সরকারের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করলেই মেরে ফেলা হতো। রাশিয়ান স্টাইলে বিরোধীদের ধরে ধরে লেবার ক্যাম্পে ঢুকানো হতো। দম বন্ধ হয়ে যাওয়া কমিউনিস্ট শাসনের ঠেলায় প্রায় ৯ লক্ষ ভিয়েতনামিজ লোক উত্তর থেকে দক্ষিণে পালিয়ে গেলো।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে শুরু হলো 'নগো দিন দায়েম' পর্বঃ

উত্তরে যখন হো চি মিনের নেতৃত্বে জবরদস্তিমূলক শাসন, তখন দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট নগো দিন দায়েম পর্ব শুরু।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "এই নগো দিন দায়েমটা আবার কে? এতক্ষণ জানতাম মার্কিন সমর্থনপুষ্ট শাসক হলেন ভিয়েতনামের সম্রাট বাও দাই।"

জারিফ উত্তর দিলো-"দায়েম ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের আমলে যখন পুতুল সম্রাট বাও দাই ক্ষমতায়, তখন সেই সরকারের একজন মন্ত্রী ছিলেন দায়েম।

১৯৩৩ সালে রাজার সাথে বিরোধের জের ধরে তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। ১২ বছর তার আর কোনো খুঁজ পাওয়া যায় নি। ১৯৪৫ সালে হো চি মিনের গেরিলা বাহিনী তাকে আটক করে। কিন্তু তার কোনো ক্ষতি করে নি হো চি মিনের গেরিলা বাহিনী। হো চি মিন স্বয়ং তাকে তাদের কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে বলেন। তিনি সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। যদিও হো চি মিন তাকে মুক্তি দেন, দায়েম আমেরিকায় চলে যান।

১৯৫৪ সালে রাজা বাও দাই দায়েমকে ভিয়েতনামে আসতে বলেন এবং তাকে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ অফার করেন। সুচতুর দায়েম এই প্রস্তাব লুফে নেন। পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে রাজাকেই ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করেন এক ভুয়া গণভোটের মাধ্যমে ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে।

তারপর থেকেই দায়েমই দক্ষিণ ভিয়েতনামের সর্বেসর্বা। দায়েমের এই অপ্রতিহত অগ্রযাত্রার পিছনে ছিলো আমেরিকার সমর্থন। আমেরিকা সবদিক দিয়ে দায়েমকে সহযোগিতা করতে লাগলো কমিউনিস্ট উত্তর ভিয়েতনামকে ঠেকানোর জন্য।

কিন্তু এই দায়েম স্বৈরাচারঃ

দায়েম নিজে ছিলেন একজন ক্যাথলিক খৃস্টান। প্রশ্ন আসতে পারে-ভিয়েতনামে খৃস্টান লোক আসলো কিভাবে?

সতেরো শতাব্দি থেকেই ফরাসি ও স্পেনীশ মিশনারীরা অবাধে ভিয়েতনামে খৃস্টধর্ম প্রচার করতে লাগলো। লাখ লাখ ভিয়েতনামী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার আশায় খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হলো। দায়েমের পরিবার ছিলো ঠিক সেরকম একজন খৃস্টান। যদিও ভিয়েতনামের সংখ্যাগরিষ্ট লোক ছিলেন বৌদ্ধ। দায়েমকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য কমিউনিস্টরা বিশাল গেরিলা বাহিনী গড়ে তুললো। দায়েম বৌদ্ধদের উপর নানা রকম নিপীড়ন চালাতে লাগলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ সমাজ দায়েমের উপর ক্ষিপ্ত। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শরীরে আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানালো। এসব ঘটনায় আমেরিকা দায়েমের উপর থেকে সমর্থন সরিয়ে নিলো। ১৯৬১ সালে আমেরিকার নির্বাচিত হন জন এফ কেনেডি। নিজেদের সমর্থনপুষ্ট শাসকের এসব ঘৃণিত কর্মকাণ্ড দেখে জন এফ কেনেডি দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেনাবাহিনীর জেনারেলদের দিয়ে তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চাইলেন। ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে ১৯৬৩ সালের ১ নভেম্বর একদল সেনা সদস্য তাকে অপহরণ করে এবং পরবর্তীতে হত্যা করে।

দায়েমকে হত্যা করতে চায় নি আমেরিকা কিন্তু উদ্ভুত পরিস্থিতিতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটলো।

নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! ঘটনার ঠিক তিন সপ্তাহ পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডিও আততায়ীর হাতে নিহত হন।

শুরু হলো আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৩:

জন এফ কেনেডি আততায়ীদের হাতে মারা যাওয়ার পর ক্ষমতায় বসলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন। জনসন ভিয়েতনামের ব্যাপারে কঠোর হতে চাইলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট নেতা হো চি মিন প্রভাব বাড়িয়েই চলছেন দিনকে দিন। মার্কিন সমর্থনপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনামেও কমিউনিস্ট গেরিলারা হামলা চালায় সরকারের উপর। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের আমল থেকেই দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারকে সবরকম সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন আমেরিকা। এসব খেলা আর ভালো লাগলো না জনসনের।

১৯৬৩ সাল নাগাদ মার্কিন উপদেষ্টা আর সৈন্যবাহিনী মিলিয়ে প্রায় ১৬ হাজার জনশক্তি দক্ষিণ ভিয়েতনামে মোতায়েন ছিলো।

১৯৬৪ সালে আরেক টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হলো ভিয়েতনামে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের দুটি জলযান 'ম্যাডক্স' ও 'টার্নার জয়' নামে দু'টি ডেস্ট্রয়ার উত্তর ভিয়েতনামে টুংকিং উপসাগরের কাছে আক্রমণের শিকার হয়।

১৯৬৪ সালের আগস্টের ৫ তারিখ প্রেসিডেন্ট জনসনের কাছে খবর পৌঁছানো হয় যে নৌবাহিনীর দুটি ডেস্ট্রয়ার বিধ্বস্ত করেছে উত্তর ভিয়েতনামের দৃষ্কৃতিকারীরা। তড়িঘড়ি করে প্রেসিডেন্ট জনসন মিটিং করলেন প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারার সাথে। মার্কিন কংগ্রেসে বিল উত্থাপন করে সদস্যদের মতামত নিয়ে এবার ভিয়েতনামে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য মনস্থির করলেন প্রেসিডেন্ট জনসন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদের উভয় কক্ষে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব পাশ হলো যে, ভিয়েতনামকে শায়েস্তা করতে যা যা করা দরকার; প্রেসিডেন্ট যেনো সর্বতোভাবে সেই উদ্যোগ নেয়।

ততদিনে মার্কিন নির্বাচন চলে আসলো। নির্বাচনী প্রচারণায় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জনসন ভোটারদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন, ভিয়েতনামকে নিয়ে পূর্বসূরী প্রেসিডেন্টদের মতো তিনি শুধু কথার ফুলঝুরি দেখাবেন না। চরম প্রস্তুতি নিয়ে বিধ্বস্ত করে দিবেন ভিয়েতনামকে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট শাসন খতম করবেন তিনি।

১৯৬৫ সালের শুরুতেই ভিয়েতনামে কুখ্যাত নাপাম বোমা নিক্ষেপ করা শুরু করে আমেরিকা। এ বছরের মধ্যেই ভিয়েতনামে ২ লক্ষ আমেরিকান সৈন্য প্রেরণ করা হয়। প্রেসিডেন্ট জনসন মার্কিনীদের আশ্বস্ত করেছিলেন, অচিরেই যুদ্ধের অবসান

হবে; কিন্তু যুদ্ধ তো আর শেষ হয় না। ভিয়েতনাম থেকে শুধু লাশের কফিন আসছে সৈনিকদের।

আমেরিকার সাধারণ জনগণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে। আসলে আমেরিকাকে ভিয়েতনামের মাটিতে তিনটি দুর্ধর্ষ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয়।

প্রথম শত্রুটা ছিলো দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাটিতে ওৎপেতে থাকা গেরিলা যোদ্ধা; যারা উত্তরের কমিউনিস্ট শাসক হো চি মিনের ভক্ত।

দ্বিতীয় শত্রুটা ছিলো উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট শক্তি। এই কমিউনিস্টরা জাপান ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বীরদর্পে লড়াই করেছে বিগত বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। গেরিলা যুদ্ধের সমস্ত কলাকৌশল ও ভিয়েতনামের প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে তারা অভ্যস্ত।

তৃতীয় শক্তিটা ছিলো চীনের লাল ফৌজ। চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং তার শিষ্য হো চি মিনের সাহায্যার্থে ১ লক্ষ ৭০ হাজার বাহিনী প্রেরণ করেন। চীনের সেনাবাহিনী উত্তর ভিয়েতনামে অবস্থান করেন।

বিজয় অর্জিত না হওয়ায় এক পর্যায়ে আমেরিকার সৈন্যসংখ্যা পাঁচ লাখে উন্নীত করা হয়। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের ১৬ তারিখ মাই লাই গ্রামের অধিবাসীদের উপর হামলা চালায় মার্কিনীরা। ৫০০ গ্রামবাসী নিহত হয় কয়েক ঘন্টায়। নিন্দার ঝড় উঠে পুরো বিশ্বে। ঘরে বাইরে তুমুল চাপের মুখে পড়ে মার্কিন সরকার। মার্কিন শহরগুলোতে প্রতিবাদ মিছিল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। জনপ্রিয়তা হারিয়ে প্রেসিডেন্ট জনসন ১৯৬৮ সালে আর নির্বাচনে দাঁড়ানোর সাহস পান নি।

নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন প্রেসিডেন্ট নিক্সন। ভিয়েতনাম থেকে সমস্ত সৈন্য ফিরিয়ে এনে সেই যুদ্ধ শেষ করাই ছিলো প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রধান কাজ।

প্যারিসের শান্তি চুক্তি ও আমেরিকার সৈন্য প্রত্যাহারঃ

১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে আমেরিকার সাথে উত্তর ভিয়েতনামের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অবশ্য চুক্তি হওয়ার আগে অনেক গোপন মিটিং হয়েছে এই দুই দেশের কর্মকর্তাদের মাঝে। ১৯৬৯ সালে নিক্সন ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকেই দু'দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। আমেরিকার ইচ্ছা ছিলো, তারা নিজের সৈন্য প্রত্যাহার করবে, পাশাপাশি দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে কমিউনিস্টরা সরে দাঁড়াবে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম যাতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকে, সে চেষ্টা আমেরিকা করেছে বারবার। কিন্তু ভিয়েতনাম অনড়। তারা আমেরিকাকে জানালো যে আমেরিকা যদি নিঃশর্ত আত্মসমর্পন না করে তাহলে এই যুদ্ধ শেষ হবে না। এ কথা শুনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন রেগে যান। ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে আবারও হামলা চালানোর হুশিয়ারি দেন। যদিও নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টারা

নিক্সনকে বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করাই হবে বিচক্ষণতার পরিচয়।

১৯৭৩ সালের ২৭ জানুয়ারি তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, আর মার্চ মাসের ২৯ তারিখের মধ্যে শেষ মার্কিন সৈন্যটি ভিয়েতনামের মাটি থেকে চলে যায়।

এভাবেই শেষ হলো আমেরিকার ইতিহাসের কলঙ্কজনক এক অধ্যায়। মোট ৫৮ হাজার মার্কিন সৈন্য নিহত হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের পতনঃ

আমেরিকাকে হটিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনাম দখল করার জন্য উঠেপড়ে লাগে উত্তর ভিয়েতনাম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন তখন নিজেই 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি' এর মুখোমুখি। মার্কিন মদদপুষ্ট নগুয়েন ভান থিউ ছিলেন পুরোপুরি দুর্নীতিপরায়ণ ও অপদার্থ একজন শাসক। ১৯৭৩ সালে নিক্সন যখন 'ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি'তে জেরবার, তখন মার্কিন কংগ্রেসে 'ওয়ার পাওয়ার্স এ্যাক্ট' পাশ হয়, যেখানে বিদেশে কোনো যুদ্ধ করতে হলে কংগ্রেসের মতামত নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

নিক্সনের পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জেরার্ড ফোর্ড। তিনি দক্ষিণ ভিয়েতনামের তাবেদার সরকারের জন্য কিছুই করতে পারেন নি। অব্যাহত কমিউনিস্ট হামলার মুখে ১৯৭৫ সালের এপ্রিলের ২১ তারিখ নগুয়েন ভান থিউ পদত্যাগ করেন এবং তাইওয়ান পালিয়ে যান। দুর্নীতিগ্রস্ত নগুয়েন ভান থিউ পরে আমেরিকায় বসবাস করা শুরু করেন। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ১৫ টন লাগেজ ও ১৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের স্বর্ণ নিয়ে দেশ ছাড়েন।

এমন একজন দুর্নীতি পরায়ণ শাসককে আমেরিকা মদদ দিয়েছিলো শুধুমাত্র কমিউনিজম ঠেকানোর জন্য। যদিও কাজের কাজ কিছুই হয় নি।

ভিয়েতনামে আমেরিকার পরাজয়ের মূল কারণ হচ্ছে, ভিয়েতনামী জনগণের ইস্পাত কঠিন মনোবল। আমেরিকার কাছে ভিয়েতনাম লড়াইটা ছিলো শুধুমাত্র কমিউনিজম ঠেকানো কিন্তু ভিয়েতনামের জনগণের কাছে সেই লড়াইটা ছিলো তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

১৯৭৬ সালের জুলাই মাসের ২ তারিখ দুই ভিয়েতনাম এক হয়। শেষ হয় প্রায় ৩৫ বছরের (১৯৪১-১৯৭৫) নিরন্তর স্বাধীনতা সংগ্রামের।

পর্ব-৯৮

কম্বোডিয়ার কথাঃ

বিংশ শতাব্দীর কম্বোডিয়ার কথা বললেই সবার আগে নাম চলে আসে কুখ্যাত শাসক পল পটের কথা। পল পট এমনই এক দানব ছিলেন যে, মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে প্রায় ২০ লক্ষ লোককে হত্যা করে।

পলপট ছিলো একজন কমিউনিস্ট শাসক ও চীনের মদদপুষ্ট। পলপটের কাহিনী জানার আগে কম্বোডিয়ার আগের কাহিনী জানা দরকার।

কম্বোডিয়া ছিলো ফ্রান্সের একটি উপনিবেশ। তবে ফ্রান্স কম্বোডিয়ার রাজতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো কম্বোডিয়াতেও জাপানীরা আসে। যদিও কম্বোডিয়ায় জাপানী হামলা এত ব্যাপক ছিলো না মালয়েশিয়া, বার্মা, সিঙ্গাপুরের মতো।

জাপানীদের প্ররোচনায় কম্বোডিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু অচিরেই জাপানের পরাজয় হয় এবং ফ্রান্স আবার ইন্দোচীনে ফিরে আসে।

১৯৫২ সালে প্রিন্স নরোদম সিহানুক কম্বোডিয়ার সর্বেসর্বা বনে যান। তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর আর কেউ ছিলো না। ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলনে লাওস, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া, ইন্দোচীনের এই তিনটি দেশকেই স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয়।

নরোদম সিহানুক প্রথমে মার্কিন মিত্র ছিলেন; কিন্তু পরে তিনি মত বদলে ফেলেন। তিনি দেখলেন, ভিয়েতনামে নগ্ন আগ্রাসন চালাচ্ছে মার্কিন বাহিনী। এটা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। সিহানুক দিব্যি চোখে দেখতে পেলেন ভিয়েতনামের কম্যুনিস্ট গেরিলারা আমেরিকাকে হটিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। তাই তিনি পুরোপুরি কমিউনিস্টদের সাহায্য করতে লাগলেন। কম্বোডিয়ার মাটি ব্যবহার করে ভিয়েতনাম আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলো।

১৯৬৫ সালে সিহানুক আমেরিকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং চীনের সাথে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার সাথেও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখলেন তিনি।

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে সিহানুক যখন রাশিয়া সফররত, তখন জেনারেল লন নল ক্ষমতায় আরোহন করেন। এ ঘটনাতেও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর হাত রয়েছে। লন নল ছিলেন মার্কিন মিত্র ও কমিউনিস্ট বিরোধী। কিংকত্যব্যবিমূঢ় হয়ে সিহানুক চীন সফরে গেলেন। চীন তাকে বললো যে এখানে

বসে একটা সরকার চালাতে। কিন্তু চীনের কাছে ক্ষমতাচ্যুত সিহানুক অপেক্ষা কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে লড়াইরত পল পটের গ্রহনযোগ্যতা বেড়ে গেলো।

১৯৭৫ সালে লন নলের খেলা শেষ। পল পটের নেতৃত্বাধীন গেরিলা বাহিনী ক্ষমতা নিয়ে নিলো। রাজধানী নমপেন ও অন্যান্য শহরের জনগণকে গ্রামে যাওয়ার নির্দেশ দিলো কমিউনিস্টরা। শুরু হলো এক মানবিক বিপর্যয় কিন্তু আসল বিপর্যয় তখনো বাকি।

ক্রুদ্ধ হয়ে জারিফ তখন বলতে শুরু করলো, কমিউনিস্টদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না, কম্বোডিয়ার ঘটনাবলীর দিকে তাকালেও বুঝবে। ক্ষমতা হাতে নিয়েই সাম্যবাদ, মানবতাবাদ এসব চটকদার স্লোগানে সয়লাব। জনগণের সমস্ত জমি কেড়ে নেওয়া হলো। খাদ্য নাই, টাকা নাই, শুধু জনগণকে বলা হলো রাষ্ট্রের জন্য কাজ করো। আর রাষ্ট্র চালাচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু জানোয়ার; যারা মুখে মুখে বলে সাম্যবাদ। কিন্তু না খেতে পেয়ে লাখ লাখ জনগণ মরতে শুরু করলো। বিন্দুমাত্র নাগরিক অধিকার ছিলো না। বিনা বিচারে লোকজনকে পাইকারী হারে মারতে লাগলো কমিউনিস্টরা।

প্রতিবেশী ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক হামলা চালাতে লাগলো পলপট সরকার। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে ভিয়েতনাম পলপট সরকারকে উৎখাতের জন্য হামলা চালালো। ক্ষমতাচ্যুত হলেন পলপট। কম্বোডিয়া রক্ষা পেলো এক নরঘাতকের হাত থেকে।

১৯৭৫ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়টুকুতে প্রায় ২০ লাখ কম্বোডিয়ান প্রাণ হারান। হায়রে সাধের সমাজতন্ত্র!



চিত্র ৩৬ : একনায়ক পলপটের নৃশংসতার খণ্ডচিত্র।

বসে একটা সরকার চালাতে। কিন্তু চীনের কাছে ক্ষমতাচ্যুত সিহানুক অপেক্ষা কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে লড়াইরত পল পটের গ্রহনযোগ্যতা বেড়ে গেলো।

১৯৭৫ সালে লন নলের খেলা শেষ। পল পটের নেতৃত্বাধীন গেরিলা বাহিনী ক্ষমতা নিয়ে নিলো। রাজধানী নমপেন ও অন্যান্য শহরের জনগণকে গ্রামে যাওয়ার নির্দেশ দিলো কমিউনিস্টরা। শুরু হলো এক মানবিক বিপর্যয় কিন্তু আসল বিপর্যয় তখনো বাকি।

ক্রুদ্ধ হয়ে জারিফ তখন বলতে শুরু করলো, কমিউনিস্টদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না, কম্বোডিয়ার ঘটনাবলীর দিকে তাকালেও বুঝবে। ক্ষমতা হাতে নিয়েই সাম্যবাদ, মানবতাবাদ এসব চটকদার স্লোগানে সয়লাব। জনগণের সমস্ত জমি কেড়ে নেওয়া হলো। খাদ্য নাই, টাকা নাই, শুধু জনগণকে বলা হলো রাষ্ট্রের জন্য কাজ করো। আর রাষ্ট্র চালাচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু জানোয়ার; যারা মুখে মুখে বলে সাম্যবাদ। কিন্তু না খেতে পেয়ে লাখ লাখ জনগণ মরতে শুরু করলো। বিন্দুমাত্র নাগরিক অধিকার ছিলো না। বিনা বিচারে লোকজনকে পাইকারী হারে মারতে লাগলো কমিউনিস্টরা।

প্রতিবেশী ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক হামলা চালাতে লাগলো পলপট সরকার। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে ভিয়েতনাম পলপট সরকারকে উৎখাতের জন্য হামলা চালালো। ক্ষমতাচ্যুত হলেন পলপট। কম্বোডিয়া রক্ষা পেলো এক নরঘাতকের হাত থেকে।

১৯৭৫ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়টুকুতে প্রায় ২০ লাখ কম্বোডিয়ান প্রাণ হারান। হায়রে সাধের সমাজতন্ত্র!



চিত্র ৩৬ : একনায়ক পলপটের নৃশংসতার খণ্ডচিত্র।

বসে একটা সরকার চালাতে। কিন্তু চীনের কাছে ক্ষমতাচ্যুত সিহানুক অপেক্ষা কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে লড়াইরত পল পটের গ্রহনযোগ্যতা বেড়ে গেলো।

১৯৭৫ সালে লন নলের খেলা শেষ। পল পটের নেতৃত্বাধীন গেরিলা বাহিনী ক্ষমতা নিয়ে নিলো। রাজধানী নমপেন ও অন্যান্য শহরের জনগণকে গ্রামে যাওয়ার নির্দেশ দিলো কমিউনিস্টরা। শুরু হলো এক মানবিক বিপর্যয় কিন্তু আসল বিপর্যয় তখনো বাকি।

ক্রুদ্ধ হয়ে জারিফ তখন বলতে শুরু করলো, কমিউনিস্টদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না, কম্বোডিয়ার ঘটনাবলীর দিকে তাকালেও বুঝবে। ক্ষমতা হাতে নিয়েই সাম্যবাদ, মানবতাবাদ এসব চটকদার স্লোগানে সয়লাব। জনগণের সমস্ত জমি কেড়ে নেওয়া হলো। খাদ্য নাই, টাকা নাই, শুধু জনগণকে বলা হলো রাষ্ট্রের জন্য কাজ করো। আর রাষ্ট্র চালাচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু জানোয়ার; যারা মুখে মুখে বলে সাম্যবাদ। কিন্তু না খেতে পেয়ে লাখ লাখ জনগণ মরতে শুরু করলো। বিন্দুমাত্র নাগরিক অধিকার ছিলো না। বিনা বিচারে লোকজনকে পাইকারী হারে মারতে লাগলো কমিউনিস্টরা।

প্রতিবেশী ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক হামলা চালাতে লাগলো পলপট সরকার। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে ভিয়েতনাম পলপট সরকারকে উৎখাতের জন্য হামলা চালালো। ক্ষমতাচ্যুত হলেন পলপট। কম্বোডিয়া রক্ষা পেলো এক নরঘাতকের হাত থেকে।

১৯৭৫ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়টুকুতে প্রায় ২০ লাখ কম্বোডিয়ান প্রাণ হারান। হায়রে সাধের সমাজতন্ত্র!



চিত্র ৩৬ : একনায়ক পলপটের নৃশংসতার খণ্ডচিত্র।

লাওসের কাহিনীঃ

ভিয়েতনাম কম্বোডিয়ার মতো লাওসও ছিলো ফরাসি উপনিবেশ। ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলনে স্বাধীন সার্বভৌম লাওসের জন্ম হয়।

ভিয়েতনামে যুদ্ধ শুরু হলে ছোট্ট দেশ লাওস নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। একপক্ষ ভিয়েতনামের কমিউনিস্টদের পক্ষ নেয়, আরেক পক্ষ নিরপেক্ষ থাকার ঘোষণা দেয়, আরেক পক্ষ হয়ে উঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও থাইল্যান্ডের আজ্ঞাবহ।

লাওসে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিলো। ১৯৬২ সালের জুনে সুভানা ফুমান এর নেতৃত্বে রাজতন্ত্রী, মধ্যপন্থী ও সশস্ত্র প্যাথেট লাও এর সমন্বয়ে একটি সরকার গঠিত হয়। পরের মাসে অনুষ্ঠিত ১৪ জাতি সম্মেলনে লাওসের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৬৪ সালে মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারি সৈন্যরা একযোগে সশস্ত্র প্যাথেট লাও বাহিনীর উপর আক্রমণ চালালে প্যাথেট লাও কোয়ালিশন থেকে বেরিয়ে আসে।

ভিয়েতনামি গেরিলাদের ধ্বংস করার জন্য আমেরিকান বাহিনী লাওসের ভূমি ব্যবহার করে। ১৯৭৫ সালে কম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিনপন্থী সরকারের পতন ঘটলে লাওসেও রাজতন্ত্র বিলোপের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালে লাওসে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে এবং রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটায়।

ফিলিপাইন-

ফিলিপাইন নিয়ে আলোচনা করার আগে একটা তথ্য জানিয়ে রাখি। এক সময় ফিলিপাইন ছিলো এশিয়ার একমাত্র খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশ। পরে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দেশ হিসেবে ইন্দোনেশিয়া থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পূর্ব তিমুর সে তালিকায় যোগ হয়।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "এশিয়াতে একটা দেশ কিভাবে খৃস্টান হয়ে পড়লো? নিশ্চয়ই ব্যতিক্রমী কোনো ইতিহাস আছে?

জারিফ বললো, "অবশ্যই ব্যতিক্রমী ইতিহাস আছে। তবে তার আগে ফিলিপাইনের নামকরণটা জেনে নাও। নামকরণের সাথে ইউরোপীয় ডাকাতদের কর্মকাণ্ড জড়িত।

১৫২১ সালে প্রথমবারের মতো পর্তুগীজ বংশোদ্ভুত স্পেনীশ অভিযাত্রী ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান ফিলিপাইনে আগমন করে। তিনি দ্বীপটিকে স্পেনের বলে দাবী করেন। ১৫৬৫ সাল থেকে স্পেনের ঔপনিবেশিকরণ শুরু হয়। স্পেনের রাজা ফিলিপের নামানুসারে জায়গাটার নাম রাখা হয় ফিলিপাইন।

সেসময় স্পেন ছিলো পররাজ্যদখলকারী কুখ্যাত ডাকাত। বিশাল ল্যাটিন আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকা ছিলো স্পেনের দখলে। মেক্সিকো থেকে শাসন ফিলিপাইন শাসন করতো স্পেনীশরা।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের আমলে ১৮১০ সালে মেক্সিকো স্পেনের অধীনতা থেকে বিদ্রোহ করে। মেক্সিকো স্বাধীন হয়ে গেলে ১৮২১ সাল থেকে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকে সরাসরি ফিলিপাইন শাসিত হতো।

১৮৯৮ সালে স্পেন-আমেরিকা গৃহযুদ্ধে স্পেনের পরাজয়ের ফলে ফিলিপাইন হয়ে উঠে আমেরিকার কলোনী।

আমেরিকান দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনের লোকজন বিভিন্ন সময় আন্দোলন গড়ে তুলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয়ে যায়। দুর্ধর্ষ জাপানীরা ফিলিপাইনের দখল নিয়ে নেয়। জাপানি আগ্রাসনের সময় প্রায় ১ লক্ষ লোক মারা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালের ৪ জুলাই আমেরিকা যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়।

বিংশ শতাব্দীর ল্যাটিন আমেরিকা

পর্ব-৯৯

যুক্তরাষ্ট্র বাদে পুরো আমেরিকা মহাদেশের কোনো দেশই সেই অর্থে বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক নয়। ১৯০১ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক সময়টুকুতে শুধু ল্যাটিন আমেরিকা নয়, যুক্তরাষ্ট্র বাদে আমেরিকা মহাদেশের যে কোনো দেশের ইতিহাস একদম নিস্তরঙ্গ ও বাকি পৃথিবীর সাথে কিছুটা সম্পর্কহীনও বটে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে দৃশ্যপট বদলাতে থাকে। বিশ্ব রাজনীতির মোড়ল আমেরিকার পড়শি দেশ হওয়া সত্ত্বেও কিছু দেশ প্রকাশ্যেই আমেরিকার বিরোধিতা করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের (রাশিয়া) সাথে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হলে, এই ভূ-খণ্ডেও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চাশের দশকের পর থেকে আমেরিকা সমাজতন্ত্রকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য বেশ কিছু ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে মেতে উঠে ল্যাটিন ও মধ্য আমেরিকা। গুয়াতেমালায় সামরিক হস্তক্ষেপ, কিউবায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, চিলিতে নির্বাচিত সরকারের প্রধান সালভেদর আলেন্দেকে সরিয়ে কুখ্যাত একনায়ক পিনাশেটকে ক্ষমতায় বসানো, গণতন্ত্রের প্রবক্তা আমেরিকাকর্তৃক বিভিন্ন দেশে সামরিক সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা দান; এসব কিছুই ঘটেছে স্নায়ুযুদ্ধের সময়টাতে। তখনকার ইতিহাস আর নিস্তরঙ্গ থাকে নি। চলুন এবার আমরা সেইসব ইতিহাসের কথা শুনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ল্যাটিন আমেরিকার প্রেক্ষাপটঃ

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে প্রথমদিকে আমেরিকা নিরপেক্ষই ছিলো। ১৯৪১ সালে পার্ল হারবারে জাপান বোমা নিক্ষেপ করলে আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আমেরিকার কাছে পড়শি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো অপেক্ষা ইউরোপের গুরুত্ব ছিলো অত্যন্ত বেশি।

একটা কথা উল্লেখ করতে হবে, ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হলে বিপ্লবের ঢেউ ল্যাটিন আমেরিকাতেও ছড়িয়ে পড়ে। ব্রাজিল, চিলি, মেক্সিকো ও গুয়াতেমালায় কমিউনিস্ট সংগঠন বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠে। কিন্তু এগুলো আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।

১৯৪১ সালের পর আমেরিকা যুদ্ধে নামলে ল্যাটিন আমেরিকার নয়টি দেশ জাপান ও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যদিও কোনো দেশই যুদ্ধে নামেনি বা সৈন্য পাঠায়নি।

আর্জেন্টিনা হয়ে উঠেছিলো আমেরিকান বিরোধী। ১৯৪৫ সালের মে মাসে আর্জেন্টিনা নামকাওয়াস্তে আমেরিকার পক্ষ নিয়ে জাপান ও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করে। পরের মাসে ইউরোপে যখন যুদ্ধ শেষ তখন চিলিও আমেরিকার পক্ষে বিবৃতি দেয়।

কিন্তু ওই যে বললাম, আর্জেন্টিনা আমেরিকান বিরোধী দেশ। যুদ্ধের প্রথমদিকে আর্জেন্টিনা যখন আমেরিকার পক্ষে বিবৃতি দেয় নাই, তখন আমেরিকা আর্জেন্টিনার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৯৪৪ সালে এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ঠেলায় পড়ে আর্জেন্টিনা আমেরিকার পাশে দাঁড়ালেও মানসিকভাবে আমেরিকাকে পছন্দ করতো না।

১৯৪৬ সালে জুয়ান প্যারন যখন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তখন তিনি নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধাপরাধীদের জন্য আর্জেন্টিনাকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করেন।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, "এজন্যই বোধহয় ইহুদীরা আর্জেন্টিনা থেকে অনেক নাৎসী নেতাকে পরবর্তীতে গ্রেফতার করে। মূল কাহিনী তাহলে এটাই?"

জারিফ উত্তর দিলো, ঠিক তাই। জুয়ান প্যারন আমেরিকা বিরোধী হওয়ার কারণে নাৎসী যুদ্ধাপরাধীরা আর্জেন্টিনায় পাড়ি জমায়।

গুয়াতেমালায় মার্কিন হস্তক্ষেপঃ

এবার আমরা ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন হস্তক্ষেপের ঘৃণ্য কাহিনীগুলো জানবো। গুয়াতেমালা মধ্য আমেরিকার একটি দেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'ট্রুমান ডকট্রিনে' এর নীতি ছিলো, বিশ্বের যেখানেই আমেরিকান বিরোধী কিংবা কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতা দখল করবে, সেখানেই হস্তক্ষেপ করে সে সরকারকে উৎখাত করতে হবে। সিআইএ প্রতিষ্ঠার মূল কাহিনীই ছিলো সেটা।

ছোট্ট দেশ গুয়াতেমালা অত্যন্ত বৈষম্যপরায়ণ একটি দেশ ছিলো। দেশের ৭০ শতাংশ জমির মালিক ছিলো আড়াই শতাংশ ধনাঢ্য লোকের মালিকানায়। গুয়াতেমালায় প্রচুর কলা উৎপাদিত হতো। এছাড়া প্রচুর ফলও জন্মাতো। আমেরিকার বেশ কিছু কোম্পানি গুয়াতেমালায় সস্তায় জমি কিনে আমেরিকায় সুলভ মূল্যে ফল রপ্তানি করতো। আমেরিকান জনগণ সস্তায় ফল পেতো, আর কোম্পানিগুলো প্রচুর অর্থ কামাতে লাগলো।

কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টে গেলো ১৯৫২ সালে যখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হলেন জ্যাকব আরবেঞ্জ। আরবেঞ্জ ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার লোক। তিনি ভূমি সংস্কার কাজে হাত দেন। ধনী ভূস্বামীদের কাছ থেকে সম্পত্তি নিয়ে প্রায় ১ লাখ গরীব ভূমিহীনদের হাতে জমি তুলে দেন তিনি। মার্কিন কোম্পানীর মালিকানাধীন অনেকের জমিই বাজেয়াপ্ত হলো।

ক্ষেপে উঠলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার। পুঁচকে গুয়াতেমালার এত বড় সাহস! আমেরিকার নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে আমেরিকান কোম্পানীর জমি বাজেয়াপ্ত করে?

১৯৫৪ সালে আইসেনহাওয়ার সিআইকে সবুজ সংকেত দিলেন গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট আরবেঞ্জকে ক্ষমতাচ্যুত করতে। প্রেসিডেন্টের বিরোধী সেনাবাহিনীর একটা অংশকে টাকাপয়সা আর বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে হাত করলো সিআইএ। একদল বিদ্রোহীকে সিআইএ নিজ হাতে প্রশিক্ষণ দিলো।

এরকম টালমাটাল পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট আরবেঞ্জ সোভিয়েত রাশিয়ার বলয়ের দেশ চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কিনার চেষ্টা চালালেন। ক্ষিপ্ত আমেরিকা গুয়াতেমালার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন আর পেশাদার বিদ্রোহীদের গুয়াতেমালা ঢোকার নির্দেশ দিলেন।

বহুত বাড় বেড়েছে গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্টের! আর সুযোগ দেওয়া যায় না। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে আমেরিকার প্রশিক্ষিত বিদ্রোহীরা গুয়াতেমালার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। প্রথম কয়েকদিন সংঘর্ষের পর গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট দেশের স্বার্থের কথা ভেবে পদত্যাগ করলেন। প্রেসিডেন্ট আরবেঞ্জ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন কিউবায়। গুয়াতেমালায় বসলো মার্কিন তাবেদাঁররা। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ফস্টার ডুলেস গুয়াতেমালার পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "The biggest success in the last five years against Communism".

কিন্তু মার্কিন হস্তক্ষেপ গুয়াতেমালায় কোনো শান্তি আনতে পারেনি। ১৯৬০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে জর্জরিত হয় গুয়াতেমালা। শ্বশানভূমিতে পরিণত হয় গুয়াতেমালা। সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো ভূমিকা ছিলো না গুয়াতেমালার এসব কর্মকাণ্ডে।

পর্ব-১০০

দেশে দেশে মার্কিন পুতুল সরকারের প্রতিষ্ঠাঃ

গুয়াতেমালার সরকারকে হটিয়ে আমেরিকা শুরু করলো ল্যাটিন আমেরিকায় শাসক পরিবর্তনের খেলা। ল্যাটিন আমেরিকাকে ইচ্ছা করলে আমেরিকা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা এনে দিতে পারতো। আমেরিকা মার্শাল প্ল্যানের মাধ্যমে ইউরোপে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দান করেছে, কিন্তু সে তুলনায় প্রতিবেশী ল্যাটিন আমেরিকার জন্য কিছুই করে নি। বরং আমেরিকা এখানে গণতন্ত্র বিরোধী সামরিক সরকারকে সহায়তা দিয়েছে।

শুনতে অবাক হলেও এটাই সত্য, গণতন্ত্রের বার্তাবাহক আমেরিকার সহায়তায় ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে একের পর এক স্বৈরশাসক ও নিপীড়নকারী সেনাশাসকের জন্ম হয়েছে।

ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে বড় দেশ ব্রাজিলে আমেরিকার ছত্রচ্ছায়ায় সেনা অভ্যুত্থান জারি হলো ১৯৬৪ সালে। টানা বিশ বছর সেনাশাসনের অধীনে থেকে ব্রাজিল পিছিয়ে যেতে থাকে। অথচ বিশাল আয়তন, প্রচুর লোকসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের আধিক্য ইত্যাদি নানা কারনে ব্রাজিল হতে পারতো অত্যন্ত উন্নত দেশ। পারলোনা শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভুল নীতির কারণে।

আমেরিকার সহায়তা নিয়ে আরও জঘন্য শাসন কায়েম হলো বলিভিয়ায়। বলিভিয়ার সামরিক শাসক জেনারেল ব্যারেনটোস ১৯৬৪ সালে ক্ষমতায় বসেন। দু'বছর পরে অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

চমকদার শাসক ছিলেন ব্যারেনটোস। লাখ লাখ ভুখা-নাঙ্গা মানুষের দেশে তিনি সারাক্ষণ হেলিকপ্টার নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। ফুটবল পাগল জনগণকে তিনি ফুটবল বিলি করতেন।

বলিভিয়ার একটি ঘটনা সারা বিশ্বের দৃষ্টি কাড়ে একটি অনন্যসাধারণ ঘটনার জন্য। কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো সরকারের মন্ত্রী ও আধ্যাত্মিক কমিউনিস্ট নেতা চে গুয়েভারা বলিভিয়াতে সামরিক সরকারকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন।

কিন্তু দু:খের বিষয়! বলিভিয়ার জঙ্গলে চে গুয়েভারা বলিভিয়ান সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন ১৯৬৭ সালে। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিষ্ঠুরভাবে চে গুয়েভারাকে হত্যা করা হয়। দু'বছর পরে ১৯৬৯ সালে বলিভিয়ার সামরিক শাসক ব্যারেনটোস হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা যান।

চে গুয়েভারার প্রসঙ্গ যখন এসেই পড়েছে তখন তার সম্পর্কে কিছু কথা বলতেই হয়।

রোমান্টিক বিপ্লবী চে গুয়েভারা:

আমার প্রিয়তম লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চে গুয়েভারাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেটা দিয়েই আজকের আলোচনা শুরু করি।

চে গুয়েভারার প্রতি
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যবদ্ধ অভিমান-

চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়
আমার ঠোঁট শুকনো হয়ে আসে, বুকের ভেতরটা ফাঁকা
আত্মায় অভিশ্রান্ত বৃষ্টিপতনের শব্দ
শৈশব থেকে বিষণ্ন দীর্ঘশ্বাস
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরধী করে দেয়-
বোলিভিয়ার জঙ্গলে নীল প্যান্টালুন পরা
তোমার ছিন্নভিন্ন শরীর
তোমার খোলা বুকের মধ্যখান দিয়ে
নেমে গেছে
শুকনো রক্তের রেখা
চোখ দু'টি চেয়ে আছে
সেই দৃষ্টি এক গোলার্ধ থেকে ছুটে আসে অন্য গোলার্ধে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়।

শৈশব থেকে মধ্য যৌবন পর্যন্ত দীর্ঘ দৃষ্টিপাত-
আমারও কথা ছিল হাতিয়ার নিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবার
আমারও কথা ছিল জঙ্গলে কাদায় পাথরের গুহায়
লুকিয়ে থেকে
সংগ্রামের চরম মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হওয়ার
আমারও কথা ছিল রাইফেলের কুঁদো বুকে চেপে প্রবল হুঙ্কারে
ছুটে যাওয়ার
আমারও কথা ছিল ছিন্নভিন্ন লাশ ও গরম রক্তের ফোয়ারার মধ্যে
বিজয়-সঙ্গীত শোনাবার-
কিন্তু আমার অনবরত দেরি হয়ে যাচ্ছে!

এতকাল আমি এক, আমি অপমান সয়ে মুখ নিচু করেছি
কিন্তু আমি হেরে যাই নি, আমি মেনে নিই নি
আমি ট্রেনের জানলার পাশে, নদীর নির্জন রাস্তায়, ফাঁকা
মাঠের আলপথে, শ্মশানতলায়
আকাশের কাছে, বৃষ্টির কাছে বৃক্ষের কাছে, হঠাৎ-ওঠা
ঘূর্ণি ধুলোর ঝড়ের কাছে

আমার শপথ শুনিয়েছি, আমি প্রস্তুত হচ্ছি, আমি
সব কিছুর নিজস্ব প্রতিশোধ নেবো
আমি আমার ফিরে আসবো
আমার হাতিয়ারহীন হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে, শক্ত হয়েছে চোয়াল,
মনে মনে বারবার বলেছি, ফিরে আসবো!
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়-
আমি এখনও প্রস্তুত হতে পারি নি, আমার অনবরত
দেরি হয়ে যাচ্ছে
আমি এখনও সুড়ঙ্গের মধ্যে আধো-আলো ছায়ার দিকে রয়ে গেছি,
আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়!

মামুন প্রশ্ন করলো, "তোমাকে আমি কমিউনিস্ট বিরোধী বলে জানতাম, আজ হঠাৎ চে গুয়েভারার প্রতি এত দরদ উথলে উঠলো কেন তোমার?"

জারিফ উত্তর দিলো, আমি কি বলেছি চে গুয়েভারার প্রতি আমার দরদ উথলে উঠেছে? আমি বরং চে গুয়েভারাকে নিয়ে তোমার রোমান্টিসিজমের অবসান ঘটাবো সত্য ঘটনার বিবরণ দিয়ে।

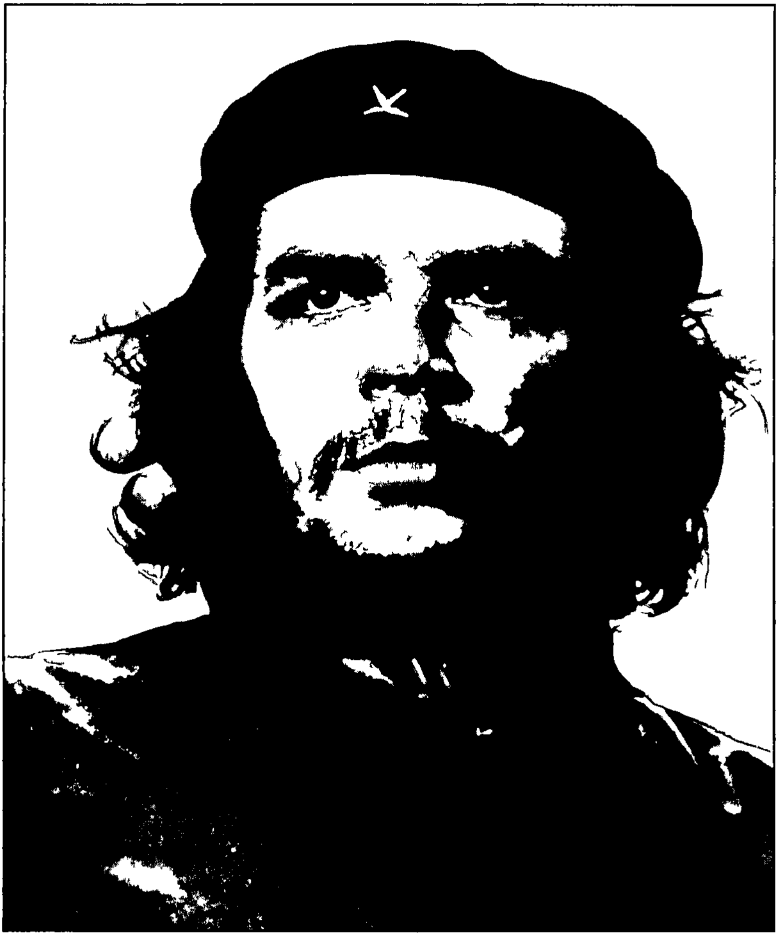
চে গুয়েভারাকে নিয়ে এক প্রস্থ আলাপঃ-

আমাদের প্রিয় ফুটবলতারকা ম্যারাডোনা-মেসির দেশের লোক হলেন চে গুয়েভারা।

১৯২৮ সালে আর্জেন্টিনার রোজারিওতে তিনি জন্মগ্রহন করেছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যার উপরে পড়াশোনা করে তিনি পুরো দক্ষিণ আমেরিকা পরিভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫১-৫২ সালে তিনি এক বন্ধুকে নিয়ে নয়টি মাস মোটরসাইকেলে করে ঘুরে বেড়ান মহাদেশব্যাপী।

আদিবাসী জনতা, গ্রামের মেহনতী মানুষের দুঃখ কষ্ট তাকে ব্যথিত করে তোলে। রাশিয়ান বিপ্লবকে গভীরভাবে অনুসরণ করেছিলেন চে গুয়েভারা। হয়তো স্ট্যালিন যে এত বড় দানব হয়ে উঠেছিলেন রাশিয়াতে, এই খবর পাননি; কিংবা এমনও হতে পারে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী হতে হলে খুনী ও দানব হতে হয়-এই শিক্ষা চে গুয়েভারা স্ট্যালিন থেকেই শিখেছিলেন।

১৯৫৫ সালে মেক্সিকোতে চে গুয়েভারার সাথে দেখা হয় কিউবান বিপ্লবী ফিডেল ক্যাস্ট্রো ও তার ছোটভাই রাউল ক্যাস্ট্রোর।



চিত্র-৩৭ : আর্জেন্টিনায় জন্ম নেওয়া বিপ্লবী চে গুয়েভারা।

তারপর থেকে ক্যাস্ট্রো ভাইদের সাথে আজীবনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠে চে গুয়েভারার। কিউবার ক্ষমতাসীন বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে ক্যাস্ট্রো ভাইদের বিরুদ্ধে গেরিলা আন্দোলন গড়ে তুলেন।

১৯৫৯ সালে বাতিস্তা সরকারের পতন হলে চে গুয়েভারাকে একটি গুপ্ত বন্দীশালার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ক্যাস্ট্রো বিরোধী লোকজনকে ঠাণ্ডা মাথায় বেছে বেছে হত্যা করেন তিনি।



চিত্র-৩৭ : আর্জেন্টিনায় জন্ম নেওয়া বিপ্লবী চে গুয়েভারা।

তারপর থেকে ক্যাস্ট্রো ভাইদের সাথে আজীবনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠে চে গুয়েভারার। কিউবার ক্ষমতাসীন বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে ক্যাস্ট্রো ভাইদের বিরুদ্ধে গেরিলা আন্দোলন গড়ে তুলেন।

১৯৫৯ সালে বাতিস্তা সরকারের পতন হলে চে গুয়েভারাকে একটি গুপ্ত বন্দীশালার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ক্যাস্ট্রো বিরোধী লোকজনকে ঠাণ্ডা মাথায় বেছে বেছে হত্যা করেন তিনি।

পরবর্তীতে তিনি কিউবান ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি কিউবার হয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন। পরবর্তীতে কিউবার শিল্প মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব পান তিনি।

কিন্তু ভবঘুরে চে গুয়েভারার ইচ্ছা হলো তিনি পুরো ল্যাটিন আমেরিকাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছড়িয়ে দেবেন। তার প্রথম কর্মক্ষেত্র ছিলো বলিভিয়া। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ চে গুয়েভারাকে তাদের এক নম্বর শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে।

অল্প কয়েকজন গেরিলা নিয়ে তিনি বলিভিয়াতে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবর বলিভিয়ার সামরিক বাহিনী তাকে বলিভিয়ার জঙ্গলে আটক করে ও পরে গুলি করে হত্যা করে।

ষাট-সত্তর ও আশির দশকে সমাজতন্ত্রকে নিয়ে পুরো তৃতীয় বিশ্বে ব্যাপক রোমান্টিকতা ছড়িয়ে পড়ে। এসব রোমান্টিক বিপ্লবীদের চোখে চে গুয়েভারা হয়ে উঠেছিলেন এক মহানায়ক।

আমাদের উপমহাদেশেও এসব রোমান্টিকতার ছোঁয়া লেগেছিলো। প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গ ছিলো বামপন্থী আন্দোলনের আঁতুরঘর। ১৯৭৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় ছিলো কমিউনিস্টরা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমাজতন্ত্রের একজন মৌন সমর্থক হওয়ায় তিনি চে গুয়েভারার মৃত্যুতে এরকম কবিতা লিখেছিলেন। তবে সুনীল বাবু কট্টর ছিলেন না।

পর্ব-১০১

সিআইএ কর্তৃক চিলির প্রেসিডেন্ট সালভেদর আলেন্দেকে ক্ষমতাচ্যুত করণঃ

আন্দিজ পর্বতমালার পাদদেশে অবিস্থত বিশ্বের সবচেয়ে সরু দেশ চিলিতে আমেরিকা যা করেছে তা নিন্দারও অযোগ্য। ২০০১ সালে টুইন টাওয়ার হামলার ঘটনা নাইন-ইলেভেন হিসেবে পরিচিত হওয়ার আগে চিলির ঘটনা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'নাইন-ইলেভেন' নামে পরিচিত ছিলো।

ঘটনা হলো, ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত এক অবাধ নির্বাচনে চিলিতে ক্ষমতায় আসেন সালভেদর আলেন্দে। আলেন্দে ছিলেন মনেপ্রাণে সমাজতান্ত্রিক। দেশে ভূমি সংস্কারের কাজে হাত দেন। শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষকদের মাঝে তিনি দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। কিন্তু চিলির অন্যান্য অংশের জনগণ ছিলেন রক্ষণশীল। আলেন্দের এসব সংস্কার কাজ তারা মানতে চায়নি। আলেন্দে জোর করে এসব সংস্কার কাজ চালু করেন। জনগণের মতামত জানানোর ক্ষমতাকে কেড়ে নিয়ে একনায়কসুলভ আচরণ করা শুরু করেন আলেন্দে।

মার্কিন রাজনীতিতে তখন বহুল আলোচিত নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটি। প্রেসিডেন্ট নিক্সন আর তার পররাষ্ট্রসচিব হেনরী কিসিঞ্জার দাবার ঘুটি চালছেন বিশ্ব জুড়ে। আলেন্দের উপস্থিতি মার্কিন প্রশাসনের কাছে রীতিমতো আতংকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

চিলি কি তাহলে হয়ে যাবে দ্বিতীয় কিউবা?

কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো বিপ্লব করে ক্ষমতায় এসেছেন, কিন্তু সালভেদর আলেন্দে যেভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে-তা অত্যন্ত আশংকাজনক।

মার্কিন প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিলো, আলেন্দেকে আর ক্ষমতায় রাখা যাবে না। আলেন্দের পরিবর্তে যদি শয়তানও ক্ষমতায় বসে, তবে তাকেও মেনে নেয়া যাবে। তাই আলেন্দেকে উৎখাতের জন্য আদা-জল খেয়ে লাগলো মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ।

১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

কয়েকদিন আগেই সালভেদর আলেন্দে সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেছেন তারই আস্থাভাজন অগাস্টো পিনাশেটকে। কে জানতো আস্থাভাজন পিনাশেট আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইয়ের সাথে হাত মিলিয়ে তারই নিয়োগকর্তাকে বিনাশের ষড়যন্ত্রে শামিল হবে?

একদল অস্ত্রধারী সৈন্য প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে ঢুকে পড়ে। পরিস্থিতি বুঝে আলেন্দে আত্মহত্যা করে বসেন।

তারপর শুরু হয় কুখ্যাত পিনাশেটের স্বৈরশাসন। প্রায় ১৭ বছর পিনাশেট চিলিকে শাসন করে নরকের রাজধানীতে পরিণত করেন।

মামুন জিজ্ঞেস করে, "ভাবা যায়? আমেরিকা এসব স্বৈরশাসকদেরকে লেলিয়ে দিয়েছিলো গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে?"

জারিফ উত্তর দিয়েছিলো, আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে চিলির ঘটনা এক কালো অধ্যায়। আজও আমেরিকার গুণীজনেরা এসব কাজের জন্য নিজের দেশের শাসকদেরকেই ধিক্কার দেন।

উরুগুয়েতে সামরিক সরকার ক্ষমতা নেয় ১৯৭৩ সালে। আর্জেন্টিনার ইসাবেলা পেরনের সরকারকে হটিয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতা নেয় ১৯৭৬ সালে। সব ঘটনাতেই আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ ছিলো।

আশির দশকে দেখা গেলো, ল্যাটিন আমেরিকার ১৫টি দেশে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট নিপীড়নকারী সামরিক সরকার ক্ষমতায় ছিলো। শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রকে হটানোর নামে আমেরিকা এসব কুখ্যাত শাসকদেরকে সমর্থন করেছে।

বিনিময়ে দেখা গেলো, এসব দেশ বারংবার পিছিয়ে পড়ছে। আর প্রত্যেকটি দেশে আজও তীব্র মার্কিন বিদ্বেষ বিদ্যমান।

নারীর চোখে বিশ্ব

পর্ব-১০২

প্রথম কথা নারীর ভোটাধিকার নিয়েঃ

জারিফ আলোচনা শুরু করলো আজ অন্য একটা প্রসঙ্গ নিয়ে। সে মামুনকে বললো, দেখো! বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি বহু রাজবংশ ধ্বংস হয়েছে, দোর্দন্ড প্রতাপশালী ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের পতন হয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে অনেক স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছে। কত না যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে! কোটি কোটি আদমসন্তান বিনা কারণে মারা গেছে শুধুমাত্র ক্ষমতাশালীদের উদ্ধারের জন্য।

কিন্তু তুমি কি জানো, বিংশ শতাব্দীতে আরও বেশি যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে নারীদের জীবনে। ১৯০১ সালের নারীর সাথে, ২০০১ সালের নারীর আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে; তা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ হোক কিংবা সবচেয়ে দরিদ্রপ্রবণ দেশ হোক।

মামুন বললো, "নারীর উন্নতির কোন দিকটি নিয়ে তুমি কথা বলতে চাও; যেটার উপর ভর করে আমরা বলতে পারি যে নারীর উন্নতি হয়েছে।

শুধু একটা দিক নিয়ে কথা আমরা বলতে চাই না। সবদিক দিয়েই নারীর আমুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেমন-ভোটাধিকার, কর্মসংস্থান, নারীর অধিকার, নারীর স্বাধীন চিন্তা করবার ক্ষমতার প্রসার-এসব কিছুতেই।

প্রথমেই আমরা নারীর ভোটাধিকার নিয়ে কথা বলবো। দেখো মামুন, নারীর ভোটাধিকার নিয়ে প্রথমে দুটো ঘটনার কথা বলবো। ষাটের দশকে আমি তোমাকে বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী বাড়ির কথা বলবো। এই বাড়িতে সব পুরুষেরাই শিক্ষিত, নারীদের মধ্যে অল্প কয়েকজন শিক্ষিত। অল্প কয়েকজন শিক্ষিত নারীর মধ্যে কেউ কেউ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়া ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দিতে চাইলো।

এ খবর শুনে রেগে আগুন বাড়ির শিক্ষিত পুরুষেরা! বলে কি? আমাদের বাড়ির মেয়েরা বাইরে যাবে ভোট দিতে? কত বড় অধঃপতন! নারীরা কি বুঝে দেশের প্রেসিডেন্ট কে হবে আর না হবে? একটু শিক্ষিত হবার এত দেমাগ?

বলে রাখি, আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদ আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ। আর সেই নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ১৯৬৫ সালে।

তুমি যদি মনে করো নারীদের ভোটদানের ক্ষমতাকে অযোগ্য মনে করেছিলো কেবল বাংলাদেশের এক রক্ষনশীল বাড়ির কর্তা-তাহলে ভুল। স্বয়ং বৃটিশ রাজনীতিবিদ উইনস্টন চার্চিল নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে ছিলেন না। ১৯১০ সালের ১৮ নভেম্বর বৃটিশ নারীরা ভোটাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পথে নেমেছিলেন। দিনটি ব্ল্যাক ফ্রাইডে নামেও পরিচিত। কেউ কেউ বলেন, সে মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং চার্চিল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ব্রিটেনে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় ১৯২৮ সালে।

মামুন বললো, আমি আরেকটা তথ্য জানিয়ে রাখি, পৃথিবীতে নারীরা প্রথম ভোটাধিকার পায় ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ডে।

১৮৯৩ সালের ২৮ নভেম্বর নারীদের ভোটাধিকারের ইতিহাসে এক স্বরণীয় দিন। ২১ বৎসর বয়সী সকল প্রাপ্তবয়স্ক নারী সেদিন ভোটাধিকারের যোগ্য বলে বিবেচিত হন।

কর্মসংস্থানে নারীঃ

আজ যে নারীকে তুমি পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অফিস আদালতে কাজ করতে দেখছো, গার্মেন্টস শ্রমিক থেকে শুরু করে বিমান চালনা-সবকাজে মেয়েরা সমানভাবে পারদর্শী। কিন্তু তুমি কি জানো, হাজার হাজার বছর যাবত মেয়েদেরকে ভাবা হতো তারা কেবলমাত্র ঘরের কাজেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখবে?

মামুন বললো, "কেন, আদিম সমাজে নাকি নারীরাই ছিলো পরিবারের প্রধান!"

জারিফ উত্তর দিলো, সে ইতিহাস অন্তত দশ হাজার বছর আগেকার। যখন মানুষ কৃষিকাজ জানতো না, পশু শিকার করে মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো তখন মানুষের মৃত্যু হয়ে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। নারী যদি সন্তান জন্ম দিতে না পারে, তাহলে মানুষের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। তাই সমাজ টিকিয়ে রাখার জন্য নারীর সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা আজও সমানভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার সময়ে চোখের পলকে বন্যজন্তুর আক্রমণে মানুষ মারা যেতো। তাই সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতাটা ছিলো সমাজের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

শুধুমাত্র সন্তান পেটে ধরার ক্ষমতার কারণেই নারীকে মর্যাদা দেওয়া হতো। কালক্রমে যখন মানুষের জীবনযাত্রা সহজ হয়ে পড়ে, তখন থেকেই নারীকে সমাজ আর মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। শারীরিক সক্ষমতায় যখন নারী পিছিয়ে, ঘরে বসে সন্তান জন্ম দেওয়া আর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।

এভাবেই হাজার হাজার বছর ধরে নারীর জন্য নানা বিধিনিষেধ প্রস্তুত করে পুরুষেরা। তার সাথে যোগ হয় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন।

নারী হারায় তার স্বাভাবিক যোগ্যতা। পুরুষের মনমতো চলাই হয়ে দাঁড়ায় নারীর নিয়তি। এর মাঝে অল্প কিছু হয়তো ব্যতিক্রমী উদাহরণ আছে; কিন্তু সেটা ধরা অবশ্যই অন্যায়। কারণ, ১০ লাখে ৫ জন নারীর ব্যতিক্রমী চলাফেরা কখনোই উদাহরণ হতে পারে না।

যাই হোক, সে অনেক কথা। সে আলোচনা বাদ দিয়ে আমরা বিংশ শতাব্দীতে নারীর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের শুরুর দিকটার কথা আলোচনা করবো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নারীর জগতকে বদলে দেয়ঃ

ভোটাধিকার আন্দোলন দেশে দেশে চলার মধ্য দিয়েই নারী অন্যরকম এক বাস্তবতার শিকার হয়। সেটা হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। লাখ লাখ সৈন্য যুদ্ধরত। কল-কারখানা থেকে শ্রমিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গিয়েছে। এখন এই কলকারখানা গুলো চালাবে কে?

পশ্চিম ইউরোপের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দিয়ে বলে কয়ে নারীকে কর্মজগতে প্রবেশ করালো। এই প্রথম নারী ঘর থেকে বের হলো পুরুষের সমান কাজ করবে বলে।

তাই বলে কি হাজার হাজার বছর ধরে নারী পুরুষের সমান ছিলো না?

অবশ্যই ছিলো। কিন্তু নারীকে দমিয়ে রেখেছে পুরুষের তৈরি অজস্র বিধিবিধান। পুরুষই এবার বাধ্য হলো নারীকে কর্মক্ষেত্রে পাঠাতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শিল্পসমৃদ্ধ যুদ্ধরত দেশগুলির অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে-পুরুষেরা যুদ্ধক্ষেত্রে, আর নারীরা কর্মক্ষেত্রে।

নারীরা কর্মক্ষেত্রে আশানুরুপ সাফল্য পেলো। পশ্চিমা সমাজ বুঝতে পারলো নারীকে দিয়ে সবকাজ সম্ভব। নারী বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে আরও বেশি দক্ষতার সাথে কাজ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার পরিস্থিতি পশ্চিমের নারীদেরকে আমুল বদলে দেয়। পুরুষতন্ত্র বাধ্য হয়ে যে নারীকে কর্মক্ষেত্র পাঠালো-এখন নারী আর ঘরের কোণে বসে থাকতে রাজি নয়। সে এখন পুরুষের সাথে সব কাজে অংশ নিতে আগ্রহী। নারীবাদী চিন্তাধারা উৎকর্ষ লাভ করলো। যদিও নারীবাদী চিন্তাধারার শুরুটা অনেক পুরনো।

নারীবাদী চিন্তাধারাঃ-

নারীবাদী চিন্তাধারায় আমরা কেবলমাত্র পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার নারী সমাজের চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করবো। প্রাচ্যদেশের নারী সমাজকে নিয়ে আমরা কোনো কথাই বলবো না।

নারীবাদী চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনার প্রথমেই আমাদের জানা উচিত-নারীবাদ কি জিনিস।

নারীবাদ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে-Feminism.

১৮৯৪ সালে নারীবাদ এর প্রতিশব্দ হিসেবে ইংরেজি শব্দটি গৃহীত হয়। তবে ১৯৩৩ সালে অক্সফোর্ড অভিধানের পরিশিষ্টতে এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

নারীবাদ হচ্ছে-এমন একটি আন্দোলন, যা কিনা পুরুষের মতো একজন মানুষ হিসেবে নারীর পূর্ণ অধিকার দাবী করে।

লক্ষ্যণীয়-নারীবাদ কথাটি থাকলেও পুরুষবাদ কথাটি কিন্তু প্রচলিত নয়। কারণ, ধরে নেওয়া হয় পুরুষ তার ইচ্ছেমতো ভুবন সৃষ্টি করতে পারে,কিন্তু নারী বিভিন্ন বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। তাই, নারীবাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

নারীবাদী চিন্তাধারাকে মোটামোটিভাবে চারভাবে ভাগ করা যায়ঃ-

ক. উদারপন্থী নারীবাদ
খ. আমূল নারীবাদ
গ. মার্কসীয় নারীবাদ
ঘ. সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ

এগুলো সম্পর্কে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার।

ক.উদারপন্থী নারীবাদ-

নারীবাদী চিন্তাধারার জগতে উদারপন্থী নারীবাদ সবচেয়ে সফল। কারণ উদারপন্থী নারীবাদ নারীদেরকে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলাকে সমর্থন দিয়েছে। উদারপন্থী নারীবাদের জননী হিসেবে সবার আগে আসবে মেরী ওলস্টোনক্রাফট এর নাম। ১৭৫৯ সালে ফ্রান্সে জন্ম নেওয়া মেরী ওলস্টোনক্রাফট শৈশবে মায়ের উপর অকথ্য নির্যাতন দেখেছেন। মেরী মনে করেন-নারীর প্রতি এই বৈষম্য সমাজেরই সৃষ্টি। মেরী মনে করেন-যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমেই নারী মুক্তি সম্ভব। ১৭৯০ ও ১৭৯২ সালে যথাক্রমে তিনি দুইটি বই লিখেছিলেন-A vindication of the rights of Men,ও A vindication of the rights of women.

জন স্টুয়ার্ট মিল ও হ্যারিয়েট টেইলর মিল উদারপন্থী নারীবাদী হিসেবে স্বীকৃত।

তবে উদারপন্থী নারীবাদীদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী হচ্ছেন-বেটি ফ্রাইডান। তাঁর লেখা-The feiminine mystique-বইয়ে তিনি নারীর প্রচলিত সনাতন ভূমিকাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। বেটি ফ্রাইডানের মতে - নারী কেন শুধুমাত্র গৃহস্থালি কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করে রাখবে? তাঁর মতে সামান্যতম সুযোগ পেলেই গৃহে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই নারী সমান দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম।

খ. আমূল নারীবাদ-

আমুল নারীবাদ একটু বৈপ্লবিক ধারণা পোষণ করে। এ ধারার নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন-জৈবিক কারণেই নারীরা পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত হন। শুলামিথ ফায়ারস্টোন এ ধারার একজন নারীবাদী চিন্তাবিদ। তিনি মনে করেন-নারী–পুরুষের মধ্যকার প্রজননমূলক সম্পর্ক হচ্ছে ইতিহাসের মূল চালিকশক্তি।

তিনি মনে করেন-নারীর জৈবিক গঠনই নারীদের প্রধান শত্রু।

গ. মার্কসীয় নারীবাদ-

মার্কসীয় নারীবাদ হলো সমাজতন্ত্রের জনক-কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এর কথামালা।

মার্কসীয় দৃষ্টিকোন থেকে -শ্রেণিহীন সমাজ যখন আদিম যুগে ছিলো তখন নারীরাই ছিলো পরিবারের কর্তা। এঙ্গেলস এর মতে-মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ নারী জাতির এক ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করলো, নারী হলো পদানত, শৃঙ্খলিত; পুরুষের লালসার দাসী ও সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।

নারী মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন সমাজ থেকে শ্রেণিবৈষম্য উঠে যাবে।

ঘ. সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ-

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মার্কসীয় নারীবাদ থেকে একটু স্বতন্ত্র। তাদের মতে নারীর বৈষম্যের মুল কারণ হলো-পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি। পুঁজিবাদ কখনো নারী শোষনের একমাত্র কারণ হতে পারে না। পুঁজিবাদের চেয়ে বড় হলো পুরুষতন্ত্র। পুরুষতন্ত্রের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিই নারীদের দুর্দশার মূল কারণ।

জাতিসংঘ ও নারীঃ-

নারীর অগ্রগতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ নারীর অধিকারের প্রতি বিশ্ব মানবতার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার জন্য ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ঘোষণা করে এবং ১৯৭৬-৮৫ সময়কালকে আন্তর্জাতিক নারী দশক ঘোষণা করে। তাছাড়া ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ সব ধরনের নারী বৈষম্য দূরীকরনের সনদ সিডও-(CEDAW) অনুমোদন করে। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিডও সনদকে

নারী বর্ষ ও নারী দশকের অসামান্য বিজয় হিসেবে লাভ করতে সমর্থ হয়েছে বিশ্বের নারী সমাজ। বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলন। এগুলো হচ্ছে-

মেক্সিকো-১৯৭৫
কোপেনহেগেন-১৯৮০
নাইরোবি-১৯৮৫
বেইজিং-১৯৯৫

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডওঃ-

নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের বৈশ্বিক প্রচেষ্টার একটি অন্যতম ফসল হলো জাতিসংঘ সিডও সনদ। নারীর প্রতি সকল প্রকার বেষম্য দূরকার এবং সামাজিক,অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে গৃহীত জাতিসংঘ সনদ হলো এই সিডও। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়-"নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ"। যার বিস্তারিত নাম হচ্ছে-Convention of the elimination of all forms of discrimination aganit women.-যেটি সংক্ষেপে সিডও সনদ নামে সর্বাধিক পরিচিত।

সিডও সনদে ৬টি পরিচ্ছেদ সংবলিত ৩০টি ধারা বা বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর সিডও সনদ অনুমোদন করে।

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জিঃ-

১. মহাযুদ্ধের নায়ক হিটলারঃ *আনিস সিদ্দিকী।*
২. ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গঃ *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।*
3. The second world war: *Michael howard*
4. History of Hong kong: *Frank welsh*
5. A history of Japan: *George bailey sansom*
6. The age of empire: *E. J. Hobsbawm*
7. Jerusalem, the biography: *Simon sebag montefiore*
8. History of the second world war: *Liddle-hart*
9. The tragedy of liberation: *Frank dikotter*
10. Franco, A personal and political biography: *Stanly G. payne*
11. The vietnam war: *Peter lowe*
12. The russian revolution: *Sean mcmeekin*
13. Diplomacy: *Henry kissinger*
14. White house years: *Henry kissinger*
15. Origins of the cold war: *Melvyn P david S*
16. 1989:the year that changed the world: *Michael meye*
17. A history of the soviet union-from the begining to the end: *Peter kenez*
18. The cold war: A world history: *Odd arne westad*
19. 100 mistakes that changed history: *Bill facett.*

অ্যাডভেঞ্চার প্রকাশনী কর্তৃক যে বইগুলি অচিরেই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে-

- ☆ গল্পে গল্পে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস
- ☆ গল্পে গল্পে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ
- ☆ গল্পে গল্পে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন
- ☆ ইংরেজি বাক্যের ময়নাতদন্ত
- ☆ আফগান বীরত্বগাঁথা ও ট্র্যাজেডি
- ☆ স্নায়ুযুদ্ধের পঞ্চপাণ্ডব
- ☆ স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বরাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সংগঠন
- ☆ মধ্যপ্রাচ্যের পাঁচ খেলোয়ার
- ☆ গল্পে গল্পে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ
- ☆ এ্যাকাউন্টিংয়ের স্বর্ণসূত্রের সন্ধানে
- ☆ মায়ানগরী মুম্বাই

চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য জনপ্রিয় গ্রুপ-ইংলিশ অ্যাডভেঞ্চার গ্রুপে যোগ দিন। চাকরির বাজারে নিজেকে এগিয়ে রাখুন।